বহ্নিবলয়

মৈনাক

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সমসাময়িক কালকে নিয়ে কিছু লেখা সেধে বিতর্ককে আহ্বান করা, বিশেষ করে সে রচনায় যদি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ থাকে। সুতরাং সূচনাতেই বলে রাখি আমি ইতিহাস লেখার প্রয়াস করি নি, কাল্পনিক পাত্র-পাত্রীদের নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছি।

বহ্নিবলয় রচনার কাল ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯ সন। প্রকাশনার নানাবিধ অনিবার্য অসুবিধার জন্য এতদিনে উপন্যাসটি প্রকাশিত হলেও এর পাণ্ডুলিপিতে আমি কোন গুরুতর পরিবর্তন সাধন করি নি। সুতরাং চার বৎসর পূর্বের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আজকে সত্য বলে প্রমাণিত হলেও এটা নিছক কাকতালীয় ঘটনা।

বহ্নিবলয় রচনা ও প্রকাশনের ব্যাপারে সর্বাগ্রে আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী ও শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়ের অবদানের কথা স্বীকার করি। তাঁর কাছে আমার ঋণের পরিমাণ নিত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে খাটো করতে চাই না। অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় ধৈর্য সহকারে সমগ্র পাণ্ডুলিপি পড়ে যে সব বহুমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন, তা উপন্যাসটির মানোন্নয়নে প্রভূত সহায়তা করেছে।

বহ্নিবলয়ের ভোজপুরী গানটি কাশীর কবিবন্ধু "সন্মার্গ" পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখরজীর রচনা। কল্যাণীয়া সবিত্রী দত্ত প্রুফ দেখায় সহায়তা করেছেন। আর যাঁদের কাছে এ লেখক ঋণী, তাঁদের কথা পৃথক ভাবে উল্লেখ করলাম না। তাঁদের পরিচয় এ উপন্যাসের পাঠক স্বয়ং পাবেন।

বৈশাখ, ১৩৭০

মৈনাক

বহ্নিবলয়

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥"

—ঈশোপনিষদ

প্রাক্কথন

"হ্যাঁ, উনি—ঐ উনিই কৌশিকদাকে খুন করেছেন।" আসামীর কাঠগড়ার ভিতর দণ্ডায়মান নারীমূর্তিটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মীনাক্ষী তীব্র কণ্ঠে তার বক্তব্য ঘোষণা করল। উত্তেজনায় তার সর্বশরীর বাত্যাবিক্ষুব্ধ ব্রততীর মত থরথর কম্পমান। বাঁ হাতে সজোরে সাক্ষীর কাঠগড়া আঁকড়ে ধরে পতনের বেগ সামলে নিয়ে মীনাক্ষী আবার কঠিন কণ্ঠে বলল, "রাত অন্ধকার হলেও পাঁচিলের আড়াল থেকে আমি স্বাহাদিকে ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটাতে দেখেছি।" মীনাক্ষী তার অবাধ্য রুক্ষ চুলের গোছা মুঠি করে পিছনের দিকে সরিয়ে দিতে দিতে অন্তর্ভেদী কঠিন দৃষ্টিতে স্বাহার দিকে চেয়ে রইল।

স্বাহা নির্বাক নিস্তব্ধ। দুই হাতে আসামীর কাঠগড়া আঁকড়ে ধরে সে অধোবদনে দাঁড়িয়ে আছে। ও যেন ভরাডুবী হওয়া কোন অর্ণবপোতের ভূতপূর্ব কাণ্ডারী। সর্বনাশের অভাবনীয়তায় ও প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে।

কোর্টে মামলা উঠেছে। মোহনপুরের চাঞ্চল্যকর জোড়াখুনের মামলা। সাধারণ খুন নয়—ডিনামাইট দিয়ে মূর সাহেবের বাংলো উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া গেছে দুটি মৃতদেহ—মূর সাহেব ও কমিউনিস্ট পার্টির বিখ্যাত কর্মী ও কিছুদিন যাবত ফেরার কৌশিক মিত্র।

আদালত ঘরের দর্শকদের প্রচণ্ড ভিড়ে নড়াচড়া দায়। রুদ্ধ নিশ্বাসে সবাই সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। মামলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী অভিযুক্ত স্বাহা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্রী ও শিষ্যা মীনাক্ষী সাক্ষ্য দিচ্ছে।

পাবলিক প্রসিকিউটার তাঁর অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যে চশমাজোড়া চেপে ধরে স্বাহার দিকে বাহু প্রসারিত করে বললেন, "চুপ করে থাকলে চলবে না—বলুন, কেন আপনি কৌশিকবাবুকে মারার জন্য মূর সাহেবের বাংলোয় ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন? আপনার সঙ্গে কিসের শত্রুতা ছিল তাঁর?"

স্বাহা ধীরে ধীরে মাথা তুলল। ক্লান্ত ক্ষীণ কণ্ঠে আপন মনে বিড় বিড় করে কি যেন একটু উচ্চারণ করে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করল। আদালত গৃহের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যে জনসমাবেশ হয়েছিল, তার উপর স্বাহার অর্থহীন দৃষ্টি ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু ও কে—কে ওখানে ঐ কোণের দিকে বসে আছে? দীর্ঘাঙ্গী গৌরকায় কৃষ্ণবর্ণ পোশাকে আচ্ছাদিত তনু আর এক বিষাদপ্রতিমা? ঐ—

ঐ তো এলসি, যে তাকে সর্বস্বান্ত করে পরাজিত করেছে। যাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য ও সেই সর্বনাশা পদক্ষেপে ব্রতী হয়েছিল, স্বাহাকে ব্যঙ্গ করার জন্যই বুঝি আজ সেই এলসি এসেছে কোর্টে। এসেছে স্বাহার ভীষণ পরাজয়ের শেষ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে! না-না-না, ওর সামনে স্বাহা নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করবে না। ওর সামনে বিজয়িনীর গৌরবে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু—কিন্তু স্বাহা যে পারছে না, কিছুতেই পারছে না। এলসিকে মারতে গিয়ে ও কৌশিককে মেরেছে মনে পড়া মাত্রই ওর মস্তিষ্কের কোষে কোষে যেন সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। স্বাহা দুই হাতে চোখমুখ চেপে ধরল। ওর কণ্ঠ থেকে উন্মত্তের মত একটা বিকৃত আওয়াজ নির্গত হল।

পাবলিক প্রসিকিউটার অধীর ভাবে সামনের টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করে হুংকার ছাড়লেন, "ও রকম করে আইনের কবল এড়াতে পারবেন না মিস ব্যানার্জী। বলুন কৌশিকবাবুর সঙ্গে আপনার কিসের শত্রুতা ছিল যার কারণে আপনি তাঁকে এমন করে হত্যা করেছেন?" কেবল আসামীর স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়, প্রসিকিউটারকে খুনের কারণও প্রতিপাদিত করতে হবে।

আদালত গৃহ নিস্তব্ধ। বিচারক ভাবলেশহীন মুখে কলম হাতে বসে আছেন। দর্শক-দল অস্ফুট শব্দও করছে না। তাই ডিফেন্স-এর আইনের বই-এর পাতা ওলটাবার শব্দও কানে বাজছে।

স্বাহা আবার ধীরে ধীরে মুখ তুলল। অশ্রুসিক্ত বেদনাহত একটি মুখ। ওর কণ্ঠমণি কয়েকবার বুঝি নড়ে উঠল। তার পর যেন মরীয়া হয়ে ও ঘোষণা করল, "ও—কৌশিক আমাকে ভালবাসত।"

ভালবাসত! আদালত গৃহের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল।

বিচারক কলম থামিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রশ্ন করলেন, "তা হলে—তা হলে ওঁকে খুন করলেন কেন?"

যদি ভালবাসত তবে খুন করলেন কেন? আদালত ঘরে উপস্থিত প্রতিটি ব্যক্তির মনের প্রশ্ন বিচারকের কণ্ঠে মুখর হয়ে উঠল।

আবেগ কম্পিত কণ্ঠে স্বাহা উচ্চারণ করল, "হ্যাঁ বলছি—সেই কথাই বলছি আমি—।" কিন্তু কথা ক'টি শেষ হবার পূর্বেই স্বাহা কাঠগড়ার মধ্যে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

আদালত ঘরের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। জনতা শোরগোল করে উঠল।

বিচারক টেবিল চাপড়ে বললেন, "অর্ডার অর্ডার। আজকের মত কোর্ট মুলতুবী। দর্শকদের মধ্যে কোন চিকিৎসক আছেন কি?"

সাময়িক মূর্ছাভঙ্গের পরই স্বাহাকে জেলের কাল রঙের বন্ধ গাড়িতে করে নিয়ে গেছে। নির্জন আদালত ঘরের বাইরে মীনাক্ষী তখনও অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে ছিল। মীনাক্ষীর পিঠে ধীরে ধীরে একটা হাত পড়ল। চমকে উঠে সে ত্রস্তভাবে পিছনের দিকে ফিরে তাকাল। এলসি। কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে মোড়া এলসি যেন শোকের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। মীনাক্ষী ওকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

এলসি ওর হাত ধরে ধীর পদক্ষেপে সম্মুখে দণ্ডায়মান জিপটির দিকে এগোতে এগোতে প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে বলল, "নো টিয়ার্স মাই গার্ল—কাঁদতে নেই। দেখছ না আমার চোখে জল নেই।"

মীনাক্ষীকে পাশে বসিয়ে এলসি গাড়িতে স্টার্ট দিল। মীনাক্ষী অঝোর ধারায় কেঁদে চলেছে। মুখে ওকে কাঁদতে মানা করলেও এলসির মনে হচ্ছে যে সে নিজেও যদি একবার প্রাণ খুলে কাঁদতে পারত! আজ এই কয় মাস ধরে যে পাষাণ-ভার ওর বুকে অনড় হয়ে চেপে বসে শ্বাসরুদ্ধ করে মারার উপক্রম করছে, তা হলে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেত। কিন্তু—কিন্তু এলসির সমস্ত অনুভূতি এমন অসাড় হয়ে গেছে যে একদিনের জন্যও সে কাঁদতে পারল না।

শুধু কি এই কয় মাস? এলসির সমস্ত জীবনই যেন মরুভূমির মত বন্ধ্যা ঊষর—জলবিন্দুর প্রেমস্পর্শবিহীন। তাই চোখের জল কোথা থেকে আসবে? এলসি সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে দৃঢ় মুষ্টিতে ষ্টিয়ারিং চেপে ধরল। গাড়ি টাটা কারখানার এলাকা ছাড়িয়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলেছে। স্টেশন ছাড়িয়ে একটু এগোলেই জামসেদপুর শহর প্রক্ষিপ্তের মত পিছনে পড়ে থাকবে, সামনে দেখা দেবে এলসির এই কয় বছরের কর্মভূমি ধলভূমের উপল বিস্তীর্ণ বন্ধুর প্রান্তর ভূমি। গ্রামময় ধলভূমের নিস্তরঙ্গ জীবনের সঙ্গে বিগত কয় বছরে এলসিও যেন নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল; কিন্তু কোথা থেকে যে দু বছর পূর্বে তার জীবন-সায়রে কৌশিক একটা প্রচণ্ড ঢেউ তুলল, তার ফলে সমস্ত কিছু ওলট পালট হয়ে গেল। দিনগুণতিতে প্রায় দু বছর হয়ে গেলে কি হবে, মনে হয় যেন এই সে দিনের কথা।

॥ এক ॥

মোটরের এক্সিলারেটরে আরও একটু চাপ দিল এলসি। জ্যৈষ্ঠ মাসের অপরাহ্ণ। ধলভূমের লাল কাঁকুরে মাটি প্রখর রৌদ্রতাপে ঝলসে যাচ্ছে। মুরমের রাস্তা দিয়ে আগুনের হল্কা উঠছে। জিপের পিছনে ক্যানভাসের পর্দা ফেলা থাকলে কি হবে? চালকের আসনের দু পাশের খোলা জায়গা দিয়ে হু হু করে গায়ের চামড়া ঝলসান অনলস্রোত দুর্বার গতিতে আসছে। দূরের বাঁকটার কাছে মাটি থেকে যেন ধোঁয়া উঠছে। অদ্ভুত সাদা রঙের সর্পিল ধোঁয়া ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ করে অনলস্রাবী লক্ষ লক্ষ কালভুজঙ্গের মত ধূসর গগনাভিমুখে তাদের তৃষ্ণিত লোল রসনা বিস্তার করে দিয়েছে। থেকে থেকে বাতাসে একটা চাপা গোঙানি। উঁ উঁ উঁ—অযুত নাগিনীর নাগপাশে পিষ্ট-ব্যথিতা ধরণীর কাতর আর্তনাদ!

এলসি একবার হাতঘড়িটার দিকে তাকাল। বেলা সোয়া তিনটে। দশটা থেকে এ পর্যন্ত পরিশ্রমের চূড়ান্ত হয়েছে। চাকুলিয়া থেকে বহড়াগোড়াগামী রাস্তার মাঝ বরাবর মানুষ মুড়িয়া গ্রাম থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে বুরুহাতুতে ওদের কাইনাইট খাদানে আজ শ্রমিকদের মাইনে দেবার দিন ছিল। এলসিদের কেরানী নারায়ণবাবু জামসেদপুরের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে আগেই ওখানে পৌঁছেছিলেন। ছোটবাবু বিভাস সোমের সহায়তায় সকলের টিপসই নিয়ে মাইনে দেবার পর্ব সমাধা করতে প্রায় একটা বাজল। তার পর রোকড় মিলিয়ে হিসাবপত্র চুকিয়ে ওখানকার বাকী কাজ সারতে সারতে আড়াইটা। ছোট ছোট কয়েকটা খাদান এলসিদের আছে। খুব বেশী সংখ্যক কর্মচারী রাখার ক্ষমতা ওদের নেই এবং তার প্রয়োজনও পড়ে না। সুতরাং অনেক কাজ নিজেদেরই ঘাড়ে পড়ে। বুরুহাতুর কাজ সেরে আড়াইটায় সে তার জিপে চড়েছে। এখনও প্রায় আধ ঘণ্টার পথ বাকী। আজ ছয় বৎসর ভারতবর্ষে এলেও এখনও এখানকার আবহাওয়া তার সম্পূর্ণ ধাতস্থ হয় নি, বিশেষ করে এই গরম কালটা একেবারে প্রাণান্তকর! কতক্ষণে নিজেদের মোহনপুরের বাঙ্‌লোতে গিয়ে একবার স্নান সেরে তার নিজের কামরায় খসখসের পর্দার অন্তরালে আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিতে পারবে—তাই চিন্তা করতে লাগল এলসি।

এলসি একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের দিকে তাকাল। ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী ডিউক জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে। জিভের ডগা দিয়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে পড়ছে। ইংলণ্ডের মত শীতপ্রধান দেশের এই সারমেয়ও এই নিরক্ষ-

দেশীয় গ্রীষ্মে কাতর। তায় এলসেসিয়ানরা আবার একটু আয়েসপ্রিয়। এলসির মনে পড়ে ডিউক্‌কে কতটুকু অবস্থায় ওর মাসীর বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল। দেশ ছেড়ে স্থায়ী ভাবে চলে আসার পূর্বে মাসীর সঙ্গে দেখা করতে ওরা ডেভনশায়ারে ওদের ফার্ম হাউসে গিয়েছিল। মাসীর বাড়ি থেকে চলে আসার পূর্বে ওরই ছোট বোন অ্যান্ ওকে তার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পত্তি ডিউকের মা জিমিকে দেখাতে নিয়ে যায়। অ্যান্দের আস্তাবলের পাশে একটা পপলার গাছের গোড়ায় জিমির ঘর। তারই মধ্যে তিনটে বাচ্চা শায়িতা জিমির বুকের উপর পরস্পরের সঙ্গে ঢুসাঢুসি করতে করতে দুধ খাচ্ছিল।

অ্যান্ই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বদেশ ছাড়ার প্রাক্কালে ওকে একটা বাচ্চা উপহার দেবার প্রস্তাব জানাল। এলসি সানন্দে সে প্রস্তাব স্বীকার করে একেবারে ছাই রঙের বাচ্চাটা পছন্দ করে নিল। সেই বাচ্চা আজ কত বড় হয়ে এখন তার সর্বক্ষণের সাথী ডিউকে পরিণত হয়েছে। ডিউকের প্রতাপে তাদের বাঙ্‌লোর ত্রিসীমানার মধ্যে আসে কার সাধ্য! মোহনপুরের সাঁওতালরা ডিউকের প্রসঙ্গ উঠলে বলে, বাবা, উয়ার কাছে কে যাবেক? খালি হাতে শুধু একটা ডাং লিয়ে চিতার সামনে চলি যাব; কিন্তু কাঁড় লিয়েও যেন উয়ার কাছে নাই যাতে হয়। উটি যম রাজার খাস বাহন বটে। ছ বছরে কী প্রচণ্ড শক্তিশালী ও সুঠাম দেহের অধিকারী হয়েছে ডিউক। ছ বছর··· অনেকগুলো দিন বটে। এলসি মনে মনে হিসাব করে তার নিজের বয়সই তো চৌত্রিশ হয়ে গেল। আটাশ বছর বয়সে তাদের জাহাজ ডোভার থেকে নোঙর তুলেছিল। তার পর কত বসন্তই এল গেল; কিন্তু এলসির জীবন-তরণী কোথাও নোঙর গাড়তে পারল না। জীবনের যে বসন্ত স্টুয়ার্টের সঙ্গে বিদায় নিয়েছিল, তা আর ফিরে এল না।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে এলসি নিজেকে প্রবোধ দিয়ে মনে মনে বলল যে তার জীবনে তো কোন অভাব নেই। এলসির জীবনকে স্টুয়ার্ট রূপ রস ও গন্ধে ভরে দিয়েছিল। স্টুয়ার্টের সঙ্গে পূর্বরাগের তিনটি বছর যেন তার কাছ থেকে উপহার পাওয়া কাব্য-সঙ্কলন থেকে বেছে নেওয়া শেলীর তিনটে কবিতা। সে কাব্য উষ্ণ প্রাণচঞ্চল এবং হৃদয়ের আকুতি ও আর্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু তবু একটা কাঁটা কোথায় যেন খচ্ খচ্ করে—ক্ষণস্থায়ী··· কত ক্ষণস্থায়ী সেই মধুমাস।

মনে পড়ে এই রকম মে মাসে সুযোগ পেলেই তারা দুই জনে "কিউ

গার্ডেনসে” চলে যেত। হাইড পার্কে বড় ভিড়, তাই বেড়াবার জায়গা হিসাবে এলসি নির্জনতর ঐ উদ্যানকে পছন্দ করত। একুশ বছরের মেয়ে আর তেইশ বছরের ছেলে। জীবনের কতটুকুই বা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের? কিন্তু পরিবেশেরও একটা প্রভাব আছে। এলসিদের মত কোলাহলবিমুখ প্রেমিক-প্রেমিকাদের বিহারভূমি বসন্তের “কিউ গার্ডেনস” তাদের মনোরাজ্যে ওলট-পালট ঘটিয়ে দিল। এদিকে ওদিকে জোড়ায় জোড়ায় যুবক-যুবতী বসে আছে মুখোমুখী হয়ে। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় পরিষ্কার নীল আকাশের তলে একটি পুষ্পিত লাইলাকের গোড়ায় তারাও অনেকের মধ্যে একটি যুগল হয়ে আসন গ্রহণ করল।

ঝির ঝির করে স্নিগ্ধ সমীরণ বইছে, থেকে থেকে কোন্ বৃক্ষচূড় থেকে এক জোড়া মেভিস পাখী ডাকছে। এলসি জানে যে ওরাও জোড়ায় জোড়ায় ঘোরে। চতুর্দিকে কত বাটারকপ, প্রিমরোজ আর ডেইজি ফুলের বর্ণাঢ্য সমাবেশ। বাতাসে পুষ্পরেণু ছড়িয়ে পড়েছে। এলসি বুক ভরা শ্বাসে সুগন্ধী মলয় টেনে নিচ্ছিল। স্টুয়ার্টের হাতে ওর হাত বাঁধা। মুখে কারও কথা নেই। অনেকক্ষণ পর স্টুয়ার্ট বলল, লিসি ডিয়ার, কী সুন্দর—না? শরমে আরক্তিম-গণ্ড এলসির মাথা আপনিই নীচু হয়ে আসে, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে সে স্টুয়ার্টের পাশে ঘাসের হরিতাভ গালিচার উপর নিজের শিথিল দেহ এলিয়ে দেয়। উষ্ণ কম্পিত করস্পর্শে স্টুয়ার্ট এলসির করপল্লব সজোরে চেপে ধরে।

ঘটাং ঘট্। একটু অন্যমনস্ক হওয়ায় গাড়ির একটা চাকা রাস্তার একটা খানায় পড়ে গিয়েছিল। বাঁ পায়ে ক্লাচ চেপে এলসি চট করে গীয়ার বদলে দেয়। গোঁ গোঁ করতে করতে গাড়ি খানা থেকে উঠে পড়ে। এলসি পাশের দিকে তাকিয়ে দেখে যে সে প্রায় ধলভূমগড় স্টেশনের কাছে এসে গেছে। ঐ তো “রিট্রিট” নাম লেখা বাড়িটা। এলসি থার্ড গীয়ার দেয়। বাঁ হাতের রাস্তা ধরে একটু এগোলেই ধলভূমগড় স্টেশন।

এলসির একবার ইচ্ছা হল যে ইন্দুবাবুর বাড়ি যায়। স্টেশনের কাছেই পাঁচিলে ঘেরা ইন্দুবাবুর বাড়ি আর অফিস। ওঁর পাথরের খাদান আছে। ঘাটশীলার পথে নরসিংহগড় ছাড়ালেই বাঁ হাতের দিকে তাঁর খাদান। এলসিদের মত কাইনাইট বা ঐ জাতীয় কোন ধাতব প্রস্তর নয়, কোয়ার্ডস ও স্টোন চিপস্-এর কারবার করেন ইন্দুবাবু। কোথায় কোন্ রাস্তা হবে, কার বাড়ি তৈরী হবে, তার জন্য ঠিকাদাররা ইন্দুবাবুর কাছ থেকে ওয়াগন

বোঝাই পাথর কিনতে আসেন। একেবারে পাথর বেচা পয়সা ইন্দুবাবুর রোজগারের সূত্র হলেও উনি কিন্তু পাথরের মত নন মোটেই। অবশ্য এলসির ভাব বিশেষ করে তাঁর স্ত্রী বীণা দেবীর সঙ্গে। ছয় বৎসর কাল স্বজাতীয়দের সম্পর্কচ্যুত হয়ে কাটাতে হলে স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে ভাব করতেই হয়। বিশেষ এলসি যখন জানে যে তাদের আর দেশে ফিরে যাবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বাবা থেকেও এক রকম নেই বলতে হবে, সর্বক্ষণ তিনি নিজেকে নিয়েই মশগুল। বীণা দেবী ছাড়া ধারে কাছে এলসির কোন বান্ধবীও নেই। কাজের সময় ছেড়ে দিলে বাকী সময়ের সবটুকু কেবল বই বা রেডিও নিয়ে কাটান যায় না। তাই ইন্দুবাবুর বাড়ি ছাড়া তার আর সঙ্গী সাথীর সাহচর্য পাবার উপায় নেই।

বীণা দেবীর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করার একটা অসুবিধা ছিল ভাষা। বীণা দেবী সুশিক্ষিতা এবং ইংরাজী জ্ঞানসম্পন্না হলেও বিদেশী ভাষায় বাক্যালাপে তেমন পটু নন। কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ করেন তিনি। তবে মন মিললে ভাষায় আটকায় না। খাদানের কাজের প্রয়োজনে এলসি বাঙলা বুঝে নিয়ে কোন মতে তার একটা জবাব দেবার মত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। ভুল ভ্রান্তি হত না বা আটকে যে যেত না, তা নয়। তবে বীণা দেবীর সাহচর্য পাবার লোভে এলসি এতদিনে কাজচলা গোছের বাঙলা শিখে নিয়েছে। তাই কতক বাঙলা, কতক ইশারা এবং শেষ অবধি ভাষায় না কুলালে ইংরাজী দিয়ে তারা কাজ চালিয়ে নেয়। ভাবতেও কেমন যেন বিস্ময় জাগে এলসির। ছয় বৎসর পূর্বে কেই বা স্বপ্নে এসব কথা চিন্তা করতে পারত।

কিন্তু না, এখন বীণা দেবীর কাছে যাওয়া চলবে না। গ্রীষ্মকালের ভারতবর্ষে বেলা চারটের মানে অপরাহ্ণ নয়। এ সময়ে কি কারও বাড়িতে যাওয়া চলে! এলসির জিপ সোজা ছুটে চলল। অকস্মাৎ মৃদু মন্দ শীতল বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। ছোট একটা শাল জঙ্গলের বুক ভেদ করে রাস্তা চলে গেছে। জঙ্গলটি আয়তনে ছোট হলেও গাছগুলি পুরাতন ও দীর্ঘ। বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় নবীন পত্রমঞ্জরীর সজ্জা। ঈষৎ রক্তিমাভ কিশলয় সমূহে সবুজের ছোপ ধরা শুরু করেছে। একটা কাঠবিড়ালী তার শরীরের চেয়েও দীর্ঘ ও স্ফীত পুচ্ছ মাথার উপরে তুলে রাস্তা পার হচ্ছিল। মোটরের শব্দে কয়েক লহমার জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সামনের পা দুটি বুকের কাছে তুলে পিট পিট করে এক ঝলক দেখে নিয়েই আবার রাস্তার অপর

প্রান্তের দিকে দৌড় মারল। কাঠবিড়ালীটির ভাব ভঙ্গী দেখে এলসির হাসি পেল।

লেফট্ রাইট্ লেফট্—হল্ট! শাল জঙ্গল পিছনে পড়ে রয়েছে। বাঁ দিকের মাঠটির শেষ প্রান্তে কয়েকটি আম গাছের ছায়ায় গুটি পনের বালককে ড্রিল করাচ্ছেন তাদের একজন শিক্ষক। সকলের অঙ্গেই খাকীর পোশাক। এলসি প্রথম দিনের মত বিস্মিত হল না। নরসিংহগড় হাইস্কুলের এ. সি. সি. এরা। তবে প্রথম যেদিন সে এদের দেখে, সেদিন তার বুকের রক্ত ছলকে উঠেছিল। আবার যুদ্ধ লাগল নাকি? যুদ্ধ? তার যে বীভৎস রূপ তারা লণ্ডনে দেখেছে! অকস্মাৎ দিগ্বিদিক মথিত করে সাইরেনের আর্তনাদ উঠল—আঁ আঁ আঁ, আঁ আঁ আঁ। প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গে জার্মান বিমানের গুঞ্জন শোনা গেল—গোঁ ওঁ ওঁ, গোঁ ওঁ ওঁ। এ দিক থেকে এক ঝাঁক স্পিটফায়ার আকাশে উঠল তাদের বাধা দিতে। অন্তরীক্ষেই লড়াই বেধে গেল। মাঝে মাঝে চোখ ধাঁধাঁন আলোর ছটা আর কানের পর্দা ফাটান আওয়াজ—বুম্ বুম্ বুম্, বুম্ বুম্ বুম্ বুম্। বাড়ির নীচের এয়ার রেড শেলটারের ভিতর এলসি কেঁপে কেঁপে উঠত। দিন নেই, রাত নেই, খাবার সময় হক বা কলেজে যাবার সময়—যখন তখন এই সংহারপর্বের সূত্রপাত হত ১৯৪১-৪২ খ্রীস্টাব্দের লণ্ডনের নাগরিক জীবনে। মাঝে মাঝে এলসির মনে হত আফ্রিকার জঙ্গলের পশুরাও বুঝি সর্বদা পরস্পরের ভয়ে এমন সন্ত্রস্ত থাকে না।

এলসি আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল যে রণদেবতার চির অতৃপ্ত ক্ষুধা মেটাতে গিয়েই তো মাকে হারাতে হয়েছে। বোমার বিস্ফোরণের ফলে বীভৎস ভাবে ছিন্নভিন্ন মায়ের মৃতদেহটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আতঙ্কে শিহরিত হয়ে এক পলকের জন্য এলসির চোখের পাতা আপনা আপনিই বুজে গেল। অস্ফুট স্বরে সে উচ্চারণ করল, ও যীশাস! ঐ দেবতারই ক্ষুধার উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে স্টুয়ার্ট। কে জানে আর কোন দিন তার সঙ্গে দেখা হবে কি না!

"অন ইওর আর্মস—মার্চ—লেফট্ রাইট্ লেফট্।" বন্দুকের বিকল্প লাঠি কাঁধে ফেলে এ. সি. সি.-রা কুচকাওয়াজ করে চলেছে। রাস্তাটা ঘুরে ওদের কুচকাওয়াজের মাঠের পাশ দিয়ে গেছে। এলসির মনে হল কোথায় যেন সে পড়েছে যে ইতিহাসের সব চেয়ে বড় শিক্ষাই হল এই যে মানুষ ইতিহাস থেকে কিছুই শেখে না। কার লেখা ঠিক মনে পড়ছে না। তবে

এক জন বিশ্ববিখ্যাত মনীষীর উক্তি ওটা। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে কি ইউরোপ থেকে এতদূরে ধলভূমের এই ছায়াচ্ছন্ন শান্ত প্রান্তরে ইউরোপের বীভৎসতা ও পৈশাচিকতার অক্ষম অনুকরণ হত? আর এদেশের এক অন্যতম সুসন্তান গান্ধীর মত অহিংসার পূজারী মহামানবের মৃত্যুর এত অল্পকালের মধ্যেই এই অক্ষম অনুকরণ! অক্ষম নয় তো কি? পারমাণবিক বোমার যুগে এই রকম করে আত্মরক্ষা করা যায় নাকি? দেশরক্ষার মূল কথা হল মনোবল, চারিত্র শক্তি। এর বিকাশ না হলে অস্ত্রশস্ত্র কোন কাজেই আসে না। আর আজকের সর্বাত্মক যুদ্ধের যুগে কেবল সৈন্যবাহিনীই যুদ্ধ করে না, যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভাগ নিতে হয় প্রতিটি নাগরিককে। তাই এই মনোবল ও চারিত্র শক্তির শিক্ষার প্রয়োজন আজ আরও ব্যাপক। "ভি ওয়ান", "ভি টু"-র যুগে লণ্ডন এ কথা চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণ করেছে।

এলসির গাড়ি নরসিংগড়ের ভিতর প্রবেশ করেছে। এক দল শিশু মোটর দেখে চেঁচাতে চেঁচাতে রাস্তার ধারে জমা হয়েছে। এলসি গাড়ির গতি মন্থর করল। তার পর হর্ন দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। শীর্ণকায় কালো কালো শিশুগুলি মোটর দেখার অকৃত্রিম আনন্দে চীৎকার করছে—হো ও ও, ও হো ও ও! পাঁচ ছয় বৎসরের মেয়েগুলিরও লজ্জা নিবারণের জন্য কয়েক আঙ্গুল চওড়া এক ফালি ন্যাকড়ার অতিরিক্ত কিছু জোটে নি। তাদের চেয়েও বড় বড় ছেলেরা একেবারে শব্দগত অর্থে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাবার পূর্বেকার আদমের প্রতিনিধি। ধলভূমের সত্যকার স্বরূপ, ভবিষ্যৎ ভারতের দেশরক্ষাকারী সিপাহী। এলসি চোখ ফিরিয়ে নিল।

দূর থেকে এখনও শিশুগুলির অস্পষ্ট চীৎকার কানে আসছে। বাঁ দিকে ইন্দুবাবুর খাদানের এলাকা পড়ল। আর একটু এগিয়ে বড় রাস্তাটা বাঁ হাতি মোড় নিয়েছে। রাত হলে এখান থেকে দূর প্রান্তরের ওপারে অবস্থিত মুসাবনীর আলোকসজ্জা দেখা যেত। দূর থেকে তখন মনে হয় যে মুসাবনী যেন পৌরাণিক ট্রয় নগরীর মত সমৃদ্ধির কনক-ছটায় ঝলমল করছে। কিন্তু এলসি ওদিকে যাবে না। তার গাড়ি ডান দিকে মোড় নিল। মোড়ের মাথায় একটা ছোট সাইনবোর্ডে ইংরাজীতে লেখা রয়েছে—"মোহনপুর কাইনাইট মাইনস"। লেখার নীচে একটি তীর চিহ্ন দিয়ে খাদানের দিক নির্দেশ করা হয়েছে।

এখন যে পথে এলসির গাড়ি চলছে, তাকে ঠিক রাস্তা বলা চলে না, জিপ ট্রাক বা ল্যাণ্ডরোভার ছাড়া অপর কোন যানবাহন এ পথে চলবে না।

অবশ্য গরুর গাড়ির কথা ওঠে না। এই গরুর গাড়ি চলা পথে কোথাও কিছু মাটি কেটে, কোথাও কিছু মুরম বা পাথর ফেলে এলসিরা রাস্তাটিকে তাদের জিপ আর ট্রাক চলার মত করে নিয়েছে। পাথর ওঠা পথের রেখা। গর্ত বাঁচিয়ে সাবধানে গাড়ি চালাতে হয়। এলসি দৃঢ় মুষ্টিতে স্টিয়ারিং চেপে ধরল। কিন্তু বেশীক্ষণ তাকে এভাবে গাড়ি চালাতে হল না। মিনিট আট-দশ সতর্ক ভাবে চালাবার পর মোহনপুর গ্রামের ভিতর তার গাড়ি এসে পড়ল। গ্রামের শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটুখানি মাঠ পেরিয়ে দুটি সাদা রঙের কোয়ার্টার্স। এগুলি এলসিদের কেরানীবাবুদের জন্য তৈরী হলেও মাত্র একটিতেই এখন লোক থাকে। খাদানের বড়বাবু নারায়ণবাবু এখানকার বাসিন্দা। দ্বিতীয়টি তাই ওদের অফিস ঘর। ছোটবাবু, অর্থাৎ বিভাস সোম এখানে থাকেন না। এখানে সঙ্গী সাথী না থাকায় নরসিংহগড়ে ভাড়া বাড়িতে থাকাই তিনি পছন্দ করেন। রাস্তার অপর পাশে একটি টিলার উপর ফুট চারেক উঁচু বৌদ্ধযুগের স্তূপের মত একটি ঘর। এলসিদের ম্যাগাজিন বা বারুদ ঘর এটি। মোহনপুর, বুরুহাতু বা তাদের কুদাদার খাদানে মাঝে মাঝে কখনও ব্লাস্টিং করার দরকার হয়। তার জন্য ডিনামাইট আর অন্যবিধ বিস্ফোরক পদার্থ ও তার সাজসরঞ্জাম মজুদ থাকে ওখানে। এলসি আবার ডান দিকে মোড় ফিরল। সামনেই আর একটি নাতিউচ্চ প্রস্তরময় টিলা আর তার শিখরদেশে এলসিদের বাঙ্লো। বাড়ির চতুর্দিকে ঈষৎ উচ্চ প্রাচীর। এলসির গাড়ি গর্জন করতে করতে চড়াই ভেঙ্গে বাঙ্লোর ফটকের দিকে এগোতে লাগল। মোটরের শব্দে একজন চাকর বাঙ্লোর ভিতর থেকে দৌড়ে এসে ফটক খুলে দিল। গাড়ি ভিতরে ঢুকে সোজা একটু সামনের দিকে গিয়ে তার পর বাঁ হাত ঘুরে গ্যারেজের ভিতর ঢুকে গেল।

॥ দুই ॥

অন্য কাউকে এ ভাবে দেখলে লোকে বিস্মিত হত। কিন্তু সেকেণ্ড মাস্টার কৌশিকবাবুর কথাই আলাদা। এই মাস কয়েক মাত্র তিনি নরসিংগড়ে এসেছেন। এর মধ্যেই অনেকে তাঁর বিচিত্র স্বভাবের কথা জেনে গেছে। তিনি মানুষ জনের সঙ্গে বড় একটা মেশেন না; সময় পেলেই শুধু বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ান। কোন কোন সময় তাঁকে দেখা যায় দূর গ্রামাঞ্চলে। ধলভূমগড় থেকে দূরে যুদ্ধের সময় চারটে গ্রামের লোককে দুদিনের মধ্যে

সরিয়ে দিয়ে এরোড্রোম তৈরী হয়েছিল। এলাকাটা এখন বিরাট পরিত্যক্ত জঙ্গলের মত পড়ে আছে। শুধু মাঝে মাঝে ভাঙ্গা বাড়ি দেখা যায়। বাড়ির চালের খাপরা ও দরজা জানালার পাল্লা মিলিটারীরা যাবার পর বিক্রি করে দিয়েছিল। এখন এলাকাটা রিজার্ভ জঙ্গলের আওতাভুক্ত হয়ে গেছে। গ্রাম থেকে যারা চলে গিয়েছিল, তারা আর ফিরে আসে নি। আশে পাশের গ্রামের লোক মাঝে মাঝে এই জঙ্গল থেকে কাঠ চুরি করতে আসে, আর কেউ কেউ পরিত্যক্ত বাড়িগুলির চৌকাঠ খুলে নিয়ে যায়। তবে কেউ একা আসে না, আসে দুই চার জন করে দল বেঁধে।

শাল পিয়াল মহুয়া পলাশ আর কেঁদের এই গভীর অরণ্যের ভিতর ভাঙ্গা বাড়িগুলির থম্‌থমে নির্জনতা যেন রূপকথার রুপার কাঠির পরশ লাগা রাজ্যের জনপদের কথা মনে করিয়ে দেয়। কৌশিকবাবু একা একা এই জঙ্গল ছাড়িয়ে আরও উত্তর দিকে কাঁকাড়াঝোরের রাস্তা ধরে এগিয়ে যান। ওদিকের সোনাপাহাড়ি কিতাডি বনগড়া ইত্যাদি গ্রাম থেকে ওঁদের স্কুলে ছাত্র আসে। কৌশিকবাবু নরসিংহগড়ের ডাক্তারবাবু, জমিদার মাহাতবাবু অথবা পুরাতন রাজাদের কারও সঙ্গে বা ধলভূমগড়ের ইন্দুবাবু বা তাঁর প্রতিবেশী কংগ্রেসের আলোকবাবু ইত্যাদি শিক্ষিত ভদ্রলোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করাটা কেন জানি তেমন পছন্দ করেন না। এই সব বনজঙ্গল এবং তার আরণ্য অধিবাসীদের সঙ্গেই কৌশিকবাবুর মাখামাখিটা বেশী। বনজঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে কোন কোন ছাত্রের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন তিনি। অভিভাবক মহলে সাড়া পড়ে যায়—আরে মাস্টরবাবু আসেছে। আন্ আন্, খাটিয়াটা আন্। আপ্যায়িত কৌশিকবাবু খাটিয়ার উপর বেশ জাঁকিয়ে বসে বলেন, তার পর খবর টবর সব কি রকম হে প্রধানের পো?

মাঝে মাঝে কৌশিকবাবু নিজেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান। এই বছর দুয়েক আগেও কি তিনি ভেবেছিলেন যে কলকাতা মহানগরী ছেড়ে তাঁকে ধলভূমের এই অরণ্যকুহেলীর ভিতর আসতে হবে? ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তাঁদের পার্টি বল্লভভাই ও তার প্রতিক্রিয়াশীল সঙ্গী-সাথীদের সমালোচনা করলেও নেহরুকে মোটামুটি সমর্থন করে আসছিল। কারণ তাঁরা জানতেন যে কূটবুদ্ধি এবং কমিউনিস্টদের গোঁড়া শত্রু বল্লভভাইএর ধারে কাছে ঘেঁষা বৃথা। বরং এককালীন মার্কসবাদী জওহরলালের রোমান্টিক স্বভাবের জন্য তাঁর কাছে প্রশ্রয় পাওয়া গেলেও যেতে পারে। আর কোন মতে যদি বল্লভভাই ও জওহরলালের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়া যায় তা হলে…।

তা হলে কাজ যে কত সহজ হয়ে যাবে সে কথা কল্পনা করতেও পার্টির কর্মীদের ঘরোয়া আলোচনায় কৌশিকবাবুদের শরীরে পুলক রোমাঞ্চ জাগত।

কিন্তু ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের আলোচনা সভায় এক নূতন বিশ্বনীতির ইঙ্গিত পাওয়া গেল এবং তার পরই সমাজতন্ত্রী শিবির ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে একযোগে রুখে দাঁড়াল। জার্মান ফ্যাসিস্টদের পরাভূত করার জন্য কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করলেও শ্রেণী সংগ্রামকে তো চিরকালের জন্য ঠাণ্ডা ঘরে রেখে দেওয়া যায় না। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই সমাজবাদী দেশগুলিকে ইঙ্গ মার্কিন ষড়যন্ত্র ও শোষণের মুখোশ খুলে দেবার জন্য কোমর বেঁধে লাগতে হল।

এ দেশেও তাঁরা নূতন ট্যাকটিকস নির্ধারণ করার জন্য একত্র হলেন, তবে তা কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য আওতায় নয়। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কলকাতায় দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ার যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। কৌশিকবাবুরা অবশ্য পূর্বেই পার্টির নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে খবর পেয়েছিলেন যে যুব সম্মেলনের আড়ালে এসিয়ার কমিউনিস্টরা নূতন লাইন অনুসারে কর্মসূচী স্থির করবে। আর বাস্তবে হলও তাই। এসিয়ায়, বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ায় দশ লক্ষ বর্গ মাইল এলাকার পনের কোটি অধিবাসীদের ভিতর অক্টোবর বিপ্লবের আদর্শে স্ট্রীট ফাইটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। কী গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নির্ণয় গৃহীত হয়েছিল তাঁদেরই কর্মভূমি কলকাতার বুকে। আর তার পরই এপ্রিলে ব্রহ্মদেশে, জুনে মালয়ের টিনের খাদান ও রবারের জঙ্গলে এবং সেপ্টেম্বরে দ্বীপময় ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্ট বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। একটি মাত্র ইঙ্গিতে সমগ্র এসিয়ায় সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল, এমন কি সুদূর ফিলিপাইনও শত শত মাইল ব্যাপী লবণাক্ত জলের ব্যবধান সত্ত্বে রক্ষা পেল না। "হুক"রা সেখানে রক্তপতাকা উড়িয়ে দিল।

কিন্তু না, এসিয়ার অপরাপর দেশের কথা থাক। কৌশিকবাবু আবার নিজেদের কথাতে ফিরে আসেন। নিজেদের, অর্থাৎ এ দেশের কমিউনিস্টদের স্ট্র্যাটেজি। যুব সম্মেলনের পর দিনই কলকাতায় তাঁদের পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল এবং তাঁদের আটশত প্রতিনিধি ছাড়াও বিদেশের পনের

জন বিশিষ্ট অভ্যাগত যোগ দিয়েছিলেন সেই অধিবেশনে। অস্ট্রেলিয়ার কমরেড শার্কে এবং ব্রহ্মদেশের কমরেড উ থান্ টুন তো সে সম্মেলনে ভারতের কমিউনিস্টদের নব কর্মসূচী সম্বন্ধে প্রোৎসাহিত করেন।

কৌশিকবাবু শ্যামল ছায়ায় ঘেরা সঙ্কীর্ণ পায়ে চলার পথটিতে চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন, তার পর পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখেন যে কখন তিনি পাকা সড়ক ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে কিতাডির রাস্তা ধরেছেন। এই শাল আর কেঁদের জঙ্গলের ওপারে তাঁর গন্তব্যস্থল। আধুনিক সভ্যতা ও সমাজের শেষ নিদর্শন ধলভূমগড় থেকে চাকুলিয়াগামী পাকা সড়ক এখন কত দূরে। বোধ হয় তাঁর বর্তমান জীবনধারা থেকে কলকাতার দূরত্বও অতখানি।

কলকাতার কথা মনে পড়ায় কৌশিকবাবু যেন চিন্তার হারান খেই খুঁজে পেলেন। কলকাতা কংগ্রেসেই পার্টিতে যে নূতন থিসিস স্বীকৃত হল তাতে নেহেরুকেও প্যাটেলেরই মত প্রতিক্রিয়াশীল বলে ঘোষণা করা হল ও নেহেরুর সমর্থক পার্টির পুরাতন সম্পাদককেও সরে গিয়ে নূতন কর্মসূচীকে রূপায়ণের উপযুক্ত অগ্নিগর্ভ নেতার জন্য স্থান করে দিতে হল। স্বাধীনতার নামে কংগ্রেসী নেতৃবর্গ কি ভাবে মাউণ্টব্যাটেনের চক্রান্তের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন তার কথা স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দিয়ে নূতন সেণ্ট্রাল কমিটি ভারতের খসড়া সংবিধানের প্রগতিবিরোধী ধারাগুলির তীব্র নিন্দা করল এবং তেলেঙ্গানার পদ্ধতিও পার্টির সরকারী সমর্থন পেল। আর তার পর প্যারিস কমিউন স্থাপনা করার সময়ের মত এসিড বাল্ব ও হাত-বোমার ট্যাকটিক্স মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করল কলকাতার পথে ঘাটে।

কৌশিকবাবু তখন এক বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে পার্টির কাজ করে চলেছেন। মূলতঃ বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমিক মহলেই তাঁর কাজ। পূর্ণ উদ্যমে তিনি ও ঐ ফ্রন্টের অন্যান্য কমরেডরা লেগে গেলেন পার্টির কর্মসূচীকে কার্যান্বিত করার জন্য। অদ্ভুত সাড়া পাওয়া যেতে লাগল ছাত্রদের কাছ থেকে। একটা নূতন কিছু, অসাধারণ কোন কিছু করার রোমান্টিক প্রেরণা বাঙালী ছাত্র ও তরুণ মহলে যে এতটা দৃঢ়মূল তা তিনি কেন, অনেকেই প্রথমে অনুমান করতে পারেন নি।

কিন্তু পুঁজিবাদীদের সুহৃদ ও সাম্রাজ্যবাদের বশম্বদ বিধান রায়ের সরকার আন্দোলনটা শক্তিশালী হবার পূর্বেই আঘাত করল। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে মার্চ বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা হল,

এবং পুলিস পার্টির বারটি অফিসে খানাতল্লাসী করে ষাট জন প্রমুখ কর্মীকে গ্রেপ্তার করল। বাকী যাঁদের গ্রেপ্তার করার সম্ভাবনা ছিল, তাঁরা আত্মগোপন করলেন এবং কৌশিকবাবুকেও সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। পার্টির দৈনিক মুখপত্রও এই সময় বন্ধ হয়ে গেল।

বাধ্য হয়ে আত্মগোপন করলেও কৌশিকবাবুদের কার্যকলাপ কিন্তু বন্ধ হল না। সরকারের আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করার জন্য তাঁরা উঠে পড়ে লেগে গেলেন। ২৭শে মার্চ তাঁদের প্রচেষ্টায় সমস্ত কলকাতার রাস্তায় ট্রাম আর চলল না এবং তার পর প্রায় প্রত্যহই শহরের কোন না কোন এলাকাতে ট্রামের গোলযোগ লেগেই থাকল। ট্রাম শ্রমিকদের ভিতর তাঁদের পার্টির সংগঠন বেশ দৃঢ়মূল ছিল বলে কোম্পানির সুপারভাইজারী স্টাফের সঙ্গে কেবল বচসাই নয়, হাতাহাতিও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়াল। কোন রকমে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ক্ষমতা দখল করতে হবে। সুতরাং বালিগঞ্জ রুটের ট্রামে আগুন লাগান হল, বেলগাছিয়ার ডিপোতে ধর্মঘট-বিরোধী আই. এন. টি. ইউ. সি মার্কা শ্রমিকদের উপর প্রস্তরবৃষ্টি হয়ে গেল এবং রাজাবাজারে টেলিফোনের তার কেটে আর লাইনের উপর ডাস্টবিন খাড়া করে ট্রাম বন্ধ করে দেওয়া হল। এর সঙ্গে সঙ্গে চলল এসিড বাল্ব ও ক্রাকার দ্বারা লক্ষ্যভেদ ও ১৪৪ধারা উপেক্ষা করে সেক্রেটারিয়েটে মাইক্রোফোন সহ শ্রমিক শোভাযাত্রা।

কোন মতে দু-চারবার গুলি চলুক এই তাঁরা চাইছিলেন। তা হলে হয়তো দেশবাসীর মনোভাবকে ত্বরিতগতিতে সরকারবিরোধী করে তোলা যাবে। অবশেষে পানিহাটির বাসন্তী কটন মিলসে সেই সুযোগ মিলল। দীর্ঘ পাঁচ মাস কাল ধর্মঘট চালিয়ে সেখানকার শ্রমিকেরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। নৈরাশ্য আর হতাশার তাড়নায় তাদের মেজাজ তখন তপ্ত বারুদের মত। ছোট্ট একটু স্ফুলিঙ্গ পড়ল তার উপর এবং তার পর শ্রমিকেরা ক্ষেপা কুকুরের মত বার বার গিয়ে মিল কর্তৃপক্ষের উপর লাফিয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত এল পুলিসবাহিনী ও তাদের সঙ্গে একজন ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু তাঁর কথায় কর্ণপাত করার জন্য তো কৌশিকবাবুদের পার্টি স্ট্রীট ফাইটের কর্মসূচী দেয় নি। অতএব মারমুখী শ্রমিকেরা একটু ইশারা পেতেই পুলিসদের উপর আক্রমণ করল এবং তার পর তাঁরা যা চাইছিলেন, তাই হল—হল গুলিবর্ষণ।

পানিহাটি এবং গ্রামাঞ্চলের কিছু গুলিবর্ষণ ও লাঠি চালনার পুঁজি নিয়ে তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচারের কাজে নামলেও এক কলকাতাস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট ছাড়া অন্যত্র তাঁরা জনসাধারণের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পেলেন না। ভারতের কেরেনেস্কী জওহরলালের সরকারের বিরুদ্ধে অক্টোবর বিপ্লবের মত জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ল না। দীর্ঘ দিন মানুষকে উত্তেজনার ঘূর্ণাবর্তে আটকিয়ে রাখা যায় না বলে ক্রমশঃ যেন তাঁদের আন্দোলনের তীব্রতা কমে এল। এদিকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও কৌশিকবাবুদের পার্টির বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ১লা ও ২রা এপ্রিল বোম্বাই সিমলা মালাবার মাদ্রাজ পুণা অমৃতসর নাগপুর আহমেদাবাদ ইত্যাদি ভারতের প্রতিটি প্রমুখ শহর ও অঞ্চলে তাঁদের পার্টির দপ্তরে আকস্মিক খানাতল্লাসী হল এবং অনেকে গ্রেপ্তার হলেন। বাঙলা ছাড়াও একে একে মাদ্রাজ হায়দ্রাবাদ ত্রিবাঙ্কুর কোচিন প্রদেশে এবং ইন্দোর ও ভূপাল রাজ্যে পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা হল এবং তাঁরা খবর পেলেন যে এক বছরের মধ্যে সমস্ত দেশে প্রায় আড়াই হাজার পার্টির বিশিষ্ট কমরেডকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

ব্রহ্মদেশেও ঐ একই স্ট্রাটিজির পুনরাবৃত্তি ঘটল। থাকিন নু সে দেশের পার্টির সম্বন্ধে অভিযোগ করতে না করতেই মার্চ মাসের শেষে তাঁদের কমরেডরা বার্মা অয়েল কোম্পানিতে ধর্মঘট শুরু করে দিল। তার পর মে মাসে পুলিস কমরেড ঘোষালের গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করল। কৌশিকবাবু মনে মনে হাসলেন। কারণ তাঁকে ধরা অত সহজ নয়। ভারত ও ব্রহ্মদেশ—দুই দেশের সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে মণিপুরের ভিতর দিয়ে উভয় দেশের পার্টির মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ যাতায়াত করতে লাগলেন। কখনও তিনি মগ, কখনও কাচিন আবার কখনও বা বৌদ্ধ ফুঙ্গীর বেশে এই সীমান্ত থেকে ঐ সীমান্তে অপ্রতিহত গতিতে ঘুরে বেড়িয়ে বিশ্ববিপ্লবের জন্য বিশ্বের সর্বহারাদের পার্টির দুই অঙ্গের মধ্যে সেতুর কাজ করে চললেন তিনি।

তবে এ সব বাহ্য গৌরব সত্ত্বেও ক্রমশঃ একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে দেশবাসী তাঁদের স্ট্রীট ফাইটের কর্মসূচী গ্রহণ করে নি। তাই ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিকে সমগ্র ভারতবর্ষে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু বিক্ষোভ ছাড়া তাঁদের পরিকল্পিত সঙ্ঘবদ্ধ সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের কোন নিদর্শন ছিল না। ৯ই মার্চের

নিখিল ভারতীয় রেলধর্মঘটের পরিকল্পনা বানচাল হওয়ায় তাঁরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তার পর কৌশিকবাবু এবং তাঁর মত আত্মগোপনকারী কমরেডদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও একের পর এক সমগ্র বাঙলা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট, কলকাতার করপোরেশনের কর্মচারী ধর্মঘট, সারা বাঙলার পাট শ্রমিকদের ধর্মঘট ইত্যাদি একেবারে ব্যর্থ না হলেও তাঁদের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ গণবিপ্লব শুরু করার কাজে অকৃতকার্য হল। বাঙলা দেশের একমাত্র আশাস্থল কাকদ্বীপেও পূর্ণোদ্যমে পুলিসী অভিযান আরম্ভ হওয়ায় তাঁদের সাধের স্তালিনগ্রাদ তাসের কেল্লার মত ভেঙ্গে পড়তে লাগল। কৌশিকবাবুরা শিহরিত হয়ে প্রত্যক্ষ করলেন যে মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে পার্টির সদস্য সংখ্যা নব্বুই হাজার থেকে কুড়ি হাজারে দাঁড়িয়েছে এবং তাঁদের শ্রমিক ফ্রণ্ট—ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সদস্যদের সাত ভাগের ছয় ভাগই অদৃশ্য। তার পর—তার পর তাঁরা যখন বিভ্রান্ত হয়ে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন তখন এল কমিনফর্মের সেই ঐতিহাসিক নির্দেশনামা, যার ফলে আবার পার্টির কর্মনীতির মোড় ফিরল। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী কমিনফর্মের মুখপত্র "ফর এ লাস্টিং পিস এণ্ড পিপলস ডেমোক্রেসী"তে যে সম্পাদকীয় রচনা প্রকাশিত হল···

"মাস্টর মশাই যে! কোন্ দিকে গো?"

কৌশিকবাবুর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে। অভ্যাস বশে পুরাতন পথ ধরে চলতে চলতে একেবারে কিতাডি গ্রামের ভিতর এসে গেছেন। চিন্তার জন্য অন্যমনস্ক ছিলেন বলে মোটেই খেয়াল করেন নি তিনি।

"য়্যাঁ—হ্যাঁ। নমস্কার, নমস্কার সনাতনবাবু। এই বাস্কে মাঝিদের ঘরের দিকে যাচ্ছি।"

"দণ্ডবৎ আঁইজ্ঞা মাস্টরবাবু। হাই লাও! আপুনি আবার হামদের মত চাষী লোককে গড় করি বলছ ক্যানে?" একটু বিশ্রাম নিয়ে সনাতন আবার বলল, "তা চল ক্যান্না, হামিও উয়ার ঠিনে যাছি।"

কৌশিকবাবু তার প্রথম কথার জের টেনে বলেন, "এইটি আপনারা মস্ত ভুল করেন সনাতনবাবু, মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে নাকি? আমাদের তো এমন রাজত্ব কায়েম করতে হবে যেখানে সকলেই সমান।"

"হাই দেখ, আবার কি বইলছে গো! উটি কেমন করে হবেক? আপুনি হল কিতাব পঢ়া বাবু লোক। আপুনি কি হামদের মত হাই লেংটি খিঁচে রোদ জল আর কাদার ভিতর ধান রুইবে নাকি? আর হামদের মত ডিয়াং

হাঁড়িয়া খাইঁয়ে চুটি কানে গুঁজি ডুবুং লাচবেক নাকি ?" সনাতন নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে উঠল।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ গুম্ হয়ে সনাতন আবার বলতে লাগল, "আপুনি তো কলম চালাবে মাস্টর বাবু। মার্। বড় দুখ বাবু এই চাষের কাজে।" সনাতনের কণ্ঠে ক্ষোভ ঝরে পড়তে লাগল। "বৈশাখ জৈঠ হইল কি রঁহে রঁহে-ভগবানের দিকে ভালছি—কি কখন উয়ার দয়া হবেক, কখন জল দিবেক উহ। জল দিল কি হাল বলদ লিয়ে বাহিরালি—খেত চষতে হবেক। এক চাষ দু চাষ তিন চাষ, যত দিন না বীজ তৈয়ার হছে চাষেই চাষ। আবার ভগবানের দিকে ভালে আছি কখনকে রোহিণী আইসবেক, জল হলে তবে বীজ ফুটবেক। চারা হল তো আবারকে হাল ঘুরাও, খেতে কাদা কর। উয়ার পর রোয়া, জল ধরা। দেবতা ভাললেক তো জল হল, গাছ বাড়ল। আর তা না হলে সব জলি গেল। উয়ার পরও কাজ আছে। খেতের জল দেখ, তো নিড়াই দাও, তো ঘাস বুদা সাফ কর, তার পর হাতি খেদাও, শূয়ার মার তো তবে ফসল কাটি ঘরে আন।"

একটু দম নিয়ে আবার নির্বাক কৌশিকবাবুকে লক্ষ্য করে সনাতন তার দুঃখের কাহিনী বলে চলে। "বলুন ক্যান্‌না বাবু, ইয়ারলে আপুনাদের কাজ ভাল লয় তো কি ? কাপড়ে দাগটি লাগবেক নাই ; কিন্তু কমাসটি গেলেই এক মুঠো টাকা। দিলি বাবু ছানাটাকে উয়ার লিয়ে ইস্কুলে ভর্তি করি। হামার জীবনটা তো মাঠে মাঠে পচলেকই। উয়াকে দু কলম শিখাঁই মানুষ করতে হবেক, যাতে আর গায়ে খাটি খাতে নাই হয়। তবে হঁ, যাই বল ক্যান্‌না মাস্টরবাবু, উ সব হছে কপালের লিখন। ভগবানে নাই দিলে কি আর হবেক ?"

ভগবান, ভগবান ! কৌশিকবাবু মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। বিপ্লবের গুরু ঠিকই বলে গেছেন, "ধর্ম জনসাধারণের কাছে আফিংএর মত।" কবে যে সোভিয়েৎ দেশের মত ধমের এই বুজরুকী ভেঙ্গে এ দেশ থেকে ভগবানকে বিদায় দেওয়া সম্ভব হবে, তা কে জানে ? মুখে অবশ্য তিনি অতটা প্রকাশ করলেন না, কারণ স্ট্রাটেজির দিক থেকে তা ঠিক নয়। কেবল বললেন, "চেষ্টায় কি না হয় ? হাত পা না খাটালে কেউ কাউকে কিছু করে দেয় না, বুঝলেন সনাতনবাবু ?"

"তা কথাটা লিয্যসই বটে। কিন্তুক এই যে হামরা আসে গেলি।"

॥ তিন ॥

জন কয়েকের উচ্চকণ্ঠের হাসি তাঁদের অভ্যর্থনা জানাল। কৌশিকবাবু প্রশ্ন করলেন, "কি ব্যপার বাস্কেবাবু, এত হাসাহাসি কেন?"

"আরে, মাস্টরবাবু যে! আস আস, বস এই ঠিন।"

জন কয়েক ওঁর জন্য একটা খাটিয়া ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কৌশিকবাবু ওদের সকলকে ধরে সেই খাটিয়ার উপর বসিয়ে দিতে দিতে বললেন, "কেন—আমি বসলে এ খাটিয়ায় আপনাদের বসতে নেই নাকি? আমাকে ছুঁলে জাত যাবে?"

ভাগবত টুডু জবাব দিল, "তা নয় মাস্টরবাবু। তবে আপনারা হলেন বাবু লোক। আপনাদের সং কি হামরা লিতে পারি?"

বাবু, বাবু, বাবু! কি করলে যে এদের মন থেকে এই ভেদ ভাবটা যায়—কৌশিকবাবুর কাছে এ এক বিকট প্রশ্ন। একটা সাধারণ ধুতি ও হাফ শার্ট তিনি পরে আছেন। পায়ে অবশ্য এক জোড়া জুতা আছে এবং চোখে পুরু লেন্সের চশমা। কিন্তু এর সব কটিই তো তাঁর পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা। এর মধ্যে বিলাসের আধিক্য কই? কৌশিকবাবু একবার চতুর্দিকে তাকালেন। বাস্কে মাঝির ঘরের সামনে তেঁতুল তলায় চার পাঁচটি খাটিয়াতে যাদের মধ্যে তিনি বসে আছেন, তাদের কারও ঊর্ধ্বাঙ্গের সঙ্গে বস্ত্রখণ্ডের সম্পর্ক নেই। কাল পাথরে খোদাই করা দেহগুলি অন্ধকারের মধ্যেই চক্ চক্ করছে। ওদের নিম্নাঙ্গেও বস্ত্রের একান্ত স্বল্পতা। ওরই মধ্যে যার শরীরে আচ্ছাদনের সব চেয়ে বেশী প্রাচুর্য, তার পরনে একটি তিন হাতের গামছা। গামছার ঝুল হাঁটুর উপর পর্যন্ত পৌঁছে থমকে থেমে গেছে। কৌশিকবাবু দেখেছেন যে ধলভূমের অধিকাংশ পুরুষেরই এই বেশ। নারীরা বাইরে বেরোবার সময় খুব বেশী হলে নয় হাতের মোটা সুতার শাড়ি গায়ে জড়ায়। শাড়ির ঝুল হাঁটুর সামান্য নীচে পর্যন্ত, পায়ের গোছা ঢাকতে পারে কি না পারে। শাড়ির শেষ প্রান্ত কষ্টে স্বষ্টে তাদের ঊর্ধ্বাঙ্গ আবরিত করে। মাঠে খেতে কাজ করার সময় ওরা এই হ্রস্ব বাসকে হ্রস্বতর করে থাকে।

প্রথম প্রথম এ দৃশ্য কৌশিকবাবুর শহুরে চোখকে পীড়া দিত, এখন সহ্য হয়ে গেছে। একবার একান্তে তাঁর সহকর্মী ইতিহাসের শিক্ষক ভোলানাথ-বাবুকে একটু ঘুরিয়ে ধলভূমবাসীর এই একান্ত বস্ত্রসঙ্কোচনবৃত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কৌশিকবাবু। ভোলানাথবাবু ধলভূমেরই বাসিন্দা। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "এই তো আমাদের দেশ কৌশিকবাবু। কজন

লোক দু বেলা পেট ভরে খেতে পায়? কাপড় কেনার কথা ছেড়েই দিন।" কি জানি কেন কৌশিকবাবুর মনে হয়েছিল যে ভোলানাথবাবু সহজ ভাবে ধলভূমের দারিদ্র্যের কথা বলেন নি। একটু যেন শ্লেষ ছিল তাঁর কণ্ঠে। খদ্দরধারী ভদ্রলোকের ঐ এক রীতি। সহজ করে কোন কথা বলা যেন তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

আবার সভার মধ্যে উচ্চ হাস্যরোল উঠল। কৌশিকবাবুর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। তিনি প্রশ্ন করলেন, "কি হল, আপনারা সবাই এত খুশী যে আজ?"

মুরুব্বি হিসাবে বাস্কে মাঝি মুখ খুলল।

"বুঝলে মাস্টার বাবু বড় মজার ব্যাপার হইল একটা।"

কিন্তু কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত বাস্কে মাঝি তার পদমর্যাদাচিত গাম্ভীর্য রক্ষা করতে পারল না। ঘটনাটার কথা মনে পড়তেই আবার সে হো হো করে হেসে উঠল। হাসি সংক্রামক ব্যাধি। সুতরাং বাস্কের দেখাদেখি আর সকলেও হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল। অতএব কৌশিকবাবুও স্মিত বদনে তাদের দিকে চেয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর হাসির বেগ সম্বরণ করে বাস্কে মাঝি যা বলল তার সার মর্ম দাঁড়ায় এই যে আজ তাদের গ্রামে এক চাষের সাহেব এসেছিলেন। স্বাধীনতার পর ইনসপেক্টর আর সাহেবে দেশ ছেয়ে গেছে। কেউ সার দেবার সাহেব, তো কেউ গাছ দেখবার সাহেব, আবার কেউ সুই (ইন্জেক্শান) দেবার সাহেব। এতে আর কোন উপকার হক না হক, ঐ লোকগুলো অন্ততঃ করে খাচ্ছে। যাই হক, সাহেবদের আনাগোনায় তারা একেবারে উত্যক্ত। কোন কাজের কাজ নেই কেবল ভ্যাজারাং ভ্যাজারাং। তা আজকের সাহেবকে যে শিক্ষা লাদু সরেন দিয়েছে, তার পর বোধ হয় সে সাহেব আর এ গাঁয়ে আসবে না।

লাদুর তরকারি বাগানে গিয়ে লাদুকে তো সাহেব সরকারী সার কেনার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগল। লাদু ভাবল, ভাল রে ভাল—সার কিনবে? আর এ দিকে ঘরের তৈরী সার গোবরগুলাকে সব জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে ঘুচিয়ে দিচ্ছে তারা। তা বন্ধ করার কোন উপায় নেই, আর ইনি এসেছেন কলের সারের উপকারিতা বোঝাতে। জঙ্গলের মাঝে তাদের বাস। চিরকাল জঙ্গল থেকে কাঠকুটা এনে তারা কাজ চালাত। গোরারা এ মুলুক থেকে চলে যাবার পর জঙ্গল বাঁচাবার নামে তা বন্ধ হয়ে গেছে।

সরকারী জঙ্গল-গার্ডদের ঘুষ না দিলে বনের শুকনা পাতা ঝুরি ঝাঁটিও পাওয়া যায় না। আর সেই জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুঁটে জ্বালিয়ে ভাত রাঁধতে হচ্ছে। যে সাহেবকেই একথা বলা হয় তিনিই বলেন ডি. এফ. ও-কে লেখ, কনজারভেটরের কাছে দরখাস্ত দাও। এর একটা ব্যবস্থা করার বেলায় কেউ নেই। লাদুদের মাঝে মাঝে মনে হয় কি জানি, কলের সার বিক্রী করার জন্যই সরকার এই কাণ্ড করছে নাকি?

যাই হক সাহেবের বক্তৃতা শুনে শুনে লাদু মাঝির প্রাণটা যখন একেবারে "বিসপিতাঁই" গেল, তখন সে সাহেবকে তার মুগ খেতের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "সাহেব আমার বরবটি গাছগুলা ঠিক মত বাড়ছে না—এর জন্য কি সার দেব?"

সার বিক্রীর এক সুযোগ পেয়েছেন ভেবে সাহেব খুব বক্তৃতা ঝাড়ল। এত "সালফুট" দাও, তো ত্যাত "এমুনি" দাও, তো অত "ফসফট" দাও—তবে বরবটি গাছ লকলকাই বাড়বে, লম্বা লম্বা শুঁটি ধরবেক। এমনি কত সাত সতের বলার পর লাদু সাহেবকে বলল, "ও সাহেব এই তুমার বিদ্যা! মুগ কলাই আর বরবটি গাছের ভেদ জানা নাই, আর হামদের ঠিনে সার বিকতে আইচ?"

সত্য সত্যই অভিজ্ঞ চাষী ছাড়া ভাদই মুগ আর বরবটি গাছের তফাত বোঝা কঠিন। সাহেব তো লজ্জায় লাল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে আর এক মিনিটও দাঁড়ায় নি। সাইকেলে উঠেই চোঁ চোঁ দৌড় দিয়েছে। তাড়াতাড়িতে পেন্টুলানের পায়ে ক্লিপ পর্যন্ত আঁটার সময় পায় নি। বলতে বলতে সাহেবের পলায়নরত সেই দৃশ্যের কথা কল্পনা করে সবাই আর এক দফা হেসে উঠল।

ওদিক থেকে ডুবুল কিস্কু বলল, "শুন তবে আর একটা মজার কথা। গেল বার গোমহা পরবে কুটমালি (কুটুম্বের ঘরে) যাঁইছিলি দামপাড়া। উখানকেও এক চাষের সাহেবকে হামার কুটুমরা যা নাকাল করিছে, তা কি বইলব। চাষের সাহেব আসি হামদের কুটুমগুলাকে চাষ ভাল করার তুক বুঝাছে। কেমন করি বীজ বুনবে তো কটি গাছ কেমন সারি সারি রুইবে—এই সব বলি চলিছে। হামার কুটুম ধান খেত নিড়াছে আর শুনছে। শুনি শুনি মনটা যখনকে বিরক্তাই গেল তখনকে সে সাহেবকে শুদিয়ালেক—বলি হঁ সাহেব, চাষ ভাল করার এত কথা তো বললে। ইবারকে বল দেখি কোন্ গা ধানের চারা, আর কোন্‌গা মুথা ঘাস? মুথা ঠিক পারা না

চিনলে তো ভাল করি নিড়াই হবেক নাই। আর খেতে জবরা থাকলে ধানও হবেক নাই। তা মুথা চিনা কি সহজ কাজ? সাহেব যে মাথা নীচু করি গেলছে তো গেলছে।"

ডুবুলের কাহিনীও সমান সরস। আসরে আবার এক চোট হাসির হর্‌রা উঠল।

বাস্কে বলল, "গবরমেণ্টোরও তো আর কাম নাই। যতগা কলম ধরা বাবুকে পাঠাছে হামদের চাষ শিখাতে। এই শিখান বাবুগুলাকে যদি পাঁচ বিঘা খেত দিয়ে বলি দি যে লাও—ইবার হামদের মত চাষ করি খাও, তবে তো উয়াদের আর ব্যাঁত বাঁইতে (মুখ খুলতে) হবেক নাই। চাষ কি বাবু-ছানার কাম?" কথা বলতে বলতে বাস্কে কৌশিকবাবুর দিকে ফিরে নিজের বক্তব্যের উপসংহার করল, "কি মাস্টরবাবু, ঠিক বলিছি কি না?"

কৌশিকবাবু বুঝলেন এইবার তাঁর তরফের কথা বলার সুযোগ এসেছে, পরিবেশ অনুকূল। লোহা গরম থাকতে থাকতে তার উপর হাতুড়ির ঘা মারতে হয়। তিনি তাই বললেন, "তা হলেই দেখুন, আজকের সরকারকে দিয়ে আপনাদের কোন উপকার হতে পারে না। সুতরাং এমন এক সরকার গঠন করা দরকার যারা সত্য সত্যই আপনাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আর তার জন্য এই গভর্নমেণ্টের মূল পর্যন্ত উৎপাটন করে মেহেনতী মানুষদের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে ক্ষমতা দিতে হবে।"

লাহু বাধা দিয়ে বলল, "আবার আমমোক্তারনামা ক্যানে বাবু? গোরাদের রাজ যখন চলতেছিল, শুনিছি স্বরাজীবাবুরা অমনেই বলতেছিল। তা তার ফল তো হামরা দেখছিনই। আমমোক্তারনামার বদলে নিজেরা কিছু করা যায় না?"

"নিজেরাই তো করবেন আপনারা। কৃষক শ্রমিকদের রাষ্ট্রে প্রত্যেকটি কর্মচারী কৃষক শ্রমিকদেরই স্বার্থ দেখবে। তাদের মঙ্গলেই সবার মঙ্গল।"

"উযে দেখবেকই তার কোন ঠিক ঠিকানা আছে?"

"নিশ্চয় দেখবে। আর তার জন্য দেশে থাকবে সদাজাগ্রত জনগণের এক পার্টি, কৃষক শ্রমিকদের পার্টি। আপনারাই তো হবেন সেই কমিউনিস্ট পার্টির বনিয়াদ। আমি তো সেই কথাই বোঝাতে চাইছি। এক দিকে এই পার্টি আর অন্য দিকে পার্টি দ্বারা পরিচালিত গভর্নমেণ্ট। কোন দিক থেকে আর চাষী মজুরদের শোষণ করার উপায় থাকবে না। এর জন্য দেশের চাষী মজুরদের সংগঠিত হওয়া দরকার। দেশ বিদেশে আজ এই হচ্ছে। রাশিয়ায়

প্রথমে হয়ে গেছে, সে দিন চীনে হল। এবার ঐ আন্দোলন এগিয়ে আসছে। তিব্বত থেকে লাডক ও পেপসু পাঞ্জাব হয়ে, নেপালের ভিতর দিয়ে, নেফা আর আসাম থেকে বাঙলা হয়ে সেই প্রচণ্ড প্রবাহ এসে সমস্ত ভারতবর্ষকে প্লাবিত করে দেবে। না, দেবে নয়—দিল বলে। তেলেঙ্গানা ও পেপসুতে কি হয়েছে? এই আসাম ও বাঙলা দেশে মেহেনতী মানুষদের যে লড়াই চলছে, তার খবর রাখেন?"

"কি, কি মাস্টরবাবু?" সকলে সাগ্রহে প্রশ্ন করল।

"বেশ, প্রথমে তা হলে তেলেঙ্গানার কথাই বলি।" কৌশিকবাবু গুছিয়ে বসে তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করলেন, "এই আপনাদেরই মত গরীব কৃষক ছিল সবাই হায়দ্রাবাদের নালগোণ্ডা, ওয়ারঙ্গবাল ও এমনি আরও তিনটি জেলা নিয়ে গঠিত তেলেঙ্গানা এলাকায়। নিজাম ও তার হাজার হাজার শোষণকারী জায়গীরদার আর জমিদারদের চাপে তারা যেন বেঁচে মরেছিল। পরের জমিতে ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত খেটেও কোন মতে পেট ভরে না। হায়দ্রাবাদ রাজ্য ভারতে আসার পরও ঐ একই অবস্থা বজায় রইল। আর থাকবে নাই বা কেন? কংগ্রেসীরাও তো নিজামশাহীর তল্পীদারদের মত এক একটি ক্ষুদে জুলুমবাজ জায়গীরদার। তাই শেষ পর্যন্ত ওখানকার কৃষকেরা বিদ্রোহ করল। সেই বিদ্রোহকে সংগঠিত ও পরিচালিত করল কে?" কৌশিকবাবু ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ উল্টো ভাবে নিজের বুকের দিকে নিশানা করে নিজেই সে প্রশ্নের জবাব দিলেন—"এই আমাদের পার্টি, মেহেনতী কৃষক মজুরদের সংগ্রামী পার্টি, 'লাঙ্গল যার জমি তার' আওয়াজ তোলা পার্টি, জমিদারের জমি কেড়ে নিয়ে কৃষকদের বিলিয়ে দেবার পার্টি।"

কৌশিকবাবু একটুক্ষণের জন্য থেমে চকিতে একবার সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করে তাঁর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন। সরল শান্ত কৃষকগুলি আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে তাঁর কথা শুনছে। ফল ধরছে তা হলে ক্রমশঃ! কৌশিকবাবু আবার বলতে লাগলেন, "এ রকম অবস্থার কথা পার্টি পূর্বেই অনুমান করে ছিল। তাই ভারত সরকারের সঙ্গে লড়বার নাম করে রাজাকারদের সঙ্গে মিলে আমাদের কমরেডরা ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট মাউণ্টব্যাটেনের চক্রান্ত সফল হবার পর থেকেই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছিল। তার পর মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে পার্টির নেতৃত্বে তেলেঙ্গানার কৃষকেরা দুই হাজারেরও উপর শোষণকারীদের ধরাধাম থেকে সরিয়ে দিয়েছে। কোন জমিদার এখন তার গ্রামে থাকতে সাহস করে না, সবাই পালিয়েছে শহরে।

এ ছাড়া তেলেঙ্গানার বীরেরা বাইশটি থানা আক্রমণ করেছে এবং কত যে শুল্কঘাটি, পাটোয়ারী ও অন্যান্য রাজস্ব বিভাগের কাছারী লুঠ করেছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি? আমরা আড়াই শ নূতন রাইফেল পেয়েছি, পার্টির তহবিলে প্রায় দশ লক্ষ টাকা জমা হয়েছে, আর— আর কৃষকেরা পেয়েছে বত্রিশ হাজার একর জমি। এ ছাড়া পার্টির শক্তি কত বাড়ল এবং পেড্ডাভিড, লিঙ্গগিরি ও ধরণীপাহাদ ইত্যাদির মত শত শত জায়গায় প্রতিক্রিয়াশীলদের জীবনের মত যে শিক্ষা দিয়ে দেওয়া হল, তার মূল্যও কি কম?"

বিস্ময় ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত কণ্ঠে ডুবুল প্রশ্ন করল, "কি করে করলেক উয়ারা এমন জবর কাম?"

প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে কৌশিকবাবু জবাব দিলেন, "সহজ ব্যাপার। কারণ পার্টির স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, 'গরিলা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে···যে যা পায়, যে কোন অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে প্রত্যেককে নিজেদের সংগ্রামের উপযুক্ত করে তুলতে হবে। চার-পাঁচজন মিলে এক একটি সশস্ত্র দল গড়ে তুলতে হবে এবং এ রকম দল যে গড়ে উঠছে, কেউ যেন তা জানতে না পারে।···ধ্বংসাত্মক কাজ করে যান; ···দাহ্য-পদার্থ ছুড়েও আপনি শত্রুকে হত্যা করতে পারেন, আবার খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়েও তাদের মারতে পারেন।' "

"বাপরে বাপ। ই তো বড় কঠিন হঁয়েছে। তা হলে এখন হুই তেলিঙ্গী মুলুকের অবস্থা কেমন মাস্টরবাবু?" আর এক শ্রদ্ধালু, স্থানীয় কৃষাণ-সভার নব নির্বাচিত সভাপতি বাস্কের প্রশ্ন।

"এখন—এখন?" কৌশিকবাবু কয়েকবার জিহ্বা দিয়ে শুষ্ক অধরোষ্ঠ লেহন করে নিয়ে ঢোক গেলেন। তার পর একটু অস্বাভাবিক তীব্র স্বরে বলেন, "হ্যাঁ এখনও তেলেঙ্গানায় বিপ্লব চলছে।" কিন্তু ঐ প্রসঙ্গ আর বেশী না বাড়িয়ে তিনি বললেন, "কেবল তেলেঙ্গানাই নয়। উড়িষ্যার গঞ্জামের কথাই ধরুন না কেন। ঠিক দুই বছর পূর্বে এমনি গ্রীষ্মকালে তাকারদা গ্রামের দুই হাজার অধিবাসী পুলিস বাহিনীকে ঘেরাও করে। কেন—না তাদের নেতা কমিউনিস্ট কর্মীকে খুনী সরকারের হাতে ছেড়ে দেবে না। চারজনকে গুলি চালিয়ে মেরে এবং বিশ জনকে ঘায়েল করেও জুলুমবাজ সরকার ওদের দাবাতে পারেনি। পাশের বাঙলা দেশের খবর তো আপনাদের জানার কথা। পার্টির নেতৃত্বে কৃষকেরা সেখানে সরকারকে কম

আঘাত করে চলেছে? কাকদ্বীপ তো দ্বিতীয় তেলেঙ্গানার রূপ ধারণ করেছে। এ ছাড়া বিচ্ছিন্ন আন্দোলনও কম হচ্ছে না। হুগলী জেলার কমলপুরের চাষীরা পুলিসের গুলি বর্ষণ উপেক্ষা করেও আত্মগোপনকারী কমরেডকে আশ্রয় দিয়েছিল। ঘাটালের গ্রামের চাষী মেয়েরা ঝাঁটা আর আঁশ বঁটি নিয়ে তেভাগা আন্দোলনের নেতার খোঁজে আগত পুলিসদের গ্রাম থেকে তাড়িয়েছিল। আমাদের পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত দেশেই আজ কৃষক সংগঠন খাড়া হচ্ছে। এই রকম বাহাদুরির পরিচয় দিয়েছে পেপসুর কৃষকেরা। পার্টি সেখানে এমন স্বাধীন পঞ্চায়েত খাড়া করে দিয়েছে যে তার এলাকার মধ্যে সরকারী শাসনযন্ত্র বিকল হয়ে গেছে, খাজনাও কাউকে আর দিতে হয় না। তার পর আসামের মিকির পর্বতের এলাকা, ত্রিপুরা রাজ্যের টিপরাদের পল্লী, মণিপুরের…"

কথার মাঝ পথেই লাদু বলে উঠল, "আমরা তাহলে আপনাদের রাজত্ব হলে জমি পাব মাস্টরবাবু? ওঃ নিজের জমিতে কাজ করার কত্ত সুখ! যা খুশি আর্জাও, যতক্ষণ খুশি খাট—আর সবটা ফসল নিজের, ভাগীদার কেউ নাই। বলুন মাস্টরবাবু, সব চাষীকে আপনারা জমি দিবেন?" লাদুর কণ্ঠে আন্তরিক উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ছে।

বড় কঠিন প্রশ্ন। কৌশিকবাবু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ভাবতে থাকেন। কমিউনিস্টরা চাষীদের জমি দেবার ধুয়ো তুলে আন্দোলন খাড়া করলেও কোন কমিউনিস্ট রাজ্যে কখনও চাষীদের হাতে জমি রাখা হয় না। কলেকটিভ ফার্ম বা কমিউন—যা হক একটা কিছু গড়ে জমির অধিকার চাষীদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তার হাতে সোপর্দ করা হয়। কারণ স্বাধীন কৃষক হচ্ছে, "সর্বশেষ ধনবাদী শ্রেণী।" জমির প্রতি চাষীদের এই অদ্ভুত আকর্ষণের কারণেই বোধ হয় মহান স্টালিন স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন যে, "কৃষকরা স্বভাবতই অসমাজতন্ত্রী"। তিনি আরও বলেছেন, "যে দুই শ্রেণী নিয়ে আমাদের সমাজ সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে কৃষক শ্রেণীর ভিত্তি যতদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থার উৎপাদক হিসাবে থাকবে, ততদিন তারা অনবরত ধনবাদ সৃষ্টি করতে থাকবে, কিছুতেই তাদের সেই দুষ্কৃতি থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না।"

কমিউনিজম তো কেবল দরিদ্রদের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য দেখাবার কর্মসূচী নয়। এ হচ্ছে উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি কয়েম করার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। লেনিন তাই ঠিকই বলেছিলেন যে কমিউনিজমের অর্থ কৃষকদের নিয়ে "ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র উৎপাদক সৃষ্টি করা নয়, সমগ্র কৃষক শ্রেণীটিকেই অবলুপ্ত করে দেওয়া। এই প্রগতিশীল ও গুরুত্বপূর্ণ নীতি অনুসরণ না করলে আমরা সমাজতন্ত্রী হতে পারব না, আমাদের স্থান হবে পাতি বুর্জোয়াদের মধ্যে। এবং এই পাতি বুর্জোয়ারা হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর সব চেয়ে বড় শত্রু।"

কিন্তু তবু কৃষকদের প্রথমেই এ সব কথা বলে সাম্যবাদ বিরোধীদের শিবিরে ঠেলে দেওয়া চলে না—এটা বুদ্ধিমানের স্ট্রাটেজি নয়। স্বয়ং লেনিন তাই কৃষকদের অক্টোবর বিপ্লবের রূপায়ণের জন্য সংগঠিত করেছিলেন। আর চীনের মাও সে তুং তো কৃষকদেরই নেতা। সুতরাং কৃষকদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের লেনিনেরই মহান শিক্ষা স্মরণ রাখতে হবে। তাঁর মতে, "শ্রমিক শ্রেণীর দিক থেকে কৃষকদের সঙ্গে কেবল তখনই মৈত্রী করা যেতে পারে, কেবল তখনই সে মৈত্রী যথার্থ বিবেচিত হতে পারে, যখন আদর্শের দিক থেকে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব সমর্থিত হবে।" ত্রিশ বৎসর পূর্বে ইন্টারন্যাশান্যাল-এর এক রিপোর্টেও তিনি ঘোষণা করেন, "একনায়কত্বের সব চেয়ে বড় আদর্শ হচ্ছে সর্বহারা ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে মৈত্রী রক্ষা করা, যাতে সর্বহারা শ্রেণী তার নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখতে পারে।" কৃষকদের সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিকোণ বুঝতে হলে লেনিনের সেই অবিস্মরণীয় উক্তির কথা মনে রাখতে হবে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি বলেছিলেন, "কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হবার নীতি সর্বহারা শ্রেণী কর্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনবাদী উৎপাদক ব্যবস্থাগুলিকে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করার সংগ্রামের কৌশল মাত্র।"

অতএব মনস্থির করে নিয়ে কৌশিকবাবু মুখে বললেন, "নিশ্চয়-নিশ্চয়। সে কথা আর বলতে? সারা রাজত্বটাই যখন আপনাদের হবে, তখন জমির মালিক আপনারা ছাড়া আর কে হবে? আর সেইজন্যই তো আপনারা সেদিন কৃষাণসভা গড়েছেন। আসল কথা হচ্ছে সকলের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। সেইজন্য মজুর ভাইদেরও ইউনিয়ন গড়ার কথা বলেছিলাম। ইউনিয়ন মানে কি?" গলার স্বর এক পর্দা চড়িয়ে কৌশিকবাবু নিজেই এর জবাব দেন, "মানে হচ্ছে সঙ্ঘ বা একত্র হওয়া। আজ আপনারা মূর সাহেবের খাদানের মজুররা এই ইউনিয়ন গড়ার জন্য একত্র হয়েছেন দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে।"

"সাহেব কুথা মাস্টরবাবু। উয়ার বিটি এলসি ম্যামসাহেবের খাদান

বল ক্যান না। ইবার বিলাতেরলে আইসে সাহেব তো কাম ধাম কিছু দেখছে নাই। দিন রাত নেশা খাঁইয়ে টং।”

“লে লাদু, তুই তোর রসের কথা থামা বাবু। হঁ মাস্টরবাবু উয়ারা আসেঁছে। ঐ যে বিপিন মাহাত, কিনু সর্দার, ডমনা ভকত আর হামদের মাঝি কুলহির আর সব লোকই আছে। এখন বল হামদের কি করতে হবেক।”

খাটিয়াগুলি ওরা পাশাপাশি টেনে আনে, মাথাগুলি আরও কাছাকাছি সরে আসে। বাতাসেরও কান আছে। পূব গগনে শুধু প্রহরীর মত একটি দুটি করে তারা দেখা দেয়। একে একে আত্মপ্রকাশ করে নিঃশব্দে তারা যেন নিম্নে ধরণীবক্ষে যে চাপা রহস্য সঞ্চিত হচ্ছে তার মর্মোদ্ঘাটন করতে চায়।

॥ চার ॥

ব্যাপারটা সামান্য; অথচ বিন্দু থেকে বারিধির উদ্ভব হল। ক্লাস নাইনের অতুল মিত্র পড়াশুনায় বিশেষ সুবিধার নয়। অথচ ওর বাবা জামসেদপুরে ওকালতি করেন বলে গ্রামের সাধারণ ছেলেদের ভিতর বেশ-বাস, চাল-চলন ও কথাবার্তায় অতুল বেশ মাতব্বরি করে বেড়ায়। নূতন স্কুল। এমনিতে ধলভূমে বাঙলা স্কুলের পক্ষে সরকারী স্বীকৃতি পাওয়া কঠিন ব্যাপার। তাই সেক্রেটারী থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি শিক্ষক এর পিছনে আপ্রাণ খাটছেন। ভাল ফল করতে পারলে স্কুলের স্বীকৃতি পাবার দাবি জোরালো হবে। কিন্তু অতুলের মাতব্বরি ও অবাধ্যতার ফলে ক্লাস নাইনের ভাল ফল করা তো দূরের কথা, ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করাও এক সমস্যা হয়ে উঠেছে। এর প্রতিক্রিয়া নিঃসন্দেহে সমস্ত স্কুলের উপরই পড়বে। অথচ অতুলকে বাগ মানান দায়।

অঙ্কের মাস্টারমশাই ব্রজেনবাবু রাশভারি লোক। পড়বি তো পড় অতুল একেবারে তাঁর খপ্পরেই পড়ে গেল। দিন পনের আগে একবার অতুল অঙ্কের টাস্ক তো করে আনেই নি, উপরন্তু ব্রজেনবাবু তাকে এজন্য ভর্ৎসনা করায় সে মুখে মুখে জবাব দিচ্ছিল। অতুলের স্পর্ধায় বিস্মিত ব্রজেনবাবু অবশেষে ক্রুদ্ধ হয়ে তার কান ধরে দুই গালে দুই চড় মেরেছিলেন। গ্রাম্য হাইস্কুলে এরকম দুই একটা ঘটনা মাঝে মধ্যে ঘটে; কিন্তু অতুল জামসেদপুরের উকিল প্রবোধবাবুর ছেলে। অতএব ব্যাপারটা গোলমেলে

হয়ে দাঁড়াল। প্রবোধবাবু পরের রবিবার বাড়ি এসে ছেলের কাছে ঘটনার বিবরণ শুনেই এর একটা বিহিত করার জন্য স্কুলের সেক্রেটারী ও কয়েকজন কমিটি মেম্বারকে চেপে ধরলেন। অধিকন্তু হিসাবে তিনি শাসিয়ে গেলেন যে এডুকেশন কোডে আজকাল মার নিষিদ্ধ। অতএব অবিলম্বে অঙ্কের মাস্টার মশাই কৃতকার্যের জন্য প্রবোধবাবুর কাছে ক্ষমা না চাইলে তিনি জেলা স্কুল ইনসপেক্টর থেকে শুরু করে রাঁচীর ডিভিসন্যাল ইন্‌স্‌পেক্টর পর্যন্ত সবাইকে তো লিখবেনই, এ ছাড়া ধলভূমের মহকুমা হাকিমের সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ খাতির আছে বলে তাঁর মারফতেও একটা বিহিত ব্যবস্থা করতে ছাড়বেন না।

অন্য সময় হলে সেক্রেটারী মশাই প্রবোধবাবুর চাপের কাছে এতটা নতি স্বীকার করতেন না। কিন্তু শীঘ্রই ডিভিসন্যাল ইন্‌স্‌পেক্টরের স্কুল পরিদর্শন করতে আসার কথা আছে। এখন এই রকম একটা গোলযোগ দেখা দিলে ভবিষ্যতে স্কুলের ক্ষতি হবে। অতএব গ্রামবাসীদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাটা জারী রাখার আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে তিনি হেডমাস্টার মশাইকে ধরলেন যা হোক একটা কিছু ফয়সালা করার জন্য। হেডমাস্টার মশাইও ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি চাইছিলেন। চুলোয় যাক নিজেদের মান সম্মান, এখন স্কুলটা কোন মতে স্বীকৃতি পেলে মস্ত বড় একটা দায় উদ্ধার হয়। নচেৎ চাঁদা যোগাড় করতে সেক্রেটারী মশাইএর কি হাল হচ্ছে, তা তো তিনি স্বচক্ষে দেখছেন। আর তাঁরা নিজেরাও মাস গেলে যত টাকা পাচ্ছেন বলে সই করছেন, আসলে পাচ্ছেন তার অনেক কম। স্কুলটা স্বীকৃতি পেলে সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে এবং তা হলে এই উঞ্ছবৃত্তিরও অবসান ঘটবে। তিনি তাই ব্রজেনবাবুকে ধরে পড়লেন। কিন্তু ব্রজেনবাবুকে রাজী করান সহজ নয়। তিনি ইস্তফা দিতে রাজী, অন্যায় ভাবে ক্ষমা চাইতে কোন মতে প্রস্তুত নন।

অবশেষে হেডমাস্টার মশাই সেক্রেটারীর সঙ্গে আলোচনা করে একটা পথ বার করলেন। স্কুলের প্রধান হিসাবে তিনিই প্রবোধবাবুর কাছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের হয়ে ক্ষমা চাইবেন। হেডমাস্টার মশাই বেচারীর উভয় সঙ্কট। না পারেন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্রজেনবাবুর উপর চাপ দিতে, আর না পারেন সেক্রেটারীর দিকে তাকাতে। সুতরাং তিনি ভাবলেন বুড়োর আবার মান অপমান! দু কলম লিখে দিলে যদি স্কুলের ক্ষতি এড়ান যায় এবং এতগুলো ছেলের শিক্ষা পাবার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে, তা হলে গেলই

না হয় তাঁর পোশাকী মান। সত্য সত্যই তো এতে তিনি আর ছোট হয়ে যাচ্ছেন না। আর গ্রামের স্কুলে এরকম অনেক হয়। তিনিও তো মাস্টারি করে করে চুল পাকালেন, একবার রেলের স্কুল থেকে রিটায়ার করে এখানে নূতন করে চাকরি নিয়েছেন। তাঁর ক্ষমা চাওয়ায় সবার যদি উপকার হয়, তা হলে হলই না হয় তাঁর একটু অসম্মান।

এই ব্যাপার নিয়েই টিফিনে মাস্টার মশাইরা আলোচনা করছিলেন। ব্রজেনবাবু অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র ভাবে একদিকে গম্ভীর মুখে সমাসীন। আলোচনায় যোগ দেবার উৎসাহ তাঁর ছিল না।

হেড পণ্ডিত রমানাথবাবু বললেন, "ঘেন্না ধরে গেল মশাই এই মাস্টারী জীবনে। দুর্বিনীত ছেলেকে শাসন করার উপায় যদি না থাকে, তা হলে আমরা কাজ করব কি করে?"

ভূগোলের উমেশবাবু বললেন, "কী যে এডুকেশন কোড হয়েছে! ভাত দেবার কেউ নয়, সব কীল মারার গোসাঁই।"

ভোলানাথবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষের ভঙ্গীতে বললেন, "আমাদের আর কি? যেমন দক্ষিণে তেমনি তার পূজো। শিক্ষা যে কি দিচ্ছি তা তো আমরাই জানি। কেবল মা-বাবার দিবানিদ্রার ব্যাঘাত যাতে না ঘটে, তাই ছেলেগুলোকে খোঁয়াড়ে আটকে রাখি আমরা। আরে মশাই, কতকগুলো তথ্য মুখস্থ করালে শিক্ষা হয় নাকি? মানুষ হবার পাঠ্যক্রম চাই।"

কৌশিকবাবু সাধারণতঃ এ সব আলোচনায় চুপচাপ থাকেন। কিন্তু কি জানি কেন আজকে ভোলানাথবাবুকে একটু ক্ষেপিয়ে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না। ঈষৎ বক্রভাবে বললেন, "সেটা আবার কি পদার্থ ভোলানাথবাবু?"

"মানুষ হবার শিক্ষা মানে চরিত্র গড়ার ব্যবস্থা। মানুষ যাতে আদর্শ সামাজিক প্রাণী হতে পারে, তারই জন্য চরিত্র গঠন অপরিহার্য।"

খদ্দরধারী প্রচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়াশীলের মুখে সামাজিক আদর্শের কথা! কৌশিকবাবু একটু বিস্মিত হন। ভোলানাথবাবুকে আরও একটু উসকে তাঁর দৌড় কত দূর দেখার জন্য তিনি বলেন, "এ তো মশাই বস্তাপচা মালের কথা বলছেন। সামাজিক আদর্শ মানে তো সেই ছেঁদো নীতি বাক্য তো? সদা সত্য কথা কহিবে, কদাচ কাহাকে কটু কাটব্য করিবে না, গুরুজনদিগকে…"

"ঠাট্টা রাখুন মশাই।" বিরক্তি মাখা কণ্ঠে ভোলানাথবাবু বলেন, "ঐ সব পুরাতন নীতি বাক্যের কথা বলছি না। আমার বক্তব্য হল সামাজিক ন্যায়বিচার। অর্থাৎ সমাজের ভবিষ্যৎ রূপরেখা কেমন হবে, সেইটা প্রথমে নির্ধারণ করে নিয়ে তার পর ভবিষ্যৎ সমাজের নাগরিক—আজকের ছাত্রদের সেই আদর্শের উপযুক্ত চরিত্র গঠনের শিক্ষা দিতে হবে।"

অনেক দিন পর মনের মত তর্ক করার সুযোগের সম্ভাবনা দেখে কৌশিকবাবু পা দুটিকে চেয়ারের উপর তুলে আসন পিঁড়ি হয়ে বসলেন। প্রাচীনপন্থী ভোলানাথবাবুকে একটু খেলাতে হচ্ছে তো! ব্যঙ্গ ভরা কণ্ঠে তিনি বললেন, "তা আপনার ভবিষ্যৎ সমাজের চিত্র কি রকম? মানে রামরাজত্ব কায়েম করবেন তো? কিন্তু মশাই রামরাজত্বের শুরুতে এখনই রামানুচরদের অত্যাচারে আমাদের মত দীন অভাজনদের যে প্রাণ যাবার যোগাড়।"

ভোলানাথবাবু ছাড়া বাকী সকলে হেসে উঠলেন। ব্রজেনবাবুর মুখেও মৃদু হাসির রেখা। ভোলানাথবাবু একবার তীব্র দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকালেন। তার পর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ রামরাজত্বই আমি চাই। এখানে বসে কথাটার অর্থ বুঝতে পারবেন না। দেশের তথাকথিত অশিক্ষিত ও নিরক্ষর চাষী মজুরদের কাছে রাম-রাজত্বের কথা বলুন, তারা এর অন্তর্নিহিত অর্থ অবিলম্বে বুঝবে। আপনাদের মত বিদেশী শিক্ষা রূপী বিষবৃক্ষের ফলের কাছে মিলিনিয়মের যে অর্থ, দেশের কোটী কোটী নরনারী রামরাজত্ব বলতে তাই বোঝে।"

উমেশবাবু বললেন, "মাপ করবেন ভোলানাথবাবু। আমাদের বিদেশী শিক্ষার বিষবৃক্ষের ফল বলছেন; কিন্তু আপনি কি? আপনিও তো ঐ শিক্ষারই পরিণাম।"

তিল মাত্র না দমে ভোলানাথবাবু উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে না। আমি মনে করি যে আমার ভিতর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব এমন বিপুল মাত্রায় ছিল যে বিদেশী শিক্ষার কুপ্রভাব তার সবটুকু বরবাদ করতে পারে নি। যেটুকু বাকী আছে আমি তা-ই এবং নিষ্ফল কেতাবী শিক্ষায় সুদীর্ঘ কাল নষ্ট করে আমার স্বকীয় প্রতিভার কণ্ঠরোধ না করলে এর চেয়ে অনেক বেশী মৌলিকত্ব আমার ভিতর দৃষ্টিগোচর হত।"

কৌশিকবাবু দেখলেন আলোচনা অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। তাই কথা-বার্তার মোড় ফেরাবার জন্য তিনি বললেন, "তা যেন হল। কিন্তু কি

যেন সামাজিক ন্যায়বিচার আর শিক্ষার নবীন আদর্শের কথা বলছিলেন না ?"

"হ্যাঁ, ভবিষ্যতে সমাজ হবে ন্যায়বিচার আধারিত এবং শিক্ষার লক্ষ্য হবে ন্যায় ভিত্তিক সমাজের অঙ্গ স্বরূপ শোষণের সম্পর্কবিহীন নাগরিক গড়ে তোলা।"

বিদ্রূপহাস্যে মুখর হয়ে কৌশিকবাবু বললেন, "আরে চুপ চুপ। খদ্দর পরে এ সব কি বলছেন ? এক্ষুনি কমিউনিস্ট বলে পুলিস ধরে নিয়ে যাবে যে।"

প্রবলতর কণ্ঠে ভোলানাথবাবু বললেন, "রাখুন মশাই ও সব ঠাট্টা। সাম্যের কথা পৃথিবীতে সর্ব প্রথম আপনাদের সাইমন, ফুরিয়ার অথবা মার্কস এঙ্গেলস ও লেনিন স্ট্যালিনই বলেছেন নাকি ? মানব সভ্যতার উষা লগ্নেই আমাদের দেশের ঋষিরা ঘোষণা করেছিলেন—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। অর্থাৎ বিশ্ব পৃথিবীর সব কিছুই ঈশ্বরের, তাই ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। মহাভারতে নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, "যাবদ ভ্রিয়তে জঠরং তাবৎ স্বত্বং দেহিনাম্, অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি।" এর মানে হল—মানুষের পেটে যতটুকু ধরে কেবল ততটুকুই নেবার সে অধিকারী। এর চেয়ে বেশী যে গ্রহণ করে, সে চৌর্যাপরাধে দোষী এবং তার তদনুরূপ শাস্তিও হওয়া উচিত। গীতা পড়েছেন ? মাথা নাড়বেনই তো। ওসব পড়ে কি হবে ? ফরেন ল্যাংগোয়েজ পাবলিশিং হাউস আর নয় থ্রিলার ও হরার কমিক পড়ার পর এ সব পড়ার সময় জুটবে কোথা থেকে। আপনাদের এ যুগের সাম্যবাদের পীর-পয়গম্বরদের জন্ম হবার বহু পূর্বেই গীতাতে ঘোষণা করা হয়েছিল—পরিশ্রম না করে যে খায় সে চুরি করছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে নেয় অর্থাৎ পরিগ্রহ করে, নিঃসংশয়ে সে অপর কাউকে বঞ্চিত করছে।"

এতক্ষণে কৌশিকবাবুর রক্তে দোলা লেগেছে। আর হাল্কা ভাবে তর্ক করা চলবে না। এবার আর ফেরার পথ নেই। নিজের বক্তব্যকে অতঃপর যথোচিত গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত করার সিদ্ধান্ত করেন কৌশিকবাবু। আবেগাপ্লুত গাঢ় স্বরে তিনি বলেন, "মশাই সাহস আছে ? সত্য সত্যই যদি সামাজিক ন্যায়বিচার চান, তার জন্য দেশের প্রগতিশীল বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে। আপনাদের ধর্মশাস্ত্র আর পুরাণবর্ণিত আধ্যাত্মিক আফিং-এ বিপ্লবী শক্তির অপমৃত্যু ঘটে, বিপ্লবের জন্য চাই গণ-আন্দোলন ও তার পিছনে

থাকা দরকার মেহেনতী মানুষদের রাজনৈতিক সংগঠন। এই হচ্ছে ইতিহাসের শিক্ষা। মিঠে বুলিতে বাবা বাছা বলে কোন দিন বিপ্লব হয়েছে? হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেল্‌ফ। ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করুন ভোলানাথবাবু।"

এক রকম তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়েই ভোলানাথবাবু বললেন, "আপনিও তো মশাই মার্কস-পুরাণ আওড়াচ্ছেন। আর তা ছাড়া ইতিহাসের মাস্টারকে ইতিহাস শেখাবেন না। প্রথম কথা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় না। ইতিহাস মানে হচ্ছে অঘটিত ঘটনার বিবরণ। ইতিহাসের যদি পুনরাবৃত্তিই কেবল হত, তা হলে ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় লেখার পর তার নীচে ডিটো দিতে দিতে ইয়া মোটা ইতিহাসের বই লেখা হয়ে যেত। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে গণ-আন্দোলন বলতে আপনি যা বলতে চাইছেন অর্থাৎ হিংসার পথে পৃথিবীতে কোন দিন বিপ্লব সাধিত হয় নি। সত্যি কথা বলতে কি এ যাবৎ পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কোন সফল বিপ্লব হয়-ই নি।"

ভোলানাথবাবুর কথায় উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হলেন। একেবারে নূতন কথা—অবিশ্বাস্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রজেনবাবুর মুখে যেন সকলের মনোভাব ভাষা পেল। তিনি বললেন, "বলেন কি মশাই? ফরাসী বিপ্লব, রাশিয়ার বিপ্লব, আর এই যে চীনে যা হয়ে গেল···"

ভোলানাথবাবু বললেন, "ওগুলো বিপ্লব নয়, যুদ্ধ। বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে প্রচলিত মূল্যবোধের পরিবর্তন। যে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী নিয়ে বাস্তিল ভাঙ্গা হয়েছিল, ফ্রান্সে আজ তার অস্তিত্ব আছে? সাম্য রাশিয়াতে আছে নাকি? স্টালিনের আয় কত জানেন? পিপলস কমিশারের সভাপতি হিসাবে ষাট হাজার রুবল, রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক হিসাবে আরও ষাট হাজার রুবল। এ ছাড়া তাঁর বই বাবদ তিনি রয়ালটি হিসাবে বৎসরে প্রায় ছয় লক্ষ রুবল পেয়ে থাকেন। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। রাষ্ট্রের কাছ থেকে আরও অনেক সুবিধা তিনি পান। ক্রেমলিনের বাসভবন ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে তাঁর জন্য তিনটি পল্লী-ভবন আছে এবং সস্তায় ভোগ্যোপকরণ কেনার টিকিট পাবারও অধিকারী তিনি। এই টিকিটের বলে বাজার দরের শতকরা আশি ভাগ কম দামে তিনি জিনিসপত্র কিনতে পারেন। অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে প্রায় দশ লক্ষ রুবল তিনি বৎসরে পেয়ে থাকেন— এ কথা বললে অন্যায় হবে না। আর একজন সাধারণ রুশ শ্রমিক পায় গড়ে বাৎসরিক পাঁচ শ রুবল। উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা ও মর্যাদার যে পার্থক্য তার কথা না হয় না-ই তুললাম। আর চীনের ব্যাপারে এত

শীঘ্র শেষ কথা বলার দিন আসে নি। কিন্তু এই সেদিন সাম্যবাদী চীন যে ভাবে তিব্বতের বুকে পিস্তলের নিশানা করে তার ঘরে ঢুকে পড়ল, তাতে মনে হয় অতি শীঘ্র ওরা কুওমিণ্টাংদের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাধীনতা-যুদ্ধের শিক্ষা ভুলে গিয়ে সাম্রাজ্যবিস্তারকামীতে পরিণত হচ্ছে। আর আর্থিক ক্ষেত্রে ওরা যদি ওদের গুরু রাশিয়ার পন্থা অন্ধভাবে অনুকরণ করে, তা হলে ওদেরও ঐ পরিণতি হতে বাধ্য।"

ভোলানাথবাবুর এই বহুমুখী আক্রমণে কৌশিকবাবু কিছুক্ষণের জন্য যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। ঘটনার এমন বিকৃতি করেন ভদ্রলোক ও তার এমন বিচিত্র ব্যাখ্যা দেন! ঠিক কোন্ কথাটার খণ্ডন করবেন ভেবে ঠিক করতে তাঁর একটু সময় লাগে। তার পর কণ্ঠে জোর দিয়ে বলেন, "কী বলছেন আপনি? মূল্যবোধ কখনও অহিংস পন্থায় বদলায়? আর নিয়মতান্ত্রিক পথও ব্যর্থ। কারণ তথাকথিত গণতন্ত্র, অর্থাৎ রেশমী দস্তানায় ঢাকা পুঁজিবাদে ভোটের যে অধিকার দেওয়া হয়, আসলে তা একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। যাদের আর্থিক স্বাধীনতা নেই, তারা স্বাধীন ভাবে ভোটের অধিকার প্রয়োগ করে কৃষক মজুর রাজ কায়েম করবে—এটা দুরাশা। অর্থশাস্ত্রের পরিভাষায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভোটও একটা কমোডিটি বা পণ্যে পরিণত হয়। তাই বিপ্লবের সার্থক পথ হচ্ছে কৃষক শ্রমিকদের সংগঠিত করে তাদের এক শক্তিশালী পার্টি গড়ে তোলা। এবং এই পার্টির দ্বারা জনগণের জন্য তাদের তরফ থেকে ক্ষমতা অধিকার করা। কায়েমী স্বার্থের ধারকেরা এটা শান্তিতে হতে দেবে, এ আশা আকাশ-কুসুম ছাড়া আর কিছু নয়। সেই জন্য ভাল লাগুক বা না-ই লাগুক হিংসা অপরিহার্য। আর তাই পূর্ব থেকে এর প্রস্তুতিও করতে হবে।"

"আর একটা অনৈতিহাসিক কথা বললেন।" বিন্দুমাত্র না দমে ভোলানাথবাবু বলে চললেন, "জনগণের জন্য জনগণের তরফ থেকে—এই লেবেল এঁটে এ যাবৎ ইতিহাসে যতগুলি দল ক্ষমতা হস্তগত করেছে, শেষ পর্যন্ত তারা সকলে জনগণের উপর রাজত্ব করেছে। এর একটা কারণ হচ্ছে এই যে বিপ্লব রূপায়ণের পথে জনসাধারণের মাঝে মাঝে উন্মত্ত হয়ে রক্তারক্তি করা ছাড়া অন্য ভূমিকা থাকে না বলে বিপ্লবের এককালীন নায়কেরা সহজেই তাদের প্রতারিত করে। জনগণের মঙ্গল করছি বলতে বলতে কখন যে তারা জনগণের কাঁধে চেপে বসে, স্বয়ং জনগণই তা বুঝতে পারে না। দ্বিতীয় এবং মূল কারণ হল মূল্যবোধ। বিপ্লবের কর্ণধাররা মুখে নূতন মূল্যবোধের

কথা বললেও আসলে তাঁরা প্রাচীন মূল্যবোধে বিশ্বাসী। সেই জন্য তথাকথিত বিপ্লব, অর্থাৎ রক্তগঙ্গা বওয়াবার পর একটু অভিনব পোশাকে পুরাতন মূল্যবোধকেই কায়েম রাখেন।"

"ব্যাপারটা একটু ঘোলাটে বোধ হচ্ছে। আর একটু স্পষ্ট করে বলুন।"

"সহজ ব্যাপার। দেখুন শোষণের দুটো রাস্তা আছে। শ্রমের শোষণ হয়, আর হয় বুদ্ধির শোষণ। দুটোর প্রক্রিয়াই হচ্ছে ব্যবস্থাপনার নামে অনুৎপাদক শ্রেণীর হাতে কর্তৃত্ব রাখা। আজকের সমাজে সম্পদের সত্যকার উৎপাদক—কৃষক-শ্রমিকদের চেয়ে তাদের সেবার অছিলায় নিযুক্ত আমলাতন্ত্রের কর্তারা স্বর্গসুখে আছেন।"

"তাই তো আমরা কৃষক-শ্রমিকদের রাজত্ব চাই।"

"কিন্তু চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না। চাই—যাঁরা বলছেন, অর্থাৎ আমার আপনার মত কৃষক-শ্রমিকবন্ধু ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম—অনুৎপাদক শ্রেণীর এই সব নেতাদের কি হবে? অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সমাজ যদি পুরোপুরি কৃষক-শ্রমিকদের হয়, তা হলে আজকের বুদ্ধিজীবী সমাজ থেকে আগত বিপ্লবের তথাকথিত নেতারা তখন খাবেন কি ভাবে? আত্মরক্ষা জীবের মৌল ধর্ম। তারই তাড়নায় তাঁরা নিজেদের বাঁচার রাস্তা খোলা রাখতে ব্যবস্থাপক শ্রেণীর নামে সেবা দেবার অজুহাতে নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থকে বজায় রাখবেন। এইটাকেই আমি মূল্যবোধ অপরিবর্তিত রাখা বলে ইঙ্গিত করছিলাম।"

"আপনার কথা ভিত্তিহীন। বুদ্ধির শ্রমও তো শ্রম। ব্যবস্থাপক বলে আপনি যাঁদের নস্যাৎ করছেন, তাঁরাও তো বুদ্ধির দ্বারা উৎপাদনে সহায়তা করছে, সামাজিক কৃত্য পালন করছে। তা হলে ওরা অনুৎপাদক কোথায়?"

ভোলানাথবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল। টিফিনের অবকাশ অতিক্রান্ত হল।

কৌশিকবাবু রুমাল দিয়ে একবার মুখ মুছে নিয়ে বললেন, "আচ্ছা আর এক দিন হবে। তর্ক মাঝ পথে বন্ধ হওয়া অস্বস্তিকর ব্যাপার।"

ভোলানাথবাবু ক্লাসের দিকে যেতে যেতে বললেন, "হ্যাঁ আসল কথা—শিক্ষার স্বরূপ আলোচনা করাই তো বাকী রয়ে গেল।"

অন্যান্য মাস্টারমশাইরাও ধীরে ধীরে নিজেদের ক্লাস অভিমুখে রওনা হলেন।

॥ পাঁচ ॥

সন্ধ্যার দিকে কৌশিকবাবু জাহাতুর বিপিন মাহাতর ঘরে পৌঁছালেন। ঘরের সামনে ধলভূমের প্রথা অনুযায়ী কয়েকটি খাটিয়া পেতে সকলের বসার ব্যবস্থা হয়েছিল। দাওয়ার উপর একটি কেরোসিনের কুপি জ্বলছে। বিপিন এবং আর কয়েক জন বসে কথাবার্তা বলছে। অবশ্য বাকী সকলে এখনও আসে নি। আজ মোহনপুরের মূর সাহেবদের খাদানের মজুরদের ইউনিয়ন গড়ার জন্য বিপিনের বাড়িতে দ্বিতীয়বার মুরুব্বীদের সভা ডাকা হয়েছে। সেদিনকার আলোচনার পর যাদের নিতান্ত বিশ্বাসভাজন মনে হয়েছিল, তাদের জনা দশ বার আসবে। এদের মোটামুটি ইউনিয়নের সমর্থক ও সক্রিয় কর্মীতে রূপান্তরিত করার পর আর সকলকে ক্রমে ক্রমে ইউনিয়নের ভিতর আনতে হবে। প্রথমেই সকলকে খবর দিলে হৈ চৈ করে সব ফাঁস হয়ে যেতে পারে। তাতে ইউনিয়ন তো গড়া হবেই না, উপরন্তু কৌশিকবাবুই হয়তো ধরা পড়ে যাবেন। আর ধরা পড়লে কম পক্ষে বছর পাঁচেকের জন্য কংগ্রেসী সরকার কি তাঁকে রাজ-অতিথি করবে না? আত্মগোপন করে থাকাকালীন ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে মে মেয়েদের সামনে রেখে তাঁদের পার্টি সেক্রেটারিয়েটের অভিমুখে যে বেআইনী শোভাযাত্রা পরিচালনা করে তার আসল নায়ক যে কৌশিকবাবু ছিলেন, তা তো শেষ অবধি লালবাজারের কর্তৃপক্ষের কাছে গোপন থাকে নি। তার পর—তার পর তাঁদের ক্যাডেটরা লালদিঘি অঞ্চলে পুলিস কর্ডনের সম্মুখীন হয়ে কেমন ভাবে মেয়েদের আড়াল থেকে ওদের উপর ইঁট পাথর ছুঁড়েছিল ও অবশেষে পুলিসকে গুলি চালাতে বাধ্য করেছিল, তার বিবরণ কিরণশঙ্কর রায়ের স্বরাষ্ট্র বিভাগের নথিপত্রে ভাল ভাবেই লেখা আছে। ঘটনাটাকে কৌশিকবাবুরা পূর্ব পরিকল্পনা মত সরকার-বিরোধী প্রচার কার্যে ফলাও করে ব্যবহার করলেও তাঁর পরিচয় সরকারের কাছে গোপন থাকে নি।

তার পর পানিহাটির ব্যাপার এবং ১৯শে জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্যদের ঘেরাও করে রাখার প্রধান নায়ক হিসাবে তাঁর নাম সরকারের কাল খাতায় মোটা মোটা অক্ষরেই লেখা আছে। শুধু তাই নয়, গুণগ্রাহী সরকার আত্মগোপনকারী কৌশিক মিত্রের গ্রেপ্তারের সহায়ক সংবাদ দেবার জন্য নগদ দুই হাজার টাকা পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। বাঙলা দেশের থানায় থানায় তাঁর ফোটোর নীচে প্রাদেশিক সরকারের এই বিজ্ঞপ্তিটা ঝোলান আছে। বাঙলার প্রতিবেশী প্রদেশ বিহার আসাম আর উড়িষ্যার বড় বড়

শহরগুলির পুলিসের কর্তাদের কাছেও কি আর "কৌশিক মিত্র ওরফে…কে চাই" মার্কা বিজ্ঞপ্তি পৌঁছায় নি? কৌশিকবাবু কিন্তু এত সহজে ধরা দিয়ে কংগ্রেসী সরকারের আনন্দ বর্ধন করতে রাজী নন। শঠে শাঠ্যম্ সমাচরেৎ—এই হচ্ছে তাঁদের পার্টির নীতি। আর তাঁদের বিরোধীরা সকলেই তো শঠ। শঠ না হলে বিরুদ্ধ পক্ষীয় হবে কেন? এই হচ্ছে ডায়লেকটিকসের অভ্রান্ত আবিষ্কার। তাই তো কৌশিকবাবু ধলভূমের এই অজ পাড়াগাঁয়ে নিকটতম থানা থেকে দশ বার মাইল দূরে ধলভূমগড়ে ঘাঁটি গেড়েছেন। কিন্তু নিষ্ক্রিয় থাকা তো বিপ্লবীর ধর্ম নয়। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে তিনি তাই এখানে থেকেই বিহারের পার্টির হয়ে কাজ কর্ম করছেন, বিহারের কমরেডদের বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে কলকাতার স্ট্রাটজি বিহারে প্রয়োগ করার উপায় খুঁজছেন আর সঙ্গে সঙ্গে মোহনপুর ও কিতাডির ল্যাবরেটারিতেও কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে কৌশিকবাবুর মনে হয় বিপ্লবের গতিধারা কী বিচিত্র! হায়দ্রাবাদের নালগোণ্ডা ওয়ারংওয়াল থেকে এক লাফে পেপস্যু আসাম ও নেপাল এবং সেখান থেকে কলকাতা আর বাঙলা দেশ হয়ে ক্রান্তির বিদ্যুল্লতা যেন এবার ধলভূমের আদিম অরণ্যের অন্ধকারে আত্মপ্রকাশ করার অপেক্ষায় আছে।

"আসুন, আসুন আইজ্ঞা মাস্টরবাবু।"

বিপিন ও তার সঙ্গী সাথীরা কৌশিকবাবুকে অভ্যর্থনা জানাল। তিনি একটি খাটিয়ার উপর জাঁকিয়ে বসে বললেন, "আর সব কোথায়?"

"এই আসছে ইয়ার পর একে একে।" তার পর পশ্চিম দিগন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিপিন বলল, "আইজ্ঞা এই এতটা বেলায় কামেরলে ছুটি হইল। উয়ার পর সিনাই করি ছুটি যা হোক মুখে দিই করি এই পৌঁছাবেক সব একে একে।"

"কে কে আসছে আজ?"

কিন্তু বিপিন মাহাত জবাব দেবার পূর্বেই গম্ভীর স্বরে কে যেন হেঁকে উঠল, "ঝট্কে ম্যা।" তীক্ষ্ণ কণ্ঠের চীৎকারে সন্ধ্যার সমাহিত ভাবটা খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে গেল। কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ বিপিনেরই ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। ঈষৎ জড়িত স্বরে কে যেন একটা ছড়া আবৃত্তি করছে, "পরদেশীকা সঙ্, হলদীকা রঙ।" তার পর দুই এক মুহূর্ত নীরব থেকেই সে হুংকার দিয়ে উঠল, "হট্ যাও, সব তফাৎ যাও—ঝট্কে ম্যা।"

অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি মানুষের মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বয়সের

ভারে তার দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। একটি মোটা লাঠিতে ভর দিয়ে সেই নরমূর্তি ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। তার গায়ে রয়েছে একটি শতছিন্ন কোটের মত অঙ্গাবরণ আর নিম্নাঙ্গে কৌপিনের মত একখানি অপ্রশস্ত বস্ত্রখণ্ড মাত্র আচ্ছাদন। পা ফেলার তালে তালে তার অবিন্যস্ত কেশরাশি আক্রমণোদ্যত ভুজঙ্গের মত দুলে দুলে উঠছে। পায়ে পায়ে সেই মূর্তি কৌশিকবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ তার দীর্ঘ শীর্ণ আঙ্গুলগুলি দিয়ে কৌশিকবাবুর বুকের কাছে জামাটা ধরে চীৎকার করে উঠল, "বাবু পারা ভালছিস যে! কী, রেল পাততে আসেছিস? ঝট্‌কে ম্যা।" কৌশিকবাবু কয়েক লহমার জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিপিন এক লাফ দিয়ে উঠে এসেই এক ঝটকায় বৃদ্ধের হাতটা কৌশিকবাবুর জামা থেকে ছাড়িয়ে নেয়। তার পর বৃদ্ধকে ঘরের দিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলে, "না না, উ তো মাস্টরবাবু। রেল পাততে আসবেক ক্যানে? তুই রইচু না?" বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত ঐখানেই দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে মস্তক আন্দোলিত করতে থাকে। তার মাথা নাড়ার তালে তালে শিশু সর্পগুলি নৃত্য করে ওঠে। অবশেষে ঘরের ভিতর যেতে যেতে সে বলে, "খবর্দার রেল পাতেঁছিস কি মরেছিস। ঝট্‌কে ম্যা।"

কৌশিকবাবু তখনও আচমকার ঘোরটা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। বুকের ভিতরটা এখনও উত্তেজনায় ঢিপ ঢিপ করছে। আর পাগলটার চোখ দুটো কী ভয়ঙ্কর! যেন দুটো আগুনের ভাঁটা চুল দাড়ির জঙ্গলের ভিতর ধক্ ধক্ করছে। অদ্ভুত হিংস্র ঐ চাউনি।

বিপিন অনুতপ্ত কণ্ঠে বলছিল, "কিছু মনে করবেন নাই আইজ্ঞা মাস্টরবাবু। উ হামার বাপের বাপ আজা বটে। অনেক দিনেরলে পাগল হইঁ গেছে।"

"উনি,...উনি ঐ সব বলছিলেন কেন? রেল লাইন পাততে এসেছি কি না, আর পরদেশী কা সঙ্—এসবের অর্থ কি?" নিজেকে একটু সামলে নিয়ে কৌশিকবাবু প্রশ্ন করেন।

"আইজ্ঞা সে তো এক মহাভারত বটে। তা উয়ারা সবাই যখন এখনও আসে নাইং, তা হলে আজা বুড়ার কথাটা আপনাকে বলি। কি জানি হামদের দুখ দরদের কথা আপনার ভাল লাগবেক কি নাই।"

"না না, বলুন না। শোনা যাক ততক্ষণ।"

সেদিন সন্ধ্যায় বিপিন মাহাত কৌশিকবাবুকে এক অদ্ভুত কাহিনী

শোনাল। ধলভূমের গ্রাম-জীবনের এক বেদনা মাখা বিয়োগান্তক কাব্য। *প্রগতির বিরাট ও নয়নাভিরাম হর্ম্য রচনার জন্য বনিয়াদের যে ইঁটগুলি আত্মদান করে আত্মগোপন করে রয়েছে, তাদেরই একটির কাহিনী বিপিনের* আজা বুড়ার ইতিহাস।

অনেক দিনের কথা। বিপিনরা তখন ধলভূমগড় থেকে ঘাটশীলা যাবার পথে রেলের যে ফটকটা পড়ে, সেইখানে থাকত। অবশ্য বিপিনের তখন জন্ম হয় নি, ওর বাবাই সবে আট বছরের শিশু। রেলের ফটক তখন কোথায়? রেল লাইনই আসে নি। ঐখানে তখন ছিল ভালুকবিঁধা গ্রাম। ধলভূমের আর পাঁচটা গ্রামের মত লাল কাঁকুরে মাটি, মাটির দেওয়াল আর খড়ে ছাওয়া কৃষাণ গৃহস্থদের ঘর। চাষীরা চাষের সময় লাঙ্গল কাঁধে বলদ তাড়াতে তাড়াতে ক্ষেতে যায় আর বাকী সময় এর ওর দুয়ারে 'কুলহির' উপর খাটিয়া পেতে আসর জমায়। বউ ঝিরা ঘর গৃহস্থালির কাজ করে, মাঠে মরদদের ভাত নিয়ে যায় আর অবসর পেলে চরকায় সুতা কাটতে কাটতে গল্প-গুজব করে। শান্ত নিস্তরঙ্গ ধলভূমের গ্রাম্য জীবন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন জীবনের এই মজা পুষ্করিণীতে প্রবল তরঙ্গ উঠল। শোনা গেল রেল লাইন বসবে আর তার উপর গাড়ি চলবে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। সে গাড়িতে নাকি মানুষে চড়লে তিন দিনে তিন মাসের পথ ঘুরে আসবে। এ কথা গাল গল্প নয়, একেবারে বাস্তব সত্য। তাদেরই গাঁ ভালুকবিঁধা থেকে দুই মাইল পূবে ছাউনী পড়েছে। সেখানে কত লালমুখ সাহেব সুবা আর দেশী বাবুদের ভিড়। এই এই সব "ভুগিল ভুগিল" শিকল ফেলে জমি জরিপ করছে, বন-বাদাড় খেত-খামার কিছু মানছে না। সব কিছুর উপর দিয়ে শিকল টানছে। মহারাণীর রেলগাড়ি চলবে। তারই লাইন বসছে। সুতরাং কারও আপত্তি চলছে না।

ভালুকবিঁধার অধিবাসীরা অবশ্য কদিন পরই রেলপাতা সরকারী লোকেদের দেখল। কিন্তু এমন এক অশুভ লগ্নে প্রথম সাক্ষাৎ হল যে সমগ্র ভালুকবিঁধা গ্রামটাই তার প্রচণ্ড আঘাতের আলোড়নে তছনছ হয়ে গেল। সেদিন ছিল করম পূজা। কি বললে মাস্টরবাবু—করম পূজা কাকে বলে? হাই লাও, করমের কথা আপনি জান না? করম ঠাকুর বড় জাগ্রত দেবতা, ধলভুঁয়ের সুখ-দুখের বড় মালিক। ভাদ্র মাসের পার্শ্বৈকাদশীর দিন হয় করম পূজা। তার পরদিন হচ্ছে রাজাদের ইঁদ পরব, আমলী সালের শুরু। আর রাজাদের খাজনা আদায়ও আরম্ভ। সমস্ত ধলভুমের

গ্রামের প্রধান আর মাতব্বরদের সেদিন ঘাটশীলার রাজবাড়িতে নেমন্তন্ন। ইঁদ ওঠার পর রাজা মাতব্বরদের দর্শন দেবেন। মোড়লরা রাজাকে প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে গাঁয়ে ফিরে খাজনা তোলার কাজে লেগে পড়বে।

কিন্তু ইঁদের কথা যাক, এখন করম ঠাকুরের কথাই শোনাই। করম পূজার আগে প্রধানদের ঘরে "জাওয়া" করতে হয়। জাওয়া হল আপনাদের অধিবাস। পূজার তিন থেকে ন'দিন আগে জাওয়া করে রাখতে হবে। তবে হ্যাঁ, জোড় দিনে জাওয়া করা নিষেধ—বিজোড় দিন হওয়া চাই। গাঁয়ের বৌ ঝি আর ছানা পোনারা কাছের নদী কিম্বা বাঁধে সকালে গিয়ে স্নান করবে। তার পর নূতন বাঁশের ডালা বালিতে ভরে নেবে। আর ঐ বালির ভিতর কুরথি, মুগ, বিরি কলাই আর ছোলার দানা পুঁতে দেবে। আগে থেকেই রঙিন কাঠি তৈরী থাকে। কোনটায় আলতা, কোনটায় কাজল, কোনটায় আবার হলুদ বাটা লাগিয়ে কাঠি রাঙান হয়। ঐ রঙিন কাঠি এর পর ডালার বালির উপর গেড়ে দিলেই জাওয়া তৈরী হয়ে গেল। ঐ জাওয়া নিয়ে এবার বৌ-ঝিরা নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে প্রধানের ঘরে যাবে। পথে মাঝে মাঝে জাওয়া নামিয়ে মেয়েদের নাচ গান চলবে।

অ্যাঁ—কি বলছ মাস্টরবাবু, জাওয়ার গান লিখলেক কে? কে আবার লিখবেক গো! এ গান তো বৌ-ঝিরা চির-কালই গায়ে আসছে। কেমন গান? শুন তবে:

> বাঘমুড়ি পাহাড়ে ঢাকল ঢাকল পাত গো।
> শাশু বাঁটে ছুটি ছুটি ভাত গো॥
> বাঁট বাঁট বাঁট শাশু, হামরি বিদায় গো।
> নহর গেলে খাব দহি ভাত গো॥
> কি নাক খাহ বহু হামরি বিদায় গো।
> মাও মরেঁছে ছ'মাস?

অর্থ? তা ইয়ার অর্থ একটা আছে বইকি। মানভূমের বাঘমুণ্ডি পাহাড়ের গাছে বড় বড় পাত্ত। কিন্তু শাশুড়ী ছুটি ছুটি ভাত দেয়। তা বহু দুখ করে বলছে যে তুমি ছুটি ছুটি ভাত দাও কেন না, বাপের ঘর গেলে দমে দহি ভাত খাব। মা ছ'মাস হল মরলে কি হবেক? বাপের বাড়ি তো আছেই।

তবে আইজ্ঞা সত্যি কথা বলব। সব গানের অর্থ হামরা জানি না। ই সব হামদের পুরাতন ভাষা—কুর্মালী ঠারের গান। ইয়ার কতক কতক

অথ গাঁয়ের বুঢ়ারাও আর জানে না। কিন্তু বহু দিনেরলে গাওয়া হচ্ছে তাই বৌ-ঝিরা গাইয়েই আসছে। যেমন :

হলুদ ফুল ঝোঁকা ঝোঁকা মালি ফুল সরু রে।
শীহরিরে বাছা খড়িকা,
লাগল চন্দনা খেরি পাতা রে।
পাতামরা হতর সন্দেশা, ফুলামরা হতরা সন্দেশারে।
শীহরি রে বাছা খড়িকা······

জাওয়া নিয়ে তো প্রধানের ঘরে রাখা হল। কিন্তু রোজ সন্ধ্যা বেলায় জাওয়ার ডালাকে প্রধান আঙ্গিনার তুলসী তলায় বার করে রাখবে। আর গাঁয়ের বৌ-ঝিরা সবাই জুটে ঐ সময় নাচ গান করবে। এই রকম চলবে করম পূজার আগের দিন পর্যন্ত। একাদশীর দিন নাচ গান হবে তিন বার। একবার সকালে, একবার তুপুরে ও সব চেয়ে জবর নাচটা হবে সন্ধ্যার সময় ধরমু আর করমুর কথা হবার পর।

কিন্তু কথা তো পরে হবে। আগে দিনের বেলায় যা হয় তাই বলি। ফুল জোটান ঐদিনকার একটি বড় কাজ। খাল বিল জঙ্গল যেখান থেকে হক না কেন, সন্ধ্যায় কথার সময় দেবার জন্য ফুল চাই। আর চাই ধানের পাতা। রোয়ার শেষে ঝির ঝির জল আর মিঠা রোদ পেয়ে ধানের চারাগুলিতে তখন রঙ ধরা আরম্ভ করে। হলুদের ছোপ লাগা পাতাগুলি গাঢ় সবুজে পরিণত হতে থাকে। ঐ সতেজ চারার সবুজ পাতাও ছিঁড়ে মেলাতে হয় ফুলের সঙ্গে। গাঁয়ের যত জোয়ান মরদ আর বৌ-ঝি সবাই একাদশীর উপাস করে আছে। বিকালে ঐ স্বয্যি ঠাকুর ডুবু ডুবু হবার খানিক আগে ঢাক, ঢোল, ধমসা নিয়ে পুরুষরা সবাই বেরোবে। দলের সামনে থাকবে গাঁয়ের প্রধান কিম্বা তার বড় ব্যাটা। কিন্তু প্রধান তখন পায়ে হেঁটে চলবে না। গাঁয়ের জোয়ানরা তাকে কাঁধে করে নিয়ে যাবে। কারণ তখন সে কেবল প্রধানই নয়, খোদ করম ঠাকুরের সেবক। তাঁর অনুষ্ঠানে তো আর ত্রুটি করা চলে না।

প্রধানকে কাঁধে নিয়ে সবাই যাবে করম গাছের গোড়ায়। যেতে যেতে গাইবে। গাইবে আর বাজাবে ঢাক ঢোল ধমসা। আর তার তালে নাচতে নাচতে এগোবে। করম ডাল আনার গানও চমৎকার :

বেগুন বাড়ি ঘুর দাদা বেগুন বাড়ি ঘুর গো।
রাখি দিও খিড়ুকি দুয়ার ॥

খিড়ুকি দুয়ারে দাদা মিরিগি সামাল গো।
উঠ দাদা ঝাঁক তলোয়ার॥

শেষের দিকে বাজনদাররা চড় বড় চড় বড় করে দ্রুত তালে ঢাকে কাঠি দিতে দিতে লাফ দিয়ে চীৎকার করে উঠবে—উর্‌র্‌ হো-হো-হো। আর গায়করাও তরোয়াল ঘোরাবার ভঙ্গীতে শূন্যে লম্ফ দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে হাতের পাঁয়তাড়া কসবে।

করম গাছের কাছে পৌঁছে প্রধান জোয়ানদের কাঁধ থেকে নামবে। তার পর গাছের গোড়ায় সিঁদুর জল দিয়ে তার পূজা হবে। পূজা শেষ হলে গাছের একটি ডাল প্রধান নিজের হাতে কাটবে। তার পর জোয়ানদের কাঁধে প্রধান এবং প্রধানের কাঁধে করম ডাল—এই ভাবে আবার বাজনা বাজাতে বাজাতে, নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে ওরা গ্রামে ফিরবে, তখন বাগাল ছানাদের গরু কাড়া নিয়ে ঘরে ফেরার সময় পার হয়ে গেছে।

প্রধানের ঘরের আঙিনায় ঐ করম ডাল গাড়া হল। যে সব বউ-ঝিরা উপোস করে ছিল তারা ফুল আর ধানের পাতা নিয়ে প্রধানের ঘরে হাজির হল। তার পর ঐ করম ঠাকুরের গোড়ায় প্রধান পূজা শেষ করে। করম ঠাকুর বড় জাগ্রত দেবতা। দুখীর দুখ ঘোচায়, ঠাকুরের দয়ায় খেত ধানে ভরে যায়। বৌ-ঝিদের মনস্কামনা পূর্ণ করে ঠাকুর বছর না ঘুরতেই কোল জোড়া ব্যাটা দেয়। মেয়েরা তাই সবার শেষে হলুদ মাখান কাপড়ে একটি কাঁকুড়কে মুড়ে ঠাকুরের থানে গড় করে আর পাতার খালায় বালি ভরে তার উপর প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। অসময়ে ঐ প্রদীপ নেভা মোটেই ভাল কথা নয়। যার প্রদীপ নেভে তাকে প্রাচিত্তির করতে হয় এর জন্য।

তার পর—তার পর ঠাকুরের কথা, আর কথা শেষ হলে একাদশীর পারণ। কিন্তু হুঁশিয়ার গরম ভাতে নয়। কেন? তা হলেই করম কপাল বাম। পারণ করতে হবে বাসি ভাতে, যা আগের দিন রাত্রে রেঁধে জল দিয়ে রাখা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। করম কপাল বাম-এর কথা তো বলাই হল না। আর ঐটাই তো করম পূজার কথা।

হ্যাঁ, বৌ-ঝিদের প্রদীপ জ্বালার পর সকলে প্রধানকে ঘিরে বসে, আর প্রধান শোনায় করম পূজার কথা। ধরমু আর করমু দুই ভাই। ধরমু করম পূজার পারণ করল বাসী ভাতে আর করমু খেল গরম ভাত। ধরমুর খেত ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু হল। আর করমু? তার করম কপাল বাম। তার ঠাকুর গরম ভাতের তেজে একেবারে সাত

সমুদ্র লঙ্কা পার। করমুর ধানের খেত জলে গেল, ফসল পোকায় খেল। ওর পুকুর গেল শুকিয়ে আর গোয়ালে লাগল মড়ক। করমু হায় হায় করে কাঁদে আর লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু সবার কাজ মেলে, তাকে কেউ কাজে নেয় না। ভাই-এর দুঃখ দেখে শেষে ধরমুর দয়া হল। সে দিল তাকে কাজ। সারা দিন খেতে ধান রোয়ার পর মুনিষরা সব খেতে বসেছে। তাদের সারিতে করমুও আছে মুখ নীচু করে। ধরমুর বাড়ির বৌ-ঝিরা মুনিষদের খেতে দিচ্ছে। কিন্তু করমুর কাছে আসা মাত্র পরিবেশনকারিণীর হাতের জিনিস ফুরিয়ে যাচ্ছে। ভাত ফুরাল, ডাল ফুরাল, তরকারিও আর নেই।

রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে করমু সামনের পাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ধরমুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভাবল এত খেটেও যখন খেতে পেলাম না, তখন খেটে খুটে ধরমুর খেতে যে ধান লাগিয়েছি তা এখনই এই রাত্রেই তুলে ফেলব। একটা দাঁতাল হাতির মত করমু গিয়ে নামল ধরমুর খেতে। কিন্তু যেই না এক গোছা ধানের চারায় হাত দেওয়া অমনি কী আশ্চর্য! আকাশ থেকে দৈববাণী হল। দৈববাণী বলল, করমু তোর করম কপাল বাম হয়েছে। ঠাকুর তাই সাত সমুদ্র লঙ্কা পারে তপস্যা করে "লাটা পাটা" হয়ে আছে। ধান না তুলে তুই তাই ঠাকুরের ঠিনকে যা। সেইখানে ঠাকুরের পূজা করলে তোর ভাল হবে।

তখনই করমু সাত সমুদ্র লঙ্কা পারে যাবার জন্য রওনা হল। যেতে যেতে দেখল একটি ডুমুর গাছ। গাছে কত পাকা পাকা ডুমুর ধরেছে। করমু ভাবল যা হোক ডুমুর খেয়ে খিদা মেটাবে। কিন্তু গাছে উঠে যে ফলটি পাড়ে তার ভিতরই পোকা, যেটি ভেঙ্গে দেখে তার ভিতরই পোকা। হাত্তেরি বলে করমু গাছ থেকে নামতে লাগল। নামতে নামতে শুনল গাছ বলছে, করমু ও করমু তুই তো ঠাকুরের ঠিনে যাচ্ছিস। আমার এত ফল তবু ক্যানে লোকের কাজে লাগে না, শুধু পোকা—এ কথা ঠাকুরকে সুদিয়াবি। করমু বলল, হ্যাঁ।

আবার যায় যায়। যেতে যেতে শোনে ঢেঁকির শব্দ। করমু ভাবল যা হোক চিঁড়া কোটা হচ্ছে যখন, তখন না হয় দুটি চিঁড়াই খাওয়া যাক। কিন্তু ঢেঁকিশালে পৌঁছে দেখে কোথায় চিঁড়া কোটা? একজন বাগাল বুড়া শুয়ে আছে আর তার বুকে পড়ছে ঢেঁকির পাড়। হাত্তেরি বলে করমু নিজের পথ ধরল। যেতে যেতে শুনতে পেল যে বাগাল বুড়া শোয়া অবস্থাতেই

তাকে বলছে, করমূ ও করমূ, ঠাকুরকে তুই আমার কথা সুদিয়াবি। আমার বুক থেকে ঢেঁকির পাড় নামে নাই ক্যানে? করমূ বলল, হ্যাঁ।

আবার যায়। যেতে যেতে দেখল একটি পুকুর। করমূ ভাবল খাবার না হয় নাই পেলাম। অন্ততঃ একটু জল খেয়েই গলা ভেজাই। পুকুরে নেমে অঞ্জলি করে জল নিয়ে যেই মুখ দিতে যাবে দেখে জলের ভিতর পোকা থিক থিক করছে। যতবারই জল হাতে নেয় তা মুখে দেবার মত নয়। আমার করম কপাল সত্যিই বাম, বলে করমূ হাত্তেরি করে উঠে গেল। উঠতে উঠতে শুনল পুকুর তাকে বলছে, করমূ, ও করমূ, তুই ঠাকুরের ঠিনে আমার কথা বলবি। আমার এত জল তবু মানুষের মুখে দেওয়ার উপায় নেই। করমূ তার কথায় রাজী হল।

এমনি করে করমূ চলতে চলতে এক পাল গরু দেখতে পেল যাদের দুধ দুইতে গেলে কেউ বা কামড়ায় আবার কেউ বা লাথি মারে। যদি কোন মতে বাঁটে হাত দেওয়া গেল তো দুধের বদলে রক্ত বেরোয়। ওদের অনুরোধে করমূ ঠাকুরের কাছে ওদের কথাও বলতে রাজী হল। তার পর করমূ দেখতে পেল এক পাল মহিষ। তাদেরও ঐ একই অবস্থা। সুতরাং ঠাকুরের কাছে করমূ মহিষদের দুঃখের কথা বলার প্রতিশ্রুতি দিল। এর পর করমূ দেখতে পেল এক পাল ঘোড়া। কিন্তু তাদের পিঠে যে চড়বে তার উপায় নেই। ধরতে গেলেই লাথি মারে আর ছুটে পালায়। করমূ তাই তাদের অনুরোধে ঠাকুরের কাছে তাদের কথাও বলতে রাজী হল।

অবশেষে করমূ সাত সমুদ্রের কূলে এসে দাঁড়াল। সামনে ডাইনে বাঁয়ে —যেদিকেই করমূ তাকায় দেখে জল আর জল। ইয়া বড় বড় ঢেউ সব গর্জন করে ছুটে আসছে। হঠাৎ সেই ঢেউএর উপর দিয়ে এই এত্ত বড় এক মকর হাঁ করে করমূর দিকে তেড়ে এল। কিন্তু কী আশ্চর্য সমুদ্রের এত জলেও মকরের গা ডোবে না। মকর কিন্তু এসেই করমূকে বলল, আয় আজ তোকে খাই। করমূ ভয় পেলেও বুদ্ধি করে বলল, তা খাবি না হয়। তাতে কি হয়েছে? কিন্তু আগে আমাকে সমুদ্র পার করে দে। আমার করম কপাল বাম হয়েছে। ঠাকুরের ঠিনে যেয়ে এর কারণ সুদিয়াই। তার পর ফেরার পথে তুই না হয় আমাকে খাস। করমূ ঠাকুরের ঠিনে যাচ্ছে শুনে মকর বলল, তবে ভালই হয়েছে। তুই আমার কথাও সুদিয়াবি তো। সাত সমুদ্রের এত জল, তবু কেন আমার গা ডোবে না? করমূ তার কথায় রাজী হল। তার পর মকর তাকে পিঠে চড়িয়ে সাত সমুদ্র পার করে দিল।

সাত সমুদ্রের পারে লঙ্কা, আর সেই লঙ্কার শেষ পারে গিয়ে করমু ঠাকুরকে দেখতে পেল। সত্যি সত্যিই ঠাকুর একেবারে লাটাপাটা হয়ে আছে। করমু ঠাকুরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করল। আশে পাশে ঝাড়ু দিল। তার পর শুদ্ধ হয়ে পূজা করল। পূজার শেষে অনেক হাতে পায়ে ধরে শেষে ঠাকুরকে জাগ্রত করল। তখন করমু ঠাকুরকে সুদিয়াল যে বল ঠাকুর কেন আমার করম কপাল বাম হল?

ঠাকুর বলল, তুই পারণ করেছিলি গরম ভাত দিয়ে। সেই গরমের জ্বালা ধরল আমার দেহে। তাই আমি সাত সমুদ্র লঙ্কা পারে চলে এলাম। আর তোরও করম কপাল বাম হল। এবার থেকে পান্তা ভাতেই পারণ করবি আর ঐ গাঁয়ের লোকদের পান্তা ভাত খাওয়াবি। করমু জিজ্ঞাসা করল, গরম ভাতে কি দোষ ঠাকুর। ঠাকুর বলল, বুঝলি না ব্যাটা, করম তোর যতই ভাল হোক তার সঙ্গে যদি গরম থাকে, যদি ঠাণ্ডা ধরম তোর সঙ্গী না হয়, তা হলে করম কপাল বাম হওয়া ছাড়া আর উপায় কি? গরম মানেই অহঙ্কার, গরম মানেই দম্ভ। আর সেই গরম যদি বড় করমের সঙ্গে জুড়ে গেল, তা হলেই তো সর্বনাশ! তাই ধরমও চাইরে ব্যাটা—করমের সঙ্গে ধরম।

ঠাকুরের কথা করমু বুঝল। তাই ঠাকুরকে গড় করে সে বলল, কিন্তু সমুদ্রের ঐ কুমীরের গা ডোবে না কেন অত জলেও। ঠাকুর বলল, লোভ রে ব্যাটা লোভ। বহু লোকের বউ বিটি খেয়েছে ঐ কুমীর। ওদের গয়নাগাটি সোনাদানা সব ওর পেটে। তারই গরমে ওর দুরবস্থা। ও সব দান করলেই ওর মুক্তি।

"আর ঐ ঘোড়ার দল, মহিষ কাড়া, গরু বাছুর ওদের অমন অবস্থা কেন?"

"দানেই ওদের মুক্তি হবে। ওদের বলবি যে ওরা নিজেদের কারও কাছে দান করুক।"

"কিন্তু পুকুরের কি হবে?"

"ওরও ওটা পাপের শাস্তি। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটা এক মানুষকে ও একবার জল দেয় নি। ওকেই বলিস সবার জন্য নিজেকে দিয়ে দিতে। জল খেতে গিয়ে কেউ যেন বিমুখ না হয়। তা হলেই ওর মুক্তি।"

"আর বাগাল বুড়া?"

"লোভ—লোভ—লোভ। ওরও লোভ। যে বয়সে ধর্ম কর্ম করার

কথা, ও সে বয়সে টাকার হিসাব নিয়ে মেতে আছে। ও যেখানে রয়েছে তার নীচে দুই ঘড়া টাকা পুঁতে রেখেছে। ওটা দান করলেই ওর মুক্তি।"

"ডুমুর গাছের কি হবে?"

"স্বার্থের জন্যে ও মরেছে। একবার খিদায় কাতর লোককে ও ফল দেয় নাই। বলেছিল ফল আমার অঙ্গের শোভা, দেব কেন? আর কখনও যেন ক্ষুধার্তকে খাবার দিতে অস্বীকার না করে।"

সবার কথা শুনে করমু ঠাকুরকে আবার গড় করে ফেরার পথ ধরল। ঠাকুর ওকে বললেন, "যা ব্যাটা—এবার তোর বাম অবস্থা ঘুচল। আমি এবার তোর ঘরে ফিরে যাব। কিন্তু খর্বদার, কখনও গরম হবি না। আর দান করবি। দেখ লা (নৌকা) বাইবার জন্য জল চাই; কিন্তু সেই জল যদি লায়ে ঢোকে তা হলে? তেমনি সংসার ধর্ম করতে অর্থ চাই; কিন্তু তা যদি খালি জমাস তো তোর সংসারের লা ডুববে। তাই দান করবি।"

করমুকে কুমীর আবার সমুদ্র পার করে দিয়ে জানতে চাইল যে ঠাকুর তার কথা কি বলেছেন? করমু বলল। কুমীর তখন পেটের সব সোনাদানা উগরিয়ে দিয়ে বলল, "দান করার বামুন বৈষ্ণব কোথায় আর পাব? তুইই আমার বামুন, তুইই আমার বৈষ্ণব। তোকে দিলাম ওসব।" কথা শেষ হতে না হতেই কুমীর ভুস করে সমুদ্রের জলে ডুবে গেল।

ঐ ভাবে ঘোড়া, মহিষ, গরু সবই করমুকে, "তুইই আমার বামুন তুইই বৈষ্ণব" বলে নিজেদের দান করে দিল। করমু ধনরত্ন সহ ঘোড়ার পিঠে চড়ে মহিষ আর গরুর পাল পিছনে নিয়ে পুকুরের ধারে উপস্থিত হল। পুকুরকে ঠাকুরের কথা বলতেই সে বলল, "ঠিক ঠিক। আমি ভেবেছিলাম যে সবাই আমার জল নিলে জল বুঝি কমে যাবে। তা ঠাকুর যখন বলেছে তখন দান করলে নিশ্চয় কমবে না। তোমরা সবাই আমার জল খাও।"

সত্যি সত্যিই পুকুরের জল একটুও কমল না। ওরা সবাই জল খেয়ে আবার রওনা হল। চলতে চলতে পৌঁছাল গিয়ে বাগাল বুড়ার কাছে। বাগাল বুড়াকে ঠাকুরের কথা বলতে সে মাটি খুড়ে তার দুই ঘড়া টাকা বার করে করমুকে দিয়ে বলল, "তুইই আমার বামুন তুইই আমার বৈষ্ণব। তাই তোকেই দিলাম এসব।"

সবাই মিলে তার পর পৌঁছাল ডুমুর গাছের কাছে। গাছকে ঠাকুরের কথা বলতেই সে বলল, "ঠিক ঠিক। বছর বছর যখন আমার ফল হবে, তখন কেন মিছামিছি এক বছরের ফলগুলি ধরে রাখতে চাই? খাও

তোমরা সব আমার ফল।" ঠাকুরের দয়ায় এবার কোন ফলেই আর পোকা নেই, সব ফলই গুড়ের মত মিষ্টি।

এই ভাবে সোনা দানা, টাকা কড়ি, গরু মহিষ নিয়ে করমু নিজের ঘরে পোঁছে দেখে যে ঠাকুর তাদের আগেই এসে হাজির। তার পর করমু ধর্মপথে চলে দান ধ্যান করে সুখে দিন কাটাতে লাগল। এই হল আমাদের করম পূজার কথা। প্রত্যেকের মুক্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে বৌ-ঝিরা সকাল বেলায় তুলে আনা ফুল আর ধানের পাতা মুঠা করে ঠাকুরের দিকে ছুঁড়ছিল। সব শেষে শেষবারের মত ফুলের মুঠা দিয়ে ঠাকুরকে গড় করে তারা যার যার ঘরে চলে যাবে। এর পর পান্তা ভাতে পারণ এবং সব শেষে নাচ গান। ঐ নাচের আসরেই সেবার ভালুকবিঁধার সর্বনাশের সূত্রপাত হল।

রেল লাইন পাতার যে তাঁবু পড়েছিল, তার সাহেব আর বাবুরা তাদের সঙ্গী সাথীদের নিয়ে ভালুকবিঁধাতে করম পরব দেখতে এসেছিল। বিকেলের দিকে ওরা মাঝিদের "পাড়া" দেখছিল। পাড়া মানে মুরগী-লড়াই। উত্তেজনায় কাল কাল বলিষ্ঠদেহ মানুষগুলি যুদ্ধরত মোরগ দুটিকে ঘিরে চীৎকার করে। মোরগের রঙ অনুসারে একদল চেঁচায়, "বালিয়া বালিয়া বালিয়া।" আর একদল হয়তো হাঁকে, "লাল লাল লাল।" মোরগদের উপর বাজিও ধরা হয়।

সন্ধ্যা হতে মুরগী লড়াই থামল। এর পর মাঝপাড়ায় শব্দ উঠল—গুড় গুড় গুড়, গুড় গুড় গুড়, গুড় গুড় ধিনাক্ ধিনা, গুড় গুড় ধিনানা ধিনা। ছুটল সবাই নাচের আসরে। খানিকটা জায়গা লেপে মুছে নাচের আসর করা হয়েছে। পান্তা ভাতে পারণ করে একে একে মাহাত পুরুষরা সবাই নাচের আসরে হাজির হচ্ছে। তাদের গলায় ঝুলছে মাদল, ঢাক কিম্বা ধমসা। দেখতে দেখতে মাদলের ধিতাং ধিতাং, ঢাকের চড় বড়, চড় বড় আর ধমসার গুড় গুড় বোলে সমস্ত গ্রাম মুখর হয়ে উঠল। গাঁয়ের বৌ-ঝিরাও ত্বরিতপদে এল, ওদের রক্তেও দোলা লেগেছে—নাচের দোলা। এল গৌড় মানকি আর ভূমিজ ললনারা। অনাবৃত উর্ধ্বাঙ্গ, কৃষ্ণবর্ণ পেশল পুরুষগুলি বাজনার তালে তালে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আসরের চারিদিকে পরিক্রমা করছে। ওদের হাতের জোড়া কাঠি ধমসার বুকে পড়ে আওয়াজ তুলছে—গুড় গুড় ধিনাক্ ধিনা, গুড় গুড় ধিনাক্ ধিনা। ঢাক বাজছে ধিনাক্ ধাঁই, ধিনাক্ ধাঁই, কোথা গেলি ওলো রাই। ধিনাক্ ধাঁই ধিনাক্ ধাঁই, তুমি বই আমি

নাইণ মাদলের জাদুমাখা বোল বলছে, ধিতিতাং ধিনৃতা ধিতাং, ধিতিতাং ধিতাং ধিতাং। নাচছে মাহাত নারীরা, নাচছে গৌড় মানকি আর ভূমিজদের পুরবালারা। সাঁওতালদের মত মাহাত বা গৌড় সমাজে নৃত্য নারীদের নিত্য কৃত্য নয়, ওদের নাচা নৈমিত্তিক ব্যাপার। তাই প্রাণ ঢেলে হেলে দুলে তারা নাচছে। পরস্পরের হাতে হাত দিয়ে আঙ্গুলে আঙ্গুলগুলি জড়িয়ে ধরে সারি বেঁধে পাঁতি করে নাচতে হয় এই "পাতা" নাচ। মাঝি মেয়েরা সব পরবেই নাচে। কিন্তু মাহাত, গৌড়, মানকি ও ভূমিজ মেয়েদের নাচ বছরে এই একবার। টুসুর ঠাকুর মাথায় নিয়ে নদীতে পরব চানে যাবার সময় টুসু গান গাইতে গাইতে উত্তেজনা ও আনন্দে চরণ বঙ্কিম ছন্দে পড়ে বটে; কিন্তু তাকে ঠিক নাচের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। তাই ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় দুলিয়ে সামনে পিছে পা সরিয়ে নাচছে ওরা প্রাণ ভরিয়ে।

নাচছে মাহাত আর গৌড়দের পুরনারীরা, নাচছে মানকি আর ভূমিজদের ঘরনীরা। আঁট-সাঁট করে পরা ওদের খাট কাপড়ের অন্তরালে সুঠাম দেহবল্লরী ধমসা আর মাদলের তালে তালে হিল্লোলিত হয়ে উঠছে। মাথার কাপড় খোঁপার নীচে নেমে গেছে; কিন্তু তার জন্য লজ্জা শরম কিছুই নেই। পরবের দিন আজ তাই ওদের কালো চোখে কেবল খুশির ঝিলিক। কখনও পায়ে পায়ে এগিয়ে কখনও পায়ে পায়ে পিছিয়ে তারা সকলে এক সারিতে নেচে চলেছে। একের বাঁ হাত অপরের ডান হাতের সঙ্গে দৃঢ় সংবদ্ধ, সকলে মিলে যেন একটি অখণ্ড মানব পঙ্‌ক্তি। এই নারীর পাঁতি "পাতা" নাচছে আর ধীর বিলম্বিত লয়ে ধলভূমের কবি অযোধ্যারামের লেখা ঝুমুর গাইছে ঃ

> শুনগো সহচরি, হেথা কেন বংশীধারী—
> যাহার লাগি নিশি জাগরণ।
> আমরা না হেরিব কালীয়বরণ॥
> শুনগো সহচরি, তুলে দাও হাতে ধরি—
> আঙিনা হইতে দেহ বিসর্জন।
> আমরা না হেরিব কালীয়বরণ॥

ওদিক সবল দেহ পুরুষরা সমে গিয়ে গায়ের জোরে ধমসা পিটে চলেছে—উরুর্ জাঘিনা জাঘিনা, উরুর্ ঘিনতা ঘিনানা, উরুর্ ধিনাক্ ধিনানা। থেকে থেকে বাদ্যকেররা একযোগে বীর বিক্রমে লাফ দিয়ে উঠে হুংকার ছাড়ছে, ও— হো— হো— ও— ও, আ— হা— হা— আ— আ। ওদের

উল্লম্ফন দেখে দর্শকজন উল্লাসে চীৎকার করছে আর নৃত্যরতা মেয়েগুলিও এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। কিন্তু তাদের গান থামছে না। সমান ভাবে তারা গাইছে :

কাটহ তমালের মূল উগারিয়া ফেল ফুল—
তমালের গাছেতে লেপহ চন্দন।
আমরা না হেরিব কালীয়বরণ ॥
গেরুয়া বসন পরি চাঁদুয়াকে দেহ ডারি—
চাঁদোয়া খাটায়ে ঘেরহ গগন।
আমরা না হেরিব কালীয়বরণ ॥

উপরে বর্ষণক্লান্ত লঘুদেহ মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চন্দ্রমার ম্লান পাণ্ডুর শোভা। নীচে আসরের মাঝে মাঝে দুই একটি মহুয়া তেলের মশাল জ্বলছে। তার ধোঁয়ার জন্য চতুর্দিকের মানুষগুলিকে স্পষ্ট দেখা যায় না। মনে হয় মাঝে মাঝে অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে।

অকস্মাৎ নাচের আসরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল আর তার সঙ্গে সঙ্গে উঠল এক আর্তনাদ। সে আর্তনাদ ভয়ার্ত নারীকণ্ঠের। ধপ্ ধপ্ করে কয়েকটা লাঠি পড়ার শব্দ হল। নিভে গেল সব কয়টি মশাল। পৃথিবীর মানুষের জঘন্য বৃত্তি দেখে চাঁদও বুঝি লজ্জায় মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেলল। অন্ধকারে মুহূর্তের মধ্যেই নাচের আসরে নারকীয় তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল।

ওরই মধ্যে শোনা গেল একটি তীক্ষ্ণ ক্রন্দনরত কণ্ঠস্বর, "ওরে হামার ফুলিকে সাহেবরা লিয়ে গেল রে।" তার কণ্ঠরবকে ডুবিয়ে দেবার জন্যই যেন বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল—গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম। বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জোড়া ভারী পায়ের শব্দ পূর্বদিকে মিলিয়ে গেল। আর মিলিয়ে গেল এক রুদ্ধকণ্ঠ বামার চাপা গোঙানি।

আবার মশাল জ্বলে উঠল। কিন্তু তখন সেখানে আর নাচের আসর নেই। এ যেন পিনাকপানির প্রলয় নাচনের পর দক্ষের যজ্ঞভূমি।

উমা মৃতা নয়, অপহৃতা। বিপিনের আজা কানু মাহাত তখন গ্রামের প্রধান। সেই তরুণ বয়সেই সাহস শক্তি আর বুদ্ধির জন্য পাঁচখানা গাঁয়ে তার প্রবল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। কানু ক্রোধে উত্তেজনায় হুংকার দিয়ে বলল, "মধু খুড়া, খুড়ীকে ঘরে রাইখে আয়। আর বউ বিটীরাও সব ঘরকে যাক এখন। যারা মরদ বঠিস তারা সব হাতিয়ার লিয়ে আয়। ফুলির বেইজ্জত হামদের গোটা মাহাত সমাজের বেইজ্জত। তাই বা ক্যানে, ই হামদের

গাঁয়ের সব মাহাত গৌড় ভুমিজ সাঁওতাল আর মানকিদের বেইজ্জত। শালা সাহেব দিগে দেখাঁই দিতে হবেক যে ধলভুঁয়ে মরদের বাচ্চা আছে।”

আধ ঘণ্টার মধ্যেই কিন্থ মাহাতর বাহিনী প্রস্তুত হল। সাঁওতাল আর ভুমিজরা এসেছে তাদের কাঁড় বাঁশ নিয়ে। তীরগুলির মুখে বিষ মাখিয়ে আনতে তারা ভোলে নি। মাহাতদের শান পাথরে ঘষা টাঙ্গি মশালের আলোয় ঝলসে উঠছে। আর গৌড় ও মানকিদের তেল চুকচুকে লাঠির উপর দিয়ে আলো পিছলে পড়ে। কান্থর ইশারা পেয়ে জোয়ানের দল নিজের নিজের হাতিয়ার মাথার উপর তুলে ধরে লাফ দিয়ে চীৎকার করে উঠল, “জয় মহুলিয়ার রঙ্কিনী মা। ইবার লর রক্তে তোর পূজা দিব।”

দু পহর রাতে কান্থ মাহাতোর ফৌজ দুই মাইল দূরে সাহেবদের তাঁবুর দিকে দ্রুত পায়ে অগ্রসর হল। অরণ্যের অধিবাসী ধলভূমের লোক আজও আদিম। তারা আইন কান্থন জানে না, তাদের বিচার হাতে হাতে।

সাহেবরা হয়তো কল্পনাই করতে পারে নি যে বন্দুক আছে জানার পরও জংলীদের এতটা সাহস হবে। অথবা হয়তো সম্ভোগের উন্মত্ত আবেগের সামনে সতর্কতার কথাই ওঠে না। কান্থর ফৌজ তাই চার দিক থেকে মার মার কাট্ কাট্ করে গিয়ে তাঁবুর উপর পড়ল।

কান্থর দলের ঐ রণহুংকার শুনে বেতনভুক্ কুলির দল কে কোথায় পালাল। সাহেবরা বন্দুকে হাত দিতে না দিতেই সাক্ষাৎ যমদূতের মত ভালুকবিঁধার জোয়ানরা সাহেবদের তাঁবু দখল করে ফেলল। ফুলিকেও পাওয়া গেল। তবে না পেলেই হয়তো ভাল হত। একটা তাঁবুর ভিতর রক্তাক্তদেহ ফুলি একেবারে বিবস্ত্র অবস্থায় বেহুঁশের মত মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছিল। মধু খুড়ার যে যৌবনবতী মেয়ে যে কোন মাহাত যুবকের রক্তে আগুনে নেশা ধরিয়ে দিতে পারত, তার দিকে জোয়ানেরা এখন এক ঝলক তাকিয়েই শিহরিত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল।

সেই তাঁবুতে বন্দুকধারী এক সাহেবকেও পাওয়া গেল। কিন্তু সাহেবের বন্দুক গর্জন করার পূর্বে বিদ্যুৎবেগে এক জন গৌড়ের লাঠি এসে সাহেবের হাতে পড়ল। আর কান্থ বিকট উল্লাসে, “জয় ধলরাজার রঙ্কিনী” বলে চীৎকার করে উঠল। তাঁবুর বাতিতে ওর হাতের টাঙ্গি বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল, আর পর মুহূর্তেই সাহেবের কাটা মাথাটা এক দিকে ছিটকে পড়ল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল ভুপতিত মুণ্ডহীন দেহটি থেকে। ফুলির অঙ্গে লিপ্ত রক্তেরই মত তা তেমনি গাঢ়, তেমনি লাল।

তার পর—তার পর আর কি? যা হওয়ার তাই হল। খবর পেয়ে পুলিস এল। সরকারী লোকের রক্তপাত? তাও মহারাণীর খাস তালুকের প্রজা একেবারে গোরা সাহেবের! মূর্খ গ্রামবাসীদের সরকার এবার উচিত শিক্ষা দেবে। ওদেরই ভালর জন্য রেল পাতা হচ্ছে, আর ওরাই কিনা নিজের ভাল না বুঝে এই সব কাণ্ড বাধিয়েছে।

গ্রামবাসীদের হয়ে বলার কেউ ছিল না। সুতরাং পুলিস তিন দিনে ভালুকবিঁধা গ্রাম একেবারে চষে ফেলল। গোটা আট দশ ঘরের চালের উপর লাল ঘোড়া দৌড়াল। দু-তিন জন মেয়েকেও পুলিস জেরা করার নাম করে তাদের তাঁবুতে ধরে নিয়ে গেল। তারা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসে যা বলল, তা শুনে বাকী মেয়েরা কে কোন্ দিকে পালাল। গরু কাড়া ছাগল মুরগী নিজের খুশি মত চরে বেড়াতে লাগল। তিন দিন পর পুলিস কানু মাহাত সহ জন পনের মরদকে কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে চাঁইবাসা নিয়ে গেল। আর তার পর বাকী সকলে গ্রাম ছাড়ল। পিছনে পড়ে রইল তাদের অর্ধদগ্ধ শূন্য কুঁড়েগুলি।

বিপিনের আজিমা বিপিনের বাবাকে নিয়ে তার বাপের বাড়ি এই জাহাতুতে পালিয়ে এল। এখান থেকেই খবর পাওয়া গেল যে চাঁইবাসায় মামলা চলছে।

তখনকার দিনে যাতায়াতের মোটেই সুবিধা ছিল না। আর পুলিসের ভয়ে কোন্ অজ্ঞ গ্রামবাসী কানুদের জন্য তদ্বির তদারক করতে যাবে? শেষে তাকেও যদি ধরে নেয়! অনেক দিন পর শোনা গেল যে দলের সর্দার কানুর সাত বছরের জেল হয়েছে; বাকী সকলের পাঁচ বছর করে। বিপিনের আজিমা কত কষ্টে গায়ে গতরে খেটে যে বিপিনের বাবাকে মানুষ করল, সে এক আলাদা কাহিনী।

সাত বছর পর কানু ছাড়া পেল। ছাড়া পাবার পর ওদের খোঁজ খবর নিয়ে কানু যখন তার শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে মিলিত হল, তখন সে এক পৃথক মানুষ। অবরুদ্ধ আক্রোশে সে একেবারে গুম্ হয়ে গেছে। কথাবার্তা যতটুকু না বললে নয়, তাই। কেবল থেকে থেকে আপন মনে সে কি যেন বিড় বিড় করে, আর মাঝে মাঝে মুঠি পাকিয়ে শূন্যের দিকে আস্ফালন করে। দীর্ঘ সাত বছরের কারাজীবনের ফলে তার লোহার মত শরীরেও ভাঙ্গন ধরেছিল। কিন্তু তবু সে চাঁইবাসা থেকে জাহাতু পর্যন্ত হেঁটে এসেছিল। তখন রেলগাড়ি চললেও সে তাতে চড়ে নি।

একটা দিন মাত্র স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে কাটিয়ে কানু মাহাত তীর্থ করতে কাশী চলে গেল। তাও হেঁটে। বলল, জেলে ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া ভাত খেয়ে জাত গেছে। এখন তীর্থস্নান না করলে শুচি হবার উপায় নেই। প্রায় এক বছর পর সে তীর্থ থেকে ফিরল।

এই এক বছরে তার পাগলামি আরও বেড়েছে। চুল কাটা ও দাড়ি কামান ছেড়ে দেওয়ায় চেহারাটাও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। স্নান করবে না, সময় মত খাবে না। কেবল পায়চারি করতে করতে বিড় বিড় করে বলবে, "দেখেলুব রেলপাতা বাবুদিগে—পরদেশীকা সঙ্, হলদিকা রঙ।" কাশী থেকে ফেরার কিছুদিন পরই কানু বদ্ধ পাগল হয়ে গেল এবং তার পর এই দীর্ঘকাল যাবত এই এক রকমই চলছে। দিন রাত ঐ ভাবে কানু ঘুরে বেড়ায় গ্রামে গ্রামে। ইচ্ছা হলে কোনদিন বাড়ি আসে, না হয় কেউ কোথাও দুটি খেতে দিলে আপন মনে গ্রামের পথে ঘাটে, বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়।

কাহিনী শেষ করে উপসংহারে বিপিন বলল, "ইয়ার পর মাস্টরবাবু হামদের সমাজে ঘরের বাহির ধাঁয়ে লাচ বন্ধ হই গেল। আর বুঢ়ারা তো এখনও সাহেব দেখি ডরায়।"

কৌশিকবাবু স্তব্ধ বিস্ময়ে বিপিনের কথা শুনছিলেন। বাকী সকলেও মন্ত্রমুগ্ধের মত নিজেদেরই এক অতীত দিনের কাহিনী শুনছিল। কখন যে খাদানের মজুরদের আর সব মুরুব্বীরা নিঃশব্দে এসে আসন গ্রহণ করেছে, কে জানে।

বিপিনই আবার নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, "লিন মাস্টরবাবু। ইয়ারা সব আসেছে। আজ কিনু সর্দাররা বলিতেছিল যে এলসি মেম মাল কম উঠা লিয়ে উয়াদেরকে সুদিয়াতেছিল। আপনার বুদ্ধিটা বড় কাজে লাগিছে। টুকু কামে ঢিলা দিতেই মালিকের টনক লড়বার লাগছে।"

কৌশিকবাবু একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নড়ে চড়ে বসলেন। এসব সেন্টিমেণ্টালিজমের প্রশ্রয় দিলে চলবে নাকি? এখন ইউনিয়নকে মজবুত করে গড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তার পর আরও কত কাজ আছে। এই তো সবে আরম্ভ।

॥ ছয় ॥

এ বছর ২৭শে জানুয়ারীতে বুখারেস্ট থেকে প্রচারিত কমিনফর্মের পত্রিকা "ফর এ লাস্টিং পিস, ফর এ পিপল্স্ ডেমোক্রেসী"-তে সেই অবিস্মরণীয় প্রবন্ধটি প্রকাশিত না হলে তাঁদের যে কি অবস্থা হত তা চিন্তা করতেও কৌশিকবাবুর ভয় হয়। পার্টির ভাষায় পূর্বতন সাধারণ সম্পাদকের মত, "ট্রটস্কি-টিটোর ধরনের উগ্র বামপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক কর্মসূচীর প্রবর্তক, রূপকার ও গোঁড়া সমর্থক" যদি এখনও দলের কর্ণধার থাকত, তা হলে সর্বনাশের আর বাকী কি ছিল? ভালই হয়েছে কিছুদিন পূর্বে সেই ভদ্রলোক নিজের ভুল স্বীকার করে পার্টির সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন, আর আজ কয়েক দিন হল একজন অন্ধ্রের কমরেড নূতন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

কিন্তু পূর্বতন কমরেড কমিনফর্মের নির্দেশের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে তাঁর তেলেঙ্গানা ট্যাকটিক্স দ্বারা পার্টির যা ক্ষতি করার, তা করে গেছেন। পার্টির সদস্য ও সমর্থকের সংখ্যা এই দুই আড়াই বছরে তো ভীষণ ভাবে কমে গেছেই, তা ছাড়া লোকচক্ষে পার্টির ইজ্জতও নেমে গেছে। নচেৎ পার্টি ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ অখিল ভারতীয় রেলওয়ে মজদুরদের ধর্মঘট করার জন্য যে ডাক দিল, তাতে কেউ সাড়া দিল না কেন? তার পর জুন মাসে বাঙলার জেলগুলিতে অনশনরত কমরেডদের উপর গুলি চালান হল। পার্টি সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানাল; কিন্তু তাও বৃথা গেল। এই তো এই দোসরা জানুয়ারীতে সারা ভারতের বস্ত্রোদ্যোগে নিযুক্ত মজুরদের একদিনের প্রতীক ধর্মঘটে যোগদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। বোম্বাই ছাড়া আর কোথাও ধর্মঘট হল না। এমন কি বোম্বাইএও সে ধর্মঘট বিশেষ শক্তিশালী হয় নি। কারণ পার্টির পত্রিকা ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ্যা পঁচাত্তর হাজার বলে প্রচার করলেও তাঁরা তো জানেন যে সঠিক সংখ্যা দেড় হাজারের বেশী নয়।

দেশের বিভিন্ন জেলে বন্দী কমরেডদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করার শাসানি দিয়ে তাদের ভুখ হরতাল করতে ও জেলের ভিতর ব্যারিকেড সৃষ্টি করে পুলিসদের উপর হামলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আশা করা গিয়েছিল যে এর ফলে বাইরে আন্দোলনের টেম্পো বাড়বে। কিন্তু এর ফল কি হল? ফল হল নির্বিচার গুলি চালনায় বহু প্রথম শ্রেণীর কমরেডের মৃত্যু বা জন্মের মত অঙ্গবিকৃতি। আর টেম্পো?

তার কথা না তোলাই ভাল। কলকাতার মত শহরে তাঁরা হাজার খানেকের বেশী লোক এর সমর্থনে রাস্তায় বার করতে পারেন নি। আর এর মধ্যে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের আত্মীয়ই ছিল বেশী। আর ছিল কিছু পাতি বুর্জোয়া ছাত্র। তেলেঙ্গানার থিসিসে যে "সংগ্রামী মজদুরদের" আশা ব্যক্ত করা হয়েছিল, তারা এ সবের ধারে কাছেই ছিল না। সংগ্রামী কৃষকদের দ্বারা জোর করে জমি দখল করে গরিলা বাহিনীর দ্বারা "মুক্ত এলাকা" স্থাপন করার পরিকল্পনাও আকাশকুসুম হয়ে রয়ে গেছে। তেলেঙ্গানা ট্যাকটিক্সের ফলে পার্টির কৃষক ফ্রণ্ট—কিষাণ সভার মেরুদণ্ডই এমন ভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে যে গত কয়েক বৎসরে এর কোন সম্মেলন আহ্বান করা সম্ভব হয় নি।

কৌশিকবাবু মনে মনে ভাবেন যে পার্টির পুরাতন সম্পাদককে বহিষ্কার করে ঠিকই করা হয়েছে। অযোগ্য নেতৃত্বের এই হচ্ছে শাস্তি। পূর্বতন সম্পাদকের এ সমস্ত থিসিসের কারণ তাঁদের পার্টি একদা কমরেড মাও এবং তাঁর পদ্ধতির অহেতুক বিরূপ সমালোচনা করেছিল। কিন্তু কমিনফর্মের প্রবন্ধে চীনের কমরেড লি শাউ চী-এর রচনা উদ্ধৃত করে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ভারতীয় কমরেডদের এবার থেকে চীনের পথেই চলতে হবে। পার্টির ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসের মুখপত্রে কমিনফর্মের ঐ নির্দেশকে মোটামুটি স্বীকার করে এক সম্পাদকীয় বিবৃতি বেরিয়েছে। কিছুদিন পূর্বে কৌশিকবাবু ঐ রচনাটি পড়ে আগামী দিনে পার্টির কাজকর্মের ধারা সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন।

এবার সকল শক্তি সংহত করে পার্টির নূতন সম্পাদকের হাত মজবুত করতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এখন অবস্থা তাঁদের অনুকূল। ভারতের তথাকথিত নিরপেক্ষ নীতির জন্য এ দেশে আমেরিকাবিরোধী ও সোভিয়েৎ-এর অনুকূল প্রচার চালান খুবই সহজ। বিশেষতঃ এই ২৫শে জুন কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় গণতন্ত্র ও ইউ এন ওর মুখোশ পরে পুঁজিবাদীরা বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করার যে কুকীর্তিতে আত্মনিয়োগ করেছে, তা ফাঁস করে দেওয়া সহজ হয়েছে। মূর্খ জওহরলাল নিরপেক্ষতার ঠাটটুকু বজায় রাখতে ব্যতিব্যস্ত। কোরিয়াতে ইউ, এন, ও'র নির্দেশে সৈন্য না পাঠিয়ে রেডক্রশ বাহিনী পাঠাবার কথা বলছেন। কিন্তু কার্যত মাউণ্টব্যাটেন শিষ্য জওহরলাল যে ইঙ্গ মার্কিণ চক্রান্তেরই সদস্য একথা কমিউনিস্টদের অজানা নয়।

"আরে, কৌশিকবাবু যে! পথ ভুলে নাকি?"

কৌশিকবাবুর তন্ময়তা ভাঙ্গল। আজ কোন গ্রামে যাবার কথা ছিল না। তবুও স্কুলের ছুটির পর অভ্যাস মত তিনি বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সকালে স্কুলের পালা চলছে। সারা দুপুর ঘরে বন্ধ থাকার পর একটু খোলা হাওয়ার লোভে লক্ষ্যহীন ভাবে এখানে আসার প্রথম দিকের মত তিনি যে কোন একটা পথ ধরে এগিয়ে চলছিলেন। চলতে চলতে স্টেশনের রাস্তা, মারোয়াড়ীদের ধানকল ইত্যাদি ছাড়িয়ে চাকুলিয়ার পাকা সড়ক ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এখানে ভোলানাথবাবুর ডাক শুনতে পাবেন, তা তিনি ভাবেন নি।

ভোলানাথবাবু কিন্তু সস্মিত বদনে তাঁর সঙ্গ নিয়েছেন, হাতে তাঁর বাজারের থলি। চলতে চলতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, "কি, কোন্ দিকে বেরিয়েছেন?"

"এমনিই একটু বেড়াচ্ছি।"

"তবে তো আর আপনাকে ছাড়া হচ্ছে না। এই কয় হাত দূরেই গরীবের কুঁড়ে। ওখানে একটু যেতেই হবে আজ। ছেলে ঠেঙিয়ে আর ঘর-গৃহস্থালি সামলে এমন একটু সময় পাই না যে লৌকিকতা বা সামাজিকতা করব। আজ যখন হাতের কাছে পাওয়া গেছে, তখন ছাড়ছি না।"

ভোলানাথবাবু কৌশিকবাবুর কোন ওজর শুনলেন না। একরকম জোর করেই তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

ঘরটি সত্য সত্যই মাটির, খড়ে ছাওয়া। তবে ওরই মধ্যে লক্ষ্মীশ্রী ঝক্ ঝক্ করছে। ছোট্ট উঠানটুকু পরিষ্কার করে গোবর দিয়ে নিকানো। মাঝখানে একটি আল্‌পনা। ঢুকতেই ডান পাশে একটি তুলসীমঞ্চ। বাঁ দিকে ঝিঙে আর পুঁই-এর লতা বর্ষার জল পেয়ে সবুজ পাতার রাশি মেলে ধরেছে। ঘর এবং সমস্ত উঠানটুকু জঙ্গলের ঝাঁটি দিয়ে ঘেরা। তার গায়েও কিসের লতা বেয়ে উঠেছে।

কৌশিকবাবুকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভোলানাথবাবু বললেন, "এ সব আমার স্ত্রীর কৃতিত্ব। আর এই অজ পাড়াগাঁয়ের ভাড়া বাড়িতে এর চেয়ে বেশী আর কি হবে?"

তাঁর হাসির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন গর্বও ছিল।

"কই গো," বলে ভোলানাথবাবু হাঁক দিতেই ঘরের ভিতর থেকে একটি নারীমূর্তি এগিয়ে এল। তামাটে রঙের মুখবর্ণ, ছোট ছোট গড়ন। কিন্তু

ভাল করে তাঁকে দেখার পূর্বেই তিনি ঈষৎ জিভ কেটে ঘোমটা টেনে ফের ভিতরে চলে গেলেন। তার পর ঘোমটা দেওয়া অবস্থাতেই আবার যখন বেরোলেন, তখন তাঁর হাতে দুটি আসন। আসন দুটিকে বাইরের বারান্দায় পেতে দিয়ে মূর্তিটি আবার ভিতরে চলে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার তিনি ত্বরিতপদে বাইরে এলেন। এবার তাঁর এক হাতে এক বালতি জল এবং অপর হাতে একখানি পাট করা গামছা। বালতি আর গামছা বারান্দায় রেখে ঘোমটার ভিতর থেকেই মাথা নেড়ে ভোলানাথবাবুকে ইশারায় কি বলে ওঁর স্ত্রী ভিতরে চলে গেলেন।

ভোলানাথবাবু কৌশিকবাবুকে লক্ষ্য করে বললেন, "নিন, হাত পা ধুয়ে নিন। এই গরম আর ধুলোয় এতটা পথ এলেন। একটু ঠাণ্ডা হয়ে জাঁকিয়ে বসা যাক।"

সামাজিকতায় অনভ্যস্ত কৌশিকবাবু কেমন বিব্রত বোধ করছিলেন। জড়িত স্বরে তিনি বললেন, "এ সব আবার কেন। আমি তো···"

বাজারের থলি হাতে ভিতরে যেতে যেতে ভোলানাথবাবু বললেন, "বা রে, তাই বুঝি হয়? গরীবের কুঁড়েতে যখন পায়ের ধুলো পড়েছে তখন একটু কিছু মুখে না দিয়ে যাবেন নাকি? তাই তো মহারাণী হাত পা ধুয়ে তৈরী হবার হুকুম দিয়ে গেলেন।" উচ্চৈঃস্বরে হাসতে হাসতে তিনি ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন।

বাইরে বেরিয়ে হাত পা ধুয়ে ভোলানাথবাবু কৌশিকবাবুর পাশে আসন গ্রহণ করতে করতে ওঁর স্ত্রী আবার এলেন। এবার তাঁর হাতে দুখানা পিতলের ছোট আকারের কাঁসি। কাঁসিতে কুচি করে কাটা কাঁচা পেঁয়াজ ও কাঁচা লঙ্কা সহ তেল মাখা মুড়ি। একটি কাঁসি কৌশিকবাবুর সামনে রাখতে রাখতে ভোলানাথবাবু বললেন, "হাতি ঘোড়া কিছুই খাওয়াতে পারব না, সে সঙ্গতি নেই। তবে ঘরে ভাজা টাটকা মুড়িও খুব খারাপ লাগবে না—একথা জোর করে বলতে পারি। নিন শুরু করুন এবার।"

ভোলানাথবাবু কোন কিছুই শোনবার পাত্র নন, তাই সব কটি মুড়ি খেতে হল। তার পর এল দুই গ্লাস দুধ। ভোলানাথবাবু বললেন, "আপনি কলকাতার লোক, তবু চা খাওয়াতে পারলাম না।" একটু বিরতির পর ঈষৎ হাস্য সহকারে আবার বললেন, "মানে ইচ্ছা করেই খাওয়ালাম না আর কি। চায়ের চেয়ে দুধ তো আর খারাপ নয়। আর এ আমার ঘরের দুধ। অবশ্য একটু খাটতে হয় গরু পোষার জন্য। তবে কষ্ট না করলে তো আর কেষ্ট পাওয়া যায় না।"

খাওয়া দাওয়ার পর আবার তাঁরা বসলেন। এই শান্ত গৃহ পরিবেশ কিছুক্ষণের জন্য যেন কৌশিকবাবুর আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়েছে। বাড়ির পাশে একটা দীর্ঘ আমড়া গাছের ডালে এক রাশ শালিক বসে কিচমিচ করছে। ও পাশে পশ্চিম দিগন্তের রক্তরাগ জমাট বর্ণ ধারণ করছে। বাড়ির ভিতর থেকে মাঝে মাঝে গোবৎসের হাম্বা ধ্বনি ভেসে আসছে। ওর মায়ের ফেরার সময় হল বুঝি। খড়ে ছাওয়া মাটির বাড়িটির বাইরের বারান্দায় চটের উপর শাড়ির পাড়ের রঙীন সুতো দিয়ে নকৃশা কাটা আসনে বসে একটা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে কৌশিকবাবু আনমনা হয়ে পড়েছেন। মাটির দেওয়াল ও চালের খড়ের সোঁদা গন্ধ নাকে ঢুকে মস্তিষ্ককে কেমন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

কিন্তু ভোলানাথবাবু ঘরের ভিতর থেকে একটা চরখা এনে সুতা কাটতে বসতেই কৌশিকবাবুর অভিভূত ভাব কোথায় উড়ে গেল। ঐ প্রাগৈতি-হাসিক যুগের যন্ত্রটা যেন প্রতিক্রিয়াবাদের মূর্ত প্রতীক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এত দিন যাবত মানুষের সযত্ন সাধনায় লভ্য ফলের মূর্তিমান অস্বীকৃতি হচ্ছে চরখা।

একটু হেসে কৌশিকবাবু বললেন, "বেশ ছিলাম এতক্ষণ ; কিন্তু এইবার আবার তর্ক শুরু হবে মনে হচ্ছে।"

সুতা কাটতে কাটতেই ভোলানাথবাবু হাসিমুখে জবাব দিলেন, "বেশ তো, হোক না। চরখা আমাদের আলোচনায় বাধা দেবে না।"

কৌশিকবাবু বললেন, "আচ্ছা শুনুন তা হলে। কি করে আদ্যিকালের এক জবরজং যন্ত্রকে আপনারা বরদাস্ত করেন, তা বুঝতে পারি না। চরখা খদ্দরের নাম শুনলেই আমার মনে হয় এ হচ্ছে মানবপ্রগতির পরিপন্থী এক চরম প্রতিক্রিয়াশীলতা। অনুন্নত ও অকার্যকরী উৎপাদন ব্যবস্থা, যার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে, তাকে অক্সিজেন দেবার এ ব্যর্থ প্রয়াস কেন?"

"ভারতের কোটী কোটী বেকারকে কাজ দেবার জন্য কুটীরশিল্প ছাড়া অন্য পথ নেই। দেখুন না, আমাদের দেশে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়েছে। এবার দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য বহুবিধ পরিকল্পনা রচিত ও কার্যান্বিত হবে হয়তো। কিন্তু দেখে রাখবেন গান্ধী বুড়োর কথা মেনে নিয়ে কুটিরশিল্পকে সর্ব রকমে উৎসাহিত না করলে এ দেশের বেকারত্ব ও দারিদ্র্য কিছুতেই মিটবে না। লোকের যদি কাজ অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা না থাকে, তা হলে দেশে বহুবিধ পণ্য উৎপন্ন হলেও তা কিনবে কে? আর এ কথা তো দিবালোকের মত স্পষ্ট

যে অধিক যন্ত্র মানেই অধিকতর শ্রমসংক্ষেপ অর্থাৎ কিনা আরও বেকারি।”

কৌশিকবাবুর কণ্ঠ প্রতিবাদের জন্য উসখুস করছিল। কিন্তু তাঁকে সে অবসর না দিয়ে ভোলানাথবাবু বলে চললেন, “নিছক ভৌতিক সমৃদ্ধির দিক থেকেই যদি বিবেচনা করেন, তা হলে দেখতে পাবেন যে প্রত্যেক মানুষের অনুৎপাদক সময়কে যৎসামান্য হলেও জাতীয় সম্পদে পরিণত করার সর্বজন-সুলভ সাধন হচ্ছে চরখা। অথবা সুতা কাটা ও কাপড় বোনা ভারতের মুখ্য উপজীবিকা কৃষির পরিপূরক শিল্প ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রের কথা আমি আজ বলব না। কারণ গান্ধীজী ও তাঁর প্রমুখ ভাষ্যকরেরা এ সব কথা বহু ভাবে বলে গেছেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে আমি পুঁজিবাদের অবসান করতে চাই বলে খদ্দর পরি আর চরখা চালাই।”

পুঁজিবাদের অবসান! এ যে তাঁদেরই কথা। কৌশিকবাবু উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু এর জন্য ভদ্রলোক খদ্দর চরখার কথা আওড়াচ্ছেন কেন। এর পথ তো মার্কস এঙ্গেলস কবেই দেখিয়ে গেছেন। বিভ্রান্ত কৌশিকবাবু নিজের মনের কথা প্রকাশ না করে কেবল বলেন, “এই আবার আপনার হেঁয়ালি শুরু হল! কোন্ বুদ্ধিমান মানুষ আজকের দিনে পুঁজিবাদের অবসান চায় না? কিন্তু তার জন্য পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, সর্বহারাদের সংগঠিত করতে হবে। ঘরের কোণে চরখা ঘুরিয়ে কি হবে?”

“দেখুন, আজকের দিনেও কালিদাসের অভাব নেই। না না, কবি কালিদাসের কথা বলছি না। সরস্বতীর বরপুত্র হবার পূর্বেকার কালিদাসের প্রতি আমি ইঙ্গিত করছি, যিনি স্বয়ং গাছের যে ডালে বসেছিলেন, সেই ডালের উপরই কুঠারাঘাত করছিলেন। এই সব মডার্ন কালিদাসের দল মনে করেন যে জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভার প্রাপ্তির ব্যাপারে পুঁজিবাদের উপর নির্ভর করেও পুঁজিবাদের অবসান ঘটান যায়। খাওয়া পরার প্রতিটি জিনিসের জন্য কেন্দ্রিত উৎপাদনব্যবস্থা ও তার মালিক পুঁজিপতিদের মুখাপেক্ষী হয়েও জাদুমন্ত্রে পুঁজিবাদ দূর করা যায়। মশাই, পুঁজিবাদের অবসান কামনা করলে প্রথমে নিজেদের জীবনকে পুঁজির প্রভাব মুক্ত করুন।”

“সেই জন্যই তো আমি বলছি যে সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষকেরা রাষ্ট্রশক্তি হাতে নিয়ে সকল ব্যবসা বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করবে।”

“আর যত দিন তা না হচ্ছে মিলের কাপড় পরে, মিলের খোরাক খেয়ে

পুঁজিবাদকে আরও পরিপুষ্ট করুক। তা ছাড়া পরিচালক বদলালেই কি কোন প্রথার স্বধর্ম পালটে যায় নাকি? স্বয়ং মজুর বা তার প্রতিনিধিরা কেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানর ভার নিলে এর স্বভাব-ধর্মে কোন পরিবর্তন ঘটবে বলে ধরে নেওয়ার অর্থ নেই। ঢেঁকি আমিই চালাই বা আপনি চালান, ও ধানই ভানবে। কাজে একটু উনিশ বিশ হতে পারে; কিন্তু ধান ভানার বদলে ঢেঁকি দিয়ে চিনি তৈরী করা যাবে না।"

কৌশিকবাবু বললেন, "ঠিক বুঝলাম না আপনার বক্তব্য। কথাটাকে আর একটু খোলসা করুন।"

ভোলানাথবাবু জবাব দিলেন, "ও প্রসঙ্গ যাক, ওটা হচ্ছে বহিরঙ্গ আলোচনা। এ সব প্রশ্নের মীমাংসা অতি সহজে হয়ে যাবে, যদি প্রথমেই সামাজিক আদর্শ স্পষ্ট থাকে। আজ বরং সেদিনকার আলোচনার জের ধরে এগোন যাক। শিক্ষার স্বরূপ নিয়ে কথা হচ্ছিল।"

"আচ্ছা তাই হক। তবে এ প্রসঙ্গে আপনি বক্তা, আর আমি শ্রোতা। আপনার কথা পুরোপুরি শোনার পর আমি আমার অভিমত ব্যক্ত করব।"

ভোলানাথবাবু একটু নড়ে চড়ে বসলেন। তার পর চরখার থেকে মুখ না তুলেই বলতে লাগলেন, "আমি চাই যে ভবিষ্যৎ সমাজ সহযোগিতার আধারে গড়ে উঠুক। সহ অবস্থান যথেষ্ট নয়। ওটা বড় বেশী হলে নেতিবাচক মনোবৃত্তি। সক্রিয় সহযোগিতার বৃত্তি ব্যক্তি-ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী-গোষ্ঠীর ভিতর ক্রিয়াশীল না হলে অতীতে মানব সমাজে সভ্যতা দানা বাঁধত না। আর এই যুক্তি সক্রিয় না থাকলে মানবজাতির ভবিষ্যৎ প্রগতির গতিও অবরুদ্ধ হবে। সুতরাং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে সহযোগিতার শরণ নিতে হবে এবং এই কলার শিক্ষানবিসি আরম্ভ হবে শৈশব থেকে। সহযোগিতা অবশ্য শূন্যে শেখার জিনিস নয়, এর মাধ্যম হল কর্ম। কর্মই মানুষের স্বজনাত্মক বৃত্তি, জীবনের প্রথম থেকে শেষ অবধি আমাদের হাত পায়ের সঞ্চালনের সাহায্যে আমরা বেঁচে থাকি। অতএব কর্মকে সহযোগিতামূলক জীবনযাত্রাপদ্ধতি শেখার মাধ্যম করতে হবে। কারণ শিক্ষা বিশেষ একটা বয়সে স্কুল কলেজ ছাড়ার পর শেষ হয়ে যায় না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্তির পর্ব চলে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে কোন্ ধরনের কর্ম শিক্ষাপ্রাপ্তির মাধ্যম হবে? স্বভাবতই উৎপাদনমূলক কাজকে এর জন্য নির্বাচন করতে হবে। মানুষের শ্রমশক্তিকে অনুৎপাদক কর্মে নিয়োগ করে অপচয় করার অর্থ হয় না, আর মানবসমাজের অর্থব্যবস্থাকে সমগ্র ভাবে

বিচার করলে এ সম্ভবও নয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে, এ কথা স্বীকার করে নিয়েই আমি সাধারণ নিয়ম হিসাবে এই নীতি ঘোষণা করছি। তা ছাড়া ন্যায়বিচার আধারিত সমাজে কেউ কারও শ্রমের ফল শোষণ করতে পারবে না। সুতরাং প্রত্যেককে যথাসম্ভব নিজের শ্রমে স্বাবলম্বী হতে হবে। অবশ্য স্বাবলম্বনের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত অর্থে কথাটা ব্যবহার করা হচ্ছে না। অতএব যে ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্তির অন্তত অন্তিম পর্যায়ে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবে স্বাবলম্বী না হবে, শিক্ষা শেষ করে শোষণবিহীন সমাজে কি ভাবে সে জীবনধারণ করবে? অতএব ছাত্রকে এমন একটা উৎপাদনমূলক ক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান ও সহযোগিতামূলক জীবনযাপনকলা শিক্ষা দেওয়া হবে, ভবিষ্যতে যার দ্বারা সে নিজ জীবন নির্বাহ করতে পারে।...”

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বাড়ির ভিতরে তিনবার শাঁখের শব্দ উঠল। ঘরের ভিতর থেকে তেমনি ভাবে ঘোমটায় মুখ ঢেকে ভোলানাথবাবুর স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। এবার তাঁর শাড়ির আঁচল গ্রীবাদেশ বেষ্টন করে পিছনের দিকে ঝুলছে। দুই করপল্লব সম্মুখপানে অঞ্জলিবদ্ধ। উন্মুক্ত করপাত্রে একটি জলন্ত মৃৎপ্রদীপ। প্রদীপটি তুলসীতলায় রেখে ভোলানাথ-বাবুর স্ত্রী সেখানে প্রণাম করলেন। তার পর ধীরে ধীরে উঠে ঘরের ভিতর গিয়ে একটি পরিষ্কার লণ্ঠন তাঁদের সামনে নামিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে আবার ভিতরে চলে গেলেন।

বেড়ার বাইরে কয়েকটি শিশুর কলহাস্য শোনা গেল। দরজা ঠেলে সারি সারি তিনটি শিশু ভিতরে প্রবেশ করল। বড়টি ছেলে, বছর দশেক বয়স। পরেরটি বছর ছয়েকের একটি মেয়ে এবং সর্বশেষেরটি ছেলে। এই সবে সে বোধ হয় হাঁটতে শিখেছে। ভোলানাথবাবু “ওরে থাম্ থাম্” বলে চরখা সামলাতে না সামলাতেই সেই ক্ষুদ্র শিশু দুই হাত বাড়িয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে আধ আধ ভাষায় কত কি বলে চলল।

ব্যতিব্যস্ত ভোলানাথবাবু তাঁকে উদ্দেশ্য করে, “দেখুন তো মশাই, কেমন বিরক্ত করে” বললেও কৌশিকবাবু লক্ষ্য করলেন যে তাঁর কণ্ঠে মোটেই অভিযোগের স্বর ধ্বনিত হচ্ছে না। বরং তাঁর মুখে মৃদু হাসি।

বড় ছেলে আর মেয়েটি বারান্দাতেই দাঁড়িয়েছিল। তাদের লক্ষ্য করে ভোলানাথবাবু বললেন, “তোমাদের কাকাবাবু হন।”

কৌশিকবাবু না না করতে করতেই তারা তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল। কৌশিকবাবু একটু বিরক্ত হলেন। প্রণাম করা বা নেওয়া

তিনি পছন্দ করেন না। এত কী দৈন্য যে একজনের পায়ের ধুলো আর এক জনের শিরোধার্য হবে? এতে মনুষ্যত্বের অবমাননা, এ প্রথা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পরিপন্থী।

কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে ভোলানাথবাবুর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতে তাঁর আর ইচ্ছা হল না। সত্যি কথা বলতে কি এই সব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে হৈ-চৈ করার প্রয়োজনও নেই। নূতন সমাজে নবীন প্রথা প্রবর্তিত হবে। কোথায় তখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই সব ফিউডাল যুগের কুপ্রথার ধ্বংসাবশেষ।

বড় ছেলে ও মেয়েটি ভিতরে গেছে। ভোলানাথবাবু কোলের ছেলেটিকে বললেন, "যাও, ভিতরে গিয়ে দাদা-দিদিদের সঙ্গে পড়তে বসো। আমি কাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলছি।"

কিন্তু আয়াসলব্ধ সিংহাসন ছেড়ে উঠে যাবার লক্ষণ তার ভিতর দেখা গেল না। সজোরে সে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "না-না-না।" ভোলানাথবাবু একটু হেসে তার মুখচুম্বন করে বললেন, "দুষ্টু কোথাকার!"

কৌশিকবাবুর মনের তাল কেন যেন কেটে গেছে। তিনি নিজের মনকে শাসন করা আরম্ভ করলেন। কি হচ্ছে এ সব? এর নাম বাজে সময় নষ্ট করা নয় কি?

শান্তিতে যে নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে সহজ নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন করছে, সে কি বুঝবে বিপ্লবের মহিমা? নিজের নিষ্কর্মা জীবন ও পরিবর্তন-ভীতি সমর্থন করার জন্য সে তো চরখা আর নূতন শিক্ষার কথা বলে কুতর্ক জুড়ে দেবেই। অপরের চোখে কেউ তো খাটো হতে চায় না। এই সব পাতি বুর্জোয়া মনোবৃত্তি সম্পন্ন মধ্যবিত্তরা কায়েমী স্বার্থের চিরকালীন পুচ্ছ। বিপ্লব বা পরিবর্তনে এদের শ্রেণীস্বার্থ ব্যাহত হবে বলে এরা বড় বড় শূন্যগর্ভ কথার আড়ালে মেকী আদর্শবাদের মুখোশ পরে বিপ্লবকে রুখতে চায়। কেমন একটা বিরূপতায় তাঁর মন ছেয়ে গেল।

কিন্তু মনের ভাব গোপন করে তিনি বললেন, "না-না, আমিই উঠছি এবার। অনেকক্ষণ হয়ে গেল।"

"কিন্তু আলোচনাটা তো শেষ হল না।"

গাত্রোত্থান করতে করতে কৌশিকবাবু জবাব দিলেন, "এ আলোচনায় কি লাভ? আপনি নূতন শিক্ষার কথা বললেও নিজে কার্যতঃ তো পুরাতন শিক্ষারই প্রসার ঘটাচ্ছেন। আপনার ভাষ্য অনুযায়ী এও তো কালিদাসবৃত্তির আধুনিক লক্ষণ।"

কথাটা কেমন যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বিশেষতঃ শেষের বাক্যটি। এ কথা বলবেন বলে কৌশিকবাবু ভাবেন নি। চাপি চাপি করেও শেষ পর্যন্ত মনের বিরূপতা চাপতে পারলেন না তিনি। লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোতেও কৌশিকবাবু লক্ষ্য করলেন যে ভোলানাথবাবুর মুখমণ্ডল কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেল।

লজ্জিত কৌশিকবাবু কোন মতে উচ্চারণ করলেন, "আচ্ছা আসি, নমস্কার।"

"নমস্কার।" কথাটা যন্ত্রচালিতের মত ভোলানাথবাবুর মুখ দিয়ে বেরোল। হাত দুটি জোড় করতেও বুঝি ভুলে গেলেন তিনি। বেড়ার ঝাঁপ টেনে দেবার সময় কৌশিকবাবু লক্ষ্য করলেন যে তিনি তখনও এক ভাবে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে বসে আছেন।

* * * *

রাস্তায় নেমেও ঐ ঘটনাটার কথা তাঁর মনে ঘুরপাক খেতে লাগল। এমন বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বার করা ঠিক হয় নি। তা ছাড়া এর কি প্রয়োজন? ভোলানাথবাবুর স্বভাবের পরিবর্তন হবে বলে কৌশিকবাবু বিশ্বাস করেন না। উনি অপরকে ঠেস দিয়ে ঐ রকম গোলমেলে বড় বড় কথা বলবেন; কিন্তু চলবেন নিজ শ্রেণীস্বার্থ অনুযায়ী। তবু কোথায় যেন একটা কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করছে। ভোলানাথবাবুও কম রূঢ়ভাষী নন—এই কথা বলে তিনি মনকে ঠিক বোঝাতে পারলেন না। যত সব বুর্জোয়া সেন্টিমেণ্ট আর কুসংস্কার বলেও ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার। স্টেশনের রাস্তা বাঁ হাতে ছেড়ে তিনি অন্ধকার পথ ধরে নরসিংগড়ের দিকে এগোতে লাগলেন। বাইরে যাবার কথা নয় বলে আজ টর্চ নিয়েও বেরোন নি। পথ অবশ্য প্রশস্ত। যুদ্ধের দৌলতে স্টেশন থেকে নরসিংগড় পর্যন্ত রাস্তায় পিচ ঢালা। তাই এমনিতে চলতে অসুবিধা নেই। তবে ঘন অন্ধকারে দু হাত দূরের জিনিসও চোখে পড়ে না। দু-একটা জোনাকি টিপ টিপ করে দৃষ্টিকে আরও বিভ্রান্ত করে। পর মুহূর্তেই ডাইনে বাঁয়ের অন্ধকার গাঢ়তর হয়।

কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌—কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌, ঝিঁঝিঁ পোকার ঐকতানের বিরাম নেই। আশেপাশে মাঝে মাঝে মৃদু খস খস আওয়াজ। হাওয়ায় শুকনো পাতা স্থানচ্যুত হল, কিংবা হয়তো দুই পাশের শাল গাছের ডাল দুলছে।

পথ এবার রিজার্ভ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গেছে। উর্ধ্বমুখী শালগাছের ভিড়ে অন্ধকার আরও জমাট বেঁধেছে। কৌশিকবাবু আকাশের দিকে তাকালেন। ইতস্তত কয়েকটি মাত্র তারা।

নরম একটা কিছুর উপর পা পড়ায় কৌশিকবাবু চমকে উঠলেন। নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করে চকিতে তিনি এক পা পিছিয়ে গেলেন। কিন্তু অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। আর বেশীক্ষণ ভাববার অবকাশও তিনি পেলেন না। হিস্ করে বুকের রক্ত জল করা একটা ক্রুদ্ধ গর্জন তাঁর কানে গেল। যেন এক লহমার জন্য হাত দেড়েক উঁচু এক ঘনকৃষ্ণ বিদ্যুল্লতা অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করে দুলে উঠল। গাঢ় অন্ধকারের ভিতর গাঢ়তর আঁধারের হিল্লোলিত রেখা। আবার সেই বুক কাঁপান শব্দ—হিস্ হিস্। কৌশিকবাবুর প্রতিটি ইন্দ্রিয় দারুণ দহনজ্বালায় জ্বলে উঠল। দংশন, প্রচণ্ড দংশন। বাঁ পায়ের গোছের নীচে কে যেন শত শত উত্তপ্ত লৌহশলাকা অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছে। মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে, দেহের স্নায়ুতে স্নায়ুতে কী অপরিসীম অগ্নিজ্বালা! উঃ উঃ—হৃদয়বিদারক আর্তনাদ করতে করতে কৌশিকবাবু টলতে লাগলেন। তাঁর সেই আর্তনাদ নির্জন শালজঙ্গলের ডালে ডালে পাতায় পাতায় প্রতিধ্বনি তুলল—উঃ উঃ।

॥ সাত ॥

এলসি ওদের দুজনকে "গুডনাইট" বলে গাড়িতে স্টার্ট দিল। বীণা দেবী ও ইন্দুবাবু আর একবার এলসিকে শুভরাত্রি জানালেন। এলসি ক্লাচ চেপে গীয়ার দিতে দিতে মৃদু হাস্যে তার প্রত্যুত্তর দিল। এক্সিলারেটারে ছোঁয়া লেগেছে। তাই গাড়ি দুলে উঠল।

এলসির মনোরাজ্যে আজ আবার সেই নিঃসঙ্গতার বিষণ্ণ বোঝা ভর করেছে। উঃ, কতগুলি দিন কেবল কুলী মজুর আর কাইনাইটের হিসাব করে কেটে গেল। জীবনটা তার যেন কোয়ারী সাইডিং-এ ধু ধু করা বন্ধুর মাঠে পড়ে থাকা নিঃসঙ্গ শেড্‌টির মত। মরুভূমি আর এর সঙ্গে তফাৎ কোথায়? হিসাব হিসাব আর হিসাব। একটু বেহিসাবী হয়ে নিজের ইচ্ছামত জীবনকে রসিয়ে উপভোগ করার উপায় নেই। মাঝে মাঝে এলসির মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তার জীবনের কাজ আর জীবনের কাব্যের মধ্যে এত বিরোধ কেন, কিসের জন্য সমন্বয় হল না এ দুয়ের মধ্যে? কপাল,

বিধিলিপি, ভগবানের ইচ্ছা? কেন, এলসির বেলাতেই বা এমন শুষ্ক নীরস ইচ্ছা হল কেন বিধাতাপুরুষের মনে?

নাঃ, আবার হিসাব করতে হচ্ছে। হিসাব করে স্টিয়ারিং বাঁ দিকে ঘোরাতে হচ্ছে। স্টেশনের সড়ক এসে নরসিংগড় গামী পথের উপর পড়েছে। এলসি হর্নে মৃদু অঙ্গুলির চাপ দিল। পি-ই-ই-প্ শব্দ করে গাড়ি বাঁ হাতি মোড় ফিরল।

রাস্তা সোজা রিজার্ভ শাল জঙ্গলের বক্ষ বিদীর্ণ করে নরসিংগড় হয়ে ঘাটশীলা চলে গেছে। অন্ধকারের বুক চিরে বর্শাফলকের মত আলোকের দুটো স্থূল ঋজু রেখা পথের বুকে ঠিকরে পড়ছে। আলোকের আগমন-সঙ্কেত প্রাপ্তি মাত্র সন্ত্রস্ত অন্ধকারপুঞ্জ রাস্তার উভয় পার্শ্বে শাল জঙ্গলের ভিতর গিয়ে আত্মগোপন করছে। এক লহমা পরে এই ক্ষণস্থায়ী আলো সরে গেলে পথের উপর আবার আঁধারের অবিচ্ছিন্ন অপ্রতিহত রাজত্ব নেমে আসবে। শাল-জঙ্গলের গায়ে বুঝি কিসের ছায়া দোলে। খস্ খস্, সর্ সর্—কত অস্ফুট অর্ধস্ফুট শব্দ অরণ্যের রহস্যঘেরা অন্দর মহল থেকে ভেসে আসছে।

কিন্তু—কিন্তু ওটা কি? এলসি চমকে উঠে সকল শক্তি সংহত করে ব্রেক কষল। ঐ যে ক হাত দূরে রাস্তার উপর কাপড় চোপড়ে ঢাকা? হ্যাঁ, মানুষের মূর্তিই তো। এলসির ভিতর পর্যন্ত কেঁপে উঠল। এদিকে অকস্মাৎ গাড়ির গতিরুদ্ধ হওয়ায় ডিউকও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ঘৌ ঘৌ ঘৌ—ডিউকের উচ্চকণ্ঠের চীৎকার নিশীথ বনভূমির নীরবতা খান্ খান্ করে ভেঙ্গে দিল। তার পর ডিউক গাড়ির পিছন থেকে লাফিয়ে পড়ে সামনের দিকে ছুটে গেল। গাড়ির হেড লাইট দুটো তেমনি জ্বলছে। অন্ধকারের বুক চিরে রাস্তার উপর দুটো সমান্তরাল ও সুপ্রশস্ত আলোকরেখা পড়েছে। আর তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে একটি মনুষ্যদেহ। এলসি একা একা রাত-বিরাতে বহু জায়গাতে ঘুরলেও এ জাতীয় অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম। ওর মাথার ভিতর থেকে যেন একটা হিমানীস্রোত মেরুদণ্ড বেয়ে নীচে নেমে গেল। ওর সর্বদেহ শিহরিত হয়ে উঠল।

ডিউক কিন্তু ধরাশায়ী মনুষ্যদেহের কাছে পৌঁছে গেছে। ভূমিশয্যাশায়ী মানুষটির চতুর্দিকে দুটো পাক দিয়ে ডিউক তার গায়ে নাক লাগিয়ে বার বার শুঁকতে লাগল। তার পর আবার অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ডেকে উঠল—ঘৌ ঘৌ ঘৌ, ঘৌ ঘৌ ঘৌ। এত সবেও শায়িত মনুষ্যদেহটিতে নড়া চড়া বা অন্য কোন রকমে জীবনের কোন নিদর্শন দেখা গেল না।

এলসি এতক্ষণে একটু ধাতস্থ হয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে এক পা দু পা করে এগিয়ে সে ঐ মনুষ্যদেহের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ধুতি আর ফুলশার্ট পরা একজন মাটিতে পড়ে রয়েছে। পাশে একটা চশমাও গড়াগড়ি যাচ্ছে। লোকটির পায়ে জুতোও আছে। চেহারা ও পোশাক-পরিচ্ছদে তো ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। ভাল করে দেখার জন্য এলসি একটু ঝুঁকে পড়ল। লোকটির মুখের দুই পাশে অল্প অল্প গাঁজলার আভাস। নেশা করেছে নাকি? কই, তা হলে তো গন্ধ পাওয়া যেত। এলসি সতর্ক ভাবে লোকটির গায়ে হাত দিল। এখনও উত্তাপ আছে। হাত ধরে নাড়া দিল। নড়ছে এখনও। থ্যাঙ্ক গড—তা হলে মরে যায় নি একেবারে।

এলসি কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। দ্রুতপদে ফিরে সে গাড়ির চালকের আসনে বসল। তার পর ডিউকের দিকে ইশারা করে বলল, "ওয়েট, আই এম কামিং।" ও কি বুঝল কে জানে? কিন্তু ভূতলশায়ী মনুষ্যদেহের পাশ কাটিয়ে গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে যাবার সময় ও বাধা দিল না।

লোকটিকে একা গাড়িতে তোলা এলসির সাধ্য নয়। আর এ রকম গোলমেলে ব্যাপারে আরও দুই-একজন সঙ্গে থাকা ভাল। হাজার হলেও সে বিদেশিনী। কিসে কি হয় কে বলতে পারে? অতএব সে নরসিংগড়ের দিকে গাড়ি চালাতে লাগল।

মোটরে কতক্ষণেরই বা পথ? মিনিট দুয়েক পর এলসির গাড়ি নরসিংগড়ের নাথুনী শেঠের দোকানের সামনে দাঁড়াল। এলসির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলে কি হবে, তাকে এ অঞ্চলের সবাই চেনে। তার উপর এলসিদের ওখানে নাথুনী শেঠ জিনিসপত্র সরবরাহ করে। সুতরাং দোকানের সামনে গাড়ি থামতে দেখে স্বয়ং নাথুনী শেঠ গাড়ির কাছে ছুটে এল।

এলসি অল্প কথায় ওকে ঘটনার বিবরণ জানিয়ে ওদের জন কয়েককে তার গাড়িতে চড়ে ঘটনাস্থলে যেতে বলল। দোকানের কাজকারবার বন্ধ হয়ে গেলেও জনকয়েক গ্রামবাসী তখনও ওখানে বসে গল্পগুজব করছিল। শেঠের অনুরোধে তাদের কয়েকজন গাড়ির পিছনে উঠে বসল। এলসি গাড়ি ব্যাক করে আবার চালিয়ে দিল।

ডিউক একই ভাবে প্রহরীর মত মনুষ্যদেহটির পাশে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মোটরের বাতি দেখে চীৎকার করে সে সাড়া দিল। এলসি

তার কাছে গিয়ে গাড়ি থামাল। তার পর ওরা সকলে দ্রুতপদে সেই ভূতলশায়ী মনুষ্যদেহের কাছে উপনীত হল।

পূর্ণ দাসই প্রথমে চিনতে পারলেন। কয়েক পা এগিয়ে তিনি বললেন, "এ আমাদের নূতন মাস্টার মশাই না?"

"ঠিক ঠিক। তাই তো, তাই তো।" আর সকলে সমবেত কণ্ঠে সমর্থন জানালেন। এ তো হাই স্কুলের নূতন মাস্টারমশাই কৌশিকবাবু। কিন্তু ভদ্রলোক এ ভাবে পড়ে আছেন কেন? খুনখারাপি না রাহাজানি—কি হয়েছে?

তবে যাই হক না কেন, প্রথমে তো এঁকে লোকালয়ে নিয়ে যাওয়া যাক। কৌশিকবাবুর অচেতন দেহ গাড়িতে তুলে দেবার জন্য এলসি ওঁদের সকলকে বলল। তার পর সে তাড়াতাড়ি গাড়ি ব্যাক করতে লাগল।

অকস্মাৎ নাথুনী শেঠ চেঁচিয়ে উঠল। কি হয়েছে? কৌশিকবাবুর বাঁ পায়ের গোছায় বেশ কয়েক ফোঁটা রক্ত চাপ বেঁধে আছে। ওঁকে ধরাধরি করে তুলতে গিয়ে পায়ের কাছে কাপড় সরে গেছে এবং মোটরের হেড লাইটে সারা জায়গাটা আলোকিত হওয়ায় রক্তের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নাথুনী শেঠ পায়ের দিকটা ধরেছিল। উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠে সে আর সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলেন।

ধনঞ্জয় মাহাতর চোখ ঐ দিকে পড়তেই তিনি চীৎকার করে বললেন, "ওরে বাবা, এ তো সাক্ষাৎ মা মনসার কামড়।"

এলসিও দেখল। বাঁ পায়ের গোছের মাঝ বরাবর কয়েক ফোঁটা রক্ত জমাট বেঁধে আছে। একটু ভাল করে নজর করলে তার মাঝে দুটি সূক্ষ্ম ক্ষত চোখে পড়ে। প্রায় আধ ইঞ্চি দূরত্বে সরল রেখায় দুটি দাঁতের চিহ্ন। বিষাক্ত সাপের কামড়ের দাগ।

ওঁরা সকলে কৌশিকবাবুর দেহকে আবার রাস্তায় শুইয়ে দিয়েছেন। ধনঞ্জয় মাহাত ও পূর্ণ দাস কপালে হাত জোড় করে কাকে নমস্কার করছেন। ওঁদের চোখ বোজা। নাথুনী শেঠও ওঁদের দেখাদেখি অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে নমস্কার করল।

এলসি জানে সাপ বাঘ হাতি ভালুক—ধলভূমে সবাই দেবতা। তার ইংরেজ রক্তে এসব কুসংস্কার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সে তাড়াতাড়ি কৌশিকবাবুর কোঁচার কাপড় ছিঁড়ে কামড়ের জায়গার উপরে একটু দূরে শক্ত করে দুটো বাঁধন দিল। স্কার্টের পকেট থেকে কলমটি বার করে

বাঁধনের ভিতর ঢুকিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তাকে আরও আঁট করে দিল। তার পর সকলের উদ্দেশে বলল, "শিগগির ওঁকে গাড়িতে ওঠান। খুব দেরি হবার আগে চেষ্টা করলে হয়তো ওঁকে বাঁচান যায়।"

কৌশিকবাবুর অচেতন দেহকে গাড়ির পিছনের দিকে শোয়ান হল। ডিউকও একপাশে থাবা গেড়ে বসল। নাথুনী শেঠ এবং বাকী কয়জন সামনে পিছনে করে গাড়িতে উঠে বসতেই এলসি গাড়িতে স্টার্ট দিল।

শেঠের দোকানের সামনে গড়ি থামিয়ে এলসি বলল, "আপনারা একজন কেউ আমার সঙ্গে ঘাটশীলায় চলুন। এখানে তো সাপে কামড়ানর চিকিৎসা হবে না। ঘাটশীলার কপার করপোরেশানের হাসপাতালে নিয়ে যাব এঁকে।"

পূর্ণ দাস বললেন, "হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কি হবে মেম সাহেব? মা মনসার দয়া হলে তো এইখানেই বাঁচবে। রেজাক ওঝাকে খবর দেওয়া যাক। ঝাড়ফুঁকে ওর খুব নাম।"

এলসি তার কথায় কর্ণপাত না করে একটু হাসল। অবিশ্বাস আর বিদ্রূপ মেশান সেই হাসি। গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে সে কেবল বলল, "চলুন কে যাবেন। বেশী দেরি করলে এঁকে আর বাঁচান নাও যেতে পারে।"

নাথুনী শেঠ গাড়ির পিছনে উঠে কৌশিকবাবুর অচেতন দেহকে চেপে ধরে বলল, "চলুন।" গাড়ি আবার অন্ধকারের বুক চিরে তীর বেগে ঘাটশীলার দিকে ছুটে চলল।

* * * * *

শেষ ইঞ্জেকশনটি দিয়ে ডাঃ বোস বললেন, "আশা করছি যে আর কোন রকম দৈব দুর্ঘটনা না হলে ঘণ্টা কয়েক পরেই পেশেণ্টের জ্ঞান ফিরে আসবে। এখনই এর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ভগবানকে ধন্যবাদ মিস মুর যে আপনি সময় মত ওখানে পৌঁছেছিলেন। নচেৎ কৌশিকবাবুর বাঁচার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কোবরা জাতীয় সাপ ওঁকে কামড়েছে। এ অঞ্চলে এর চেয়ে বিষাক্ত সাপ আর নেই বললেই চলে। শঙ্খচূড় অবশ্য কখনও কখনও দেখা যায়। তবে ওরা সাধারণতঃ মানুষ বা জন্তু-জানোয়ারের চলাচলের পথ থেকে দূরে একটু নির্জন পাহাড়ী জায়গায় থাকে। জনবসতির মধ্যে গোখরো, খরিস ইত্যাদি বিষাক্ত সাপই বেশী। কিন্তু থাক সে কথা। ঘণ্টচারেক তো হল। রাত এবার প্রায় দেড়টা বাজে। আর আপনার থাকার কোন প্রয়োজন নেই। আমিও এবার কোয়ার্টার্সে

তার কাছে গিয়ে গাড়ি থামাল। তার পর ওরা সকলে দ্রুতপদে সেই ভূতলশায়ী মনুষ্যদেহের কাছে উপনীত হল।

পূর্ণ দাসই প্রথমে চিনতে পারলেন। কয়েক পা এগিয়ে তিনি বললেন, "এ আমাদের নূতন মাস্টার মশাই না?"

"ঠিক ঠিক। তাই তো, তাই তো।" আর সকলে সমবেত কণ্ঠে সমর্থন জানালেন। এ তো হাই স্কুলের নূতন মাস্টারমশাই কৌশিকবাবু। কিন্তু ভদ্রলোক এ ভাবে পড়ে আছেন কেন? খুনখারাপি না রাহাজানি—কি হয়েছে?

তবে যাই হক না কেন, প্রথমে তো এঁকে লোকালয়ে নিয়ে যাওয়া যাক। কৌশিকবাবুর অচেতন দেহ গাড়িতে তুলে দেবার জন্য এলসি ওঁদের সকলকে বলল। তার পর সে তাড়াতাড়ি গাড়ি ব্যাক করতে লাগল।

অকস্মাৎ নাথুনী শেঠ চেঁচিয়ে উঠল। কি হয়েছে? কৌশিকবাবুর বাঁ পায়ের গোছায় বেশ কয়েক ফোঁটা রক্ত চাপ বেঁধে আছে। ওঁকে ধরাধরি করে তুলতে গিয়ে পায়ের কাছে কাপড় সরে গেছে এবং মোটরের হেড লাইটে সারা জায়গাটা আলোকিত হওয়ায় রক্তের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নাথুনী শেঠ পায়ের দিকটা ধরেছিল। উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠে সে আর সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলেন।

ধনঞ্জয় মাহাতর চোখ ঐ দিকে পড়তেই তিনি চীৎকার করে বললেন, "ওরে বাবা, এ তো সাক্ষাৎ মা মনসার কামড়।"

এলসিও দেখল। বাঁ পায়ের গোছের মাঝ বরাবর কয়েক ফোঁটা রক্ত জমাট বেঁধে আছে। একটু ভাল করে নজর করলে তার মাঝে দুটি সূক্ষ্ম ক্ষত চোখে পড়ে। প্রায় আধ ইঞ্চি দূরত্বে সরল রেখায় দুটি দাঁতের চিহ্ন। বিষাক্ত সাপের কামড়ের দাগ।

ওঁরা সকলে কৌশিকবাবুর দেহকে আবার রাস্তায় শুইয়ে দিয়েছেন। ধনঞ্জয় মাহাত ও পূর্ণ দাস কপালে হাত জোড় করে কাকে নমস্কার করছেন। ওঁদের চোখ বোজা। নাথুনী শেঠও ওঁদের দেখাদেখি অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে নমস্কার করল।

এলসি জানে সাপ বাঘ হাতি ভালুক—ধলভূমে সবাই দেবতা। তার ইংরেজ রক্তে এসব কুসংস্কার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সে তাড়াতাড়ি কৌশিকবাবুর কোঁচার কাপড় ছিঁড়ে কামড়ের জায়গার উপরে একটু দূরে শক্ত করে দুটো বাঁধন দিল। শার্টের পকেট থেকে কলমটি বার করে

বাঁধনের ভিতর ঢুকিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তাকে আরও আঁট করে দিল। তার পর সকলের উদ্দেশে বলল, "শিগগির ওঁকে গাড়িতে ওঠান। খুব দেরি হবার আগে চেষ্টা করলে হয়তো ওঁকে বাঁচান যায়।"

কৌশিকবাবুর অচেতন দেহকে গাড়ির পিছনের দিকে শোয়ান হল। ডিউকও একপাশে থাবা গেড়ে বসল। নাথুনী শেঠ এবং বাকী কয়জন সামনে পিছনে করে গাড়িতে উঠে বসতেই এলসি গাড়িতে স্টার্ট দিল।

শেঠের দোকানের সামনে গড়ি থামিয়ে এলসি বলল, "আপনারা একজন কেউ আমার সঙ্গে ঘাটশীলায় চলুন। এখানে তো সাপে কামড়ানর চিকিৎসা হবে না। ঘাটশীলার কপার করপোরেশানের হাসপাতালে নিয়ে যাব এঁকে।"

পূর্ণ দাস বললেন, "হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কি হবে মেম সাহেব? মা মনসার দয়া হলে তো এইখানেই বাঁচবে। রেজাক ওঝাকে খবর দেওয়া যাক। ঝাড়ফুঁকে ওর খুব নাম।"

এলসি তার কথায় কর্ণপাত না করে একটু হাসল। অবিশ্বাস আর বিদ্রূপ মেশান সেই হাসি। গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে সে কেবল বলল, "চলুন কে যাবেন। বেশী দেরি করলে এঁকে আর বাঁচান নাও যেতে পারে।"

নাথুনী শেঠ গাড়ির পিছনে উঠে কৌশিকবাবুর অচেতন দেহকে চেপে ধরে বলল, "চলুন।" গাড়ি আবার অন্ধকারের বুক চিরে তীর বেগে ঘাটশীলার দিকে ছুটে চলল।

* * * * *

শেষ ইঞ্জেকশনটি দিয়ে ডাঃ বোস বললেন, "আশা করছি যে আর কোন রকম দৈব দুর্ঘটনা না হলে ঘণ্টা কয়েক পরেই পেশেণ্টের জ্ঞান ফিরে আসবে। এখনই এর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ভগবানকে ধন্যবাদ মিস মুর যে আপনি সময় মত ওখানে পৌঁছেছিলেন। নচেৎ কৌশিকবাবুর বাঁচার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কোবরা জাতীয় সাপ ওঁকে কামড়েছে। এ অঞ্চলে এর চেয়ে বিষাক্ত সাপ আর নেই বললেই চলে। শঙ্খচুড় অবশ্য কখনও কখনও দেখা যায়। তবে ওরা সাধারণতঃ মানুষ বা জন্তু-জানোয়ারের চলাচলের পথ থেকে দূরে একটু নির্জন পাহাড়ী জায়গায় থাকে। জনবসতির মধ্যে গোখরো, খরিস ইত্যাদি বিষাক্ত সাপই বেশী। কিন্তু থাক সে কথা। ঘণ্টচারেক তো হল। রাত এবার প্রায় দেড়টা বাজে। আর আপনার থাকার কোন প্রয়োজন নেই। আমিও এবার কোয়ার্টার্সে

ফিরে যাব। কোন প্রয়োজন বুঝলে নার্স আমাকে খবর দেবে। আপনি এবার মোহনপুরে ফিরে যেতে পারেন মিস মুর।"

তার পর ঈষৎ হেসে আবার তিনি বললেন, "অবশ্য এত রাতে অত দূর না গিয়ে এখানেই রাত কাটাতে বলতে পারতাম। কিন্তু হাসপাতালে বিছানা-পত্রের যা অবস্থা তাতে সে অনুরোধ করার সাহস পাচ্ছি না।"

এলসি জবাব দিল, "না না, তার জন্য চিন্তা কি? নাথুনী শেঠ সঙ্গে আছেন, তিনিও তো ফিরবেন। আমার জন্য চিন্তা করবেন না ডাঃ বোস।"

প্রৌঢ় ডাঃ বোস বললেন, "না, চিন্তা আর কি? যার কপালে যা আছে। তবে আজ আপনি কৌশিকবাবুর নূতন প্রাণ দিলেন বলা যায়।"

ডাঃ বোসের অদৃষ্টবাদ নিয়ে এলসি একটু ঠাট্টা করার লোভ সংবরণ করতে পারল না। বলল, "এই কি আপনার কপালের উপর নির্ভর করা হল ডক্টর? আপনার মতবাদ অনুযায়ী তো ওঁর কপালই তো ওঁকে বাঁচিয়েছে। আর তা ছাড়া আমি তো কেবল ওঁকে এখানে পৌঁছে দিয়েছি। বাকী সব কৃতিত্ব আপনার।"

ডাঃ বোস অন্যমনস্ক ছিলেন। তাই "ঠিক ঠিক" বলেই অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। সুতরাং পর মুহূর্তেই স্বর পাল্টে বললেন, "মানে ঠিকই বলেছেন, কৌশিকবাবুর কপালই ওঁকে বাঁচিয়েছে। তবে কিনা বুঝলেন সময় বলেও একটা কথা আছে, আর এই সময়েই আপনি ওঁকে দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু না, আর আপনি কষ্ট ভোগ করবেন না। এবার আপনি আসুন।"

* * * *

নাথুনী শেঠকে তার দোকানে নামিয়ে দিয়ে এসে এলসি যখন মোহনপুরে তাদের বাংলোর দরজায় পৌঁছাল, তখন রাত দুটো বেজে গেছে। আয়া দরজা খুলে দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, "খানা আপনার ঘরে টেবিলের উপর রাখা আছে। আর সাহেবকে কি ডেকে দেব? উনি অনেক রাত অবধি আপনার কথা বলছিলেন।" এলসি বলল, "না থাক, ওঁকে বিরক্ত করার দরকার নেই। তুমিও শুতে যাও এবার। আমার আর কোন দরকার নেই।"

এত রাত্রে খাবার ইচ্ছা আর নেই। গত কয়েক ঘণ্টা শরীর ও মনের উপর দিয়ে কম ধকল গেছে! এখন আর কিছু না করে কেবল বিছানায় গা এলিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে।

কিন্তু কাপড়-চোপড় ছেড়ে বিছানায় শোয়ার পরও শীঘ্র এলসির ঘুম এল

না। কত এলোমেলো ভাবনা চিন্তা। অতীতের রোমন্থন আর ভবিষ্যতের গহন অন্ধকারে দৃষ্টিপাতের প্রয়াস। চতুর্দিকে কেমন একটা শূন্যতা, আর গতানুগতিকতা। বড় নিঃসঙ্গ বড় একান্ত এই গতানুগতিক দিনচর্যার আবর্তনের মধ্যে গত রাত্রির কয়েক ঘণ্টা যেন একটা আকস্মিকতার চমক। নিথর অন্ধকারের বুকে বুঝি চকিত শম্পার ক্ষণস্থায়ী আঁচড়।

॥ আট ॥

পরের দিন এলসির যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে চায়ের টেবিলে এসে দেখল বাবা বসে খবরের কাগজের পাতা ওলটাচ্ছেন। চা এবং ব্রেকফাস্টের সাজসরঞ্জাম টেবিলের মাঝখানে রাখা। এলসি বাবার রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে অনুযোগের সুরে বলল, "এ কি ড্যাড, তুমি এখনও খাও নি যে!"

মুর সাহেব স্মিত হাস্যে বললেন, "খাব মা, খাব। রোজই তো প্রায় একা একা খেয়ে নিই তুমি আগেই বেরিয়ে যাও বলে। আজ যখন আছ, তখন ভাবলাম এক সঙ্গেই এসে খাওয়া যাবে।"

বাবার দিকে রুটির প্লেট এগিয়ে দিতে দিতে এলসি বলল, "জান ড্যাড, কাল এক ভীষণ ব্যাপার হয়ে গেছে। আর এই জন্য আমার ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল।"

বিস্মিত মুর সাহেব খাওয়া বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করলেন, "তাই নাকি, কি হয়েছিল?"

চা পান করতে করতে এলসি মুর সাহেবকে পূর্ব রাত্রের ঘটনা জানাল।

সব শুনে মুর সাহেব বললেন, "থ্যাংক গড। ভগবান যাকে বাঁচাতে চান, তাকে মারবে কে?" বলতে বলতে তিনি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। দুই-এক লহমা চুপ করে থেকে আপন মনেই স্বগতোক্তির মত বলতে লাগলেন, "কিন্তু ডরোথিকে বাঁচাতে চাইলেন না কেন?"

এলসি বাবার সেই ভাবান্তর লক্ষ্য করছিল। সে ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে বলল, "আপন মনে কি বলছ ড্যাড? শুনছ আমার কথা?"

মুর সাহেব বাস্তব জগতে ফিরে এলেন। অপ্রতিভের মত হেসে বললেন, "না, মানে বলছিলাম কি কালকের সেই ভদ্রলোকের ঘরে খবর দেওয়া হয়েছে তো? ওঁর স্ত্রী হয়তো…"

এলসি মাঝ পথেই জবাব দিল, "তার আর দরকার হয় নি। কারণ তিনি একাই থাকতেন। নাথুনী শেঠের কাছে খবর পেয়েছি। আজ না হয় ওঁর আত্মীয়স্বজনদের ঠিকানা নিয়ে তাঁদের খবর দেবার ব্যবস্থা করব।"

মুর সাহেব অন্যমনস্কের মত অস্ফুট স্বরে বললেন, "আশ্চর্য, এও একা!"

বাবার অস্বাভাবিক আচরণ আবার এলসির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মুর সাহেবকে উদ্দেশ করে তাই সে বলল, "তোমার শরীরটা কি ভাল নেই বাবা? তা হলে আমার সঙ্গে তুমিও ঘাটশীলায় চল। তোমাকে একবার ডাক্তার বোসকে দিয়ে দেখিয়ে আনি।"

ঈষৎ হাস্যে মুর সাহেব বললেন, "কফিনে শুতে চলেছি, এখন আর ও সব কি দরকার?"

এলসিকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। প্রাতরাশ পর্ব সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে টেনে টেনে হেঁটে তিনি এলসির চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়ালেন। এলসির মুখমণ্ডলের বেদনাহত ভাব ক্রমশঃ বিস্ময়ের রূপ ধারণ করছিল।

বাঁ হাতে চেয়ারের উপর ভর দিয়ে ডান হাতে এলসির চুলের উপর হাত বুলোতে বুলোতে মুর সাহেব কাটা কাটা ভাবে বলতে লাগলেন, "চল মা, আমরা আবার হোমে ফিরে যাই। কি হবে ব্যবসা করে? আমি তো গেছিই; কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎও যে নষ্ট করে চলেছি।"

ইদানিং বাবার রুদ্র রূপটাই এলসির কাছে যেন স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। তাই অনেক দিন পর আবার তাঁর পুরাতন স্নেহময় ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়ে অনেক কষ্টে ও নিজের হৃদয়ের আবেগকে সংযত করার প্রয়াস করতে লাগল। স্ফুরিত অধরকে দন্তে দংশন করে কম্পিত কাতর কণ্ঠে সে বলল, "আবার তুমি ঐ সব বলছ ড্যাড? তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। বেশ আছি এখানে। এ সব কথায় আমি কত দুঃখ পাই তা তো তুমি জান।"

মুর সাহেব মাঝপথে থমকে থেমে গেলেন। এলসি দুই হাতে মুখ ঢেকে টেবিলের উপর মাথা নীচু করে বসেছিল। মুর সাহেব তার পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় দিতে দিতে বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা মা, চুপ করলাম। কিন্তু বুড়োর মুখ বন্ধ করে তো সত্যকে পালটে দেওয়া যায় না।" তাঁর কণ্ঠ থেকে যেন স্নেহ আর নিরাশা যুগপৎ ঝরে পড়তে লাগল।

বলতে বলতে তিনি তাঁর ঘরের দিকে এগোতে লাগলেন। তাঁর চটির শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। আবেগে অভিভূত এলসি তখনও টেবিলের উপর দু হাতের মধ্যে মুখ চাপা দিয়ে বসে আছে।

* * * * *

অফিসে সেদিনকার ডাক দেখে নারায়ণবাবুকে কাজ-কর্ম সম্বন্ধে দু-চারটি নির্দেশ দিয়ে এলসি আবার গাড়িতে চেপে বসল। ডিউক পূর্বেই নিজের স্থান দখল করেছিল। গাড়ি ধুলো উড়িয়ে ঘাটশীলার পথে চলল।

কপার কোম্পানির ছোট্ট হাসপাতাল। বেশির ভাগ আউটডোর রোগী। মাত্র কয়েক জন ইনডোর রোগী রাখার ব্যবস্থা আছে। তাও সে সব সীটে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রসূতিরাই থাকে। কোম্পানির কর্মচারী এবং তাদের পোষ্যদের মোটামুটি চিকিৎসা এখানে হয়। বেশী জটিল রোগ হলে জামসেদপুরে টাটা কোম্পানির হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। উভয় কোম্পানির মধ্যে পারস্পরিক ব্যবস্থা আছে।

এলসি যখন হাসপাতালে পৌঁছাল তখন ডাঃ বোস আউটডোরের রোগীদের নিয়ে ব্যস্ত। তাঁকে বিরক্ত না করে এলসি ইনডোরে যাবার জন্য পিছনের দিকে ঘুরল।

কৌশিকবাবু জেগেই ছিলেন। এলসি তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে শায়িত অবস্থাতেই তিনি তাকে সুপ্রভাত জানালেন। তার পর বললেন, "ডাক্তার বোস উঠতে নিষেধ করেছেন। আপনার কথা তাঁর কাছে শুনেছি। আপনার কাছে ঋণের শেষ নেই। অশেষ ধন্যবাদ।"

কৌশিকবাবুর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হলেও আন্তরিকতায় ভরা। এলসি লক্ষ্য করল যে তখনও তাঁর চোখে লালের ঘোর রয়েছে। এক রাত্রেই চোখের কোলে কালি পড়েছে। গালও যেন বসে গেছে।

প্রশংসা শ্রবণে লজ্জিতা এলসি রক্তবর্ণ গণ্ডদেশকে আরও আরক্তিম করে বলল, "না না, ধন্যবাদের কি আছে? এ তো মানুষের কর্তব্য। এখন শীঘ্র আপনি ভাল হয়ে উঠুন।"

পূর্ববৎ মৃদু কণ্ঠে কৌশিকবাবু বললেন, "এখনও দিন তিনেক এখানে থাকতে হবে বলে ডাঃ বোস বলেছেন। ভালই হয়েছে। নয় তো একলা মানুষকে এই অবস্থায় কে দেখত? যেখানে কামড়েছিল, ডাঃ বোস সেখানে এমন নির্মম ভাবে ছুরি চালিয়েছেন যে এখন কিছু দিন হাঁটা চলা মুশ্‌কিল হবে।" শেষের কথাটি বলার সময় তাঁর মুখমণ্ডল ক্লিষ্ট হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

কি যেন অকস্মাৎ এলসির মনে পড়ে গেল। ব্যস্ত ভাবে সে তাই কৌশিকবাবুকে উদ্দেশ করে বলল, "ভাল কথা, আপনার পরিবারের লোকদের ঠিকানা কি বলুন। তাঁদের চিঠি দিই। খবর না পেলে তাঁরা দুশ্চিন্তায় পড়বেন।"

কৌশিকবাবুর ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসি খেলে গেল। তিনি উত্তর দিলেন, "যার পরিবারই নেই, তার পরিবারের লোকদের আর খবর দেবেন কি করে?"

বিস্মিত এলসি প্রশ্ন করল, "কেউ নেই? স্ত্রী পুত্র কন্যা অথবা মা বাবা ভাই বোন?"

"বললাম তো, সংসার করি নি। আর মা বাবা ইত্যাদি আগে যাঁরা ছিলেন, অনেক দিন হল তাঁদের কোথায় ফেলে চলে এসেছি।" কৌশিকবাবু মাঝ পথে থেমে গেলেন।

সহানুভূতি মাখা কণ্ঠে এলসি প্রশ্ন করল, "তা হলে এখান থেকে ছেড়ে দিলে কোথায় যাবেন, স্কুলের হোস্টেলে এই অবস্থায় কে আপনাকে দেখবে?"

"এ একটা কথা বটে।" এই পর্যন্ত বলেই কৌশিকবাবু আবার থামলেন। দুই-এক লহমা ভেবে নিয়ে এলসিকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কাছে পোস্টকার্ড হবে নাকি?" তার পরই কি মনে পড়ে যাওয়ায় লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু আমি কি অভদ্র দেখুন। এতক্ষণ হল, আপনাকে বসতেও বলি নি। আপনি দয়া করে ঐ টুলটা টেনে নিয়ে বসুন।"

তাঁকে নিরস্ত করে এলসি বলল, "হাসপাতালটা কি আর পেশেন্টদের পক্ষে ফর্মালিটি করার জায়গা? আপনি কিছু ভাববেন না। কিন্তু দাঁড়ান গাড়ি থেকে আগে আমার ফোলিও ব্যাগটা নিয়ে আসি।"

কয়েক মিনিট পরেই এলসি ফিরল। তার হাতে চামড়ার ফোলিও ব্যাগ। খাটের নীচে রাখা টুলটা টেনে নিয়ে সে তার উপর বসল। তার পর ব্যাগের জিপ টেনে খুলে ফেলে তার ভিতর থেকে একটি পোস্টকার্ড বার করে সে কৌশিকবাবুর হাতে দিল। নিজের কলমটা খুলে তাঁর হাতে দিতে দিতে সে বলল, "এ অবস্থায় আপনি কি লিখতে পারবেন? আমি বাঙলা লিখতে জানলে আপনাকে আর কষ্ট করতে হত না।"

কৌশিকবাবু পাশ ফিরে লিখতে লিখতে বললেন, "ঠিকানাটা আপনি লিখে দেবেন। তা না হলে এখন যে হাতের লেখা হচ্ছে তাতে চিঠি আর স্বস্থানে পৌঁছাবে না।"

পোস্টকার্ডে কয়েক লাইন লিখেই কৌশিকবাবু সেটি এলসির দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, "আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এইবার দয়া করে ঠিকানাটা লিখে দিন।"

এলসি কলম নিয়ে তৈরী হয়ে বলল, "কি লিখব বলুন।"

"লিখুন, শ্রীস্বাহা বন্দ্যোপাধ্যায়, গার্লস হাই স্কুল, জামসেদপুর।"

লেখার শেষে কলম বন্ধ করে ফোলিও ব্যাগের মধ্যে রেখে এলসি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আচ্ছা, উঠি এবার। কাজ আছে। যাবার পথে ডাক্তার বোসের সঙ্গে একবার দেখা করে যাব। কাল সকালে আর আসা হয়ে উঠবে না। বিকেলে আবার খবর নেব।"

কৌশিকবাবু বললেন, "অজস্র ধন্যবাদ।"

॥ নয় ॥

ঠক্ ঠক্ ঠক্।

স্বাহা দরজার দিকে দুই পা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। তার পর জিজ্ঞাসা করল, "কে?"

"চিঠি আছে।"

ও, পোস্টম্যান। স্বাহা নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা খুলে চিঠি হাতে নিল। চিঠি পড়ে স্বাহার মুখমণ্ডলে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা ফুটে উঠল। পোস্টকার্ডে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লেখা কয়েক ছত্রের ছোট্ট চিঠি। কিন্তু তা হলেও স্বাহা বুঝতে পারল যে হাতের লেখা কৌশিকের। ঘাটশীলার হাসপাতাল থেকে তিনি লিখছেন :

কল্যাণীয়াসু,

যমের দুয়ার থেকে ফিরে এসেছি বলতে পার। সাপে কামড়েছিল। এখন ভয়ের কারণ নেই। তবে কয়েক দিন নড়া-চড়া চলবে না। দেখা হলে বিস্তারিত কথা হবে। একবার আসা সম্ভব হবে কি? ইতি—

চিঠিটি হাতে ধরে স্বাহা ঘরের ভিতর পায়চারি করতে লাগল। স্বল্পবাক্ কৌশিকের এই সংক্ষিপ্ত চিঠিতে অনেক কথা অনুক্ত রয়ে গেছে, আবার মৌন ভাষায় অনেক কিছু বলাও হয়েছে। সুতরাং যাওয়া নেহাতই প্রয়োজন। স্বাহা ছোট টেবিলের উপর রাখা টাইমপিসটার দিকে তাকিয়ে দেখল।

নটা বাজে। তাড়াতাড়ি করলে কলকাতাগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা এখনও ধরা যায়। তবে হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করে ছুটি নেবার সময় নেই। স্বাহা নিজের দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দিয়ে মাথার এক গোছা চুল জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে টেবিলের কাছে রাখা চেয়ারটিতে বসল। এক মুহূর্ত কি ভেবে নেবার পর কাগজ কলম নিয়ে সে এক দিনের ছুটির দরখাস্ত লিখতে লাগল।

* * *

ট্রেন ছুটে চলেছে ধলভূমের গৈরিক প্রান্তর ভেদ করে। মাঝে মাঝে ছোটখাটো পাহাড়—স্থানীয় ভাষায় এদের বলে ডুংরী। এর অধিকাংশই রুক্ষ, প্রাণস্পর্শশূন্য। তাম্রাভ প্রস্তরখণ্ড ইতস্তত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরে গভীর অরণ্যরেখা। ধলভূমের আরণ্য অধিবাসী খাড়িয়া শবরদের বাসভূমি এবং হস্তী চিতা ও ময়াল সাপের নর্মভূমি দলমা পাহাড় শাখা প্রশাখা বিস্তার করে সে দিক জুড়ে রয়েছে। দক্ষিণে রাজদোহার পর্বতশ্রেণী সুদূর পূর্ব দিগন্তের গায়ে গিয়ে মুসাবনী পাহাড়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। ও দিকে সাঁওতাল আর মাহাত, ভূমিজ আর গৌড়রা এক সঙ্গে মিলে মিশে একই গ্রামে বাস করে। মিলে মিশেই তারা চিতা আর নেকড়ের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে এবং ক্ষেত থেকে বন্য শূকর ও শৃগাল তাড়ায়। থেকে থেকে শাল-মহুয়ার জঙ্গল। কেঁদ আর পলাশও ইতস্তত দেখা যায়।

একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বেঞ্চের শেষ প্রান্তে হেলান দিয়ে স্বাহা বসেছিল। জানালা দিয়ে হু হু করে ক্ষেপা হাওয়া এসে তার অবিন্যস্ত অলকদামের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। জানালাতে বাঁ হাতের কনুই রেখে মুখখানিকে বাম করপল্লবের উপর সঁপে দিয়ে স্বাহা অপলক দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। তার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখখানি উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় আরও একটু ম্লান। ছোট্ট কপালের নীচে টানা টানা দুটি চোখ ও তার মাঝখানে টিকালো নাকটির অগ্রভাগে ঈষৎ স্বেদ-কণিকার আভাস। অনুচ্চ তন্বী দেহ-লতিকার রেখায় রেখায় কোথাও যেন একটু কমনীয়তা লুকিয়ে আছে, হয়তো একটু মাদকতাও। কিন্তু চোখের স্থির গম্ভীর দৃষ্টি আর চিন্তান্বিত ললাটের কুঞ্চিত রেখার মধ্যে তা খুঁজে বার করা সহজ নয়।

সাধারণ কাল পাড়ের একটি আটপৌরে শাড়ি ও সাদা ব্লাউজে স্বাহাকে ভালই মানায়। রূপের প্রচণ্ড প্রখরতা নেই এবং প্রসাধন ও সাজসজ্জায় তাকে উগ্রতর করার প্রয়াসও নেই। গলায় এক চিলতে সরু হার, হাতে দু

গাছা চুড়ি এবং মণিবন্ধে ছোট্ট হাত ঘড়ি। এ ছাড়া অপর কোন আভরণ তার দেহের কোথাও নেই। এই আটাশ বছর বয়সেই স্বাহার ভিতর সংযত সাজসজ্জার জন্য বেশ একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়েছে। ছাত্রী মহলে স্বাহা তাই যতটা জনপ্রিয়, ততটাই আবার সম্ভ্রমের পাত্রী।

ওর সমবয়স্কা শিক্ষয়িত্রীরা এবং বিশেষতঃ যাঁরা বিবাহিতা, তাঁরা তার বিলম্বিত কুমারীত্ব নিয়ে কদাচিৎ রসিকতা করলেও সে রসিকতা কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না। তাঁরা জানেন স্বাহা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্দিকে কিসের যেন একটি অদৃশ্য দেওয়াল আছে। তাই স্বাহার খুব কাছে যাওয়া চলে না। ছাত্রীরাও তাদের স্বাহাদিকে ভালবাসলেও অপ্রয়োজনে তার কাছে ঘেঁষে না। গাম্ভীর্য ও চটুলতার পরিপন্থী একটা বায়ুমণ্ডল ওকে কেন্দ্র করে বিরাজিত। এবং সেইজন্য ক্লাসের বাইরে যতটুকু তার সাহচর্য পাওয়া যায়, ছাত্রীরা তাতে কৃতার্থ বোধ করে।

স্বাহা ভাবছিল। ভাবনা-চিন্তার কি আর শেষ আছে? কৌশিকের সঙ্গে যেদিন থেকে প্রথম পরিচয়, ভাবনার পালা সেইদিন থেকেই শুরু হয়েছে। বার বার তলিয়ে ভাবতে বলা তারই উপদেশ। কবে যে এই ভাবনার পালা শেষ হবে, তা কে বলতে পারে?

কত দিন হল? তা প্রায় আট বছর তো নিশ্চয়। সে তখন বি. এ. পড়ে। মন্বন্তর আর মহামারী বাঙলার বুকে তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দিয়েছে। বুভুক্ষু জনতার ভাত চাইবার স্পর্ধা হয় না। একটু ফ্যান দাও মা—বলে তাদের ক্ষীণ কণ্ঠ কলকাতার অলি-গলিতে কাতর অনুরোধ জানিয়ে ফেরে।

স্বাহারা তখন পাড়ায় একটা লঙ্গরখানা খুলেছিল। সেবা? হয়তো তাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু স্বাহারা বেশ বুঝতে পারছিল যে লাপসী খাইয়ে এদের বাঁচান যাবে না। জীবন-মৃত্যুর এই প্রচণ্ড যুদ্ধে লড়ার মত রসদ সংগ্রহ করা স্বাহাদের মত অল্পবয়স্কা ছেলে-মেয়েদের সাধ্যে নেই। পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা আর মুষ্টিভিক্ষা চেয়ে ক'জনের আর পেট ভরান যায়? তা ছাড়া এই যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য দেবার মত সামর্থ্য কজনেরই বা তখন ছিল? কিন্তু মানুষ যখন, তখন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। স্বাহারা আপ্রাণ খেটে যাচ্ছিল বটে; কিন্তু আসন্ন পরাজয়ের আভাস ওদের মনে পাষাণভারের মত চেপে বসছিল।

নিরাশার সেই গহন অন্ধকারে আশার বর্তিকা জ্বেলেছিলেন কৌশিকদা। তখন তাঁকে কৌশিকদা বললেও এখন কিন্তু স্বাহা নামের শেষের "দা" টুকু

বিসর্জন দিয়েছে। অবশ্য ও পক্ষের কেবল সম্মতিই নয়, হয়তো প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ও ছিল এতে। এ বিষয় বোঝবার জন্য মেয়েদের একটা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় আছে। পলিটিক্স করলেও মেয়েদের সে ইন্দ্রিয় অনুভূতিশক্তি হারায় না। পাশাপাশি তিনটে পাড়ার লঙ্গরখানার কর্মীদের সভায় কৌশিকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। কর্মীদের অধিকাংশই স্বাহাদের মত ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতী। দীর্ঘ গৌরবর্ণ সুগঠিত দেহ ছাত্র-ছাত্রী মহলে পরম সমাদৃত "কৌশিকদা" তখন তাদের চোখে রূপকথার দেশের রাজপুত্র। বহুদিন কারাবাসের পর সম্প্রতি মুক্তি পেয়ে তিনি অধ্যাপনা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেশসেবা করছেন—এ খবরটা স্বাহারা ভাসা ভাসা ভাবে পেয়েছিল। সুতরাং তাঁকে ঘিরে বেশ একটা বিস্ময় কৌতূহল ও রহস্যের ভাব সর্বদাই বিরাজ করত। প্রথম পরিচয়ের দিনই স্বাহা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হল। অদ্ভুত তাঁর বাগ্মিতা, বিচিত্র তাঁর যুক্তিবিন্যাস। আর সর্বোপরি আকর্ষণীয় হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্ব।

সেদিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে কৌশিক বলল যে এই ভাবে জোড়াতালি দিয়ে মানুষকে বাঁচান যাবে না। সমস্যার মূলে পৌঁছাতে হবে। লঙ্গরখানা পরিচালনা সাময়িক কার্যক্রম মাত্র। মূল সমস্যা হচ্ছে শোষণ। পৃথিবীতে মাত্র দুটি শ্রেণী আছে—শোষক ও সর্বহারা। শোষকদের বিরুদ্ধে সর্বহারাদের সংগঠিত করে বিপ্লব করতে হবে। তার পর সর্বহারার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তা না হওয়া পর্যন্ত পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার আওতায় মাঝে মাঝে এ রকম সংকট দেখা দেবেই। বিপ্লবী গণচেতনাকে পদানত করে রাখতে পুঁজিবাদীরা চিরকালই এ পদ্ধতির শরণ নিয়ে এসেছে। সমগ্র ইতিহাসের শ্রেণী-সংঘর্ষের বিবরণ এর সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং সত্যকার বিপ্লবে, এখন পুঁজিবাদের এই সর্বশেষ দুষ্কৃতির লগ্নে বিপ্লবের তীর্থভূমি সোভিয়েৎ দেশকে রক্ষা করতে হবে ও সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদী নামে আখ্যাত পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের ফ্যাসিস্ট এজেণ্টদের বিরুদ্ধেও লড়তে হবে। যুদ্ধ সমাপ্ত হবার পর শেষ সংগ্রাম আরম্ভ হবে। তখন কৃষক শ্রমিকদের রাষ্ট্র সোভিয়েৎ দেশ প্রেরণার উৎসরূপে সকল দেশের সংগ্রামী জনতার পিছনে থাকবে।

অত দিনের কথা। সুতরাং কৌশিকের বক্তব্য যথাযথভাবে তার মনে নেই। তবে তার ভাবার্থ ঐ রকমই ছিল। কিন্তু অর্থ যাই হক না কেন, হতাশা-পীড়িত স্বাহাকে সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছিল কৌশিকের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। আর তা ছাড়া এই বুভুক্ষু জনসাধারণের ক্ষিদে স্থায়ী ভাবে মেটাবার পথ আছে—এই সমাচারও তার মনে আবার ভরসা ও বিশ্বাসের

সৃষ্টি করল। কৌশিকের সঙ্গে পরিচয় হবার পর সে ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দিল।

সেখানে সাপ্তাহিক আলোচনা-চক্রে মানবসমাজকে গড়ে তোলার নূতন পদ্ধতি, এক নবীন সভ্যতা—সোভিয়েৎ রাশিয়ার সমাজব্যবস্থার কথা জানল। স্বাহারা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল। মানুষে মানুষে ভেদ নেই, শ্রেণী সংঘর্ষ নেই, উচ্চ নীচের পার্থক্য নেই, নারী পুরুষের ক্রীতদাসী নয়—সত্যকার জীবনসঙ্গিনী, যথার্থ অর্ধাঙ্গী। এই তো আদর্শ সমাজ, এই তো আদর্শ দেশ। ওখানকার সমাজ ও তার জনসাধারণকে শ্রদ্ধা না করবে তো আর করবে কাকে? তরুণ বয়সে মন যখন আদর্শবাদী ও ঈষৎ ভাবালু থাকে, যখন তলিয়ে বিচার করার চেয়ে ইমোশানের তাগিদই অধিকতর শক্তিশালী হয়, তখনই পড়ল তার বুকে বিপ্লবের বীজ। এমন উর্বর ভূমিতে সেই বীজ উপ্ত হতে আর কত দিন লাগবে? স্বাহা অনতিবিলম্বে ফেডারেশনের গণ্ডি ছাড়িয়ে বেড়ে উঠল। তাকে পার্টির পুরোদস্তুর সদস্য করে নেওয়া হল।

বয়স হলে বেঙ্গাচির লেজ খসে যায়, গুটি কেটে প্রজাপতি বেরিয়ে আসে। অতএব স্বাহা যখন বিপ্লবের রসে জারিত হয়ে উঠল, তখন ছাত্র ফেডারেশন রূপী পুচ্ছ বা গুটির প্রয়োজন আর রইল না।

অবশ্য স্বাহার এই ক্রমাভিব্যক্তির পিছনে কৌশিকের অবদানও কম নয়। প্রথম দিনের পরিচয় থেকে আরম্ভ করে ফেডারেশনের সাপ্তাহিক আলোচনা-চক্র পর্যন্ত এবং সেখান থেকে পার্টির প্রাথমিক সেলের সদস্য নিযুক্ত হওয়া অবধি সারাটা পথ চলার প্রেরণা এবং শক্তি জুটিয়েছে কৌশিক। কলেজে আর কতটুকু পড়াশুনা করেছে? বি, এ পাশ করে কি আর এমন বিদ্যা লাভ করা যায়? স্বাহার অধিকাংশ পড়াশুনা কৌশিকের দৌলতে। ইতিহাস অর্থশাস্ত্র সমাজ-বিজ্ঞান রাজনীতি-শাস্ত্র সকল দিক থেকে স্বাহাকে বিপ্লবের আদর্শ সৈনিকরূপে গড়ে তোলার উপযুক্ত জ্ঞান সরবরাহ করেছে কৌশিক। পুঁথি পত্রিকা দিয়ে তার টেবিল ভরিয়ে দিয়েছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে ডায়লেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম পড়িয়েছে, ইউটোপিয়ান আর সায়েন্টিফিক সোশালিজিমের পার্থক্য বুঝিয়েছে। ডিটারমিনজিমের অপরিহার্যতা, লাইসেঙ্কো আর মিচুরিয়ান থিওরী এবং পাবলোভের বিহেভিয়ারিজম এবং আরও কত কি কৌশিক তাকে শিখিয়েছে।

এক কথায় বলতে গেলে কৌশিকের সংস্পর্শে তার জন্মান্তর ঘটেছে। স্বাহার বিচারবুদ্ধি, ধ্যান ধারণা—সব কিছুর রূপকার কৌশিক, তার আশা-

আকাঙ্ক্ষা কৌশিকের মনের প্রতিচ্ছবি। আর এই প্রক্রিয়ায় ক্রমে তারা এত কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে যে কৌশিক ছাড়া স্বাহা নিজের অস্তিত্বের কথা কল্পনাই করতে পারে না। আর কৌশিকও যে সে কথা একেবারে জানে না, তা নয়।

কিন্তু তবু একান্ত ভাবে সান্নিধ্য পাওয়া তাদের জীবনে ঘটে ওঠে নি। কলকাতায় থেকে কৌশিকের সহকর্মী হিসাবে আহার নিদ্রা ভুলে ছাত্র মহিলা অথবা সংস্কৃতি ফ্রন্টে কাজ করা সত্ত্বেও বাহ্য জগতে কাজের গণ্ডির বাইরে খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা ওর সঙ্গে হয় নি। সময় কই? যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই কংগ্রেসীদের সঙ্গে লড়াই। তার পর আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি-দাবি আর নৌ-বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে কলকাতার বুকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আগুন জ্বালান। শান্তিতে হৃদয়-বীণায় মধুর তান তোলার অবকাশ কোথায়?

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তার পর মাউণ্টব্যাটেন ও র‍্যাড্‌ক্লিফের সঙ্গে ন্যাশনালিস্টদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র—চতুর্দিকের এই দীপক রাগিণীর মধ্যে কি জয়জয়ন্তীর আলাপ করা চলে? এরই মধ্যে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের শেষাশেষি স্বাহার উপর নির্দেশ হল কাকদ্বীপে যাবার। এই আজাদী যে ঝুট তার ইঙ্গিত সেপ্টেম্বর মাসে কমরেড ঝানভের কাছ থেকে পাবার পর স্বাহাদের পার্টি মরীয়া হয়ে উঠল। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ থেকেই ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার গ্রামাঞ্চলে কমরেড হালদার ও কমরেড হাজরার নেতৃত্বে জমিদারী ও জোতদারী প্রথার লোপ ও ভাগচাষীদের সংগঠিত করে তেভাগা আন্দোলন চলছিল। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে সুপরিচালনার জন্য ক্ষুধার্ত কৃষকদের দাবি ব্যাপক হয়ে ওঠে, কাকদ্বীপ অঞ্চল বাঙলার তেলেঙ্গানায় পরিণত হয়। বাঙলার তেলেঙ্গানাতে নারী-শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য কলকাতা থেকে স্বাহার ডাক পড়ল।

সুতরাং মন বোঝাবুঝির পালা মুলতুবী রইল, শিশু অঙ্কুরটি বীজের কঠিন আবরণ ভেদ করে মাথা তোলার পূর্বেই বিচ্ছেদ এসে গেল। পার্টির নির্দেশ অমান্য করার উপায় নেই। আর তা ছাড়া কৌশিক এ সব ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। সে বলে বিপ্লবীর জীবনে পার্টি-নিরপেক্ষ কোন অস্তিত্বই নেই। সেই থেকে যে সংগ্রাম স্বাহার জীবনে শুরু হয়েছে তার সর্বগ্রাসী প্রভাব কবে তার জীবন থেকে সমাপ্ত হবে, তা কে জানে?

অবশ্য কাকদ্বীপে সে যে ভাবে কাজ করেছিল, তাতে পার্টি সেক্রেটারিয়েট এবং কৌশিক সবাই তার উপর সন্তুষ্ট হয়। না হয়েও উপায়

ছিল না। কলকাতার নাগরিক জীবন থেকে অকস্মাৎ কাকদ্বীপের ঐ পরিবেশে গিয়ে কাজ করা কি সহজ কথা? তিনদিকে গৈরিক বর্ণের ঊর্মিমালার অবিরাম নৃত্য এবং মাত্র এক পাশে তাল নারকেল ও সুপারী গাছে ঘেরা মাটির উপর সবুজের রেখা। এরও মাঝে মাঝে আবার বাদা আর জলায় ভর্তি। জল আর জল। এই হচ্ছে কাকদ্বীপ। কাকদ্বীপের জলে কুমীর আর ডাঙ্গায় বাঘ। না, ঠিক হল না। ডাঙ্গায় দাঁতাল শূয়ার, যাকে দেখলে বনের রাজা ডোরাকাটা রয়াল বেঙ্গল টাইগারও সত্রাসে পথ ছেড়ে দেয়। নচেৎ এই বরাহরাজের কবলে পড়লে সাক্ষাৎ ভীমেরও নিস্তার নেই। অবলীলাক্রমে পথরোধকারীকে ধরাশায়ী করে তীক্ষ্ণ দাঁতের আঘাতে তার দেহকে ফালা ফালা করে দিয়ে শমনসদৃশ ঐ হিংস্র পশু গম্ভীর ঘুৎকার ছাড়তে ছাড়তে চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু এখানকার মাটি সত্য সত্যই রত্নগর্ভা। সুঁদরি কাঠের জঙ্গল কেটে বাঘ আর ময়াল সাপ খেদিয়ে একদা যারা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল, তাদের দূরদৃষ্টির তারিফ না করে পারা যায় না।

এই জলার দেশে হিংস্র পশুর রাজত্বে স্বাহাকে আগুন জ্বালার সাধনা করতে হয়েছিল দীর্ঘ আঠার মাস। সভা ও শোভাযাত্রার কলরবে কাকদ্বীপ ভরে গেল, লক্ষ লক্ষ উত্তেজনাপূর্ণ ইস্তাহারে গ্রামাঞ্চলকে ছেয়ে ফেলা হল। ভাগচাষী ও ভূমিহীন কৃষকদের সংগঠিত করে অভিযান আরম্ভ হয়ে গেল। জ্বলতে লাগল জোতদার আর জমিদারদের কাছারীবাড়িগুলি। দ্বারিক সামন্তের সুবৃহৎ কাছারীবাড়ি দখল করে তার নাম রাখা হল লালবাগান। কাছারী সংলগ্ন পুকুরের নূতন নামকরণ হল—লালদিঘি। এমন কি গোটা লায়ালগঞ্জেরই নবরূপায়ণ হল। কংগ্রেসী শাসনের অবসান ঘটিয়ে সেখানে যে পিপলস কমিটির কর্তৃত্ব কায়েম করা হল, তার নির্দেশে জায়গাটির নূতন নাম হল লালগঞ্জ।

পার্টির ভলেন্টিয়ারে ভলেন্টিয়ারে গোটা কাকদ্বীপ ছেয়ে গেল। অধিকাংশ তরুণই লাল টুপি মাথায় দিয়ে পরস্পরকে লাল সেলাম বাজিয়ে অভিবাদন করে। আর প্রতি রাত্রে জ্বলে জোতদার ও পার্টিবিরোধীদের ঘরের চাল। বহুদূর থেকে সেই অগ্নিশিখা দেখা যায়। তার পর তাদের ধান চাল চলে যায় ভাগচাষী ও পার্টির কর্মীদের ঘরে। থেকে থেকে বন্দুকের গুলির শব্দে দিগ্বিদিক প্রকম্পিত হয় আর তার প্রতিধ্বনি জাগে অনেক দূরে—বারতলির গাঙে। স্বাহা নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে জ্বলন্ত

উল্কার মত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ধেয়ে বেড়ায়। কখনও ছিপে, কখনও ধান-চালের ব্যাপারী নৌকায়, কখনও বা পদব্রজে কিম্বা গো-শকটে কমরেড বোসের সহকর্মী স্বাহা তার আগুন জ্বালার কর্তব্য সম্পাদন করে চলে।

স্বাহারই অতুলনীয় প্রচেষ্টার ফলে "বাঙলার বধূ বুকে তার মধু নয়নে নীরব ভাষা" সেখানে চামুণ্ডা মূর্তি ধারণ করে জাগ্রতা হয়ে ওঠে। কেবল বঁটি আর কাটারী নয়, ওখানকার মেয়েরা শড়কি, রামদা আর লেজা নিয়ে জমিদার জোতদারদের পাইক বরকন্দাজ ও তাদের তল্পীবাহক পুলিসী ফৌজকে দুই মাইল রাস্তা ধাওয়া করে ভারতীয় নারী-জাগরণের ইতিহাসে এক নবীন অধ্যায় সংযুক্ত করে ছিল।

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির গোপন এক বৈঠকের পর থেকে ভারতের ইতিহাস নবরূপ ধারণ করে ছিল। একেবারে দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্তে মালাবারের মোপালাদের আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে তেলেঙ্গানার কৃষক-বিদ্রোহ এবং সেখান থেকে কাকদ্বীপ ও মেদিনীপুরের নূতন অধ্যায় রচনা পর্ব থেকে শুরু করে আসামের মিকির আর মিজো পাহাড় হয়ে চীন ও ব্রহ্ম সীমান্ত পর্যন্ত বিপ্লবের অগ্নিরেখা প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। লেনিনের একটি উক্তির তাৎপর্য এই সময়ে স্বাহা যথাযথ ভাবে বুঝতে পারল: "বিশ্ব সাম্যবাদের কাছে প্যারিসের রাস্তা পিকিং ও কলকাতা হয়ে।" পিকিং ও কলকাতা হয়ে! কী অলোকসামান্য দূরদৃষ্টি ছিল লেনিনের।

শুধু কি ভারতেই মেহনতী জনতার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল? ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ার যুব সম্মেলনের অন্তরালে সমগ্র এসিয়া মহাদেশের জন্য যে কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল, পরবর্তী কয়েক বৎসর তারই সফল রূপায়ণ দেখা গেল প্রাচ্য মহাদেশের কোণে কোণে। চীনে পরিপূর্ণ জয় লাভ করার পর বিপ্লববহ্নি দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল এসিয়ার দেশে দেশে। ব্রহ্মদেশ যায় যায়, ইন্দোনেশিয়া টলমল, ভিয়েৎনামের জঙ্গী বাহাদুররা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের কফিনে শেষ কীলক ঠুকছে। মালয়ের রবার বাগান আর টিনের খনিতে প্রচণ্ড আগুন লেগেছে এবং প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে আবার ম্যানিলার আশেপাশে গিয়ে জ্বলে উঠেছে। এই কটা বছর বিশ্বের মেহনতী জনতার মুক্তিসংগ্রামে পৌরোহিত্য করেছে আর এই সংগ্রামের পুরোভাগে রয়েছে লাল চীনের প্রেরণা।

চীনের অবদানের কথা স্মরণ হতেই স্বাহার মনে পড়ে গেল যে বিপ্লবের অগ্রদূত এই দেশের মহান নেতাদের সম্বন্ধে এক সময় তাদের পার্টি কী ভ্রান্ত দৃষ্টিকোণেরই না পরিচয় দিয়েছিল। তবে সৌভাগ্যের কথা এই ট্যাকটিক্যাল মিস্টেক দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। যে দেশের নেতা কমরেড মাও-এর মত আদি এবং অকৃত্রিম প্রলেটারিয়েট এবং যাঁর দিগ্‌দর্শনে লং মার্চের মত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে, তাঁর কি ভুল হতে পারে? কৌশিকের কাছে রোমাঞ্চিত শরীরে স্বাহা লং মার্চের বিবরণ শুনেছে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের কাহিনী। সমগ্র দেশে আঘাত খেয়ে চীনের কমিউনিস্টরা তখন মাও-এর কর্মভূমি হুনান ও কিয়াংসীর পার্বত্য দক্ষিণ এলাকায় দানা বাঁধতে থাকে। কিন্তু চ্যাং ও তার তাঁবেদার ওয়ারলর্ডদের অত্যাচারে সেখানেও কমিউনিস্টরা বেশী দিন শান্তিতে থাকতে পারল না। তাই শুরু হল দীর্ঘ ছয় হাজার মাইলের ঐতিহাসিক পদযাত্রা। আশী হাজার কমরেডের মাত্র কুড়ি হাজার পৌঁছাল সোভিয়েৎ দেশের প্রতিবেশী ইয়েনানে। বাকী সবাই হল শহীদ। কিন্তু শহীদদের এই আত্মদান বৃথা গেল না। কমরেড মাও-এর দূরদৃষ্টির পরিণামে কেবল মিত্র ও সুহৃদ নয়, সর্বহারা বিপ্লবের পীঠভূমি সোভিয়েৎ রাশিয়ার সীমান্ত দেশ ইয়েনান ও মাঞ্চুরিয়ায় ঘাঁটি গাড়ায় অনতিবিলম্বে চীনের কমরেডরা শক্তিশালী হয়ে উঠল। পিছন থেকে আক্রমণের ভয় তো নেইই, বরং পরিপূর্ণ সাহায্য পাওয়া গেল। আর পাওয়া গেল শিল্পসমৃদ্ধ মাঞ্চুরিয়ার রসদ। চীনা মুক্তি-ফৌজ ঐখানে যে শক্তি সঞ্চয় করল, তারই বলে মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে পীত দেশ রক্তবর্ণ ধারণ করে বিশ্বকে চমৎকৃত করে দিল।

ইয়েনান ও মাঞ্চুরিয়ার চীনা কমরেডদের কাছে সোভিয়েৎ দেশের প্রতিবেশীত্ব যতখানি মূল্যবান ছিল, ভারত তথা দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ার বিপ্লবীদের কাছে প্রতিবেশী লাল চীন তার চেয়ে কম মূল্যবান নয়। সুতরাং পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ এসিয়া ছেড়ে যাবার উপক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সব দেশে ১৯৪৮-৪৯ খ্রীস্টাব্দে বিপ্লবীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আর বিশ্ববিপ্লব সফল করার জন্য এ স্ট্রাটেজি অপরিহার্য। সুতরাং নূতন চীনের জয়গান এসিয়ার বিপ্লবীদের এক মহান ব্রত।

স্বাহা জানে যে এর আরও একটি কারণ হচ্ছে এই যে সম্প্রতি স্বাধীন এসিয়ার দেশগুলিতে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আর্থিক প্রগতি হলে ভীষণ বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। তা হলে বিপ্লবের সমগ্র থিসিসকেই যে

আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলে দিতে হয়। সুতরাং লাল চীন যখন কমিউনিস্ট পদ্ধতিতে আর্থিক পুনরভ্যুত্থানের জন্য কোমর বেঁধে লেগে পড়েছে, তখন এসিয়ার অন্যত্র বিপ্লবীদের কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের দেশের পুঁজিবাদী সরকারের তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনা যে কোন উপায়ে বানচাল করা। এইজন্য স্বাহাদের বর্তমান ট্যাকটিক্স হচ্ছে এক দিকে নিজেদের দেশে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং অন্য দিকে চীনের প্রগতির শত মুখে প্রশস্তি। কেবল দলের লোকের কথা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং জনসাধারণ হয়তো বিশ্বাস নাও করতে পারে। তাই চাই ডেলিগেশন।

এ ডেলিগেশন কালচারাল, সৌহার্দ্য এবং এমন কি ফুটবল ক্রিকেটের হলেও আপত্তি নেই। বিচারবুদ্ধির দিক থেকে যারা সীমান্তদেশবাসী অথবা কোন না কোন কারণে যারা ক্ষমতাধীশদের প্রতি অসন্তুষ্ট অতৃপ্ত, বেছে বেছে তাদের নূতন চীন দেখতে পাঠাতে হবে। তারা সে দেশের ভাষা না-ই বা বুঝুক। চীনা দোভাষীরা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবে। এবং তার পর সে দেশ থেকে ফিরে এসে তারা যখন মুখ খুলবে, সাত দিনের অভিজ্ঞতা সত্তরটি প্রবন্ধে সাত শ পৃষ্ঠায় লিখবে! এরই নাম রিভলিউশনারী স্ট্রাটেজি।

কিন্তু যাক সে কথা। কাকদ্বীপ থেকে আঠার মাস পর আবার গা ঢাকা দিতে হল। কারণ বিধান রায়ের সরকারও এবার সমস্ত শক্তি নিয়ে কাকদ্বীপের রণাঙ্গনে নেমে পড়ল। কৃষক সমিতি ও স্বাহাদের তৈরী আরও দুটি প্রতিষ্ঠানকে বেআইনী ঘোষণা করে অবাধ গ্রেপ্তার আর গুলি চালানর পালা চলতে লাগল। লঞ্চে লঞ্চে কাকদ্বীপের নদী নালা খাল বিল ভরে গেল। সব লঞ্চেই সশস্ত্র পুলিসবাহিনীর লোক। দুই-একজন নূতন কমরেড অত্যাচারের ঠেলায় এপ্রুভার হয়ে গেল এবং তাদের কাছ থেকে সূত্র পেয়ে পুলিস কমরেড হাজরা আর মালিকে ধরে ফেলল। তাই একদিন গভীর রাত্রে কাকদ্বীপের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বৈঠকে আণ্ডার গ্রাউণ্ড-এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর কমরেড হালদার, কমরেড বোস ও স্বাহা এই তিনজনে তিনটি ছিপ নিয়ে তিন দিকে বেরিয়ে পড়ল।

অতঃপর কাকদ্বীপ থেকে জামসেদপুর। ছিন্নমস্তা এবার বীণাপাণি হলেন। বাড়বানলের স্বাহা বালিকা বিদ্যালয়ের শান্ত সুশীলা শিক্ষয়িত্রীরূপে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হল। পার্টি লাইনও বদলে গেল। তাই প্যারিস কমিউনের ধরনে কলকাতার বুকে অনুষ্ঠিত স্ট্রীট ফাইট বামপন্থী টেররিজমের আখ্যায়

নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হল। কিন্তু সংগ্রাম তা বলে থেমে যায় নি। নূতন টেকনিক অনুযায়ী……

গুম্ গুম্ গুম্, গুম্ গুম্ গুম্। সুবর্ণরেখার পুলের উপর দিয়ে গাড়ি চলেছে। গালুডি এসে গেল। এর পরই ঘাটশীলা। স্বাহা নিজের আসনে নড়ে চড়ে বসল। ও, কতদিন পর আবার কৌশিকের সঙ্গে দেখা হবে। কাকদ্বীপ থেকে জামসেদপুর আসার পথে মাত্র অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতায় পার্টি কর্মীদের এক গোপন আড্ডায় কৌশিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারও তখন আত্মগোপন করে থাকার পালা চলছে। তার পর এই এতগুলো মাস কেটে গেল, দুজনের মধ্যে আর দেখা-সাক্ষাৎ নেই। ক্বচিৎ কখনও চিঠি পেলে কি হবে? তাতে কি সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা মেটে?

কেমন দেখবে গিয়ে কৌশিককে? ভাল আছে নিশ্চয়। কিন্তু যদি…। না, সে কথা স্বাহা ভাবতেই পারে না। কৌশিক ছাড়া ওর স্বতন্ত্র সত্তাই নেই। কৌশিক যতই বলুক না কেন—পার্টিই সব কিছু, স্বাহার কাছে কৌশিক আগে তার পর পার্টি। সত্যি কথা বলতে কি পার্টিকে তো কৌশিককে জানার পরই চিনেছে। এমন কি কৌশিকের মাধ্যমে কৌশিকের জন্যই চিনেছে—এ কথা বললেও অত্যুক্তি হবে না। স্বাহার ধ্যান ধারণা আদর্শ সবই তো কৌশিককে কেন্দ্র করে, কৌশিক-ময়।

॥ দশ ॥

হাসপাতালের কোন্ জায়গায় কৌশিক আছে, তা খুঁজে নিতে স্বাহার বেগ পেতে হল না। বেলা দুটো বাজে। এখন ডাক্তার কম্পাউণ্ডার কেউ নেই। কেবল একজন জমাদার বসে ঝিমোচ্ছিল। সে-ই স্বাহাকে কৌশিকের ঘর দেখিয়ে দিল।

কৌশিকবাবু বুঝি একটু চোখ বুজে ছিলেন। স্বাহার অধীর পদশব্দে তিনি চোখ মেলে চাইলেন। তখনও তাঁর চক্ষে তন্দ্রার জড়িমা মাখা বলে পরিচয়ের স্বীকৃতি ফুটে ওঠে নি।

কয়েক মুহূর্ত চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে থাকার পর ধরা ধরা গলায় স্বাহা কোন মতে উচ্চারণ করল, "কেমন আছ?" আবেগ ও উচ্ছ্বাসে ওর কণ্ঠ রুদ্ধ চক্ষের কোণে বাষ্পের আভাস। ওর বুকের ভিতর সপ্ত সিন্ধু উত্তাল,

আলোড়ন তুলেছে। স্বাহা ঢোক গিলে উচ্ছ্বাস দমন করতে করতে আবার প্রশ্ন করল, "কেমন আছ?"

কৌশিকবাবু কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, "ভালই, তুমি— এলে তা হলে তুমি?"

"কেন, তুমি কি ভাবছিলে আসব না বুঝি? আমার সম্বন্ধে এই তোমার ধারণা!" অনুযোগে ওর কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠল।

"না না, তা নয়। আসার কত অসুবিধা রয়েছে তা তো জানি। তাই আর কি…"

"থাক, আর কৈফিয়ত দিতে হবে না তোমাকে।" বলতে বলতে স্বাহা এগিয়ে এসে অর্ধোত্থিত কৌশিকবাবুকে তাড়াতাড়ি ধরে আবার শুইয়ে দিতে দিতে বলল, "উঠতে হবে না। থাকই না খানিকক্ষণ শুয়ে। এমনিতে তো আর কখনও বিশ্রাম নেবার সময় পেলে না।"

প্রশান্ত হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে কৌশিকবাবু বললেন, "এই যে, দেখা হতে না হতেই তোমার অভিযোগের ভাণ্ডার উজাড় করা আরম্ভ করলে।"

ঈষৎ লজ্জিত হয়ে স্বাহা বলল, "আমাকে তো তুমি কেবল অভিযোগ করতেই দেখ। আমার মনটা বোঝার চেষ্টা তুমি কোন দিনই করলে না।"

"কমরেড, এমন যুগে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি যে মন বোঝা-বুঝির উপযুক্ত অখণ্ড অবসর আমাদের হাতে নেই।" বক্তৃতা দেবার মত গুরুগম্ভীর ভাবে কৌশিকবাবু বলে চললেন, "নাউ অর নেভার। বিপ্লবীর কাছে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। প্রতিক্রিয়াশীল এবং গতানুগতিকতাপন্থীদের আঘাত হানতে এক সেকেণ্ড যদি দেরি করেছ, তবে তারা তোমার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দেবে। সমগ্র বিশ্বের কোণে কোণে তাই প্রতিক্রিয়া আর প্রগতির মধ্যে বিরামহীন সংঘর্ষ চলেছে। অন্যদিকে মন দিয়ে মূল কাজে শৈথিল্য প্রকাশ করার অর্থ জীবনের ঘোষিত নীতিরই বিরুদ্ধাচরণ, বিপ্লবীদের আচার-সংহিতায় এ অপরাধের ক্ষমা নেই। কিন্তু না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ লড়াই করবে? টুলটা টেনে নিয়ে বসো। এখনও ঘণ্টা দুয়েক হাসপাতাল এই রকম নির্জন থাকবে। ডাক্তারবাবু চারটের আগে আসবেন না। রয়ে সয়ে ঝগড়া করার অনেক সময় পাবে। ভাল কথা, তোমার মেয়াদ কতক্ষণ?" শেষের দিকে কৌশিকবাবুর কণ্ঠস্বরে একটা ঘরোয়া ভাব ফুটে উঠল।

স্বাহা ততক্ষণে টুলটা টেনে নিয়ে খাটের পাশে বসেছে। হাতের ব্যাগটা নীচে নামিয়ে রেখে সে কৌশিকের চুলে আঙুল চালাতে চালাতে স্মিতহাস্যে

বলল, "যতক্ষণ তোমার অনুমতি। হুকুম না পেলে কি এখানে আসতে পারতাম। এতদিন যে ধলভূমগড়ে এই এত কাছে রয়েছ, এক বারও কি আসতে লিখেছ? তোমার জামসেদপুরে যাবার কথা না হয় না-ই বললাম। তুমি কাজের মানুষ। কিন্তু আমাদের মত বেকাররাই না হয় তোমার কাছে আসত।" স্বাহা বহুদিন এমন একান্ত ভাবে কৌশিককে কাছে পায় নি। তাই যেন ওর মনের অর্গল খুলে গেছে।

কৌশিক এই অভিযোগের প্রত্যুত্তর দিলেন না, কেবল একটু হাসলেন।

স্বাহাই আবার বলল, "সন্ধ্যা পর্যন্ত তো নিশ্চয় আছি। বিকেলের ট্রেনে যখন আর যাবার সময় নেই, তখন রাত বারটার আগে তো আর গাড়ি পাচ্ছি না। কিন্তু কাজের কথা হক। তোমাকে ছাড়ছে কবে বল তো?"

"ডাঃ বোস বলছিলেন যে কালকের দিনটা দেখে যেতে দেবেন। অর্থাৎ খুব সম্ভব পরশু যেতে পারব।"

"তা হলে তো মাঝে কেবল কালকের দিনটা পাচ্ছি। তা এক রকম গুছিয়ে নিতে পারব। আমার কোয়াটার্স ছোট্ট হলেও কোন অসুবিধা নেই। একা মানুষ তো। অবশ্য মাঝে মাঝে মেয়েরা আসে। তা সে ভালই হবে। তোমার একটা কাজ জুটে যাবে। ওদের নিয়ে সুবিধা মত ক্লাস করো। দেখো, আমার ছাত্রী ফ্রন্টের কাজ কেমন দানা বাঁধছে।"

"আরে, তুমি যে দেখছি ধরেই নিয়েছ যে আমি জামসেদপুরে যাচ্ছি।"

"যাবে না তো কি? এ অবস্থায় আমি তোমাকে ধলভূমগড়ের বনজঙ্গলে একা ছেড়ে দিতে পারি না।"

"আচ্ছা মুরুব্বিয়ানা জুড়ে দিলে তো! বয়সে আমি তোমার চেয়ে কত বড় তার হিসাব আছে? আর সম্পর্কেও তোমার কেবল গুরুজনই নই, গুরুও বটে। পার্টির স্ট্যাটাসের কথাটা না হয় না-ই তুললাম।"

দৃপ্তভঙ্গীতে স্বাহা জবাব দিল, "এটা মেয়েদের এলাকা। রাজনীতি করি বলে তো এ অধিকার বর্জন করি নি। তাই এখানে হস্তক্ষেপ করতে এস না।" তার পর এক মুহূর্ত নীরব থেকে উচ্ছ্বাসের আবেগকে ঈষৎ সংযত করে বলল, "অসুস্থ অবস্থায় রোগীর রুচি মোটেই বিবেচ্য নয়, তা জান তো?"

এ প্রসঙ্গ আর না বাড়িয়ে কৌশিক জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, গেলাম না হয়। কিন্তু সেখানে কি বলে আমার পরিচয় দেবে? ছাত্রী আর সহকর্মীরা যখন আমার কথা জিজ্ঞাসা করবে, তখন কি বলবে? দুই জনের বিরুদ্ধেই কতগুলি করে ওয়ারেন্ট আছে তা ভুলে যাও নি নিশ্চয়। আর তা ছাড়া

তোমরা মেয়েরা বি. এ, এম. এ যা-ই পাশ কর না কেন, তোমাদের জিভের বিষ ঠানদিদিদের তুলনায় বিন্দুমাত্র কমেছে বলে বিশ্বাস হয় না।"

স্বাহা ফুঁসে উঠে জবাব দিল, "তা তো বলবেই। এত দিন ধরে আমাকে পরীক্ষা করার পর এ কথা তুমিই বলতে পার। দেখছি সাম্যের কথা কেবল তোমাদের মুখে। আসলে এখনও তোমরা মেয়েদের দাসী করে রাখার নীতিতেই বিশ্বাসী। সব স্থুডো রিভলিউশনারীর দল।"

হাসতে হাসতে কৌশিক বললেন, "আরে না না। তুমি ছাই ঠাট্টাও বোঝ না। আর তা ছাড়া তুমি তো অনন্যা। তোমার সঙ্গে কার তুলনা চলে?"

কৃত্রিম কোপে ভর্ৎসনা করে স্বাহা বলল, "যাও, আবার রসিকতা হচ্ছে।" তার পর শায়িত কৌশিকবাবুর হাতের আঙ্গুলগুলি নিয়ে খেলা করতে করতে একটু চিন্তান্বিত ভাবেই সে বলল, "শেষ পর্যন্ত কেঁচো খুড়তে খুড়তে সাপ না বেরিয়ে যায়। একবার খদ্দরধারী টিকটিকিদের নেকনজরে পড়লে কি আর রক্ষা আছে? সত্যি সত্যিই এ সমস্যার কি হবে বল তো? তুমিই বল বাপু লোককে কি বলব।"

"বলে দিও তোমার দাদা এসেছেন। রাঁচীর বাসিন্দা পিসতুত দাদা।"

"ভাল লাগে না এ রকম মিথ্যা পরিচয় দিতে।"

কৌশিক কয়েক সেকেণ্ড স্বাহার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কি যে ওর মুখের ভাব থেকে বোঝার চেষ্টা করলেন, তা তিনিই জানেন। তার পর মুচকি হেসে মুখ নামিয়ে নিয়ে বললেন, "তা হলে যাব না বল?"

"না, না। তাই বলছি নাকি? ভাবছি আর কত দিন…"

"আর কত দিন মানে?" কৌশিকবাবু ওর কথার জের টেনে প্রশ্ন করলেন।

কৌশিকবাবুর অজ্ঞাতসারে স্বাহা একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল। ছিঃ, এ কী হচ্ছে? সত্যি সত্যিই কি বিপ্লবের সৈনিকের এত সেন্টিমেণ্টাল হওয়া শোভা পায়? মনের ভাব গোপন করে শুষ্ক কণ্ঠে সে তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "না, কিছু না। ঐ কথাই বলব।"

* * *

সাড়ে চারটা আন্দাজ ডাঃ বোস এলেন। আউটডোরে বসার আগে একবার ইনডোরের রোগীদেরও দেখে যান উনি এ সময়। কৌশিকবাবুকে অবশ্য দেখার খুব বেশী কিছু ছিল না। পায়ের ঘাটার প্রতি একবার ভাল

করে দৃষ্টি দিয়ে তিনি কৌশিকবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কেমন আছেন ?"

কৌশিকবাবু উত্তর দিলেন, "ভালই।"

তার পর স্বাহার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বললেন, "একে খবর দিয়েছিলাম। জামসেদপুর থেকে এসেছে। জিজ্ঞাসা করছে ছাড়া পাব কবে।"

স্বাহার দিকে তাকিয়ে সস্মিত বদনে তিনি উত্তর দিলেন, "আচ্ছা, কাল তা হলে এঁকেই চিঠি দিয়েছিলেন। তা কালকের দিনটা বাদ দিয়ে পরশু যেতে পারেন। জামসেদপুরে নিয়ে যাবেন বুঝি ?"

স্বাহা মস্তক আন্দোলিত করে সায় দিল। তার পর বলল, "আমাদের বান্ধবী, মানে স্কুলের সহকর্মীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে এখানকার রণজিৎবাবুর সঙ্গে। তাঁরা থাকেন দাহিগোড়ায়,—"

"কে—রণজিৎ চট্টোপাধ্যায় ? ওঁরা তো সোহন সিং-এর কোয়ার্টার্সের কাছের টিলাটায় থাকেন।" ডাক্তার বোস বললেন।

স্বাহা মৃদু হেসে বলল, "ও, আপনি চেনেন দেখছি ওঁদের। ওঁদের সঙ্গে দেখা করে ব্যবস্থা করছি, পরশু এঁকে সকাল বেলার লোকাল ট্রেনে তুলে দেবেন। আজ গিয়েই কাল আবার আসা আমার পক্ষে একটু মুশ্‌কিল হবে—তাই। অবশ্য টাটানগর স্টেশনেই থাকব আমি।"

ডাঃ বোস বললেন, "ট্রেনে উঠিয়ে দিতে কোন অসুবিধা হবে না। দরকার হলে আমরাও সে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

"না, না। আপনাকে আর কষ্ট দেব না। এমনিতে এ কয়দিনে তো আর কম করলেন না। এক রকম আপনার জন্যই তো প্রাণ ফিরে পেল ও।"

"কি যে বলেন ? কে কাকে প্রাণ দিতে পারে ?" ডাক্তার চেষ্টা করে। প্রাণ দেওয়া নেওয়ার মালিক যে আর একজন—এ কথা আমরা চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা অন্ততঃ মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। আচ্ছা, আমি আসি তা হলে। নমস্কার।"

"নমস্কার," "নমস্কার"। স্বাহা ও কৌশিকবাবু দুজনেই প্রতিনমস্কার করলেন।

॥ এগার ॥

এলসি যখন ইন্দুবাবুদের বসার ঘরে ঢুকল, তখন সেখানকার আবহাওয়া যথেষ্ট উত্তপ্ত। জন কয়েকে মিলে জোর আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। এঁদের ভিতর গৃহকর্তা ইন্দুবাবু ছাড়া কংগ্রেসের আলোকবাবু এবং তাঁর প্রতিবেশী জঙ্গলের ঠিকাদার শচীবাবুকে এলসি চেনে। বাকী দু জন ভদ্রলোক তার অপরিচিত। তাঁরা সম্ভবতঃ নবাগত। বীণা দেবীও আসরের এক দিকে একটা কৌচে বসেছিলেন। তাঁর চোখ মুখে একটা নির্লিপ্ত ভাব। বেশ বোঝা যাচ্ছে এ সব তত্ত্বকথার চর্চায় তাঁর মন নেই। বীণা দেবী উঠে এসে এলসির হাত ধরে নিজের পাশে নিয়ে গিয়ে বসালেন। এলসিকে প্রবেশ করতে দেখে ইন্দুবাবুরা উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন।

এলসি আসন গ্রহণ করার পর ইন্দুবাবু ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, "জাস্ট এ মিনিট প্লীজ।" তার পর এলসির জবাব শোনার জন্য বিলম্ব না করে বিপুল উৎসাহে মুলতুবী বক্তব্যের জের টেনে বলতে লাগলেন, "আপনি বলছেন মার্কস কথিত ডায়লেকটিকস যদি চিরকালীন সত্য হবে এবং থিসিস এন্টিথিসিস ও সিন্থেসিসের প্রক্রিয়া যদি বিশ্বজনীন নিয়ম হবে, তা হলে সাম্যবাদ স্থাপিত হবার পর এই নিয়মের কি হয়? খুবই সঙ্গত প্রশ্ন আপনার—এরা কি হারাকিরি করে? তা করলে এদের শাশ্বত বিধান রূপে স্বীকার করা যায় না এবং যদি বলেন করে না তা হলে মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তির অনেকটাই ফাঁপা প্রমাণিত হয়। দেখুন কথাটা হচ্ছে এই যে মার্কস্ তাঁর ভবিষ্যৎ সমাজের রূপরেখা সম্বন্ধে কোথাও বিস্তারিত ভাবে বলেন নি। কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পদ্ধতি ও তার অপরিহার্যতা সম্বন্ধেই তিনি প্রধানতঃ আলোচনা করেছিলেন···"

মাঝ পথে আলোকবাবু বললেন, "তা ছাড়া মার্কস একবার বলছেন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা ঐতিহাসিক পূর্ব বিধান বা ডিটারমিনজিম অনুযায়ী অবধারিত। তা হলে তার জন্য আবার শ্রমিকদের সংগ্রাম করতে বলার অর্থ একটা অনাবশ্যক বাহুল্য নয় কি?"

"যাই বলুন না কেন নিরপেক্ষ বিচারক হিসাবে এর জন্য আমি মার্কসকে দোষ দিতে পারব না। তর্কশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই হচ্ছে এই যে প্রেমিস বা প্রতিজ্ঞা যদি ঠিক থাকে তা হলে কোন তত্ত্ববেত্তা নিজের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে তার আধারে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীর

এই মূল ভিত্তি—প্রতিজ্ঞা পরবর্তী কালে কোন কারণে পরিবর্তিত হয়ে গেলে তার জন্য তত্ত্ববেত্তার উপর দোষারোপ করা যায় না।"

আলোকবাবু বললেন, "মার্কস এঙ্গেলস যে বলেছিলেন ইংলণ্ড ও জার্মানীতে যন্ত্রশিল্পের ক্রমবিকাশের ফলে সর্বহারাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে সাম্যবাদী বিপ্লব সর্বপ্রথম ঐ জাতীয় শ্রমশিল্প-অধ্যুষিত দেশে সর্বপ্রথম সংসাধিত হবে। কিন্তু তার বদলে হল কিনা কৃষিপ্রধান অর্থনীতির দেশ রাশিয়া ও চীনে। এ ছাড়া এত দিন হওয়া সত্ত্বেও পুঁজিবাদের স্ববিরোধ ও তার অন্তিম পরিণতি সম্বন্ধে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়া দূরে থাক, স্বয়ং কমিউনিস্ট রাশিয়া উৎপাদন ও জনসাধারণের জীবনমানের দৃষ্টিকোণ থেকে পুঁজিবাদী আমেরিকা থেকে অনেক পিছনে পড়ে আছে। আর তাই রাশিয়া সর্বদাই আমেরিকার সমান হব—এই মন্ত্র জপ করছে। আর একটা কথা। রাশিয়া চীন বা অন্য যে কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখুন, কোথাও মার্কসীয় ধারায় সর্বহারার বিপ্লবের দ্বারা কমিউনিস্ট শাসনের সূত্রপাত হয় নি, হয়েছে সৈন্যবাহিনীর জোরে। এ সবের ব্যাখ্যা কি তা হলে?"

ইন্দুবাবু জবাব দিলেন, "এর জন্য দোষ দিতে হবে মার্কসের চেলাদের। কথায় বলে না—গুরুর চেয়ে চেলা দড়, এও হয়েছে তাই। এঁরা মার্কসের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত স্পিরিট বা ভাব না বুঝে তার শাব্দিক অর্থ নিয়ে হৈ-চৈ করে মার্কসবাদের বিকৃতি ঘটিয়েছেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের নিত্য প্রগতির দিনে এক শতাব্দীরও পূর্বেকার ইতিহাস অর্থনীতি বা সমাজনীতি সম্বন্ধে লিখিত অভিমতকে জ্ঞানরাজ্যের শেষ কথা বলা আধুনিক যুগের কুসংস্কারের এক অভিনব নিদর্শন। এ ব্যাপার প্রগতির পরিপন্থীও বটে। পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই দেখুন না কেন, ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের কোন কোন সিদ্ধান্ত নিউটন খণ্ডন করেছেন এবং নিউটনের কোন কোন সিদ্ধান্ত আইনস্টাইন বর্জন করেছেন। আবার ভবিষ্যতে হয়তো আইনস্টাইনের কোন কোন সিদ্ধান্ত বিশ্বের স্বরূপ বোঝার পক্ষে অপর্য্যাপ্ত মনে হওয়ায় তারও খণ্ডন হবে। অথবা এই প্রক্রিয়াকে খণ্ডন আখ্যা না দিয়ে বোধ হয় সংস্কার বা বিকাশ বলাই অধিকতর শ্রেয়।

একটু থেমে ইন্দুবাবু বলতে লাগলেন, "তা যা-ই নাম দেওয়া হক না কেন, জ্ঞানের অধিকতর বিকাশের ফলে আজ ম্যাক্সওয়েল বা নিউটনের মতবাদ অচল হলেও এতে তাঁদের প্রতিভার কি কিছুমাত্র হানি হয়, না

এতে তাঁদের অসম্মান করা হয়? কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি কিছুতেই এ কথা বলবেন না যে ভৌতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের মতবাদের উপরে আর কিছু হতেই পারে না। কিন্তু পরিতাপের কথা হচ্ছে এই যে ভৌতিক বিজ্ঞানের মত কনক্রিট বা মূর্ত বিষয় সম্বন্ধে আমরা যে দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করি, আধুনিক কাঠ মোল্লার দল অর্থশাস্ত্র বা সমাজ-বিজ্ঞানের মত এবস্ট্রাক্ট অর্থাৎ বিমূর্ত বিষয় সম্বন্ধে অতটুকু গ্রহণশীল দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করতে প্রস্তুত নন। এই জন্যই বোধ হয় মার্কস শেষ জীবনে বলেছিলেন যে, ভাগ্যকে ধন্যবাদ তিনি স্বয়ং মার্কসবাদী নন। যাই হক এর কারণ নিশ্চয় গভীরমূল। মূর্ত বিজ্ঞানে আবিষ্কারের লক্ষ্য থাকে শুদ্ধ জ্ঞান বা জানার ইচ্ছা। কিন্তু অর্থনীতি ও সমাজশাস্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে রাজনীতি অর্থাৎ ক্ষমতা পাবার প্রক্রিয়ার সমন্বয় হলে সত্যকে এত সহজে স্বীকার করতে মন চায় না। কারণ তার অর্থ হল যে মই-এর সাহায্যে ক্ষমতা পাব, তাকেই ভেঙ্গে ফেলা।"

শচীবাবু মাঝপথে বললেন, "প্রেমিসেব কথা কি যেন বলছিলেন।"

ইন্দুবাবু বললেন, "হ্যাঁ রাজনীতির কথা যাক, আমি রাজনীতিজ্ঞ নই এবং আলোকবাবু থাকতে সে মর্যাদা পাবার ক্ষীণতম আশাও নেই। কি বলেন আলোকবাবু?"

ইন্দুবাবুর কথা বলার ধরনে সবাই হেসে উঠলেন।

তিনি এবার বলতে লাগলেন, "সশস্ত্র বিপ্লবের মতবাদ ঘোষণা করার পর থেকে চারটি অত্যন্ত মৌলিক ব্যাপার পৃথিবীতে ঘটে গেছে। এর ফলে মার্কসের বক্তব্যের ভিত্তিভূমিতেই প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটে গেছে। মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে লেখেন, 'কমিউনিস্টরা প্রকাশ্য ভাবেই ঘোষণা করছে যে একমাত্র সশস্ত্র পদ্ধতিতে প্রচলিত যাবতীয় সামাজিক পরিস্থিতির উৎখাত দ্বারাই তাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হবে। শাসক-শ্রেণী যেন কমিউনিস্ট বিপ্লবের ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।' আর ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে এবং পরবর্তী খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর এঙ্গেলসের সম্পাদনায়। মার্কসবাদের এই সব শাস্ত্রীয় পুঁথি প্রকাশিত হবার পর সব চেয়ে বড় পরিবর্তন হয়েছে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'কালেকটিভ বারগেনিং' বা শ্রমিকদের ইউনিয়ন কর্তৃক মালিকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে শ্রমিকদের জন্য অধিকতর অধিকার আদায় করার পুপদ্ধতি। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে টোলডলের শ্রমিক নেতাদের সঙ্ঘবদ্ধ হবার অপরাধে

শাস্তি দিলেও শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তিশালী হতে হতে কালেকটিভ বারগেনিং-এর ফলে এখন এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে অধিকাংশ সভ্য দেশে আজ শ্রমিক রাষ্ট্র স্থাপিত হবার পূর্বেই শ্রমিকদের জন্য যথেষ্ট সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হচ্ছে।...”

কথার মাঝখানে প্রতিবাদের ভঙ্গীতে নবাগতদের একজন বললেন, “কিন্তু......”

তাঁকে নিরস্ত করে ইন্দুবাবু বললেন, “আমার কথাটা শেষ পর্যন্ত শুনে নিন এবং তার পর কোন সন্দেহ থাকলে তার জবাব দেব। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ইংলণ্ড ও কন্টিনেণ্টের ইনডাসট্রিয়াল রিভলিউশানের সমসাময়িক যুগ বা তার পরবর্তীকালের যে সব শ্রমিকদের দেখে মার্কস সামাজিক বৈষম্য সম্বন্ধে গভীর ভাবে গবেষণা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে ঐ রকম নারকীয় পরিস্থিতির মধ্যে কর্মরত শ্রমিকদের আজ আর থাকতে হয় না। এর ফলে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষটা তার প্রাথমিক তীব্রতা হারিয়ে ফেলেছে। অথচ সংঘর্ষ তীব্র না হলে সশস্ত্র বিপ্লব সাধিত হবার কোন আশা নেই। এ ক্ষেত্রে মালিকদের ভিতর এনলাইটেনড সেলফ ইণ্টারেস্ট এসেছে বলতে হবে। অবশ্য বুঝতেই পারছেন যে কথাটা আমি অ্যাডাম স্মিথের অর্থে ব্যবহার করছি না।” শেষের বাক্যটি উচ্চারণ করার সময় ইন্দুবাবু স্মিতহাস্যে সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

“দ্বিতীয় ব্যাপার হল গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার। শোনা যায় ইংলণ্ডে প্রথম ব্যাপক গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার স্বীকৃত হবার পর স্বয়ং এঙ্গেলস একজনের প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করেছিলেন যে ইংলণ্ডের মত পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের দেশে সর্বহারা বিপ্লব সাধন করার জন্য এর পর হিংস পন্থা অপরিহার্য নয়। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলসের পরবর্তী অনুগামীরা কথাটা বেমালুম চেপে যান। কথা হচ্ছে এই যে মার্কস বা এঙ্গেলস যে ক্ষেত্রে হিংসাকে একটা সাধন বা উপায় হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর অনুবর্তী নামে আখ্যাত ব্যক্তিরা সেখানে হিংসাকেই একটা সাধ্য বা লক্ষ্য বলে ধরে নিয়েছেন।”

ইন্দুবাবু কয়েক মুহূর্তের জন্য থামলেন। তার পর হাসিমুখে বললেন, “বুঝতে পারছি বড় বক্তৃতা মার্কা হয়ে যাচ্ছে কথাগুলো। কিন্তু কি করব, বিষয়টাই এমনি। তবে এবারে সংক্ষেপে সেরে ফেলব। হ্যাঁ, তৃতীয় কথা হচ্ছে উৎপাদন পদ্ধতি বা এর জন্য প্রয়োজনীয় মোটিভ পাওয়ার

সম্বন্ধে। মার্কস বাষ্পীয় যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রিত উৎপাদনের অপরিহার্যতা এবং তদনুযায়ী ক্রমাগত অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হাতে অধিকতর মাত্রায় উৎপাদন যন্ত্র ও তৎসম্পর্কিত শক্তি কেন্দ্রিত হবার কল্পনা করে শ্রেণী সংগ্রামের অনিবার্যতা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তার পর বিদ্যুতের যুগ এসেছে এবং পারমাণবিক যুগ আসব আসব করছে। এ ছাড়া উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্ততঃ বিষুবরেখার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে এ সবের পাশ কাটিয়ে সৌরশক্তির যুগ আসাও অসম্ভব নয়। এ সবের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থাকে আর কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজন হবে না। অন্যদিক থেকে বিমান যুদ্ধের আশঙ্কার ফলে রণনীতির দিক থেকেই অন্ততঃ নিত্যব্যবহার্য পণ্য বিকেন্দ্রিত উপায়ে উৎপাদন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে··· ।”

“কিন্তু রকেট, ব্যালাস্টিক মিসলস বা হাইড্রোজেন বোমার বেলায় কি হবে?” নবাগন্তুকদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন।

“তা হলে তো সব সমস্যার সমাধান! কারণ মানুষই যদি না থাকে তা হলে তার সমস্যা আর রইল কোথায়?” কথাটি ইন্দুবাবু গম্ভীর মুখে উচ্চারণ করলে কি হবে, তার প্রচ্ছন্ন রসিকতায় সকলে আবার হেসে উঠল। এলসি কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারল না। চকিতে তার চোখের সামনে ১৯৪১-৪২ খ্রীস্টাব্দের লণ্ডনের ছবি ভেসে উঠল।

ইন্দুবাবু বলে চলছিলেন, “এর ফলে আজ উৎপাদনের পদ্ধতিই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। মার্কসই বলে গেছেন যে সমাজের কাঠামো এবং শ্রেণীসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তাঁর এই কথা যদি সত্য হয় তবে পরিবর্তিত উৎপাদন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদ এখন অকার্যকরী মনে হয়। চতুর্থ পরিবর্তন হচ্ছে যৌথ কোম্পানীগুলি। বিশেষ করে আজকের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীগুলি মার্কসের পুঁজি, পুঁজিপতি ও পুঁজিবাদ সম্পর্কিত ধারণার আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। এমন দিন আসা বিচিত্র নয় যখন মার্কসের পরিভাষা অনুযায়ী পুঁজি বা পুঁজিপতির অর্থ এনসাইক্লোপেডিয়া দেখে খুঁজে বার করতে হবে। কে যে পুঁজিপতি নয়, তখন তা আবিষ্কার করাই এক সমস্যা হবে। সত্যি কথা বলতে কি আমেরিকাতে তো ইতিমধ্যেই একদল লোক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলিকে ‘জনগণের পুঁজিবাদ’ বা পিপলস ক্যাপিটালিজম্ আখ্যা দিতে আরম্ভ করেছে।”

শচীবাবু বললেন, “কিন্তু যাই বলুন না কেন, কমিউনিজমের ডাক যেন

অপ্রতিরোধ্য। দেখুন না কেবল যে একটার পর একটা দেশ কমিউনিস্ট হচ্ছে তাই নয়, আমাদের দেশেও কমিউনিস্টরা সংখ্যা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিতে বেড়ে চলেছে।"

বিরক্ত কণ্ঠে তাঁকে বাধা দিয়ে আলোকবাবু বললেন, "ওটা একটা আধুনিক ফ্যাশান মশাই। এখনকার হুজুগ হল এই যে বামপন্থী বলে পরিচয় দেওয়াটাই ফ্যাশান সঙ্গত। বামপন্থীর অর্থ কি তা বোঝার দরকার নেই, আধুনিকতার খাতিরে আমরা কমিউনিস্ট হই।"

নবাগতদের মধ্যে একজন বললেন, "শুধু কি তাই? আমার তো মনে হয় জাতি হিসাবে আমরা অর্থাৎ ভারতীয়রা এখনও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে রপ্ত হয়ে উঠি নি। আমাদের অতীত ইতিহাস দেখুন—গণতন্ত্রের কল্পনাই এ দেশে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অবদান। আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক সংগঠনেও গণতন্ত্রের নাম গন্ধ নেই। সুতরাং এ যুগে সর্বাপেক্ষা দক্ষ স্বৈরতন্ত্রের নমুনা হিসাবে আমাদের যদি সাম্যবাদের প্রতি প্রীতি হয়ে থাকে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে?"

কথাগুলি এলসির কাছে একেবারে নূতন, গভীর ভাবে চিন্তা করার মত।

শচীবাবু বলছিলেন, "আরও এক মুশকিল হয়েছে এই যে গণতন্ত্রের নামে যে শাসনব্যবস্থা এদেশে চলছে, তা না সৎ না দক্ষ। দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেল। সৎপথে থেকে যে ব্যবসাপত্র করে খাব, তার আর উপায় নেই। এতে গণতন্ত্র এমন কি সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার প্রতিই জনসাধারণের আস্থা চলে যাচ্ছে। দেখছেন না, এখনই লোকে বলা শুরু করেছে যে এর চেয়ে ইংরেজ-রাজত্ব ভাল ছিল।"

এলসি চমকে উঠল। ইংলণ্ডের চরম দুর্দিনেও কি কোন ইংরেজ এ কথা বলতে পারে যে স্বাধীনতার চেয়ে পরবশ্যতা ভাল। সত্য সত্যই ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ!

আলোকবাবু জবাব দিলেন, "এই কয় বছরের স্বাধীনতার মধ্যেই কি দেশের এত দিনের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে নাকি? আর একটু সময় দিন শিশু রাষ্ট্রকে। ক্রমে ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে। এই তো গত বছর প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হয়েছে। দুই-চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে পারলে দেশের আর্থিক সচ্ছলতা হবে এবং তা হলে দারিদ্র্যের নরকান্ধকারে সাম্যবাদের যে বীজ লালিত-পালিত হয়, তার আর বিকাশ হবে না।"

ইন্দুবাবু এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে সবার কথা শুনছিলেন। তিনি কুঞ্চিত কপালে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, "আপনারা প্রত্যেকে যা বলেছেন তার ভিতর সত্য আছে। যে কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার কারণ একটা হয় না, হয় একাধিক। সুতরাং আমার মতে আপনাদের প্রত্যেকের বিশ্লেষণই সত্য। তবে এ ছাড়া এর আরও কয়েকটা কারণ আছে বলে আমার মনে হয়। আপনারা কি একটা বিষয় খেয়াল করেছেন যে এ দেশে দরিদ্রদের চেয়ে একটু সচ্ছল অবস্থার লোকেরাই বেশী করে কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকছে। সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক-অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, ছোটখাটো ব্যবসায়ী ইত্যাদি নিম্ন ও উচ্চ মধ্যবিত্তরা ক্রমশঃ ওদের দল ভারী করছে?"

"বললাম তো ওটা একটা নূতন ফ্যাশান।" তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আলোকবাবু বললেন।

"আপনার সঙ্গে সহমত হতে পারলে খুশী হতাম আলোকবাবু। আমার কিন্তু মনে হয় যে ব্যাপারটা অত সরল নয়। এর কারণ মানসিক বা ইমোশানাল। প্রাচীনপন্থী লেবেল লাগার আশঙ্কা থাকলেও আমি বলব যে আধুনিকতার উদগ্র নেশায় ভারত পাশ্চাত্য শিক্ষা-পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ করে নূতন যুগের মন থেকে দেশের প্রাচীন ধর্মকে মুছে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে তো শূন্যতার স্থান নেই, তাই শূন্য স্থান পূর্ণ করতে এগিয়ে এসেছে এক নূতন ধর্ম যার নাম জড়বাদ। অবাধ ভৌতিক সুখসমৃদ্ধিই এর কাম্য এবং এর অভাব শিক্ষিত মহলে জন্ম দিচ্ছে নিদারুণ অতৃপ্তির অশান্তি। অন্যদিকে আর এক জড়বাদী ধর্ম সাম্যবাদ ইশারা করে বলছে যে তার শরণ নিলে ঐ স্বর্ণমৃগকে করায়ত্ত করা যাবে। তাই শিক্ষিত ও সচ্ছল অবস্থার লোক আরও সমৃদ্ধির আশায় কমিউনিস্ট হচ্ছে।"

কিছুক্ষণ সকলে মৌন রইলেন। ইতিমধ্যে ইন্দুবাবু নিজের আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে বই-এর সেলফের কাছে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে কি যেন একটা পত্রিকা খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে মৃদুস্বরে, "পেয়েছি" বলে পত্রিকাটি হাতে করে নিজের জায়গায় ফিরে এসে বললেন, "এ সম্বন্ধে একজন বিশ্ববিখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও ভূতপূর্ব কমিউনিস্টের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। আমি এম. এন. রায়ের কথা বলছি। ওঁর দুটি রচনা থেকে একটুখানি করে বাংলায় অনুবাদ করে শোনাচ্ছি। ওঁর বিশ্লেষণ আপনারা ষোল আনা না মানতে পারেন; কিন্তু একজন প্রথম শ্রেণীর অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে

ওঁর বক্তব্যের নিশ্চয় বিশেষ মূল্য আছে। রায় এই এক জায়গায় বলছেন :

"কমিউনিস্ট পার্টি আশাহত এবং অসন্তুষ্ট লোকেদের দানা বাঁধার উপযুক্ত ক্ষেত্র দিয়ে থাকে।···নৈরাশ্য ও হতাশার এই পরিবেশের মধ্যে প্রচলিত বিধি-বিধানকে নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত কর্মসূচীর আবেদন অত্যন্ত শক্তি-শালী হয়ে থাকে।—সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার চেয়েও একনায়কত্ব-মূলক ক্ষমতার আকর্ষণ নিম্ন ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের কাছে প্রবল। কারণ আজকের এই প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থাই সর্বাপেক্ষা অসহায় ও শোচনীয়। আর এই জন্যই এশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নেতৃত্ব মধ্যবিত্তরা করছেন। কারণ তাঁরা জানেন যে পলিটব্যুরোর একনায়কত্ব কার্যত: তাঁদের একনায়কত্বই হবে।···"

পড়া শেষ হবার পর অপর একটি পত্রিকার পাতা উল্টে তিনি আবার বলতে লাগলেন, "এই দেখুন, আর এক জায়গায় তিনি বলছেন :

'কমিউনিজমের পাঞ্চজন্য নির্ঘোষ শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মারফত ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে পৌঁছায়। আর সত্যি কথা বলতে কি এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলিতে কমিউনিজম মধ্যবিত্তদেরই আন্দোলন।······ কেবল আর্থিক সহায়তায়······খুব একটা কিছু হবে না। এর সঙ্গে সঙ্গে যাকে আধ্যাত্মিক সাহায্য বলে, তা-ই চাই।'

"ওঁর এক মিনিট তো শেষ হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আর এই সব রাজনীতির গুরুগম্ভীর কথা ভালও লাগছে না নিশ্চয়।"

চাপা কণ্ঠস্বরে এলসির চমক ভাঙ্গল। বীণা দেবী ওর কানের কাছে মুখ এনে চাপা স্বরে কথা কটি বলে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। ওঁর মুখে সেই মিষ্টি হাসি, যার উপর নির্ভর করা চলে।

কেন জানি এলসির মনে হল এই হাসির সঙ্গে তার মায়ের কোথাও মিল আছে। আবার যেন নূতন করে বীণা দেবীকে দেখতে লাগল এলসি। অদ্ভুত সুন্দরী উনি। গৌরবর্ণা বললে তাঁর দেহবর্ণের সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয় না। এলসির মনে হয় বীণা দেবীর রঙ ঠিক যেন গোলাপ ফুলের মত। ইংলণ্ডেও সচরাচর এত সুন্দরী মহিলা দেখতে পাওয়া যায় না। তাদের দেশের মেয়েরা কেমন যেন ফ্যাকাশে ফর্সা। আর অনেকেরই গালে মুখে বাদামী স্পট বা মেচেতা। বীণা দেবী অনবদ্যা। হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বাস্থ্যনিটোল গাল দুটিতে কী সুন্দর ঈষৎ কুঞ্চন রেখা পড়ে। চোখের তারা

এলসির মত নীল নয়—কাল, ঘন কৃষ্ণবর্ণ। মাথার উপর শাড়ির চওড়া পাড় মুখখানিকে গোলাপ কুঁড়ির আধার সবুজ পাতা ছুটির মত ঘিরে আছে। পাড়ের নীচে ঘন চুলের আভাস উঁকি মারছে আর ললাটদেশের ঠিক মাঝখানে রক্তবর্ণ সিঁদুরের লেখা। বসন্তকালে ধলভূমের পার্বত্য প্রান্তরে পলাশের ডালে ডালে যে আগুন লাগে, তারই একটি সূক্ষ্ম স্রোতোধারা যেন বীণাদেবীর সীমন্তদেশ অলঙ্কৃত করে শোভা পাচ্ছে।

বিস্ময়াভিভূত হয়ে এলসি বীণা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছুতেই সে এ চিন্তাটাকে মন থেকে তাড়াতে পারে না যে ওঁর সঙ্গে কোথায় যেন তার মায়ের একটা সাদৃশ্য আছে। খুঁটিয়ে দেখতে গেলে চেহারায় পোশাকে কথাবার্তায়—কোথাও মায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজে পায় না এলিসি। কিন্তু তবু যেন সবটা মিলিয়ে কোথাও একটা মিল দেখতে পায়। আর সত্যি কথা বলতে কি অনেকটা সেই জন্যই ঘুরে ফিরে সে বীণা দেবীর কাছে আসতে চায়। মিসেস ম্যাকডোনাল্ড এঁর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বলে এলসি তাঁর কাছে ঋণী। ইংরেজ মেয়ে। হঠাৎ গায়ে পড়ে কারও সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করা তার স্বভাব নয়। আর বীণা দেবীও খুব আলাপপটু নন। এ ছাড়া নিজের গৃহস্থালি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দু-একবারের বেশী এলসিদের বাড়ি যেতেও পারেন নি। তবু এলসি এই নির্বান্ধব দেশে তার নিঃসঙ্গ জীবনে কিঞ্চিৎ প্রীতিস্নিগ্ধ পরিবেশ পায় বীণা দেবীর এখানে এলে। তাই আসেও সে ঘুরে ফিরে।

"কি দেখছেন এত মন দিয়ে?" কেমন একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে বীণা দেবী আবার মৃদু স্বরে প্রশ্ন করেন।

এলসিও লজ্জা পায়। ছিঃ, এই ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা কি উচিত হয়েছে? তাই অপ্রীতিকর ব্যাপারটার উপর যবনিকা টেনে সে বলে, "আবার আপনি? এ রকম তো কথা ছিল না।"

"ও ঠিক ঠিক, মনে ছিল না।" হাসতে হাসতে বীণা দেবী জবাব দেন। তার পর এলসিকে সম্বোধন করে আবার বলেন, "কি ভিতরে যাবে, না এ সব গরম গরম কথা ভাল লাগছে?"

সত্যিই এলসি এই আলোচনা শুনতে খুব একটা রস পাচ্ছিল না। হিংসা ও স্বৈরতন্ত্রের যে রূপ ইংলণ্ড ও ইউরোপে গত যুদ্ধের সময় প্রকট হয়েছিল, তার পর থেকে ঐ সব কথা শুনলেই তার মন বিষিয়ে ওঠে। তাও তো তখন চার্চিল রুজভেল্ট থেকে আরম্ভ করে হিটলার পর্যন্ত সবাই শক্তির

কথা আওড়াতেন। ওদের শান্তি-কামনার নিদর্শন যদি দ্বিতীয় বিশ্বসমর হয়, তা হলে যারা তত্ত্বগত কারণে হিংসা ও স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাস করে তাদের কার্যকলাপের স্বরূপ কি হবে ভেবে এলসি শিউরে ওঠে।

কিন্তু এত কথা বলে কি লাভ? তাই একটু হেসে সে বীণা দেবীকে শুধু বলে, "চলুন ভিতরেই যাই।"

বীণা দেবী উঠে দাঁড়ালেন। তার পর ইন্দুবাবুকে উদ্দেশ করে বললেন, "আমরা উঠলাম। ভিতরে গিয়ে তোমাদের চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ইন্দুবাবুরা নিজেদের আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। তাই ওদের বাধা দিলেন না।

ভিতরে যেতে যেতে বীণা দেবী আবার ফিক্ করে একটু হেসে ফেললেন। বললেন, "সত্যি ভাই, আমারও ও সব ভাল লাগে না। মেয়েমানুষ ঘর-গৃহস্থালির কাজ দেখব, ছেলেপিলেদের ভাল করে মানুষ করব—তা না, ঐ সব মার মার কাট্ কাট্......" কিন্তু কথাটা শেষ করার পূর্বেই তিনি মাঝ পথে থেমে গেলেন। তার পর হঠাৎ জিভ কেটে বললেন, "এই যাঃ, একটা ভুল হয়ে গেছে। তোমাকে বলাই হয় নি যে অমিতা এসেছে।"

"ও লর্ড, তাই নাকি? কই, কোথায় অমিতা?"

"চল, ওর ঘরেই যাচ্ছি।"

ভিতরে আর একটা ঘর পেরিয়ে একটি অপ্রশস্ত আঙিনা। আঙিনার ওপাশের একটি কুঠরি থেকে এলোমেলো ভাবে হারমোনিয়ামের চাবি টেপার শব্দ আসছিল।

কিন্তু ঘরের সংলগ্ন বারান্দা পেরিয়ে উঠোনে পা দেবার পূর্বেই তাঁরা বাধা পেলেন। দীপ তার ছোট ছোট দুটি হাত প্রসারিত করে ওদের পথ আটকে দাঁড়াল।

"পাস কই? পাস দেখাও, তবে তো যাবে।"

বীণা দেবী আদর করে দীপের গাল টিপে দিয়ে বললেন, "আছে বাবা, আছে। একেবারে একসঙ্গে দেখাব। বার বার কি দেখান যায়?"

দীপ বলল, "আর ওঁর, ঐ মাসীর পাস?"

"ওঁর পাস কি হাতে থাকে? ও তো তোমার বাবার মত মোটরে রাখা আছে। যাবার সময় দেখাবেন।"

দীপ একটু কর্তৃত্বের স্বরে বলল, "ঠিক দেখাবে কিন্তু।" তার পর হাত

দুটিকে ঘুরিয়ে একটা গোলাকৃতি কিছু ধরার মুদ্রা করে মুখে অঁর্‌র্‌ অঁর্‌র্‌ শব্দ করে চক্রাকারে বারান্দার চারিদিকে দৌড়তে লাগল।

বীণা দেবী হাসতে হাসতে বললেন, "কাল ওর বাবার সঙ্গে মোটরে জামসেদপুরে গিয়েছিল। পথে পুলিসদের রোড পারমিট চেক করতে দেখার পর থেকে ও পাস দেখা শুরু করেছে।"

*　　　*　　　*

এলসিকে দেখে অমিতা লাফিয়ে উঠল। তার পর হারমোনিয়াম ছেড়ে এসে দুই হাত দিয়ে এলসির বাঁ হাতটা চেপে ধরল। অমিতাকে দেখতে ঠিক ওর মায়ের মত। তেমনি সুন্দরী, তেমনি লাবণ্যে ঢল ঢল মুখখানি। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছা করে।

এলসি ডান হাত দিয়ে অমিতার পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় মারতে মারতে বলল, "সুইট অমিতা—হাউ ডু ইউ ডু?"

"ভাল। কখন এলেন আপনি?"

"এই খানিকক্ষণ।"

"এতক্ষণ বুঝি বাবাদের ঘরে হৈ চৈ করছিলেন?"

"না, তা ঠিক নয়। এই বসেছিলাম আর কি।"

"এবার পাঁচ মিনিট পরই তো বলবেন—গুড নাইট অমিতা।"

"না, না, তা কেন? কতদিন পর এসেছি। আজ তোমার গান শুনব, তবে তো যাব।"

বীণা দেবী বললেন, "মাসীকে বসতে দে অমিতা। আমি ওঁদের চায়ের ব্যবস্থা দেখি।" তার পর এলসির দিকে ফিরে বললেন, "তুমি বসে অমিতার গান শোন। আমি একটু গৃহস্থালি সামলে আসি—কি বল?"

এলসি মাথা নেড়ে বলল, "স্বচ্ছন্দে।"

বীণা দেবী বেরিয়ে গেলেন।

এলসিকে তক্তপোশের পাশে একটা চেয়ারে বসতে দিয়ে অমিতা নিজের জায়গায় ফিরে যেতে যেতে বলল, "এসেই শুনলাম আপনি নরসিংগড়ের এক জন মাস্টার মশাইকে খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন।"

"আমি বাঁচিয়েছি কে বলল? ওঁর কপালের জোরে বেঁচে গেছেন।" এলসি জবাব দিল।

"কিন্তু মাসী, আপনার খুব সাহস বলতে হবে। আমি হলে তো ঐখানেই মরে যেতাম।" অকৃত্রিম আতঙ্কে অমিতা চোখ মুখ পাকিয়ে বলল।

হাসতে হাসতে এলসি জবাব দিল, "তাতে কি লাভ হত? কে কাকে হাসপাতালে নিয়ে যেত?"

অমিতা শিউরে উঠে বলল, "না বাবা, লতাকে আমার ভীষণ ভয়।"

"লতা—লতা কি?" এলসির কণ্ঠে বিস্ময়।

"ওমা, ঐ যে—ওর নাম কি বলে…", এলসিকে কি করে বোঝাবে অমিতা ভেবে পায় না। অবশেষে মরীয়া হয়ে বাঁ হাতের চেটোতে ডান কনুই রেখে ডান হাতকে সাপের ফণার মত বেঁকিয়ে বলে, "একে—এই একে বলে লতা। রাত্রে নাম করতে নেই তো!"

এলসি ওর ভাবভঙ্গী দেখে খুক্ খুক্ করে হাসতে থাকে। খানিকক্ষণ হাসার পর হঠাৎ খেয়াল হয় যে অমিতা হয়তো মনঃক্ষুণ্ণ হতে পারে। তাই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সে বলে, "নাও ওসব কথা ছেড়ে এবার নূতন কি গান শিখে এলে তাই শোনাও।"

অমিতা হারমোনিয়ামের চাবিগুলির উপর অল্প কিছুক্ষণ আঙ্গুল চালাবার পর কেমন অপ্রতিভের মত হেসে ফেলল। তার পর হতাশ ভঙ্গীতে বলল, "কি গান গাইব বলুন? কিছু মনে আসছে না। কেউ গাইতে বললে ঐ আমার এক বিপদ হয়। কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়।"

এলসি জবাব দিল, "বারে, আমি কি করে বলব? তবে শান্তিনিকেতনে পড় যখন, তখন টেগোরের লিরিক শুনতে পাব, এইটাই তো আশা করি।"

অমিতা মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ ভাবল। তার পর বলল, "আচ্ছা, একটা গান মনে পড়েছে। কিছুদিন আগে আমরা চিত্রাঙ্গদা অভিনয় করেছিলাম। তারই একটা গান গাইছি।"

"কিন্তু তার আগে চিত্রাঙ্গদার গল্পটা একটু সংক্ষেপে শুনিয়ে দাও না কেন। তা হলে আমার বুঝতে আরও সুবিধা হবে।"

অমিতা বলল, "ঠিক বলেছেন। তবে আপনি অল্প সময়ের মধ্যে যে রকম বাঙলা শিখে নিয়েছেন, তাতে গল্প না শুনলেও গানের মানে বুঝতে অসুবিধা হত না।"

সংক্ষেপে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার কাহিনী শুনিয়ে দিয়ে অমিতা গান ধরল:

"আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি।
আনন্দে বিষাদে মন উদাসী।

পুষ্পবিকাশের সুরে দেহ মন উঠে পুরে,
কী মাধুরী সুগন্ধ বাতাসে যায় ভাসি।
আমার অঙ্গে অঙ্গে·········

এলসি চিত্রার্পিতের মত গান শুনছিল। কোথায় মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা, কতদূরে মহাভারতের যুগের পৌরুষের প্রতীক অর্জুন! কিন্তু সঙ্গীতের আবেদনের গুণে যেন কত কাছের মানুষ মনে হয় এদের। আর অতৃপ্ত চিত্রাঙ্গদার আকুল আকাঙ্ক্ষাও যেন এলসির মনে কিসের এক অনুরণন জাগায়। নবীন রূপে রূপান্তরিতা যৌবনীতা চিত্রাঙ্গদার মত এলসির সত্তা নিজের মনের অর্জুনের ব্যগ্র বাহুবন্ধনে আত্মসমর্পণ করে ধন্য হতে চায়। কিন্তু······

গান শেষ করে অমিতা এলসির দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

দীর্ঘশ্বাস গোপন করে প্রসন্ন কণ্ঠে এলসি বলে, "চমৎকার হয়েছে মিতা ডার্লিং। আমার বলার অপেক্ষা না রাখলেও বলি টেগোরের লিরিকের মত ভাব, ভাষা আর সুর—এই তিনটির এমন অপূর্ব সমন্বয় আর কোথাও দেখি নি। কিন্তু—কিন্তু থেমে গেল কেন? আবার হক।"

পর পর আরও দুটো রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইল অমিতা। ওর গলায় খুব একটা ওস্তাদি বা কারিগরি না থাকলেও একটা স্বাভাবিক মিষ্টতা আছে। আর আন্তরিকতা সহকারে গায় বলে শুনতে ভালই লাগে। এলসি ভারতীয় রাগ-রাগিণীর রস পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে না। তবে কৈশোরে সঙ্গীতশিক্ষার ফলে সুর উপলব্ধি করার কান তার আছে। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের গানে কোথাও কোথাও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রেশ থাকায় ওঁর গান শুনতে এলসির ভালই লাগে। তবে টেগোরের লিরিকের কাব্যাংশ পূর্ণ মাত্রায় বুঝতে পারলে আরও ভাল লাগত নিশ্চয়। যাই হক গানের কথার যতটুকু সে বোঝে এবং সুরের যতখানি রস গ্রহণ করা তার সাধ্যায়ত্ত, তার সম্মিলিত এফেক্ট বা প্রভাব তার মনে আনন্দেরই সঞ্চার করেছে। তাই কতক বোঝা কতক না বোঝার আনন্দের এক কল্পলোকে সে যেন এতক্ষণ বিহার করছিল।

গান থামিয়ে অমিতা আব্দারের সুরে বলল, "এবার আপনাকে একটা জিনিস শোনাতে হবে মাসী।"

কৃত্রিম আতঙ্কের ভঙ্গীতে এলসি জবাব দিল, "কি—গান? ও লর্ড, সে

সব কোন্ কালে ভুলে গেছি। খাদানের কাইনাইটের দাম কষতে কষতে গান বেরোয় নাকি ?”

মৃদু হেসে অমিতা বলল, “ভয় নেই গান নয়, কবিতা—ইংরাজী কবিতা। বাড়ি আসার সময় আমাদের লাইব্রেরী থেকে একটি ভাল কবিতার বই এনেছি। ইংরাজী সাহিত্যের বিখ্যাত কবিদের রচনার বাছাই করা সঙ্কলন। তার থেকে শেলীর কবিতা শোনাতে হবে। আমাদের ক্লাসে কিছুদিন আগে শেলীর ‘টু এ স্কাইলার্ক’ পড়ান হয়েছিল। এত সুন্দর লাগল কবিতাটি যে শেলীর আরও কবিতা পড়তে ইচ্ছা হল। তাই বইটি নিয়ে এসেছি।”

শেলীর কবিতা! এলসির বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ল। স্টুয়ার্টও তো কবিতা, বিশেষ করে শেলী বলতে অজ্ঞান ছিল। এলসির এক জন্মদিনে ওকে ইংরাজী কাব্য সঙ্কলনের এক খণ্ড উপহার দিয়েছিল। উপহারের পৃষ্ঠায় যা লিখেছিল, তার প্রতিটি কথা এলসির মনে গাঁথা আছে। প্রথমেই শেলীর একটি বহুপঠিত কবিতার চারটি চরণ :

“Nothing in the world is single ;
All things, by a law divine,
In one another's being mingle—
Why not I with thine ?”

তার নীচে লেখা—টু লিসি, মাই লাভ।

শেলীর কবিতা পড়তে হবে ? এলসি কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা দেখছে চোখে। কণ্ঠনালী ভার-ভার ঠেকছে। একটা প্রবল আবেগ যেন বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। যেন স্পষ্ট স্টুয়ার্টের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে এলসি। উইকএণ্ডে একবার তারা টেমসের মোহনার সংলগ্ন লী-তে বেড়াতে গিয়েছিল। লণ্ডন থেকে খুব বেশী দূর নয়—মোটরে সেভেনওকস হয়ে টনব্রিজ, আর তার পর এসেক্স-এর লী নামক ক্ষুদ্র জনপদ। ব্রেকফাস্ট সেরে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে ওরা সমুদ্রের কূলে বেড়াবার জন্য বেরোল। স্টুয়ার্টের পাশে এলসি, ওর হাতে হাত দিয়ে চঞ্চলা কুরঙ্গীর মত চপল চরণে চলছিল। জনকোলাহল ছাড়িয়ে একটু নির্জন বালুকাতটে দুজনে পাশাপাশি বসল। ঊর্মির শিখর-শোভা ফেনপুঞ্জ মাঝে মাঝে ওদের ছুঁয়ে যাচ্ছে ? যাক। জুতো ভিজছে ? ভিজুক। ওদের দৃষ্টি সুদূর দিগন্তের দিকে। সম্মুখে অতল নীলাম্বু গুরুগম্ভীর গর্জনে তটের উপর মুহুর্মুহু ভেঙ্গে পড়ছে। মাটি আর জলের চিরকালীন বুড়ি

ছোঁয়াছুঁয়ির খেলা। দূরে পাল তোলা জেলে ডিঙ্গি বিরাটকায় মরালের মত মন্থর গতিতে আসছে, কচিৎ কখনও সশব্দে জল কেটে চলে স্টীমলঞ্চ। শুভ্রপক্ষ সী-গালদের ভিতর কিসের যেন মহোৎসব লেগেছে। ওদের হুড়োহুড়ির বিরাম নেই।

গায়ে গা লাগিয়ে ওরা দুজন পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে। উভয়ের হাতে হাত ধরা। দুজনের চুল উড়ছে চঞ্চল বায়ুহিল্লোলে। স্টুয়ার্টের কণ্ঠ সমুদ্রের গাম্ভীর্যের সঙ্গে তাল রেখে উদাত্ত হয়ে উঠল :

"Our breath shall intermix, our bosoms bound
And our veins beat together, and our lips
With other eloquence than words, eclipse
The soul that burns between them, and the wells
Which boil under our being's inmost cells,
The fountains of our deepest life, shall be
Confused in Passion's golden purity ;
As mountain springs under the morning sun,
We shall become the same, we shall be one
Spirit within two frames, Oh ! Wherefore two ?"

"এই যে মাসী, বই এনেছি। আপনার পছন্দ মত শেলীর যে কোন একটি কবিতা পড়ুন।"

অমিতার ডাকে এলসি বাস্তব জগতে ফিরে এল। শেলীর সঙ্গে স্টুয়ার্টের নাম ওর কাছে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এক জনকে বাদ দিয়ে অপর জনের কথা যেন ভাবাই চলত না। আশ্চর্য, তবু কত দিন শেলীর কথা সে ভুলে ছিল।

অমিতা ধরেছে যখন, তখন একেবারে এড়ান যাবে না। স্টুয়ার্টের স্মৃতি বেদনা দেবে? তা দিক। ও মধুর বেদনা তার একান্ত আপনার সম্পদ। লোকসমক্ষে সেই বেদনামধুর পূর্বস্মৃতির কথা উল্লেখ করা যায় না। অমিতার কাছে তো নয়ই। আবৃত্তির জন্য এলসি তাই কবিতা বাছতে লাগল।

॥ বার ॥

কৌশিকবাবুর কিন্তু ট্রেনে যাওয়া হল না। পরের দিন এলসি এসে জামসেদপুরে যাওয়ার ব্যবস্থার কথা শুনে বলল যে তা হলে তো তার সঙ্গেই কৌশিকবাবু যেতে পারেন। ঐ দিন বিকেলে সেও জামসেদপুর যাবে এবং সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে তাকে ধানবাদ রওনা হতে হবে। মাইনিং অফিসারের সঙ্গে এলসির খাদান সংক্রান্ত কয়েকটা ব্যাপারে দেখা করা দরকার। হাসপাতাল থেকে স্টেশনে যাবার জন্য একবার গাড়িতে ওঠা আবার নামা, তার পর ট্রেনে চড়ার ঝঞ্ঝাট এবং জামসেদপুরে আবার ওঠা নামার ঝামেলা করার দরকার কি? এলসির গাড়িতেও পৌঁছাতে ঐ একই সময় লাগবে। কেবল ওরা বিকেলের বদলে সন্ধ্যায় জামসেদপুর পৌঁছাবে।

সব দিক থেকে চিন্তা করে এ প্রস্তাব কৌশিকবাবুর মন্দ লাগল না। তবে এর পর যার বিরুদ্ধে তাঁকে লড়াই করতে হবে, তার কাছ থেকে এ ভাবে সাহায্য নিতে একটু সংকোচ যে হল না, তা নয়। তবে কৌশিকবাবু অবশ্য এমন নীতিবাগীশ নন যে ব্যক্তিগত ভাবে উপকৃত হবার জন্য শোষিত শ্রেণীর স্বার্থ বিসর্জন দেবেন। আর তা ছাড়া আর একটা কথা কৌশিকবাবুর মনে হল। এলসির সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা হয়ে থাকলে হঠাৎ সরকারী মহা-প্রভুদের নজরে পড়ার সম্ভাবনা কম। বাঘের ঘরেই যে ঘোগের বাসা—এ কথা কে কল্পনা করবে? অতএব তিনি বিশেষ আপত্তি না করে প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

স্বাহাকে সেই মর্মে চিঠিও লিখে দেওয়া হল। নচেৎ সে কৌশিকবাবুকে ট্রেনে দেখতে না পেলে চিন্তা করবে। আর রণজিৎবাবু যখন বিকেলে তাঁকে দেখতে এলেন, কৌশিকবাবু তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে জানিয়ে দিলেন যে কাল আর তাঁকে কষ্ট করতে হবে না।

* * *

বিকেল চারটে আন্দাজ এলসি এল। ডাঃ বোসকে আর এক দফা ধন্যবাদ দিয়ে ওরা রওনা হল।

সূর্য পশ্চিম গগনের দিকে অনেকখানি হেলে পড়েছে। শাল মহুয়ার শীর্ষদেশে আবীর গুলালের ছোপ। রাস্তার বাঁ দিকে কপার কোম্পানির কারখানার উচ্চ প্রাচীর। রোপওয়ে অবিশ্রান্ত ঘূর্ণন করছে। সাত মাইল দূরস্থ মুসাবনীর খাদান থেকে তামার পাথর এই ভাবে ঝুলতে ঝুলতে

আসছে। বহুযুগ ধরে ধরণী যক্ষের মত নিজের অন্ধকার বক্ষের মধ্যে যে সম্পদ গুপ্ত রেখেছিল, মানুষ তাকে মুক্ত করে আলোকের মুখ দেখাবে।

গাড়ি নীচে নামছে। বালু আর উপলখণ্ড বুকে নিয়ে শূন্যগর্ভা সুবর্ণরেখা সম্মুখে শায়িতা। উপরে মেঘমুক্ত আকাশ। অপরাহ্নের অনুগ্র রৌদ্রকরে দ্যুতি বিকীর্ণ করছে প্রতিটি বালুকণা—যেন সুবর্ণচ্ছটা। তির্ তির্ করে ক্ষীণ জলধারা এধার ওধার দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। মেঘের ডম্বরু বাজিয়ে যখন প্রচণ্ডধারায় বর্ষণ নামে, তখন এই সুবর্ণরেখাই অনন্তযৌবনা সুরপুরনন্দিনী রূপে নয়, রাক্ষসী মূর্তিতে জেগে ওঠে। ফেনকিরীট-শোভিত গৈরিক জলপুঞ্জ বিকট উল্লাসে লক্ষ হাতে তালি দিতে দিতে প্রলয় নাচন নেচে চলে। পদাতিক তো দূরের কথা, কোন যানবাহনের সাধ্য নেই তখন সুবর্ণরেখাকে অতিক্রম করে। সৌভাগ্যক্রমে নদীতে এখনও ঢল নামে নি। গাড়ি তাই দুলে দুলে সুবর্ণরেখা পার হচ্ছে। চাকার নীচে নুড়ি পড়ায় মাঝে মাঝে গাড়ি লাফিয়ে উঠছে আর সঙ্গে সঙ্গে আরোহীরাও এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। দূরে পূর্ব দিকে বাদিয়ার ঘাটের আভাস দেখা যায়। সুবর্ণরেখার অপর পারে ধলভূমের আরণ্যভূমির অসীম বিস্তার। নীলাভ পর্বতগাত্রে ঘন সবুজের রেখা চোখে পড়ে। মোটরের গর্জন বেড়ে উঠল। নদীবক্ষ থেকে গাড়ি এবার উপরে উঠছে।

গাড়ি ডান দিকে মোড় নিল।

কৌশিকবাবু প্রশ্ন করলেন, "বাঁ হাতের রাস্তা কি মুসাবনী গেছে?"

এলসি তাঁর দিকে ফিরে জবাব দিল, "হ্যাঁ। পুরোটাই মোটর চলার মত রাস্তা।"

এতক্ষণে কৌশিকবাবু ভাল করে এলসিকে দেখলেন। সুন্দর একটা রেশমী রুমাল ওর মাথায় বাঁধা। নচেৎ দুরন্ত হাওয়ার দৌরাত্ম্যে চোখে মুখে চুল উড়ে এসে পড়ে দৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটাত। রুমালের পাশ দিয়ে দুই-চার গাছা ঈষৎ স্বর্ণাভ চিকুর বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। গৌর বর্ণের গাল দুটিতে সিঁদুরের রঙ। ঈষৎ প্রসাধনের চিহ্ন থাকলেও তার স্বাভাবিক বর্ণই যথেষ্ট রক্তিম। টানা টানা দুটি ভ্রু, তবে ঠিক কৃষ্ণবর্ণ নয়। চোখ দুটি অপূর্ব। নীল তারাতে যেন নীলাম্বুর অতলান্ত গভীরতা। ওষ্ঠ ও অধর পরস্পর সন্নিবিষ্ট। তাতেও লালিমার ছোপ। সবুজ চেক-এর একখানি সিল্কের স্কার্ট এলসির পরনে। ইউরোপীয় নারীর পক্ষে এ পোশাক খুবই সাধারণ, তবে অনভ্যস্ত ভারতীয় চক্ষুতে এই-ই হয়তো অসাধারণ। এলসির অনাবৃত

সুপুষ্ট দুটি বাহু ও দশ করাঙ্গুলি গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলকে নিয়ে যেন খেলা করছে। প্রসাধন সামগ্রীর মৃদু সৌরভ কৌশিকবাবুর নাকে এসে লাগছে—বেশ একটা মন-মাতান মিষ্টি ঘ্রাণ।

কৌশিকবাবু বাইরের দিকে চোখ ফেরালেন। পাহাড়ের পাশ দিয়ে রাস্তা। দুই পাশে নীরব বিটপীশ্রেণী সগর্বে মস্তক উত্তোলিত করে দণ্ডায়মান। বৃক্ষের শাখা ও পত্রের ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা চলছে। রৌদ্রের প্রখরতা নেই। ঈষৎ ছায়ান্ধকার বন-বেষ্টিত পথ যেন কোন্ এক রহস্যলোকে উপনীত হবার সোপান। পি-ই-ই-প, পিপ, পিপ্। একটা হরিণ দৌড়ে পালাল। এক লহমার জন্য দেখা দিয়েই আবার চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উত্তেজিত কণ্ঠে কৌশিকবাবু বললেন, "দেখেছেন হরিণ একটা!"

মৃদু হাস্যে এলসি জবাব দিল, "হ্যাঁ। কেবল হরিণই নয়। রাতের বেলায় এ রাস্তায় বাঘ দেখাও বিচিত্র নয়। আর পাহাড় থেকে মাঝে মাঝে হাতী তো নেমেই থাকে।"

হাসলে এলসিকে আরও সুন্দর দেখায়। ঝক্‌মকে ছোট ছোট দাঁতের সারি ঐ বন্য কুরঙ্গীর মত একবার দেখা দিয়েই চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এলসি ডান দিক নির্দেশ করে বলল, "ঐ দেখুন রাখামাইন্‌সের রাস্তা। বড় রাস্তা থেকে মাইল দুয়েক দূরে ঐ রাখামাইন্‌সে প্রথমে তামার খনি আবিষ্কৃত হয় আর কেপ কপার কোম্পানি ওখানে গিয়ে কারখানা খোলে।"

"সে কারখানার কি হল?"

"এখন ধ্বংসস্তূপ। কেন, জামসেদপুর যেতে যেতে রাখামাইন্‌স্ স্টেশন থেকে কারখানার ভাঙ্গা ঘর বাড়ি আর চিমনী তো দেখা যায়।"

"আমি তো এই প্রথম জামসেদপুরে যাচ্ছি।"

"আচ্ছা, তাই নাকি।"

আবার নীরবতা নেমে আসে। অধিক কৌতূহল প্রকাশ করা ইংরেজের স্বভাববিরুদ্ধ এবং বহুদিন সমাজের স্বাভাবিক পরিধির বাইরে থাকায় কৌশিকবাবুও আলাপ জমানর কলায় পটু নন। কথা বন্ধ হলেও অবশ্য মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় থাকে না। কৌশিকবাবু চিন্তার জাল বুনে চলেন। এলসিকে তাঁর বড় অদ্ভুত মনে হয়। তিনি অবশ্য মূর সাহেবের কথা আবছা আবছা জানেন। তবু তাতে কৌতূহল সম্পূর্ণ মেটে না। কেবল কি ব্যবসা করার

জন্য এলসি এই আত্মীয়-বন্ধু-বিহীন দেশে জীবন কাটাচ্ছে ? খাদান আর তার মজুরদের নিয়ে যতটা সময় কাটে, তার পর এলসি কি করে ? ওদের সমাজের কারও সঙ্গে কি এলসির ভাব নেই ? মৌভাণ্ডার আর মুসাবনীর ইংরেজ সমাজের সঙ্গে না মিশে ইন্দুবাবুর বাড়িতে গিয়ে কি আনন্দ পায় এলসি ?

এলসির মনও নিষ্ক্রিয় ছিল না। কৃপণ বৃদ্ধ যেমন সুযোগ পেলেই সঙ্গোপনে তিলে তিলে সঞ্চিত নিজের ধনভাণ্ডার সম্মুখে মেলে ধরে সঞ্চয়ের আনন্দ উপভোগ করে, সেও তেমনি পূর্ব স্মৃতির রোমন্থন করে চলছিল। স্টুয়ার্টের সঙ্গে সেবার সে কান্ট্রি সাইডে বেড়াতে গিয়েছিল। এমনি অপরাহ্ন বেলা। হু-হু করে মোটর এমনিই ছুটে চলছিল। পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে সামনের আসনে সে আর স্টুয়ার্ট বসে আছে। দুরন্ত হাওয়ায় দাপটে বব আর এলবার্ট একাকার হয়ে যাচ্ছে। এলম্ ওক আর চেস্টনাটের মাঝ দিয়ে রাস্তা। দিনের বেলাটা বেড-ফোর্ডের পাব-এ কাটিয়ে ওরা লণ্ডনে ফিরছিল। স্পীড, স্পীড—স্পীডের নেশা ওদের দুজনকে পেয়ে বসেছে। শক্ত হাতে ষ্টিয়ারিং ধরে স্টুয়ার্ট সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, এলসি ওর স্কন্ধে মস্তক ন্যস্ত করে স্পীডের নেশা উপভোগ করছে। সামনের রাস্তা থেকে চোখ না ফিরিয়েই স্টুয়ার্ট আবৃত্তি শুরু করল :

"My courses are fed with lightning,
They drink of the whirl wind's stream,
And when the red morning is brightning
They bathe in the fresh sunbeam ;
They have strength for their swiftness I deem,
Then ascend with me daughter of Ocean.
I desire ; and their speed makes night kindle ;
I fear : they outstrip the Typhoon ;
Eve the cloud piled on Atlas can dwindle
We encircle the earth and the moon ;
We shall rest from long labours at noon ;
Then ascend with me, daughter of Ocean."

শেষ বার "daughter of Ocean" উচ্চারণ করার সময় স্টুয়ার্ট সহসা বাঁ হাতে ওর কটিদেশ বেষ্টন করে তীব্র আবেগে অসতর্ক এলসির ওষ্ঠে চুম্বন করেছিল।

গাড়ি একটু টাল খেল। বেপরোয়া স্টুয়ার্টের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। এলসি কপট ক্রোধে ধমকে বলল, "এমনি করলে আর আমি কোন দিন তোমার সঙ্গে আসব না। এখনই সবশুদ্ধ চুরমার হয়ে স্বর্গে যেতাম যে।"

স্টুয়ার্ট অট্টহাস্য করে জবাব দিয়েছিল, "ক্ষতি নেই, সেখানেও আমি তোমার পাশেই থাকব।"

পাশেই থাকব! এলসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশে তাকায়। কৌশিকবাবু ওর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। চোখে চোখ পড়তে তিনি তাঁর দৃষ্টি বাইরের দিকে নিবদ্ধ করলেন।

গাড়ি চলছে। বনের এলাকা সমাপ্ত। মাঝে মাঝে রাস্তা থেকে একটু দূরে দুই একটি গ্রাম নজরে পড়ে। খড়ে ছাওয়া ছোট ছোট মাটির বাড়িগুলির দেওয়ালে গিরিমাটির প্রলেপ এবং তার উপর কত রকমের চিত্র-বিচিত্র। কদাচিৎ একদল পথচারী রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ধাবমান মোটর গাড়ি দেখে। আদিবাসী নারী ও শিশুদের চোখে মুখে অকৃত্রিম বিস্ময়। মাদলে ঘা দিতে দিতে এক দল যুবক চলেছে, চলার তালে তালে তাদের প্রস্তরে খোদাই করা কৃষ্ণবর্ণ দেহের পেশীগুলি নৃত্য করে উঠছে। ধিন্ ধিন্ ধিন্ তা, ধিন্ ধিন্ ধিন্ তা—অদ্ভুত মিষ্টিসুর তুলছে মাদল। এক রহস্যজনক মাদকতায় ভরা মাদলের গুঞ্জরণ। সূর্য পশ্চিম গগনের দিক্‌চক্রবালে নেমে গেছে। সামনের আকাশ লালে লাল। নভোমণ্ডল থেকে যেন মুঠো মুঠো স্বর্ণরেণু ঝুর ঝুর করে ধরণীর বুকে ঝরে পড়ছে। মহার্ঘ উপচারে দেব বিবস্বান ধরিত্রী মাতাকে দিনশেষের বন্দনা জানাচ্ছে। মাঠ ঘাট, ঐ কাল কাল পাথরের ডুংরী—সর্বত্র তার নিদর্শন।

কৌশিকবাবু অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন। বিংশ শতাব্দীর সভ্য জনপদে এও কি সম্ভব? কিন্তু চক্ষুকে তো অবিশ্বাস করা যায় না। ঐ তো কয়েকজন নর-নারীর জটলা। চলন্ত গাড়িতে বসেই বেশ দেখা যাচ্ছে। একটি সাঁওতাল পুরুষ একটি সাঁওতাল যুবতীর হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে। যুবতীটি এবং তার সঙ্গী আরও তিনটি মেয়ে পুরুষটিকে দুমদাম করে মেরে চলেছে; কিন্তু পুরুষটির কোন দিকে খেয়াল নেই। চারটি মেয়ের চেঁচামেচি আর্তনাদ বা প্রতিরোধ ওকে ওর দুষ্কৃতি থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে অসমর্থ। আরও দুটি যুবক পাশে পাশে চলেছে। কিন্তু ওরা প্রথম জনের কুকর্মের সাথী বলেই হক কিম্বা ভয়ে নারীহরণকারীর কাজে বাধা দিচ্ছে না। দেখতে দেখতে মোটর তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। উত্তেজিত

কৌশিকবাবু এলসিকে উদ্দেশ করে বললেন, "গাড়িটা থামান তো। দেখছেন না, কী ভয়ঙ্কর অত্যাচার হচ্ছে!"

এলসির মুখমণ্ডলে বিদায়ী সূর্যের ছটা পড়ল যেন। ওর রক্তিম গণ্ড আরও রক্তাভ হয়ে উঠল। তার পর সে ফিক্ করে হেসে ফেলল। কিন্তু গাড়ি তখনও সমান বেগেই চলছে।

"হাসলেন যে মিস মুর! দুই-এক জন দুষ্কৃতিকারীর সঙ্গে লড়ার ক্ষমতা এখনও আমার আছে।"

এলসি এবার একটু শব্দ করেই হেসে উঠল। তার পর সম্মুখপানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি সাঁওতালদের প্রথা জানেন না কৌশিকবাবু?"

"না তো, আমি সম্প্রতি এই অঞ্চলে এসেছি।"

"ও, তাই বলুন। ওটা নারীহরণ নয়, কোর্টশিপ।" কথাটা বলতে বলতে এলসি আর একবার অরুণাভ হয়ে উঠল।

"কোর্টশিপ কি রকম?" কৌশিকবাবুর কণ্ঠস্বরে বিহ্বলতার আভাস।

"হ্যাঁ, ঐ ওদের প্রথা। যে যাকে পছন্দ করবে এই ভাবে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে যাবে। মেয়েটি যদি তিন রাত ছেলেটির ঘরে থাকে তা হলে উভয় পক্ষের অভিভাবকরা কথাবার্তা বলে বিয়ের ব্যবস্থা করবে। আর এর মধ্যে মেয়েটি যদি চলে যায়, তবে বুঝতে হবে যে পাত্র তার মনোমত নয়।"

কৌশিকবাবু নিজের অজ্ঞতায় লজ্জিত হন। একজন বিদেশী মেয়ে ভারতীয় উপজাতিদের একটি শ্রেণীর সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে যা জানে, তিনি স্বয়ং এ-দেশবাসী হয়ে তার খবর রাখেন না। এর উপর এক জন যুবতীর সঙ্গে ঐ রকম নাটকীয় ভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করাতে তিনি আরও লজ্জা পান। আর কোন কথাবার্তা না বলে তিনি চুপ করে থাকেন।

এলসি বোধ হয় তাঁর মনের ভাব অনুমান করতে পারে। তাই আবহাওয়াকে সহজ করার জন্য সে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করে। রাস্তায় লোক চলাচল একটু একটু করে বাড়ছিল। সামনের ঐ নদীটা পেরোলেই কালিকাপুর গ্রাম। আজ বোধ হয় ওখানে হাট ছিল। হাটের ফেরত সবাই বাড়ি যাচ্ছে। এলসি বলল, "জানেন কৌশিকবাবু, ধলভূমের হাটে এলেই যে কিছু কেনা-বেচা করতে হবে—এর কোন মানে নেই।"

কৌশিকবাবুকেও মুখ খুলতে হয়। বলেন, "তা হলে এত দূর হেঁটে হাটে আসার অর্থ ?"

"এটাকে একটা বিলাস বলতে পারেন। আবার হাট এ দেশের লোকের সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রও বটে। অকারণে কেবল গল্প-গুজব করার জন্যও অনেকে হাটে আসে।"

"বিচিত্র ব্যাপার তো !"

খুট্ করে গাড়ির হেড লাইট জ্বালার শব্দ হয়। অন্ধকার হয়ে এসেছে। দু পাশের ক্ষেত-খামার, পাথুরে ডুংরী ও মেটে ঘর বাড়ি আর দেখা যায় না। কেবল মোটরের হেড লাইট থেকে দুটি আলোর রেখা পথের উপর পড়ে খানিকটা জায়গা আলোকিত করেছে ও সেই আলোতে পথ দেখে নিয়ে গাড়ি দ্রুত বেগে ধেয়ে চলেছে। চলার বেগে ছোট ছোট পাথরের কুচি আর রবারের টায়ারের ক্ষণিক আলিঙ্গনে কেমন একটা একটানা শব্দ উঠছে —চিট্ চিট্ চিট্, চিট্ চিট্ চিট্। গাড়ির ভিতর স্পিডোমিটারের পাশে একটা ছোট বাল্ব জ্বলছে। তার অস্পষ্ট আলোকে স্কার্ফ দিয়ে ঘেরা এলসির মুখের একাংশ আবছা ভাবে দেখা যায়। কেমন যেন রহস্যাবগুণ্ঠিত মনে হচ্ছে এলসিকে। ও যেন এই পৃথিবীর নয়, কোন নক্ষত্র কিম্বা গ্রহান্তর থেকে আবির্ভূতা। গাড়ির ভিতরকার ঐ ক্ষীণ আলোকটুকু ছাড়া সম্মুখে পিছনে—চতুর্দিকে নিবিড় ঘন অন্ধকার। গাড়ি চলেছে সেই গহন অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করে।

এলসি শক্ত হাতে স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে চলেছে। লাল মুরমের পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে। কখনও চড়াই, কখনও উৎরাই। কখনও বা ছোট ছোট পুল সাঁৎ সাঁৎ করে পার হয়ে যাচ্ছে। পটকা পিছনে পড়ে রইল, পার হয়ে গেল রোলাডি আর সরমদা। পি-ই-ই-প্— পার হয়ে গেল জুড়ির ফটক। রেল লাইনের উপর গাড়ি একটু লাফিয়ে উঠল। এ পথের সব কিছু এলসির নখদর্পণে। জামসেদপুর থেকে ধলভূমগড় আর ধলভূমগড় থেকে মানুষমুড়িয়া—এই রাস্তার প্রতিটি গাছপালাও যেন এই কয় বৎসরে এলসির আপন জন হয়ে গেছে। ঐ তো বাঁ হাতে দূরে হলুদপুকুরের বাজারের আলো দেখা যাচ্ছে। এলসি অবশ্য হলুদপুকুরে যাবে না। ওর গাড়ি হাতাতে এসে ডান হাতে মোড় নিল। জামসেদপুর এখান থেকে কুড়ি মাইল।

কৌশিকবাবু একেবারে চুপচাপ। গাড়ির দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি

ভদ্রলোক? হবে হয়তো। কিন্তু এলসির ঘুমোলে চলবে না। তাকে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে হবে। কিন্তু আর কত দিন? কত কাল আর তাকে নিঃসঙ্গ বর্তমান থেকে অতীতের মুখরতার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে? এই রকম ভাবে সঙ্গীর পাশে থেকেও নির্জনতার বৈচিত্র্যহীন আনন্দলেশহীন জীবনের বোঝাকে শেষ দিন পর্যন্ত বিষম ভারের মত বয়ে বেড়াতে হবে নাকি?

এলসি একটু চমকে উঠল। ভূড়িডির ফটকের কাছে ডান দিকে মোড় ফিরতেই তার কাঁধের উপর যেন কিসের স্পর্শ অনুভব করল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে দ্রুত অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখে ঘুমন্ত কৌশিকবাবুর শিথিল মাথা গাড়ি মোড় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তার কাঁধের উপর এসে পড়েছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য এলসি কেমন বিহ্বল হয়ে গেল। জাগিয়ে দেবে নাকি ভদ্রলোককে, না ধীরে ধীরে একটু সরে যাবে? আহা, অসুস্থ ভদ্রলোক ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওঁর চোখে মুখে পরম নির্ভরতার ছাপ। তার নিজের একটু অস্বস্তি হচ্ছে বলে কি ওঁকে বিরক্ত করবে? এলসি আর এক ঝলক কৌশিকবাবুকে দেখে নিল। স্পিডোমিটারের পাশের ক্ষুদ্রকায় বাল্বটার আলো তির্যক ভাবে তাঁর মুখের উপর পড়েছে। প্রশস্ত গৌরবর্ণ ললাটে বলিরেখার ঈষৎ আভাস। ভাল করে লক্ষ্য করলে কানের পাশে চুলে কিঞ্চিৎ শুভ্রতার নিদর্শন চোখে পড়ে। গালে কয়েক দিন ক্ষৌরকর্মের সঙ্গে সম্পর্কবিহীনতার চিহ্ন। দুই-একটি দাড়িতে শ্বেতবর্ণের ছোপ পড়েছে। চোখ এ কয় দিনে একটু বসে গেছে, কোটরের পাশে কালির আভাস। বহু সংগ্রাম ও ঝড় ঝাপ্টার সঙ্গে যুদ্ধ করার চিহ্ন তাঁর মুখমণ্ডলের সর্বত্র বিদ্যমান। ঘুমন্ত কৌশিকবাবুকে দেখে এলসির মায়া হয়। গাড়ির ঝাঁকুনির তালে তালে সমস্ত দেহ চেতনাবিহীনের মত দুলছে। আহা, কী অসহায় দেখাচ্ছে!

গাড়ি আবার দুলে উঠল। সুন্দরনগরের রেল ফটক। ঝাঁকুনির চোটে কৌশিকবাবুর তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। লজ্জিত ভাবে তাড়াতাড়ি এলসির কাছ থেকে দূরে সরে যেতে যেতে তিনি বললেন, "ক্ষমা করবেন, হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে এলসি জবাব দিল, "তাতে কি হয়েছে?"

কিন্তু মনে মনে কেন জানি তারও লজ্জা বোধ হচ্ছে। অবশ্য এলসির সঙ্কোচ কৌশিকবাবুর নজরে পড়ার কথা নয়।

দূরে বৈদ্যুতিক আলোর সমারোহ। পূর্ব থেকে পশ্চিমে কয়েক মাইল

এলাকা যেন উৎসবসজ্জা ধারণ করেছে। উত্তরের আকাশ অকস্মাৎ লোহিত বর্ণ ধারণ করল। সেই আলোকে টাটা কারখানার চিমনীর সারি আর কত শত ছোট বড় ধাতব গম্বুজ চোখের সামনে ভেসে উঠল।

বাকী পথটুকু আর কোন কথাবার্তা হল না।

বালিকা বিদ্যালয়ের সংলগ্ন স্বাহার কোয়ার্টার খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধা হল না। মোটরের হর্ন শুনে স্বাহাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু কৌশিকবাবুর পাশে এলসিকে দেখে স্বাহা কয়েক মুহূর্তের জন্য কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। এগিয়ে এসে কৌশিকবাবুকে অভ্যর্থনা করতে অথবা এলসিকে ধন্যবাদ জানাতেও যেন ভুলে গেল।

কৌশিক কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, "এই যে এসে গেলাম এবার তোমার আশ্রয়ে।" তার পর এলসির দিকে ফিরে বললেন, "আচ্ছা আসি তা হলে মিস মূর। অনেক— অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।"

এলসির গাড়ি এগিয়ে চলল।

গাড়ির অপস্রিয়মাণ রক্তচক্ষুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে স্বাহা এতক্ষণে প্রশ্ন করল, "কে—কে ও?" ওর কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিকতা কিন্তু কৌশিকের কাছে ধরা পড়ল না।

স্বাভাবিক ভাবেই কৌশিক বললেন, "উনি—উনি তো মিস মূর যিনি আমাকে সেই রাত্রে প্রথম দেখেন ও হাসপাতালে পৌঁছে দেন।" তার পর কণ্ঠে ঈষৎ কৌতুক মিশিয়ে বললেন, "একটা অদ্ভুত প্যারাডক্স স্বাহা। উনি জানেনই না যে উনি ওঁর ক্লাস এনিমিকে বাঁচিয়েছেন। চল, বলছি সে সব কথা।"

স্বাহা এক দৃষ্টিতে কৌশিককে লক্ষ্য করছিল। কৌশিকের আত্মভোলা ভাব দেখে সে বুঝি নিশ্চিন্ত হল। এতক্ষণ পর মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "চল, শুনছি তোমার কথা।"

॥ তের ॥

স্বাহার ঘরে বসে কথাবার্তা হচ্ছিল। কৌশিকবাবু খাটের উপর অর্ধোপবিষ্ট, একটি চাদর দিয়ে তাঁর কোমর থেকে দেহের নিম্নভাগ ঢাকা। দুটি চেয়ারে দু জন আগন্তুক উপবিষ্ট। এক জনের বয়স চল্লিশ বৎসরের মত, অপর জন যুবক। বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্বোধন করে কৌশিকবাবু প্রশ্ন করলেন, "বলুন কমরেড সিংহ, আপনার শ্রমিক মহলের খবর কি?"

একটু ভেবে নিয়ে কমরেড সিংহ জবাব দিলেন, "গোলমুরীর দিকে আমরা বেশ শক্তিশালী। টিনপ্লেট কারখানার প্রত্যেক বিভাগে আমাদের লোক আছে। ওখানকার ইউনিয়নেও আমাদের জন কয়েক কমরেড রয়েছেন। প্রয়োজন বুঝলেই তাঁরা কাজ শুরু করে দেবেন। কেবল্ কোম্পানিতে আমরা ইউনিয়ন পুরোপুরি দখল করে নিতাম; কিন্তু মুখার্জীবাবু মাঝখানে পড়ে একটু গোলমাল করে দিয়েছেন। ভদ্রলোক জন সাহেবের বিরোধী হলে কি হবে, একেবারে গোঁড়া কংগ্রেসী। ওয়ার প্রডাক্টসে গোলমাল চলছে। জন সাহেবের আই. এন. টি. ইউ. সি ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শ্রমিক মহলে অসন্তোষ বাড়ছে। কংগ্রেসের বি টিম সোসালিস্টগুলি যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে, তবে ও ইউনিয়ন আমাদের হাতে এসে যাবার ষোল আনা সম্ভাবনা আছে। টাটা লোকোমোটিভ কারখানাতেও আমরা এগোচ্ছি। নানা বিভাগে ক্লোজ্ড্ ডোর মিটিং চলছে। কিন্তু···"

কমরেড সিংহ একটু থেমে আবার বলা শুরু করলেন, "কিন্তু এখানকার সব চেয়ে বড় কারখানা টাটাতে আমরা সুবিধা করতে পারছি না। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে বারী সাহেবের মৃত্যুর পর সেই যে গোলমালটা পাকিয়ে এসেছিল, মেশিন শপ আর কোক ওভেন্সের কয়েকজন কমরেডের হেস্টি একশানের ফলে তা ঠিক সুপরিণত বিপ্লবের রূপ নেবার পূর্বেই ভেঙে পড়ল। সেই থেকে ওখানে আমরা ঠিক দানা বাঁধতে পারছি না।"

"ওখানে আপনাদের বর্তমান স্ট্রাটেজি কি?"

"পার্টি লাইনে চলার স্ট্রাটেজিই আমরা অনুসরণ করছি। সর্বত্রই কিছু না কিছু অসন্তুষ্ট লোক থাকে। প্রথমে তাদের সঙ্গে আমরা ইউনাইটেড ফ্রন্ট বা সংযুক্ত মোর্চা গড়ে তুলি। এর ফলে কংগ্রেসের দালাল আই. এন. টি. ইউ. সি'র মাতব্বরা আইসোলেটেড হয়ে যায়। তার পর ধীরে ধীরে মোর্চাকে নিজেদের দখলে আনা হয়।"

"চমৎকার আইডিয়া।" কৌশিকবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে থাকেন, "লেনিনের সেই মহান উক্তি মনে পড়ে তো? ক্ষমতা অধিকারের ব্যাপারে যদি মোট পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, তা হলে তিন জনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পঞ্চম জনকে চূর্ণ করে দাও। তার পর বাদ বাকী দুই জনের সঙ্গে মিতালী করে চতুর্থ জনকে অপসৃত কর। অতঃপর বাকী দুই জনের মধ্যে এক জনের সঙ্গে আঁতাত করে তৃতীয় জনকে ধ্বংস কর। এর পর বাকী থাকে কেবল এক জন প্রতিদ্বন্দ্বী আর তাকে সহজেই পরাভূত করা চলে।" উল্লসিত

কৌশিকবাবু আনন্দিত স্বরে কমরেড সিংহকে লক্ষ্য করে বলেন, "খেয়াল রাখবেন কমরেড সিংহ, এই বৈপ্লবিক স্ট্রাটেজির কারণেই আজ মহান স্টালিন সমস্ত কমিউনিস্ট জগতের অদ্বিতীয় পথপ্রদর্শক। তিনি প্রথমে ট্রটস্কিকে সরানর জন্য ঝিনোভিয়েভ ও ক্যামানোভের সঙ্গে হাত মেলালেন। তার পর ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে ওদের দুই জনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিল পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস ও তার দুই বৎসর পর তাদের কারাগারে পাঠান হল। অবশেষে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে মস্কোর সেই বিখ্যাত বিচারে বিশ্বাসঘাতকদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হল।"

বিনীত ভাবে কমরেড সিং বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। এ দেশে আমাদের হাতে কর্তৃত্ব এলে আমরাও এই ভাবে বিপ্লবের শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে দেব।"

ঈষৎ চাপা স্বরে কৌশিকবাবু বললেন, "ব্যস্ত হবেন না, সময়ে সে হবেই। সমস্ত পূর্ব ইউরোপের নূতন গণতন্ত্রগুলিতে এই একই পদ্ধতিতে আমাদের পার্টি ক্ষমতা দখলের পর শেষ শত্রুর নিধন করেছে। পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, আলবেনিয়া—সর্বত্র। এই অভ্রান্ত স্ট্রাটেজির ফলেই কেরল ও মাদ্রাজে আমাদের পার্টি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ঐ দুই প্রদেশে এখন যারা পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, এই পদ্ধতিতে তাঁদের ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে সোসালিস্ট পার্টি থেকে রিক্রুট করা হয়। কিন্তু এখনই তা বলে শেষ পরিণতির আভাস দিলে চলবে না। ভড়কে ওরা সব পালিয়ে যাবে তা হলে।" শেষের কথাগুলি উচ্চারণ করার সময় কৌশিকবাবুর কণ্ঠস্বর প্রায় ফিসফিসানির পর্যায়ে উপনীত হয়।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ঈষৎ সন্ত্রস্ত ভাবে একবার চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার পর অপেক্ষাকৃত নিম্ন কণ্ঠে কমরেড সিংহ বলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ কমরেড, আমার ভুল হয়ে গেছে। তা যাই হক, এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা মাস্ লেভেলেও কাজ শুরু করেছি। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়নে আমরা সদস্য সংগ্রহ করে চাঁদা ওঠাবার কাজও আরম্ভ করে দিয়েছি। তবু সত্যি কথা বলতে কি এ ব্যাপারে খুব সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথমতঃ ওদের ইউনিয়ন কোম্পানির স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বলে ওরা কারখানার ভিতরে চাঁদা তুলতে পারে। দ্বিতীয়ত ওদের ইউনিয়ন শ্রমিকদের দৈনন্দিন অভাব অভিযোগ নিয়ে কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা করে তার মীমাংসার চেষ্টা করে। তৃতীয় কথা······"

কমরেড সিংহকে বাধা দিয়ে কৌশিকবাবু বললেন, "ঐ লেভেলে আমরা

ওদের সঙ্গে পারব না। আর শ্রমিকদের নিত্যকার অভাব অভিযোগ দূর করার রিফর্মিস্ট কাজ জন সাহেব আর তার অনুচরেরা করুক। আমাদের রিভলিউশনারী ট্যাকটিক্স গ্রহণ করতে হবে। উপকার করে মন জয় করা আমাদের পথ নয়। আবার আপনাকে আমি লেনিনের এক ঐতিহাসিক উক্তির কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার ঐ মহান গুরুর মতে, 'যুদ্ধ হচ্ছে সমগ্র ব্যাপারটির একটি অংশ মাত্র, সম্পূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে রাজনীতি।' বুঝলেন তো—রাজনীতি।"

কথাটার উপর আর একবার জোর দিয়ে কৌশিকবাবু বলতে থাকেন, "ইঙ্গিতটা আমাকে আর বিশদ ভাবে বোঝাতে হবে না নিশ্চয়। সুতরাং কংগ্রেসী দালাল জন সাহেবদের বিরুদ্ধে আমাদের অসন্তোষ ও বিদ্বেষ ছড়াতে হবে এবং মূলতঃ তারই উপর ব্যাঙ্ক করে আমাদের সামনে এগিয়ে আসতে হবে। এখন এই দিক থেকে বিবেচনা করে বলুন যে কোন্ কোন্ ফ্রন্ট থেকে কংগ্রেসী ইউনিয়নকে আঘাত করা যায়?"

"এ বিষয়ে একটা কাজ আমরা করেছি। হুইসপার প্রপাগ্যাণ্ডা দিয়ে র‍্যাঙ্ক এণ্ড ফাইল অর্থাৎ সাধারণ শ্রমিকদের ভিতর এই খবর আমরা চালিয়ে দিয়েছি যে টাটা কোম্পানি আর বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীরাই বারী সাহেবকে খুন করিয়েছে।"

"শ্রমিকদের মধ্যে এর প্রভাব কেমন পড়ছে?"

"খুব ভাল কমরেড। প্রায় সবাই কথাটা বিশ্বাস করে নিয়েছে। লোকে ভুলেই গেছে যে বারী সাহেব বেঁচে থাকার সময় আমরাই তাঁর সব চেয়ে বড় বিরোধী ছিলাম।"

মৃদু হাস্য সহকারে কৌশিকবাবু বললেন, "এই হচ্ছে মব বা জনসাধারণের সাইকলজি। এ না হলে তো পৃথিবীর কোন দেশেই আমরা এগোতে পারতাম না। বিপ্লবীর পক্ষে জনসাধারণের এই বিস্মৃতিপরায়ণ স্বভাব-বৈশিষ্ট্য সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য। কিন্তু যা বলছিলাম—আর কোন্ কোন্ ফ্রন্ট থেকে এদের আঘাত করা যায় ভেবে দেখুন।"

কমরেড সিংহ মিনিট কয়েক মৌন রইলেন। তার পর বলতে লাগলেন, "দুটি কারণের জন্য জন সাহেব ও কংগ্রেসী ইউনিয়ন আপনা থেকে অপ্রিয় হচ্ছে। এর সঙ্গে আমরা যদি একটি তৃতীয় ফোর্স যোগ করে দিতে পারি তা হলে শীঘ্র ফললাভ হতে পারে।"

"কি কি কারণে ওদের বদ্‌নাম হচ্ছে?"

"প্রথমতঃ ওঁদের নেতৃবৃন্দ ও কর্মিমহলে বারী সাহেবের আমলের মত অনাড়ম্বরতা আর নেই। অবশ্য ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্টের পর থেকে গোটা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানেই এই রোগ ঢুকেছে। তবে শ্রমিক এলাকায় এটা চট করে চোখে পড়ে। শ্রমিক নেতার চোদ্দ পনের হাজার টাকা দামের মোটর গাড়ি কেনা শ্রমিকরা কিছুতেই বরদাস্ত করতে রাজী নয়। তার সঙ্গে পোশাক-পরিচ্ছদ আর অফিসের সাজসরঞ্জাম বাবদ খরচের বাহুল্য তো আছেই। দ্বিতীয়তঃ এরা ভীষণ প্রভুত্বলোলুপ হয়ে উঠেছে। ইউনিয়নের কোন পদে যিনি একবার নির্বাচিত হয়েছেন, তিনি রাজাদের মত প্রায় বংশানুক্রমেই ঐ পদ আঁকড়ে থাকতে চান।"

সপ্রশংস দৃষ্টিতে কৌশিকবাবু বললেন, "আপনার এনালিসিস অত্যন্ত যথার্থ।"

মৃদু হেসে প্রশংসাটুকু উপভোগ করে কমরেড সিংহ বলতে লাগলেন, "কিন্তু মানুষ কাউকে—তা তিনি যতই দক্ষ ও ন্যায়বিচারক হন না কেন, চির দিন একই পদে আসীন দেখতে চায় না। কিন্তু ঐ সব পদে এঁরা আর কাউকে আসতে দেবেন না। এই রোগের আরও একটা নিদর্শন হচ্ছে একটা পদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার পর আরও পদ চাওয়া। অর্থাৎ ভাল করে কাজ করলে যেখানে একটা ইউনিয়ন সামলানই দায়, সেখানে এক জন যদি বাহান্নটা ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, আর তার উপর এম. এল. এ, কংগ্রেসের নেতা এবং গোটা কুড়ি সরকারী ও বেসরকারী কমিটির প্রমুখ সদস্য হয়ে বসে, তা হলে যে তার পক্ষে কোন কাজের প্রতিই সুবিচার করা সম্ভব হয় না—এ কথা তো বুঝতেই পারছেন। এই সবের জন্য এদের দুর্নাম বাড়ছে এবং আমরা সুকৌশল প্রচারের দ্বারা এর টেম্পো বাড়াতে পারি। তৃতীয় যে ফোর্সের কথা বলছিলাম, তার সাহায্য নেওয়া যায় বটে ; তবে তার ফলে শ্রমিক আন্দোলন দুর্বল হয়ে যাবারও আশঙ্কা আছে।"

"আপনার প্ল্যানটা শোনা যাক।"

"সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রাদেশিকতা। মানে ঠিক আমরা প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করব না, এ ক্ষেত্রেও হুইসপার প্রপাগ্যাণ্ডার শরণ নেব। বাঙ্গালীদের বলা হবে যে ইউনিয়নটা বিহারীরা দখল করতে চাইছে। বিহারীদের কাছে প্রচার করা হবে যে জন সাহেবের বুদ্ধিদাতা মণিবাবু আর তারাবাবু বাঙলা দেশের এজেণ্ট। পাঞ্জাবীরা শুনবে যে ইউনিয়নের মাদ্রাজী সেক্রেটারী তার বহুত ভাই ব্রাদারকে চাকরি পাইয়ে দিল। উড়িয়াদের

বলা হবে যে ওড়িয়ার লোহা-পাথর না পেলে টাটা কোম্পানি অচল ; কিন্তু কোম্পানিতে উড়িয়াদের দিকে কেউ ফিরে তাকায় না। তেলেগুরা জানবে······ ”

“চমৎকার আইডিয়া কমরেড, এক্ষুনি লেগে পড়ুন। হুইসপার প্রপাগ্যাণ্ডাতে জামসেদপুর ছেয়ে যাক।” কৌশিকবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

কমরেড সিংহকে কিন্তু খুব উদ্দীপ্ত মনে হল না। দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন, “কিন্তু হয়তো এর পরিণাম সামলান কঠিন হবে কমরেড। শ্রমিক মহলে একবার পারস্পরিক অবিশ্বাস দানা বাঁধলে শ্রমিক-সংগঠনের মূলই শিথিল হয়ে যাবে। বিপ্লবের পক্ষে এর ফল শেষ পর্যন্ত কি শুভ হবে ?”

“কমরেড সিংহ, এখনও আপনি বুর্জোয়া মরালিটি আর স্ক্রুপলের দুষ্ট প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি বোধ হয়। লেনিনের সেই অমর উক্তি কি আপনি ভুলে গেলেন যেখানে তিনি কমিউনিস্টদের উপদেশ দিচ্ছেন, ‘নৈতিকতার কোন শাশ্বত বিধানে আমাদের আস্থা নেই এবং নৈতিকতার এই প্রবঞ্চনার মুখোশ আমরা খুলে দেব। কমিউনিস্ট নৈতিকতা ও সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা ও তাকে শক্তিশালী করার সংগ্রাম অভিন্ন বস্তু।’ শ্রমিক-আন্দোলন ও শ্রমিক-সংগঠন কে করতে চায় ? আমরা চাই ক্ষমতা অর্থাৎ পাওয়ার, যার দ্বারা সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়। সেই পাওয়ার বা ক্ষমতা দখলের পথে শ্রমিক-সংগঠন একটা সাধন বা মিনস ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের ক্ষমতাপ্রাপ্তির অর্থই যখন শেষ অবধি শ্রমিক-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, তখন এ রকম একটু পন্থাগত ত্রুটিবিচ্যুতি ধর্তব্যের মধ্যে নয়।”

লজ্জিত কমরেড সিংহ তাড়াতাড়ি বললেন, “না, না—আমি ঠিক তা বলি নি। আমারও এতে মত আছে। তবে ব্যাপারটা হচ্ছে কি······”

কৌশিকবাবু এবার যুবকটিকে সম্বোধন করে বললেন, “এবার আপনার সাহিত্য ও সংস্কৃতি ফ্রন্টের খবর বলুন কমরেড সুকুমার।”

যুবকটি অর্থাৎ সুকুমার দত্ত বলল, “আমাকে আবার আপনি বলছেন কেন কৌশিকদা ? আমি আপনার কত ছোট।”

দুই হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে স্বাহা ঘরে ঢুকছিল। সে টিপ্পনি কাটল, “সুকুমার আবার কবে থেকে আপনি হলে ?”

“বলুন না স্বাহাদি, আপনি বলুন। আমাকে আপনি বলার মানে হয় ?”

কৌশিকবাবু বললেন, "আচ্ছা তুমিই বলা যাবে না হয়।" তার পর স্বাহাকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, "নাও, বোস এবার এখানে। কাজের কথা শোন। ঘরের কাজ তো তোমার শেষ হবে না দেখছি।"

"দাঁড়াও সবাইকে চা দিয়ে নিই আগে। চা না হলে শুধু মুখে পলিটিক্স জমে নাকি ?"

চায়ের পেয়ালায় তৃপ্তিভরে চুমুক দিয়ে কৌশিকবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তা হলে এবার সাহিত্য সংস্কৃতির রিপোর্ট শোনা যাক।"

"সাহিত্য ফ্রণ্টে আমাদের কাজ ভালই চলছে। বাঙলা, হিন্দী, উড়িয়া, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় যাঁরা একটু লিখে থাকেন বা ঐ সব ভাষায় এখানে যাঁরা সাহিত্যপ্রেমী বলে আখ্যাত, তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। সম্প্রতি অন্ধ্র ক্লাবে আমরা একটি মুসাইরা বা কবি-সম্মেলন আহ্বান করেছিলাম এবং হিন্দী ও উর্দু ভাষার যেসব কবি পার্টি লাইনে লেখেন, বেছে বেছে তাঁদের আমন্ত্রণ করে উপস্থিত জনসাধারণকে তাঁদের রচিত কবিতা শোনান হয়েছিল। এদিকে আমরা সুকৌশলে প্রচার করেছিলাম যে ঐ সব কবিরা তাঁদের নিজ নিজ ভাষার শ্রেষ্ঠ জীবিত কবি। সুতরাং তাঁদের কবিতা শুনে সাহিত্য-রসিক মহলে এই ধারণা জন্মেছে যে প্রত্যেক ভারতীয় ভাষার সেরা লেখকরাই এখন পার্টি লাইনে সাহিত্য রচনা করছেন এবং এই রকম করাটাই প্রগতিশীলতার লক্ষণ। এর আর একটা সুফল হয়েছে এই যে এখানকার যে সব নবীন সাহিত্য-যশাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক স্থাপন করেছি, তাঁরাও ঐ সব কবি ও লেখকদের লাইনে লেখাই আদর্শ বলে ধরে নিয়েছেন। অর্থাৎ সাহিত্য-স্রষ্টা ও তার সমঝদার— এই দুই শ্রেণীর ভিতরই আমরা পার্টি লাইনে চলার ইচ্ছা সৃষ্টি করে দিয়েছি।"

সুকুমারকে উৎসাহ দিয়ে কৌশিকবাবু বললেন, "বেশ বেশ, খুব ভাল। তুমি আমাদের সাহিত্য ফ্রণ্টের স্ট্রাটেজিটা ঠিক ধরেছ দেখছি।"

তরুণ কমরেড প্রশংসাটা উপভোগ করলেও ঈষৎ ক্ষুণ্ন স্বরে বলল, "কিন্তু এখানকার বাঙালী সাহিত্যপ্রেমীদের ষোল আনা বাগে আনা যাচ্ছে না। তাঁদের মাথা হচ্ছে এক বুর্জোয়া ডাক্তার আর এক খেপাটে সাহিত্য-পাগল। একজন সভাপতি ও অপর জন সম্পাদক। আর্ট ফর আর্টস সেক—মোটামুটি এই তাঁদের বক্তব্য। সাহিত্যের যে একটা সামাজিক উদ্দেশ্য থাকবে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কনটেক্সটে যে তার রূপায়ণ হবে, এটা কোন মতেই তাঁদের বোঝান যাচ্ছে না।

"বুর্জোয়া ও পাতি বুর্জোয়াদের শ্রেণী-স্বার্থই যে বিপ্লবের পরিপন্থী। ও দলে আর কাউকে পাচ্ছ না?"

"আর আছেন দুই উকিল। কিন্তু তাঁরা আরও বিপজ্জনক। ওঁরা হলেন প্রতিবিপ্লবী রায়ের চেলা।"

মুখ বাঁকিয়ে কৌশিকবাবু উচ্চারণ করলেন, "লেফ্‌ট ডিভিয়নিস্ট প্রচ্ছন্ন ট্রটস্কিপন্থী এম. এন. রায়ের লোক তা হলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবে তো ওদের সঙ্গে কোন বোঝাপড়া হওয়া সম্ভবই নয়। ওরা সব পিপলস এনিমি নাম্বার ওয়ান। বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করাই ছিল রায়ের চিরকালীন পেশা। তা ওদের আইসোলেট করার চেষ্টা করছ না কেন?"

"চেষ্টা করেছি; কিন্তু খুব সুবিধা করে উঠতে পারছি না। ডাক্তারের সঙ্গে ওঁদের গলায় গলায় ভাব। আমি তাই আমাদের প্যারালাল সাহিত্য-সভা আরম্ভ করে দিয়েছি। গোলমুরী, সাকচী ও কদমা অঞ্চলে মাসে দুটো একটা সাহিত্য আলোচনার বৈঠক বসছে এবং তার মারফত নূতন কমরেড সাহিত্যিক রিক্রুট করার কাজও এগোচ্ছে।"

"ঠিক আছে। এর সঙ্গে সঙ্গে ইনফিল্ট্রেট করতে থাক।"

"ইনফিল্ট্রেট?" একটু বিস্মিত কণ্ঠেই সুকুমার প্রশ্ন করে।

কৌশিকবাবু বুঝিয়ে বলেন, "হ্যাঁ, মানে তোমাদের ঐ বুর্জোয়া ডাক্তারের সাহিত্য পরিষদ না কি যেন, ওটা দখল করার চেষ্টা কর। শুনেছি বাঙালী মহলে ঐ প্রতিষ্ঠানটির প্রেস্টিজ আছে। তা সেটাকেও তো কাজে লাগাতে হবে। সুতরাং ধীরে ধীরে নূতন কমরেডদের ওর সদস্য করে দাও। ক্রমশঃ তাদের হাতে এক-আধটা "কী পোজিশান" চলে আসুক। এদিকে রায়ের চেলা ঐ দুই প্রতিবিপ্লবীর বিরুদ্ধে হুইসপার প্রপাগ্যাণ্ডা চলতে থাকুক। যা বুঝছি ঐ সাহিত্য-পাগল খেপাটে স্বভাবের সম্পাদক সম্বন্ধে চিন্তার কারণ নেই। যে কোন দিন ওকে সরিয়ে দিয়ে তোমরাই ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হয়ে পড়বে।" স্বর পালটিয়ে তিনি তার পর বলেন, "এবার এখানকার সংস্কৃতি ফ্রণ্টের খবর শোনাও।"

সুকুমার একটু বিমর্ষ ভাবেই সংস্কৃতি ফ্রণ্টের খবর শোনান শুরু করল। বলল যে ঐ ফ্রণ্টে ওরা খুব সুবিধা করে উঠতে পারছে না। অভিনয়-কলা এবং নৃত্য গীত ও বাদ্যের ক্ষেত্রে ওরা কয়েক জন সমর্থক পেলেও একটা স্বতন্ত্র

দল হিসাবে দানা বাঁধার মত আয়োজন এখনও হয় নি। সাকচীর আর্টিস্টরা সব সাহিত্য পরিষদের ডাক্তারের অনুগত। বিষ্ণুপুরে ওরা কিছু শুরু করার পূর্বেই কংগ্রেসীরা একটা দল তৈরী করে ফেলেছে। নবীন ডাক্তার দাশগুপ্ত ঐ দলের মুরুব্বী। ডাক্তার একাই এক শ, তার উপর তাঁর স্ত্রীও গান-বাজনায় ওস্তাদ। সুতরাং ও পাড়ার ছেলেমেয়েগুলি ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রীর প্রভাবে পড়ে ঐ দলে চলে গেছে। এর উপর ওদের রসদ যোগাচ্ছে ডাক্তারের শ্যালক অশোকবাবু ও ইউনিয়নের মণিবাবুর ছোকরা চ্যালা শৈলেশ।

শৈলেশের প্রসঙ্গ উঠতেই স্বাহা বলল, "ঐ ছাত্র সংসদের শৈলেশ তো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, স্বাহাদি। ডাঃ দাশগুপ্তের সঙ্গে মিলে ওরা একটা দল গড়ে নিয়েছে। ডাঃ দাশগুপ্ত আবার বুর্জোয়া কবি রবীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্ত। ওঁকে যে আমাদের দলে টানতে পারব, তার কোন ভরসা নেই।"

কৌশিকবাবু বললেন, "ঐ রাবীন্দ্রিকগুলোকে বাদ দাও। যত সব বুর্জোয়া মিস্টিক ওরা। এ যুগের কবি হচ্ছে আমাদের সুকান্ত ভট্টাচার্য। কিন্তু যাক্ সে কথা। এখন সংস্কৃতি ফ্রন্টের অবস্থা উন্নত করার জন্য কি করছ বল ?"

"আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। শীঘ্র একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করব মিলনীতে। এই সুযোগে নূতন নূতন আর্টিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগও হবে। তবে ঐ সময় আমাদের গণনাট্য সঙ্ঘের সেণ্ট্রাল ইউনিট থেকে জন কয়েক আর্টিস্ট এলে খুব ভাল হয়। তা হলে ফাংশানের মর্যাদা বাড়ে এবং আমরাও কিছু মান্যগণ্য দর্শকের কাছে পার্টি লাইনটা উপস্থাপিত করার সুযোগ পাই।"

ঠক্ ঠক্ ঠক্, ঠক্ ঠক্ ঠক্।

বাইরের দরজায় কে আঘাত করছে।

স্বাহা প্রশ্ন করল, "কে ?"

"আমি দিদি—কবিতা।"

"ও কবিতা বুঝি—এস এস," স্বাহা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

কিন্তু কবিতা ঘরের ভিতর এক পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল। এতগুলি অপরিচিত লোককে দেখে সে আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

স্বাহা ওর অবস্থা বুঝতে পেরে ওর হাত ধরে টানতে টানতে এনে নিজের চেয়ারটিতে ওকে বসিয়ে দিল। তার পর কৌশিকবাবুর খাটের এক কোণে বসতে বসতে তাঁকে উদ্দেশ করে বলল, "কবিতা আমাদের ছাত্রী ফ্রন্টের এক

জন প্রধান কর্মী। আজ মীনাক্ষী ইলা ওরাও আসবে। ছেলেদের মধ্যে অনন্তকেও আসার খবর পাঠিয়েছি। এদের আজ তুমি ছাত্র-ছাত্রী সংগঠন সম্বন্ধে কিছু বলবে, যেমন বলতে আমাদের।” কথা বলতে বলতে কৌশিকবাবুর দিকে তাকিয়ে স্বাহা ঈষৎ রহস্যমাখা হাসি হাসল। কিন্তু কৌশিকবাবু মাথা নীচু করে স্বাহার বক্তব্য শুনে যাচ্ছিলেন বলে স্বাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন না। স্বাহা তাই পূর্বের বক্তব্যের জের টেনে বলতে লাগল, “ভাল কথা, আমাদের কবিতার বাবা কে জান তো? এখানকার কংগ্রেসী ইউনিয়নের এক জন মাতব্বর ব্যক্তি।” কথার শেষে স্বাহা কবিতার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

স্বপ্নোত্থিতের মত কৌশিকবাবু বললেন, “ও—তাই নাকি? প্রতিক্রিয়ার গর্ভ থেকেই বিপ্লবের জন্ম হয়। কথাটা আমার নয়, আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা গুরুর বাণী।”

সকলের দৃষ্টির লক্ষ্য হওয়ায় কবিতা লজ্জায় আরও যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। সে ঘাড় নীচু করে রইল।

কমরেড সিংহ বললেন, “আমি উঠি এবার। কমরেড কৃত্যানন্দ শর্মার আসার কথা আছে আজ। টিকটিকিদের ফাঁকি দেবার জন্য পুরুলিয়া থেকে বাসে আসবেন। সন্ধ্যার মধ্যেই পৌঁছে যাবার কথা।”

কৌশিকবাবু বললেন, “তাই নাকি? ওঁর সময় হলে একবার এদিকে নিয়ে আসবেন। অনেক দিন দেখাও হয় নি, আর তা ছাড়া উত্তর বিহারের খবরটাও তা হলে পাওয়া যায়।”

কমরেড সিংহ বললেন, “আচ্ছা।” তার পর কৌশিকবাবু ও স্বাহাকে নমস্কার করে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

সুকুমারকে লক্ষ্য করে স্বাহা বলল, “তুমিও উঠছ নাকি? তাড়া না থাকলে আর কিছুক্ষণ থাক। আমাদের ছাত্র ফ্রণ্টের কার্যকলাপের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা উচিত। আর এদের সকলের সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত পরিচয় থাকলে কাজের সুবিধা হবে।”

সুকুমার মাথা নেড়ে বলল, “ঠিকই বলেছেন।”

স্বাহা উঠে দরজায় খিল দিয়ে এসে আবার নিজের জায়গায় বসল। তার পর সে তার বক্তব্য শুরু করল, “যতক্ষণ মীনাক্ষীরা না আসছে আমি ততক্ষণে তোমাকে এখানকার ব্যাক গ্রাউণ্ডটা জানিয়ে দিই। ক'মাস পূর্বে এখানে যখন প্রথম পৌঁছাই তখন আমাদের ছাত্র ফ্রণ্টের অস্তিত্বই ছিল না

বলতে পার। অন্য অনেক জায়গার মত পার্টির অফিসে ছাত্র ফেডারেশনের দপ্তর আছে বলে প্রচার করা হলেও তার বাস্তব কোন চিহ্ন ছিল না। কারণ ছাত্রদের সঙ্গে এখানকার কমরেডদের যোগাযোগই ছিল না। ছেলেদের ভিতর ইউনিয়নের শৈলেশ ছাত্র সংসদ গড়ে ওদের ভিতর ঢুকছিল আর মেয়েদের ভিতর বসুধাদি তাঁর ছাত্রী সংসদ চালাচ্ছিলেন।"

মাঝপথে বাধা দিয়ে কৌশিকবাবু প্রশ্ন করলেন, "বসুধাদিটি আবার কে ?"

স্বাহা একটু হেসে জবাব দিল, "ও হ্যাঁ, তুমি জানবে কেমন করে ? উনি আমাদের স্কুলের বাংলার টীচার। বসুধাদি পাক্কা খদ্দরধারী এবং তার উপর শৈলেশের সঙ্গে তাঁর খুবই দহরম মহরম। ফলে প্রথমটায় আমাকে মেয়েদের মধ্যে ঢুকতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। উঁচু ক্লাসের শোভনা প্রভাতী ইরা হাসি ইত্যাদি তো সব বসুধাদি বলতে অজ্ঞান। আমি তাই ক্লাস এইট নাইনের মেয়েদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করলাম এবং এরই ফলে আজ এই কয় মাসের ভিতর এই কবিতা এবং মীনাক্ষী ইলা ইত্যাদি অন্ততঃ গুটি দশেক মেয়ে আমাদের দলে এসেছে। ছেলেদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কে. এম. পি. এম-এর ম্যাট্রিকের ছাত্র অনন্তর মারফত কাজ করতে হয়। অবশ্য অনন্তর বাবা সুজয়বাবুকে আমাদের দলেরই লোক বলা চলে। উনি টাটা কোম্পানির এক জন উঁচু দরের কর্মচারী। আর আনন্দের কথা উনি পার্টির জন্য সব কিছুই করতে প্রস্তুত। অনন্তর মারফত লাক্ষা সিং ইতাদি আরও কয়েকটি ছেলে এসেছে। কিন্তু তা হলেও কে. এম. পি. এম-এর বাঙালী ছেলেদের ভিতর এবং আর. ডি. টাটা স্কুলের অবাঙালী ছাত্রদের মধ্যে ছাত্র সংসদেরই প্রভাব বেশী।

ঠক্ ঠক্ ঠক্, ঠক্ ঠক্ ঠক্। নির্দিষ্ট মাত্রার নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দ।

"ঐ ওরা এল বুঝি," স্বাহা দরজা খুলে দিল।

মীনাক্ষী ও অনন্ত ঘরের ভিতর প্রবেশ করল।

অনন্ত বলল, "আমি নর্দার্ন টাউন থেকে বার্মামাইনসে গিয়ে মীনাক্ষীকে নিয়ে বাসে এলাম। লাক্ষা সিং-এর সঙ্গেও দেখা হল। ও সাইকেলে আসছে।"

একটু পরেই ইলা এবং তার পিছন পিছনই লাক্ষা সিং এসে গেল।

কৌশিকবাবুকে সম্বোধন করে স্বাহা বলল, "নাও, এই বার তুমি তোমার বক্তব্য শুরু কর।"

জন প্রধান কর্মী। আজ মীনাক্ষী ইলা ওরাও আসবে। ছেলেদের মধ্যে অনন্তকেও আসার খবর পাঠিয়েছি। এদের আজ তুমি ছাত্র-ছাত্রী সংগঠন সম্বন্ধে কিছু বলবে, যেমন বলতে আমাদের।" কথা বলতে বলতে কৌশিকবাবুর দিকে তাকিয়ে স্বাহা ঈষৎ রহস্যমাখা হাসি হাসল। কিন্তু কৌশিকবাবু মাথা নীচু করে স্বাহার বক্তব্য শুনে যাচ্ছিলেন বলে স্বাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন না। স্বাহা তাই পূর্বের বক্তব্যের জের টেনে বলতে লাগল, "ভাল কথা, আমাদের কবিতার বাবা কে জান তো? এখানকার কংগ্রেসী ইউনিয়নের এক জন মাতব্বর ব্যক্তি।" কথার শেষে স্বাহা কবিতার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

স্বপ্নোত্থিতের মত কৌশিকবাবু বললেন, "ও—তাই নাকি? প্রতিক্রিয়ার গর্ভ থেকেই বিপ্লবের জন্ম হয়। কথাটা আমার নয়, আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা গুরুর বাণী।"

সকলের দৃষ্টির লক্ষ্য হওয়ায় কবিতা লজ্জায় আরও যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। সে ঘাড় নীচু করে রইল।

কমরেড সিংহ বললেন, "আমি উঠি এবার। কমরেড কৃত্যানন্দ শর্মার আসার কথা আছে আজ। টিকটিকিদের ফাঁকি দেবার জন্য পুরুলিয়া থেকে বাসে আসবেন। সন্ধ্যার মধ্যেই পৌঁছে যাবার কথা।"

কৌশিকবাবু বললেন, "তাই নাকি? ওঁর সময় হলে একবার এদিকে নিয়ে আসবেন। অনেক দিন দেখাও হয় নি, আর তা ছাড়া উত্তর বিহারের খবরটাও তা হলে পাওয়া যায়।"

কমরেড সিংহ বললেন, "আচ্ছা।" তার পর কৌশিকবাবু ও স্বাহাকে নমস্কার করে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

সুকুমারকে লক্ষ্য করে স্বাহা বলল, "তুমিও উঠছ নাকি? তাড়া না থাকলে আর কিছুক্ষণ থাক। আমাদের ছাত্র ফ্রণ্টের কার্যকলাপের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা উচিত। আর এদের সকলের সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত পরিচয় থাকলে কাজের সুবিধা হবে।"

সুকুমার মাথা নেড়ে বলল, "ঠিকই বলেছেন।"

স্বাহা উঠে দরজায় খিল দিয়ে এসে আবার নিজের জায়গায় বসল। তার পর সে তার বক্তব্য শুরু করল, "যতক্ষণ মীনাক্ষীরা না আসছে আমি ততক্ষণে তোমাকে এখানকার ব্যাক গ্রাউণ্ডটা জানিয়ে দিই। ক'মাস পূর্বে এখানে যখন প্রথম পৌঁছাই তখন আমাদের ছাত্র ফ্রণ্টের অস্তিত্বই ছিল না

বলতে পার। অন্য অনেক জায়গার মত পার্টির অফিসে ছাত্র ফেডারেশনের দপ্তর আছে বলে প্রচার করা হলেও তার বাস্তব কোন চিহ্ন ছিল না। কারণ ছাত্রদের সঙ্গে এখানকার কমরেডদের যোগাযোগই ছিল না। ছেলেদের ভিতর ইউনিয়নের শৈলেশ ছাত্র সংসদ গড়ে ওদের ভিতর ঢুকছিল আর মেয়েদের ভিতর বসুধাদি তাঁর ছাত্রী সংসদ চালাচ্ছিলেন।”

মাঝপথে বাধা দিয়ে কৌশিকবাবু প্রশ্ন করলেন, “বসুধাদিটি আবার কে?”

স্বাহা একটু হেসে জবাব দিল, “ও হ্যাঁ, তুমি জানবে কেমন করে? উনি আমাদের স্কুলের বাংলার টীচার। বসুধাদি পাকা খদ্দরধারী এবং তার উপর শৈলেশের সঙ্গে তাঁর খুবই দহরম মহরম। ফলে প্রথমটায় আমাকে মেয়েদের মধ্যে ঢুকতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। উঁচু ক্লাসের শোভনা প্রভাতী ইরা হাসি ইত্যাদি তো সব বসুধাদি বলতে অজ্ঞান। আমি তাই ক্লাস এইট নাইনের মেয়েদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করলাম এবং এরই ফলে আজ এই কয় মাসের ভিতর এই কবিতা এবং মীনাক্ষী ইলা ইত্যাদি অন্ততঃ গুটি দশেক মেয়ে আমাদের দলে এসেছে। ছেলেদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কে. এম. পি. এম-এর ম্যাট্রিকের ছাত্র অনন্তর মারফত কাজ করতে হয়। অবশ্য অনন্তর বাবা সুজয়বাবুকে আমাদের দলেরই লোক বলা চলে। উনি টাটা কোম্পানির এক জন উঁচু দরের কর্মচারী। আর আনন্দের কথা উনি পার্টির জন্য সব কিছুই করতে প্রস্তুত। অনন্তর মারফত লাক্ষা সিং ইতাদি আরও কয়েকটি ছেলে এসেছে। কিন্তু তা হলেও কে. এম. পি. এম-এর বাঙালী ছেলেদের ভিতর এবং আর. ডি. টাটা স্কুলের অবাঙালী ছাত্রদের মধ্যে ছাত্র সংসদেরই প্রভাব বেশী।

ঠক্ ঠক্ ঠক্, ঠক্ ঠক্ ঠক্। নির্দিষ্ট মাত্রার নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দ।

“ঐ ওরা এল বুঝি,” স্বাহা দরজা খুলে দিল।

মীনাক্ষী ও অনন্ত ঘরের ভিতর প্রবেশ করল।

অনন্ত বলল, “আমি নর্দার্ন টাউন থেকে বার্মামাইনসে গিয়ে মীনাক্ষীকে নিয়ে বাসে এলাম। লাক্ষা সিং-এর সঙ্গেও দেখা হল। ও সাইকেলে আসছে।”

একটু পরেই ইলা এবং তার পিছন পিছনই লাক্ষা সিং এসে গেল।

কৌশিকবাবুকে সম্বোধন করে স্বাহা বলল, “নাও, এই বার তুমি তোমার বক্তব্য শুরু কর।”

॥ চৌদ্দ ॥

মীনাক্ষী যখন কে. এম. পি. এম. হাই স্কুলের সামনে দাঁড়াল, তখন সবে দুটি একটি করে ছাত্ররা বেরোতে শুরু করেছে। স্কুলে ছুটির ঘণ্টা পড়ে গেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরাট স্কুল বাড়িটির কামরাগুলিতে সারি সারি ডেস্ক ও চেয়ার টেবিল ছাড়া জীবিত কোন প্রাণীর দেখা পাওয়া দুর্ঘট হবে। মীনাক্ষী রাস্তার ও পাশের ফুটপাথের উপর থেকে স্কুলের গেটের দিকে তাকিয়ে ছিল। ছুটির আনন্দে কোলাহল করতে করতে ছেলের দল বাঁধ-ভাঙ্গা জলস্রোতের মত গেট দিয়ে বেরোচ্ছে। কেউ খুব হাত মুখ নেড়ে সঙ্গীর সঙ্গে গল্প করতে করতে আসছে। কেউ বা স্কুলের ভিতর থেকেই সাইকেলে চড়ে ভিড়ের মধ্যে ঘন্টি বাজাতে বাজাতে এসে রাস্তায় পড়ছে। ফটকের সামনে ছেলেদের মেলা। ঐ-ঐ-ঐতো সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে অনন্ত বেরোল। সৌভাগ্য যে ও একা। নয় তো ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করা মুশকিল হত। অনন্ত নর্দার্ন টাউনে যাবে, ঐখানেই ওদের বাসা। বাঁ দিকে মোড় ফেরার পূর্বে একবার সম্মুখের দিকে তাকাতেই সে রাস্তার অপর ফুটপাথের উপর অপেক্ষারতা মীনাক্ষীকে দেখতে পেল। অনন্ত এ দিকে তাকিয়েছে দেখে মীনাক্ষী চলা শুরু করল। এ-ই যথেষ্ট ইশারা হওয়া সত্ত্বেও চলতে চলতে একবার সে আড়চোখে অনন্তকে দেখে নিল। রাস্তার ঐ পাশ দিয়ে সেও ধীরে ধীরে সাইকেলে করে এগোচ্ছে।

মানুষজনের ভিড় এড়ানর জন্য রীগ্যাল সিনেমা বাঁ হাতে রেখে মীনাক্ষী বিষ্টুপুর থানার সামনে দিয়ে ডান দিকে মোড় ফিরল। জেনারেল অফিসের দিকে কয়েক পা এগোতে না এগোতেই মীনাক্ষী তার পিছনের দিকে সাইকেলের মৃদু ঘন্টি শুনতে পেল। মীনাক্ষী নিজের গতিবেগ কিছুমাত্র সম্বরণ করল না বা পাশ ফিরে তাকাল না। স্কুলের ফেরত শান্ত ছাত্রীটির মত বই খাতার গোছা বুকের সঙ্গে লাগিয়ে আপন মনে পথ চলতে লাগল। কেবল তার অধর-প্রান্তে একটু দুষ্টু হাসি খেলা করছিল। সাইকেলে প্যাডাল করার শব্দও কিন্তু থামল না। মীনাক্ষীর পিছনে পিছনে মাঝে মাঝে ঘন্টি বাজাতে বাজাতে তা এগোতে থাকল।

জেনারেল অফিস ও টাটা কারখানার প্রধান ফটকের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে মীনাক্ষী চলছিল। কয়েক গজ এগিয়ে ডান দিকে ঘুরে সাকচী যাবার ঢালু রাস্তায় সে পড়ল। এ রাস্তাটি নির্জন। আর ঘণ্টা খানেক পরে জেনারেল অফিসের ছুটি হলে অবশ্য এই নির্জনতা থাকবে না। এখানকার মৌন

পথ সে সময় গৃহযাত্রী কেরানীদের কলগুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠবে। ঢালু রাস্তা দিয়ে মীনাক্ষী তর্ তর্ করে এগিয়ে চলল।

অনন্তও নির্জন পথের অপেক্ষায় ছিল। এবার বিনা ভূমিকায় ওর পাশে এসে ব্রেক চিপে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল এবং এ দিক ও দিকে তাকিয়ে নিয়ে ওর বেণীতে একটি মৃদু টান মেরে বলল, "ও, কী লক্ষ্মী মেয়েরে! এতক্ষণ ধরে ঘন্টি বাজাচ্ছি অথচ একবার তাকাবারই ফুরসত হল না।"

কৃত্রিম কোপে মীনাক্ষী তাকে ভৎর্সনা করে উঠল, "আবার এই সব দুষ্টুমি হচ্ছে। কেউ দেখে ফেলে যদি?"

"আচ্ছা হয়েছে। না দেখতে পেলে তো দোষ নেই।"

মীনাক্ষী অনন্তর দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলল। অনন্তও তার হাসিতে যোগ দিল। পথে চলতে চলতেই মীনাক্ষী আবার বলল, "নাও থাম এবার। কাজের কথা আছে। কৌশিকদার একটা চিঠি স্বাহাদি আমাকে দিয়ে বললেন যে তুমি যেন এখনই এটি কমরেড সিংহকে দিয়ে এস।"

অনন্ত চিঠিটিকে নিয়ে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, "আচ্ছা, কৌশিকদা এখন বেশ ভাল হয়ে উঠেছেন তো?"

মীণাক্ষী জবাব দিল, "হ্যাঁ, আজই তো দেখে এলাম। এবার বেশ চলা ফেরা করছেন। পরশু উনি চলে যাবেন শুনলাম।"

"ও, তাই নাকি? তা হলে তো কাল একবার দেখা করতে হয়। ওঁর কাছ থেকে এই কয়েক দিনের মধ্যে কত কি যে শিখলাম।"

"সত্যি, এখন কাজ করার নূতন প্রেরণা পাচ্ছি।"

"তোমাদের ছাত্রী মহলে বই-পত্র কেমন চলছে?"

"বেশ ভাল। রোজ প্রায় পাঁচ সাত টাকার বই বিক্রি হয়। আর এত সস্তা দামের বই পাঁচ সাত টাকায় বিক্রি হবার মানে কত জনের কাছে আমাদের বই পৌঁছাচ্ছে তা তো বুঝতেই পারছ।"

অনন্ত একটু হতাশ কণ্ঠে জবাব দিল, "আমরা কিন্তু এ ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা করতে পারছি না। ছাত্র সংসদের ললিত ভবানী ও উৎপল ইত্যাদিরা ভীষণ উল্টো প্রচার করছে। ওরা বলে যে চার-ছ আনায় চার-পাঁচ শ পৃষ্ঠার বই বিক্রি করা যায় নাকি? বই বাঁধাবার খরচই তো ওর চেয়ে বেশী। তাই ওরা অন্য ছেলেদের কাছে প্রচার করে যে বইগুলি আমরা বিনা পয়সায় পাই বিলি করার জন্য। ফলে ছেলেরা সব এমনিই বই চায়। বরুণটা আরও শয়তান। কারও হাতে 'সোবিয়েৎ দেশ' দেখলেই ভারতবর্ষের

ভূগোলের বিদঘুটে সব প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞাসা করবে। আর তার জবাব না দিতে পারলেই ঠাট্টা করে বলবে যে নিজের দেশকে জানার চেষ্টা নেই, সোভিয়েত দেশ নিয়ে মাতামাতি! কমল আর উজ্জ্বলরা হল্লা করে বেড়ায় যে আমাদের ঐ সব মোটা মোটা ইংরাজী বই কেউ বুঝতে পারে না। কেবল ফ্যাশানের জন্য হাতে নিয়ে ঘোরে।"

"আমাদের মেয়েরাও বোঝে নাকি? আমি নিজেও ঐ সব বইএর দুই একখানার কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি কিচ্ছু বুঝতে পারি নি। কিন্তু স্বাহাদি বলেছেন যে পার্টির খরচের অনেকটা ঐ সব বই বিক্রির টাকা থেকে আসে। তাই পার্টির জন্য বই বিক্রি করতেই হয়। আর যে মেয়ে বই কেনে তাকে আমরা কমরেড বলে ডাকতে আরম্ভ করি। বলি সে প্রগতিশীল বিপ্লবী। তাই প্রগতিশীল ও বিপ্লবী কমরেড হবার জন্য মেয়েরা বুঝুক আর নাই বুঝুক জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে বই কেনে। তা ছাড়া ঐ রকম একটা মোটা ঝকৃঝকে ইংরাজী বই হাতে নাড়া-চাড়া করলে বেশ একটা গৌরব বোধ হয়। এই জন্য এবং দামও জলের মত সস্তা বলে অনেকেই দুই-একখানা করে কেনে। তোমরাও এই ভাবে চেষ্টা কর। নিশ্চয় বিক্রি হবে।"

অনন্ত বলল, "তবে আমাদের স্কুলে একটা বিষয়ে আমরা এগিয়েছি। কলেজ আন্দোলন আমাদের মধ্যে বেশ সাড়া জাগাচ্ছে। ছাত্র কংগ্রেসের ওরা একটা কলেজ কমিটি তৈরী করেছে। কিন্তু আমরাই এখন ওটার সর্বেসর্বা।"

"কিন্তু ছেলেরা কলেজ প্রতিষ্ঠা করবে কি করে? এতে কত টাকা চাই। কত সংগঠন চাই। এ সব তো বড়দের কাজ।"

"তা ঠিক, কাজটা বড়রাই পরে করবেন। আমরা কেবল এর জন্য আন্দোলন করব। এতে একটা সুবিধা আছে। কলেজ তো সবাই চায়। সুতরাং কলেজের জন্য আন্দোলনকারী সমিতির সদস্য সকলকেই করা যাচ্ছে। এখন তো আর কেউ বলতে পারবে না যে এটা স্রেফ পার্টির ব্যাপার। কৌশিকদা বলেছেন যে এর পর এই আন্দোলনের উৎসাহী কর্মীদের— মানে যারা চাঁদা আদায় করবে, পোস্টার লাগাবে, তাদের ধীরে ধীরে ফেডারেশনের ভিতর টানতে হবে। আর একবার কৌশিকদা কিংবা স্বাহাদির সঙ্গে আলোচনা করিয়ে দিতে পারলে আর কোথায় যাবে? দেখলে না সেদিন কৌশিকদা এখানে কলেজ না করার পিছনে টাটা

কোম্পানি এবং তার দালাল জন সাহেবের ইউনিয়নের কোন্ গোপন মতলব আছে, তা কেমন জলের মত বুঝিয়ে দিলেন।

মীনাক্ষী সোৎসাহে বলল, "সত্যি উনি না বলে দিলে কেই বা বুঝতে পারত যে অল্প বেতনে মজুর পাবার জন্য টাটা কোম্পানির এই চাল। কলেজের ডিগ্রী থাকলেই তো বেশী মাইনে দিতে হবে। তাই কলেজ না করার ষড়যন্ত্র। আর ইউনিয়নের লীডাররাও ভাবছে যে শিক্ষিত লোক কাজ পেলে তারা ইউনিয়ন দখল করে ওঁদের মাতব্বরি করতে দেবে না।"

"তা ছাড়া ছাত্ররাই তো সব আন্দোলনের নায়ক। তাই যখন একটু বড় সড় ছেলেরা ছাত্র হিসাবে কলেজে পড়বে, তারাই শহরের নেতা হয়ে যাবে বলে এই সব কংগ্রেসী ইউনিয়ন মালিকদের সঙ্গে জোট পাকিয়ে এখানে কলেজ হতে দিচ্ছে না।"

"ঠিক বলেছেন কৌশিকদা। এই সব বুড়োরা আমাদের পদে পদে বাধা দিচ্ছে।" অনন্তকে সমর্থন করে মীনাক্ষী বলতে লাগল, "আমাদের বাড়ির কথাই ধর না। একটু স্বাধীন ভাবে নিজের মনের মত পার্টির কাজ করব, তার উপায় নেই। বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হলেই মা হাজার বার কৈফিয়ত চাইবেন। ভাগ্যিস বাবার শিফট ডিউটি থাকে, তাই একটু আধটু বাইরের কাজকর্ম করতে পারি। তা না হলে স্কুল আর বাড়ির জেলখানাতেই কয়েদ হয়ে থাকতে হত।"

"এই সব অন্যায় বিধিনিষেধের বেড়া আমরা ভেঙ্গে ফেলব। সাম্যবাদী সমাজে মেয়েরাও পুরুষদের সমান হবে। সর্ব বিষয়ে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। ছেলেমেয়েদের একটু একত্র দেখলেই তখন সবাই বাঁকা চোখে চাইবে না—প্রত্যেকে প্রত্যেকের কমরেড হবে। কৌশিকদা বলেছেন যে তখন আর আমরা এই সব বুর্জোয়া স্বার্থরক্ষার জন্য সৃষ্ট মিথ্যা নৈতিক নিয়ম কানুন মানব না। প্রথম ধাক্কায় জাহান্নামে পাঠান হবে ধর্মকে যা কিনা জনসাধারণের কাছে আফিঙের মত। তার পর যত সব নৈতিক বাধা-বন্ধন গুঁড়ো গুঁড়ো করে উড়িয়ে দিয়ে তার পরিবর্তে মেহনতী জনগণের বৈপ্লবিক বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সব ব্রাহ্মণ শূদ্র, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের ভেদাভেদ তো থাকবেই না, মেয়েরাও আদর্শ কমরেড বা পরিপূর্ণ স্বাধীন হবে।"

"নিশ্চয়, তা না হলে সাম্যের আর অর্থ কি ?" মীনাক্ষী এক মুহূর্ত থেমে একবার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করল। তার পর বলল, "কিন্তু না, আর তুমি দেরি করো না। এই তো আমরা সাকচী ওয়াটার টাওয়ারের কাছে পৌঁছে

গেছি। তুমি এবার বাঁ দিকে মোড় ফের। আমি সোজা যাব। এর পর রাস্তায় লোক চলাচল বাড়বে। কে দেখে নেবে কোন্ দিক থেকে।”

অনন্ত মীনাক্ষীর পাশে চলতে চলতে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চতুর্দিকে তাকাল। পিছনে কেউ নেই। সামনের দিক থেকে দুই-একজন লোক এগিয়ে আসছে। অবশ্য ওরা বেশ কিছুটা দূরে। সে নিজের ডান হাত দিয়ে মীনাক্ষীর বাঁ কনুই-এ মৃদু চাপ দিয়ে বলল, “আচ্ছা চলি কমরেড।” কথার শেষে সে সাইকেলে প্যাডাল করা আরম্ভ করল।

মীনাক্ষী ওর অপস্রিয়মাণ মূর্তির দিকে একবার চেয়ে দেখে নিজের পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল। ওর মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস এবং বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করলেও অধরপ্রান্তে প্রসন্ন হাসির আভাস।

॥ পনের ॥

পাশের কামরাতে রেডিও বাজছে। সাগর পারের সুরের ঢেউ এলসির বুকে দোলা দিল। ভায়োলিন ফ্লুট ড্রাম আর কর্নেট সুরের এক বিচিত্র মায়ালোক সৃষ্টি করছে। মাঝে মাঝে চেলো ও ম্যারাকাসের তালে তালে গুঞ্জনও কানে আসছে। কতদিন অর্কেস্ট্রাতে যায় নি এলসি! ওঃ, কতদিন হয়ে গেল।

বাইরে বেরোবার পোশাক পরতে পরতে এলসির মন কোথায় কোন্ সুদূরে উধাও হয়ে গেল। লণ্ডনের তার নৃত্য-শিক্ষয়িত্রীর কথা মনে পড়ে গেল। কত যত্ন করে তিনি এলসিকে নাচ শেখাতেন। বার বছর বয়স থেকে এলসিকে পিয়ানোর তালে তালে পা ফেলতে শিখিয়েছিলেন মিসেস ওয়েডবার্ন। ওয়ালজ্ ফক্সট্রট জ্যাজ—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে কত রকমের নৃত্যকলা এলসি দক্ষতা সহকারে শিখেছিল। স্টুয়ার্টের সঙ্গেও তো তার ঐখানে পরিচয় হয়। ও মিসেস ওয়েডবার্নের কাছে ভায়োলিন শিখত। একবার মিসেস ওয়েডবার্নের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে একটা ব্যালের আয়োজন করেছিল। সুদক্ষ পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি হয়েছিল চমৎকার। এলসির সবচেয়ে ভাল লেগেছিল স্টুয়ার্টের বাজনা। অথবা বাজনার চেয়ে তার তন্ময়তাই এলসিকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল। ঘাড়টি বাঁ দিকে ঈষৎ হেলিয়ে ডান হাতের চারটি আঙুলের সাহায্যে ছড় ঘষতে ঘষতে বাঁ হাতের দীর্ঘ অঙ্গুলিগুলিকে ভায়োলিনের তারের উপর

দিয়ে লঘুছন্দে নাচিয়ে অদ্ভুত মনোমোহনকারী স্বরজাল বিস্তার করেছিল স্টুয়ার্ট।

স্টুয়ার্টের আর একটা ভঙ্গিমা এলসির মনে স্থায়ী দাগ কেটে বসে আছে। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের বড়দিন। সেবার স্টুয়ার্ট তাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছিল স্বর্ন রেস্তোরাঁতে। খাবার ঘর কী সুন্দর ভাবে সাজান। উৎসবের বেশে সজ্জিত নরনারীদের ভিড়ে রেস্তোরাঁ সেদিন রাজপ্রাসাদের মত রূপ ধারণ করেছে। ওরা দুজনে ওদের জন্য সংরক্ষিত টেবিলটির দুই দিকে দুটি চেয়ার নিয়ে মুখোমুখি বসল। হাসিখুশি গল্পগুজবের মধ্যে দিয়ে খাবার পাট চুকে গেল। ঘরের এক কোণে এতক্ষণ বিলম্বিত লয়ে যে অর্কেস্ট্রা বাজছিল, এবার তার আলাপন দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগল। ব্যাণ্ড মাস্টারের স্টিকের নির্দেশে বাদকের দল সুরের জাদু রচনা করে চলেছে। ট্রা ট্রা—লা লা লা, ট্রা লালা, ট্রা লা লা লা—রেস্তোরাঁ-গৃহের বাতাসে পর্যন্ত নৃত্যের দোলা লাগল। কখনও আবেশ, কখনও আবেগ, আবার কখনও বা সমে গিয়ে উচ্ছ্বাস ফেটে বেরোচ্ছে বাদ্যযন্ত্রগুলির রন্ধ্র রন্ধ্র থেকে। এই সুরের ইঙ্গিতগর্ভ আহ্বান উপেক্ষা করা যায় না—রক্তের প্রতিটি কণিকায় তার দোলা লেগেছে।

ওরা দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। মৌন ভাষায় আলাপন হল তরুণ-তরুণী দুটির মনে মনে। তার পর ওরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। স্টুয়ার্টের বাঁ হাত এলসির ক্ষীণ কটিদেশ বেষ্টন করে আছে। স্বপ্নাভিভূত এলসির বাঁ হাতও বর্ধিষ্ণু ব্রততীর মত স্টুয়ার্টের পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করল। দুজনের ডান হাতের দশটি আঙুল পরস্পরকে আইভি লতার মত জড়িয়ে ধরল। ঘরের মেঝেতে জোড়ে জোড়ে পা পড়ে যে মিলিত ধ্বনি উঠছিল, তার মধ্যে ওদের পদশব্দও ডুবে গেল। এলসির রক্তের ভিতর কারা যেন ট্রাম্পেট বাজাচ্ছে—গুর গুর গুর, গুর গুর গুর, ঝম্ ঝম্ ঝম্—সমের মুখে করতাল বেজে উঠল। দেহের প্রতিটি অণু পরমাণুতে কি যেন সির্ সির্ করছে। বিচিত্র মাদকতাপূর্ণ অনুভূতি। দুই পেগ শ্যাম্পেনেই কি নেশা হয়ে গেল নাকি? না—এ তো কোন পানীয়ের নেশা নয়। এর মূল, এর উৎস আরও গভীরে—মস্তিষ্কের কোষে কোষে, স্নায়ুর কেন্দ্রে কেন্দ্রে।

কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল। প্রচণ্ড করতালি ধ্বনিতে এলসির চমক ভাঙল। বাজনা থেমে গেছে, নাচও শেষ। দ্বিতীয়বার নৃত্যের জন্য

প্রস্তুত হবার পূর্বে আর সকলে রক্তিম পানীয় দিয়ে কণ্ঠ সিক্ত করে নিচ্ছে। কিন্তু এলসি আর দেরি করতে পারবে না। মা ঘরে অপেক্ষা করছেন।

নৃত্যসঙ্গিনী হবার জন্য স্টুয়ার্ট তাকে ধন্যবাদ জানাল। প্রত্যুত্তরে জড়িত কণ্ঠে এলসি কি বলল, তা সে নিজেই বুঝতে পারল না। ওকে বিদায় দেবার জন্য স্টুয়ার্ট হোটেলের গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত এল। ক্যাবের দরজা খুলে ধরে সে তাকে ভিতরে যাবার জন্য সাহায্য করল। এলসি যন্ত্রচালিতের মত গাড়ির ভিতরে গিয়ে আসন গ্রহণ করল। তার পর—তার পর স্টুয়ার্ট উপবিষ্ট এলসির দক্ষিণ করপল্লব সযত্নে নিজের হাতে গ্রহণ করে ধীরে ধীরে নিজের দিকে এগিয়ে আনতে লাগল এবং শেষ দিকে অকস্মাৎ অত্যন্ত দ্রুত বেগে নিজের অধরোষ্ঠের সঙ্গে চেপে ধরল। ঝম্ ঝম্ ঝম্—আবার এলসির বুকের ভিতর কনসার্টের করতাল বিপুল শব্দে বেজে উঠল।

স্টুয়ার্টের গুড নাইটের উত্তরে সেও গুড নাইট বলতে চাইল; কিন্তু শুধু তার ঠোঁট নড়ে উঠল, গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোল না। খট্ করে দরজা বন্ধ হল। ঈষৎ ঝাঁকুনি দিয়ে ক্যাব অগ্রসর হল। স্টুয়ার্ট তখনও হাত নেড়ে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে। এলসির কিন্তু হাত উঠল না, সে যেন সংজ্ঞাহারা। তার চক্ষু উন্মীলিত হলে কি হবে, কোন কিছুই তার দৃষ্টিতে পড়ছে না। শুধু সেই মধুময় স্বপ্নমাখা মুহূর্তগুলি তার চোখের পর্দায় ভাসছে। স্টুয়ার্ট প্রেমবিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে, তার নীল চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে স্বর্গের সুষমা মণ্ডিত বিভা। অর্কেস্ট্রায় মোহন সুর-লহরী, আর তার তালে তালে ঘন সন্নিবদ্ধ দেহ দুটি এক প্রাণ হয়ে পা ফেলছে।

ঝন্ ঝন্ ঝন্—এলসির স্বপ্ন খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে গেল। আর বোধ হয় চূর্ণ বিচূর্ণ হল কোন কাঁচের বাসন। এলসি দ্রুতপদে পাশের কামরায় পৌঁছাল। মিস্টার মুর তখনও চীৎকার করছেন, "ড্যাম সোয়াইন!"

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে এলসি জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে ড্যাড—হোয়াট্স দি রং?"

ক্রুদ্ধ মুর সাহেবের টেবিল থেকে কয়েক হাত তফাতে ওদের খানসামা রহমান বিভ্রান্ত ভাবে দাঁড়িয়েছিল। এলসিকে দেখতে পেয়ে রহমান এক অর্থপূর্ণ চোখের ইশারা করল। এলসি তার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বাবার দিকে এগিয়ে গিয়ে শাসনের স্বরে বলল, "সকাল থেকেই আবার এইসব আরম্ভ করেছ ড্যাড? এমন করলে ক'দিন বাঁচবে?"

মুর সাহেব তখনও ফুঁসছিলেন। জড়িত স্বরে হুংকার দিয়ে তিনি বললেন, "হ্যাং ইট। কে বাঁচতে চায়?" রক্তবর্ণ চক্ষের বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তিনি বেদনাহত এলসির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে বলতে লাগলেন, "বাঁচতে চাইলেই বাঁচা যায় নাকি? ডরোথি তো বেঁচে থাকতে চেয়েছিল। তবে কেন তাকে অমন শোচনীয় ভাবে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল? যে জার্মান উড়োজাহাজ ওর উপর বোমা ফেলেছিল, তার পাইলটের সঙ্গে তোমার মায়ের তো কোন শত্রুতা ছিল না। বুঝলে এলসি ডিয়ার, এই দুনিয়াটাই ঠগেদের আড্ডা। অল ড্যাম চিটস এণ্ড রাসকেলস লজ হিয়ার। তা না হলে এত দামী জিনেও কিনা নেশা হয় না? আই টেল ইউ দিস রহমান এতে জল মেশাচ্ছে।" শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠ আবার তর্জন করে ওঠে।

রহমান করুণ স্বরে বলল, "মিসিবাবা, দোকান থেকে কেনা বোতলের সীল যেমনকার তেমনই আছে। তা হলে আমি জল মেশালাম কি করে?"

তাকে বাধা দিয়ে এলসি বলল, "বুঝেছি। তোমাকে আর বলতে হবে না। আচ্ছা তুমি যাও এখন। গিয়ে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা দেখ। ড্যাডকে নিয়ে আমি এখনই টেবিলে যাচ্ছি।"

এলসি ধীরে ধীরে এগিয়ে বাবার টেবিল থেকে অর্ধ সমাপ্ত মদের বোতলটি তুলে দেওয়াল আলমারিতে রেখে দিল। তার পর বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, "চল বাবা খেতে চল।"

মুর সাহেব অধৈর্য ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "ও—নো নো। আমার এখন খিদে নেই। ভগবানের দোহাই, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।"

"একা থাকা মানে তো আবার ঐ বিষ গেলা। আচ্ছা বাবা, আমার দিকে একটু চাইবে না। একা আমি কত দিক সামলাব?" কথা বলতে বলতে এলসি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বলল, "মা মরে বেঁচেছে। আমার ছাই মরণও হয় না। হায় ভগবান!"

মুর সাহেব এলসির চোখের জল দেখে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েন। তাঁর জেদ কোথায় অদৃশ্য হয়। পরুষ দৃষ্টি ধীরে ধীরে কোমল হয়ে আসে। ঊর্ধ্বচারী মেঘের বাষ্পপুঞ্জ যেমন জমে শীতল হয়ে বারি বিন্দুর রূপ পরিগ্রহ করে, তাঁর উষ্মাও তেমনি জাদুমন্ত্র প্রভাবে করুণায় রূপান্তরিত হয়। ধরা ধরা গলায় তিনি বলেন, "নো—নো ডিয়ার। নো টীয়ারস প্লীজ। চোখের জল আমি সহ্য করতে পারি না।" বলতে বলতে তাঁর চক্ষু-দুটি ছল ছল করে

ওঠে। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বলে চলেন, "আমি তো চিরকাল এমন ছিলাম না। ঐ যুদ্ধ আমার সর্বনাশ করেছে, তোমার মাকে প্রাণে মেরেছে আর আমাকে জীবন্ত মেরে রেখে গেছে। বোমার আঘাতে বিদীর্ণ ডরোথির রক্তাক্ত দেহের বীভৎস দৃশ্যের স্মৃতি ভোলবার জন্যেই তো আমি মদ খেয়ে খেয়ে সমস্ত অনুভূতি-কেন্দ্রগুলিকে অসাড় করে ফেলতে চাই। অর এলস আই হ্যাড বিন এ গুড ফাদার, এ গুড হাসব্যাণ্ড। বল—বল মাই গার্ল, তাই নয় কি?"

চোখের জল মুছতে মুছতে এলসি কেবল বলে, "হ্যাঁ"।

* * *

প্রাতরাশ সেরে এলসি বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তার পর কি ভেবে আবার ভিতরে গিয়ে রহমানকে বাবার দিকে নজর রাখতে বলে এল এবং তিনি যাতে পারতপক্ষে রেগে না ওঠেন সে দিকে দৃষ্টি দেবার জন্যও তাকে সতর্ক করে দিল। রহমান ঘাড় নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করল।

খুট্...খুট্...খুট্...। জুতার উঁচু গোড়ালি আর সিঁড়ির পাথরে আলাপন শুরু হল। লাল মুরমের রাস্তা পার হয়ে এলসি গ্যারেজের সামনে এসে থামল। ডিউক আগে থেকেই তৈরী ছিল, যেন সময় মত খবর দেওয়া হয়েছে ওকে। মালি এসে এলসিকে সেলাম করে গ্যারেজের দরজা খুলে দিল। এলসি ডিউকের মাথায় আদর করে একটা চাপড় মারতেই ডিউক আনন্দে গর্ গর্ আওয়াজ করতে করতে লাফিয়ে এলসির কাঁধে নিজের পা দুটি তুলে দিয়ে প্রায় ওর নাকের সামনে মুখব্যাদান করে দীর্ঘ জিহ্বা বার করে লেজ নাড়তে লাগল।

"দ্যাটস অল রাইট," বলে এলসি তার মুখে আর একটা চাপড় মেরে মুখটা এক পাশে সরিয়ে দিল। একান্ত অনুগতের মত ডিউক কাঁধ থেকে নেমে গিয়ে এক পাশে দাঁড়াল।

এলসি গ্যারেজে ঢুকে মোটরে স্টার্ট দিয়ে ব্যাক করে গাড়ি বাইরে আনল। ডিউককে কিছু বলতে হল না। এক লাফে সে পিছন দিক দিয়ে জিপের ভিতর ঢুকে নিজের আসন দখল করে আবার জিভ বার করে হাঁপাতে লাগল। এলসির গাড়ি ফটকের বাইরে বাঁ দিকে মোড় নিল।

* * *

ঠং ঠং ঠং...ঠন্ ঠন্...ঠনাৎ ঠন্। লোভী মানুষের সিঁধকাঠি ধরিত্রীর রত্ন-পেটিকা থেকে সম্পদ আহরণ করে চলেছে। আহরণ নয়, অপহরণ।

এলসি কথাটির উপর মনে মনেই জোর দিল। চিন্তা করে দেখল একে অপহরণ ছাড়া আর কী বা আখ্যা দেওয়া যায়? কত যুগ-যুগান্ত পূর্বে এই উপগ্রহের সৃষ্টির উষালগ্নে প্রাকৃতিক কারণে ধরণীগর্ভে যে অমূল্য সম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর মানব বেহিসাবীর মত তার অপচয় করে চলেছে। কাইনাইট লাগে ফায়ার ক্লে বা পোর্সেলিনের মত ধাতু গলানর কাজে। কাইনাইটের সাহায্যে লোহা-পাথর থেকে তৈরী হয় লৌহ পিণ্ড এবং তার থেকে হয় আধুনিক সভ্যতার এক অপরিহার্য উপকরণ—ইস্পাত।

অপরিহার্য—এলসি নিজের মনেই ভেবে চলে। কিন্তু পৃথিবীতে আজ যত ইস্পাত ব্যবহার হয়, তার শতকরা কত অংশ সত্য সত্যই অপরিহার্য? এই যে আমরা বড় বড় ইমারৎ বানাই, জাহাজ এরোপ্লেন মোটর আর রেল গাড়ি বানাবার জন্য লক্ষ লক্ষ টন লোহা আর ইস্পাত খরচ করি, এর সবটুকুই কি একান্ত প্রয়োজনীয়? যে সব উড়ো-জাহাজ থেকে লণ্ডনে বোমা পড়ত, যে বোমার স্প্লিণ্টারটি তার মায়ের মৃত্যু ঘটিয়েছিল বা স্টুয়ার্ট যে হেলমেট মাথায় দিয়ে আর যে রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে তার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়েছিল, সেগুলি বানাতে যে লোহা আর ইস্পাতের প্রয়োজন ঘটেছিল, তা কি সত্য সত্যই এ যুগের সভ্যতার গৌরব ঘোষণা করার কাজে লেগেছিল?

এলসির মনে হয় যুদ্ধ আর শান্তির সময় এই যে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এত সব অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজন মেটাবার উপকরণ নির্মাণের জন্য অজস্র ধারায় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যয় করা হচ্ছে, এর তো আর পরিপূর্তি হবে না। নূতন করে তো পৃথিবীর গর্ভে খনিজদ্রব্য সৃষ্টি হচ্ছে না। কিছুদিন পূর্বে সে পড়েছিল যে, যে হারে দুনিয়ায় কয়লা খরচ হচ্ছে তাতে পৃথিবীর সমস্ত সঞ্চিত কয়লা আর এক শতাব্দী টেনে টুনে চলে কি না সন্দেহ। অন্যান্য ধাতুর পুঁজিরও ঐ একই অবস্থা। তার পর কি হবে সে এক বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন। বর্তমান সভ্যতার মত যে পিতা ভবিষ্যদ্বংশীয়ের জন্য কেবল ঋণের বোঝা রেখে যান, পুঁজি রইল কিনা তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না—তাকে কি আখ্যা দেওয়া উচিত? আজকের দেউলে-ধর্মী অর্থনীতির দায়িত্ব নয় সে কথা চিন্তা করা। অতএব পৃথিবীর আর পাঁচটা মানুষের মত এলসিও নিজের কাজে মন দিল।

"গত সপ্তাহে রেসিং কত হয়েছিল নারাণবাবু?"

এলসিদের খাদানের বড়বাবু অর্থাৎ একাউণ্টেণ্ট প্রৌঢ় নারায়ণ রায় এগিয়ে

এলেন। মাথার কাঁচা-পাকা চুল একটু চুলকিয়ে নিয়ে ঈষৎ ম্লান মুখে তিনি জবাব দিলেন, "বড় কম হয়েছে ম্যাডাম। মাত্র চারশ বত্রিশ টন।"

"এত কম!"

"গত সপ্তাহে আমাদের বত্রিশ জন মজুরের মধ্যে বার জনই কোন না কোন কারণে অনুপস্থিত ছিল। আজ এ পরব তো কাল ও পরব। এ ছাড়া ছুটকো-ছাটকা অসুখও লেগে আছে। ঘরে যদি এক দিনেরও খোরাক থাকল, তো পারত পক্ষে কাজে আসবে না। বেহড কুঁড়ের জাত এরা মিস মুর। তার উপর যারা কাজে এসেছে, তারাও খুব মন দিয়ে কাজ করছে বলে মনে হয় না। মেট লাখু মাঝি বলছিল যে এরা আধ ঘণ্টা পাথর কাটবে তো আর আধ ঘণ্টা চুটি টানবে। এমন করে কি কাজ হয়?"

"তাই তো, বড় চিন্তার কথা। আগামী সপ্তাহে বোধ হয় তিনটে ওয়াগন পাওয়া যাবে। ঐ তিনটে লোড করলে কলকাতার ম্যাকাঞ্জি লায়ালের অর্ডারটা পুরো হয়। আর ওটা পুরো না করতে পারলে টাকা পয়সার বড় টানাটানি যাবে। তার পর এমাসে আবার কবে ওয়াগন পাওয়া যায় দেখুন। ভাল কথা, আমাদের ইনডেণ্ট গেছে?"

"আজ্ঞে এই ফর্ম ভরা হয়ে গেছে। আপনি তো লোডিং দেখতে আমাদের সাইডিং-এ যাবেন। বিভাসবাবু ওখানেই আছেন। তাঁকে এই ইনডেণ্টটা দিয়ে দিলে তিনি ফরওয়ার্ডিং নোটের সঙ্গে এটাও স্টেশনে জমা করে দেবেন।"

নারায়ণবাবু তাঁর পকেট থেকে ইনডেণ্ট-এর কাগজ বার করে এলসির হাতে দিলেন।

ঠন্ ঠন্ ঠন্......ঠনাৎ ঠং ঠং। কাল পাথরে খোদাই করা মূর্তিগুলি গাঁইতা দিয়ে মৃত্তিকা গহ্বরে ঘা মারছে। ধাতব খনিত্রের আঘাতে মাটি মেশান ছোট বড় ঢেলার আকারে কাইনাইট সেই গর্ত থেকে উঠছে। সমস্ত এলাকাটায় পাথর উঠে উঠে সমতল ভূমি থেকে কোথাও বার চোদ্দ ফিট এবং কোথাও বা তারও বেশী—বিশ ফিটের মত গর্ত হয়ে গেছে। উপর থেকে মজুরদের সম্পূর্ণ শরীরটা দেখা যায় না। শুধু কোমর থেকে দেহের উর্ধ্বাঙ্গ আনত হয়ে রয়েছে ও গাঁইতা ধরাতল স্পর্শ করার সময় দেহের ঐ অংশ কেঁপে কেঁপে উঠছে চোখে পড়ে। কৃষ্ণবর্ণ পেশল পৃষ্ঠদেশ ও বাহুর পেশীতে সঞ্চিত স্বেদকণিকার উপর সূর্যরশ্মি পড়ে চক্ চক্ করছে। এলসি

বন্ধুর ভূমির উপর দিয়ে নীচের দিকে নামতে লাগল। পিছনে নারায়ণবাবু ও তাঁকে অনুসরণ করছে ডিউক।

"সেলাম মেম সাহেব।"

"সেলাম হুজুর।"

"দণ্ডবৎ হই আঁজ্ঞা।"

"গুড মর্নিং মেম সাহেব।"

এলসি স্মিত বদনে মাথা নেড়ে মজুরদের অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিচ্ছিল। ইংরাজীতে সম্ভাষণ শুনে চমকে উঠল।

নারায়ণবাবু বললেন, "আজ্ঞে কিষু সর্দার। নূতন ভর্তি হয়েছে। ওদের গ্রামের পাঠশালায় তিন বছর পর্যন্ত পড়েছিল, সেই কথাটা জানাবার জন্য মাঝে মাঝে ঐ রকম ইংরাজী বলে।"

হাউ সিলি! এলসি বিস্মিত হয়। ও নিজে কোথায় চেষ্টা করে এ দেশের ভাষা শিখছে এদের কথা বুঝতে পারবে বলে, আর এরা তাকে খাতির করার জন্য ইংরাজীতে কথা বলতে চাইছে। ইংলণ্ডের কোন শ্রমিক ফরাসী বা নরউইজানদের কোন কারখানা বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ করলে কিন্তু ইংরাজী-ই বলবে। নিজের মাতৃভাষার চেয়ে বিদেশী ভাষার ইজ্জত বেশী ভাবার পিছনে কী মনোবৃত্তি ক্রিয়া করে, এলসি তা বুঝতে পারে না।

ওদের দিকে ফিরে এলসি প্রশ্ন করে, "কাজ জোরে হচ্ছে না তো? আর তোমরা এত নাগা করছ কেন?"

ওরা চুপ করে থাকে। নারায়ণবাবু ওদের ধমকে ওঠেন, "আ মর—সব সঙ যেন। চুপ করে আছিস কেন তোরা? জবাব দে মেমসাহেবের কথার।"

মেট লাখু মাঝি বলে, "আঁইজ্ঞা মুরুখ লোক সব। কি আর বইলবেক? বল ক্যান না—এমন আর হবেক নাই।"

ওরা সবাই মাটির দিকে তাকিয়ে লাখুর কথার পুনরাবৃত্তি করে, "আঁইজ্ঞা এমন আর হবেক নাই।"

এলসি যে খুব একটা আশ্বস্ত হয়, তা নয়। তবে এর বেশী তার করারই বা কি আছে? এদেশে সে আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখছে। গ্রামের এই সব মানুষগুলি কিছুতেই মন খোলে না। যত সাধ্য-সাধনাই করা যাক না কেন, মনের কথাটি জানাবে না। এরা যখন হ্যাঁ বলে ঘাড় নাড়বে, ঠিক বুঝতে হবে তার মানে না। অথবা মুখে হ্যাঁ বললেও করবে যা তার মনে

আছে। কে জানে সে বিদেশিনী বলেই এরা তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে কি না? কিন্তু সে তো নিজেকে ভিন্ন দেশীয় মনে করে না। আর তারা ইংলণ্ডে ফিরবে কিনা, তার স্থিরতা কই? এলসি তো আজকাল এই মোহনপুরকেই তার দেশ বলে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে।

আত্মসমাহিত ভাবে এলসি খাদানের পাথর তোলার এলাকা ছাড়িয়ে একটু চড়াই ভেঙ্গে আবার সমতল ভূমিতে উঠে এল।

ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্, ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্। এক সঙ্গে হাজার হাজার বিচিত্র বাজনা বাজছে। এর কোন যতি বা ইতি নেই। জন কয়েক কামিন কাইনাইটের বোল্ডারগুলি ছোট ছোট হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভাঙ্গছে। একে বলে সাইজ করা। আড়াই তিন থেকে শুরু করে অর্ডার অনুযায়ী সাত আট ইঞ্চি পর্যন্ত পরিধির টুকরো করে ভেঙ্গে আকার অনুসারে থাক বা চৌকা লাগান এই সব কামিনদের কাজ।

এলসিকে দেখে ওরা সেলাম দণ্ডবৎ কিছুই বলল না, কেবল খিল খিল করে মুক্ত ঝর্নার মত হেসে উঠল। এলসিও স্মিত হাসি দিয়ে তার প্রত্যুত্তর দিল। ধলভুমের মজুরদের চেয়ে কামিনদের বরং এলসির ভাল লাগে। কাল কাল দেহবর্ণ, নিটোল স্বাস্থ্যের আধার এই মেয়েগুলি যখন তখন কারণে অকারণে হেসে লুটোপুটি খেতে পারে। খাটো শাড়ি আঁটসাঁট করে পরা, জব জবে করে তেল দেওয়া চুলে চুড়ো করে খোঁপা বাঁধা এবং তাতে দুই একটি করে ফুল বা অভাবে এক গুচ্ছ সবুজ পাতাই গোঁজা—প্রকৃতির দুলালী এই পর্বতকন্যারা পাহাড়ী নদীর মতই সাদা উৎফুল্ল। বেশ লাগে এদের। ওদের দিকে আর একবার প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে এলসি এগিয়ে চলল।

চলতে চলতে এক জায়গায় এসে এলসি থমকে দাঁড়াল।

"একি, এ জায়গার পিটটা ধ্বসে গেছে দেখছি।"

পশ্চাৎবর্তী নারায়ণবাবু জবাব দেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, পরশু আপনা আপনিই ধ্বসে গেছে। ভাগ্যিস তখন এখানে কেউ কাজ করছিল না। লাখুকে বলে দিয়েছি, কাল পরশু দু-চার জন মজুর লাগিয়ে ঠিক করে দেবে। কিছু বাড়তি খরচ হবে আর কি।"

এলসি তখন অন্য কথা ভাবছিল। ছোট্ট এই গর্তটিরও তা হলে ভারকেন্দ্রের গোলযোগ হল এবং তার পরিণামে গর্তটি ধ্বসে গেল। সুতরাং মানুষ এই যে এত দিন ধরে কয়লা লোহা সোনা ও আরও কত শত খনিজদ্রব্য

বার করার জন্য নিত্য পৃথিবীর বক্ষে মূষিকের মত গহ্বর খুঁড়ে চলেছে, এর ফল স্বরূপ যদি পৃথিবীর ভারসাম্য কোন দিন বিঘ্নিত হয়? বিভিন্ন ধাতু বা তার আকরিকের আপেক্ষিক গুরুত্ব তো সমান নয়। তা হলে বেহিসাবীর মত এক জায়গায় গর্ত করে অন্য জায়গার ভার-বৃদ্ধি করলে পৃথিবীর ওজনসাম্য কি বিচলিত হতে পারে না? আর পৃথিবীতে এমনি এক ধ্বস নামলে কত জন মজুর কত দিনে তা ঠিক করতে পারবে—এ কথা মনে আসতেই এলসির এই অদ্ভুত অঙ্কের কথা ভেবে হাসি পেল।

হাসিমুখেই সে মোটরের দিকে এগিয়ে গেল।

* * *

সাইডিং-এ এলসি গাড়ি থেকে নামতেই ওদের ছোটবাবু বিভাস সোম এগিয়ে এল। বিভাস ঈষৎ খুঁড়িয়ে চলে। তরুণ বয়স্ক এই কর্মচারীটির অঙ্গ-বিকৃতি প্রথম থেকেই এলসির মনে সহানুভূতির সঞ্চার করেছিল। কষ্ট হবে ভেবে বিভাসকে পারতপক্ষে সে দৌড় ঝাঁপের কাজে পাঠায় না। লোডিং দেখা বা অফিসের চিঠি পত্র লেখা, মজুরদের সাপ্তাহিক মাইনে দেওয়া ও তার হিসাব রাখা ইত্যাদি বিভাসের কাজ।

বিভাসের নমস্কারের প্রত্যুত্তর দিয়ে এলসি এগিয়ে চলল। দুটো ওয়াগন কাইনাইট পাথরে বোঝাই হচ্ছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লোডিং সারতে না পারলে খেসারত দিতে হবে। অবশ্য স্টেশনের বাবুদের দুই এক টাকা পান খাবার নাম করে দিলে জরিমানার বহু টাকা বেঁচে যায়। কোন্ মন্ত্রবলে বাবুরা যে এই অসাধ্য সাধন করেন কে জানে?

"লোডিং আজ হয়ে যাবে তো?"

"সেই রকমই তো চেষ্টা করছি।" দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ করেই উত্তর দেয়।

ঐ এক স্বভাব বিভাসের। এলসির মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা ও এড়িয়েই চলে। ওকে সম্মান দেবার জন্য, না ইয়ংম্যান সুলভ লজ্জা কিংবা অপর কোন কিছু কে জানে? এখন এলসির ওসব নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই, মিছামিছি খেসারত যাতে না লাগে তার জন্য বিভাসকে আর একবার সাবধান করে দিয়ে সে বলল, "দেখুন ডেমারেজ না লাগে যেন!" কথা বলতে বলতে সে ঝুড়ি মাথায় দৌড়ে দৌড়ে যে সব কামিন বাঁশের মাচা বেয়ে ওয়াগনের মুখ পর্যন্ত উঠে তার ভিতর কাইনাইটের বোল্ডার ঢালছিল, তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

মনিবকে দেখে সকলের ভিতরই বিশেষ একটা কর্মতৎপরতা দেখা দিয়েছে। তবে এলসির মনে ডেমারেজের টাকা বাঁচানর কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল। না, নিজে সে ডেমারেজ বাঁচানর জন্য রেলের বাবুদের শরণাপন্ন হবে না। তার ইংরেজ-চরিত্র-স্থলভ সততা তাকে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে দেয় না। কিন্তু এলসি ভেবে পায় না যে স্বাধীন ভারতের শিক্ষিত আখ্যাধারী ভদ্রলোকেরা এই ভাবে ঘুষ নেওয়া দেওয়ার কারবার করে কি করে? বৃথাই এরা এত দিন চিৎকার করত যে ইংরেজদের শাসনের জন্যই তাদের দেশে দুর্নীতি ও নৈতিক অধঃপতন বেড়ে চলেছে। এখন তো এ দেশে ইংরেজ শাসন নেই। তবে পূর্বের তুলনায় ভ্রষ্টাচার বেড়েছে বলে এরা নিজেরাই কেন আন্দোলন আর হট্টগোল করে?

এলসির মনে পড়ে গেল টয়নবি না কোন্ একজন ঐতিহাসিকের লেখায় পড়েছিল যে পরাধীন কেউ কাউকে করতে পারে না, জাতীয় চরিত্রের অবনতি না ঘটলে কোন দেশ অপরের পদানত হয় না। আজকাল এলসির স্মৃতিশক্তিও কেমন ক্ষীণ হয়ে আসছে। লেখকের নামটা সঠিক মনে না পড়ায় নিজের উপরই এলসির রাগ ধরল।

আর স্মৃতিশক্তিরই বা দোষ কি? ব্যবসার ঝামেলা ও বাবার জন্য দুশ্চিন্তায় যে সে পাগল হয়ে যায় নি এই ঢের। এর পূর্বে মুর সাহেবই ব্যবসার সব কিছু দেখতেন। এলসি আর তার মা থাকত লণ্ডনে। ধলভূমের এই আদিম গ্রামে লেখা-পড়ার স্থবিধা থাকার কথাই ওঠে না। এ ছাড়া সোসাইটি বলেও কিছু নেই বলে মুর সাহেবকে এই ব্যবস্থা করতে হয়। বর্ষাকালে খাদানে কাজের চাপ কমে গেলে তিনি বছরে একবার হোমে যেতেন।

স্থায়ীভাবে এবার এখানে আসার পূর্বে এলসিও মায়ের সঙ্গে দুই তিন বৎসর অন্তর এখানে এসেছে। কিন্তু এবার লণ্ডনের বাস তুলে দিয়ে তাকে নিয়ে মুর সাহেব এখানে আসার পর থেকে ক্রমশঃ তার বাবা কাজ-কর্ম দেখা ছেড়ে দিতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যবসার দায়িত্ব এসে পড়ল তার উপর। আর যতই সে আরও বেশী করে পরিশ্রম করে ব্যবসার সব দিক সামলাবার চেষ্টা করছে, তার বাবা ততই বাইরে বেরোন বন্ধ করে ধীরে ধীরে নিজেকে শেষ করে দেবার দিকে এগিয়ে চলেছেন।

দুই দিকের চাপে সর্বদাই এলসির মনে হয় যে কে যেন তার মাথায় অসম্ভব ভারী এক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। তার জীবন থেকে আনন্দও সম্পূর্ণ ভাবে বিদায় নিয়েছে, কর্তব্য কেবল কর্তব্য দিয়ে ঠাসা জীবনের

প্রতিটি মুহূর্ত। এই জন্য একটু একলা চিন্তা করার সুযোগ পেলেই বড় একা বোধ হয় এলসির। কেবল পরিবার ও ব্যবসাক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র বিশ্বে সে যেন সঙ্গীসাথীহীনা নিতান্ত নিঃসঙ্গ। এই ভাবে আরও কত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে কে জানে ?

কিন্তু নাঃ। এ সব ভাবলে তো চলবে না। এখনও কাজ বাকী পড়ে রয়েছে। বিভাসকে এলসি ইনডেণ্টের কাগজপত্র দিয়ে ওয়াগন বোঝাই এর পর ফরওয়ার্ডিং নোট জমা দেবার সময়ে স্টেশনে দাখিল করার নির্দেশ দিল। তার পর আত্মমগ্ন ভাবে জিপের দিকে চলা শুরু করল। এবার তার গন্তব্য-স্থল বুরুহাতু। কৌশিকবাবুর ব্যাপার, তার পর ধানবাদ যাওয়া ইত্যাদির জন্য অনেক দিন ওখানকার খাদানের কাজকর্ম দেখতে যাওয়া হয় নি।

কৌশিকবাবু—কি জানি কেমন আছেন ভদ্রলোক। একটা খবরও তো আর দিলেন না জামসেদপুর গিয়ে। যাক্, জীবনের বন্ধুর পথে নিঃসঙ্গ যাত্রী এলসি বৃথা কেন ওঁর কথা ভেবে মরে। ওর নিজের এখন কাজ, কাজ—কত কাজ। একা হাতে এলসি কত দিক সামলায়। সুতরাং দিবারাত্র তাকে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়। কিন্তু কাজ বেশী বলেই কি এলসি কর্ম-সমুদ্রে আত্মনিমজ্জন করতে চায়। ওর জীবনের প্রচণ্ড নিঃসঙ্গতাকে কর্ম-মুখরতায় ভরিয়ে দেবার একটা চেষ্টা নেই কি ? পাছে একান্তে কখনও নিজের মনের সত্যস্বরূপের সম্মুখীন হতে হয়, তাই নিজেকে সযত্নে এড়িয়ে চলার মানসে কাজের এই নিশ্ছিদ্র ব্যূহ রচনা করে নিজের কাছ থেকে নিজেই দূরে সরে থাকার প্রয়াস নয় তো ?

কিন্তু—যাকগে, ও সব গোলমেলে চিন্তা। গাড়ির হর্ন শুনে ডিউক ওদিকে যে পাখীটার উপর তাক করে লাফ মারার মতলব ভাঁজছিল, তাতে ক্ষান্তি দিয়ে দৌড়ে এসে গাড়ির পিছন দিকে নিজের জায়গায় বসল। সুইচ অন, এক্সিলেটারে পায়ের মৃদু স্পর্শ—গাড়ি গর্জন করে উঠল। ক্লাচ···গিয়ার··· এক্সিলেটর···ধোঁয়া উড়িয়ে গাড়ি ছুটল বড় রাস্তার দিকে।

আর বিভাস ? সে জলন্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ এলসির গাড়িটির গমন-পথের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকার পর আপন মনে কি যেন বিড় বিড় করতে করতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সাইডিং-এর দিকে চলা আরম্ভ করল।

॥ ষোল ॥

স্কুল থেকে কৌশিকবাবু একটু অভিভূতের মত ফিরে এলেন। ট্রেন প্রায় বেলা বারটায় ধলভূমগড়ে পৌঁছায় বলে গাড়ি থেকে নেমেই তিনি সোজা স্কুলে চলে যান। স্নান আহার পর্ব জামসেদপুরে সেরেই তিনি গাড়ি ধরেছিলেন। স্কুলে পৌঁছাবার পর যা যা ঘটেছিল, তা এবার তাঁর এক এক করে মনে পড়তে লাগল। হেডমাস্টার মশাই তাঁকে দেখা মাত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অকৃত্রিম আনন্দে তিনি গদগদ স্বরে বললেন, "ওঃ, ভগবানের দয়ায় খুব বেঁচে গেছেন কৌশিকবাবু। আমরা তো রোজ রোজ আপনার জন্য প্রার্থনা করেছি।" তার পর সেই বৃদ্ধ কৌশিকবাবুর হাত ধরে নিজের পাশের চেয়ারে বসাতে বসাতে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন আর কোন কষ্ট নেই তো?"

কৌশিকবাবু মাথা নাড়লেন। দেখতে দেখতে সারা স্কুলে কৌশিকবাবুর আগমন সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল।

লাইব্রেরী থেকে ব্রজেনবাবু এলেন। তাঁর ক্লাস ছিল না। স্বল্পভাষী ব্রজেনবাবু তাঁর হাত দুটি ধরে গাঢ় স্বরে ডাকলেন, "কৌশিকবাবু!" ওঁর দৃষ্টিতে হৃদ্যতা জ্বল জ্বল করছিল।

উমেশবাবু, হেডপণ্ডিত রমানাথবাবু এবং অন্যান্য মাস্টার মশাইরাও ক্লাস ছেড়ে সব হাসি মুখে ছুটে এসে হেডমাস্টার মশাই এর ছোট্ট অফিস ঘরটিকে সরগরম করে তুললেন। এদিকে অফিস ঘরের সামনে ছেলেদের ভিড় জমে গেল। খুব সাহসী ছেলেরা দু-এক জন অফিস ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে কৌশিকবাবুকে দেখতে লাগল। হেডমাস্টার মশাই তাই হাসতে হাসতে বললেন, "চলুন কৌশিকবাবু, ছেলেদের একবার দর্শন দেবেন। ওদের দাবিও তো কম নয়।" হেডপণ্ডিত রমানাথবাবু টিপ্পনী কেটে বললেন, "ঐ অতগুলি বালখিল্যের প্রার্থনার কাছেই যমরাজ পরাভূত হয়েছেন জেনে রাখবেন।"

কৌশিকবাবু হেডমাস্টার মশাইএর সঙ্গে তাঁর অফিসের বারান্দায় দাঁড়ানমাত্র চতুর্দিক থেকে প্রণাম করার পালা শুরু হয়ে গেল। তাঁর আপত্তিসূচক "না না" ছেলেদের কলগুঞ্জনের মধ্যে কোথায় ডুবে গেল। হেডমাস্টার মশাই ছাত্রদের উদ্দেশে ঘোষণা করলেন যে কৌশিকবাবু সুস্থ হয়ে ফিরে আসার উপলক্ষ্যে সেদিনকার মত ছুটি হয়ে গেল। ছেলেরা প্রবল হর্ষধ্বনি করে তাঁর ঘোষণাকে অভিনন্দিত করল এবং তার পর বাড়িমুখো দৌড়ান শুরু করল।

মাস্টার মশাইরা আরও কিছুক্ষণ বসে গল্পগুজব করার পর একে একে বিদায় নিলেন। হেডমাস্টার মশাই কৌশিকবাবুকে লক্ষ্য করে স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন, "যান, আপনি এবার ঘরে গিয়ে একটু আরাম করুন গে। কাল থেকে তো আবার ঘানিতে নামতেই হবে। আমি হাতের কয়েকটা কাজ সেরেই যাচ্ছি। আমার জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।" তার পর কি মনে পড়ে যেতে আবার বললেন, "ভাল কথা। আজ রাত্রে আর হোস্টেলের ঘ্যাঁট খেয়ে কাজ নেই। আজ আমার ওখানে যা হোক ছুটি মুখে দেবেন। বিদেশে একা আছেন। মাঝে মাঝে তো আমাদের এ সব করার কথা। কিন্তু..."

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে কৌশিকবাবু বললেন, "না না, তাতে কি হয়েছে? কিন্তু আপনি কেন কষ্ট করবেন?"

হা হা করে হেসে বৃদ্ধ হেডমাস্টার মশাই বললেন, "আমার আবার কষ্ট কিসের মশাই? আপনাদের মত দুর্ভাগা তো নই যে হাত পুড়িয়ে রাঁধব কিংবা হোস্টেলের ঠাকুরের রান্না খাব। কিন্তু কাউকে রেঁধে খাওয়াতে বাঙালী মেয়েদের কষ্ট হয় না এই কথাটা আপনাকে আগে ভাগেই বলে দিলাম। আর এ তো মানুষের কর্তব্য। স্নেহ ভালবাসা দয়া মায়া—এই সব বৃত্তির জন্যই তো মানুষে পশুতে প্রভেদ। ভালবাসা না থাকলে মানুষ পশু ছাড়া আর কি?"

কথাটা কৌশিকবাবুর কানে কেমন যেন বেসুরো বাজল। কারণ তাঁর অধ্যয়ন তাঁকে শিক্ষা দিয়েছে যে মানুষের উদ্বর্তনের পথে স্ট্রাগল ফর একজিসটেন্স বা জীবন সংঘর্ষই মুল প্রবর্তনা। বিশ্বজুড়ে এই সংঘর্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। যারা সবল, তারা সংঘর্ষে জয়লাভ করে এগিয়ে চলছে। আর যারা দুর্বল পরাজিত হয়ে তাদের ভুমিশয্যা গ্রহণ করতে হচ্ছে। বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী, মানব—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি জড় ও চেতন পদার্থের উদ্বর্তন বা ক্রমবিকাশের ধারার ভিতর এই সংঘর্ষই ক্রিয়াশীল। এবং প্রকৃতির ভিতর অন্তর্নিহিত এই সংঘর্ষ তরঙ্গের অন্তিম ও যুক্তিসিদ্ধ পরিণতি—শ্রেণী সংগ্রামকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যই তো তাঁদের এই সাধনা।

কিন্তু হেডমাস্টার মশাই-এর এই হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার সামনে এ নিয়ে তখন কোন বিতর্কে অবতীর্ণ হবার আগ্রহ কৌশিকবাবু বোধ করলেন না।

হেডমাস্টার মশাই-এর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় কথাটা কৌশিক-বাবুর মনে পড়ে গেল। কই, ভোলানাথবাবুকে তো দেখা যাচ্ছে না। কি হল ভদ্রলোকের? কথাটা তিনি হেডমাস্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করলেন।

হেডমাস্টার মশাই বললেন, "ও শোনেন নি বুঝি খবরটা। আর কোথা থেকেই বা শুনবেন? আসার পরই তো আপনাকে ঘিরে সব হৈ চৈ জুড়ে দিল।" তার পর সখেদে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "হুঁঃ, তাঁর কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। পাগল মশাই, নিছক পাগল। আপনাকে সাপে কামড়াবার খবর যে দিন পেলাম ঠিক সেই দিনই স্কুলে এসে দেখি তাঁর এক চিঠি। ঠিক চিঠি নয়, পদত্যাগপত্র। তিনি সেই দিন থেকে চাকরিতে ইস্তফা দিচ্ছেন। বেশী কথা লেখা ছিল না তাতে। চিঠি নিয়ে যে ছেলেটি এসেছিল, তার কাছ থেকে খবর পেলাম যে ভোলানাথবাবু সেইদিন ভোর বেলাতেই ট্রেনে রাখামাইন্‌স্ গেছেন। এর দিন দশেক পর তিনি এসে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের নিয়ে গেলেন। পাকাপোক্তভাবে যাবার আগে এসে একবার আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। খ্যাপামি মশাই, নিছক খ্যাপামি। তা না হলে একটা সংসারের দায়িত্ব কাঁধে থাকা সত্ত্বেও বাঁধা আয়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কিনা চাষবাস করতে যায়? শুনলাম রাখামাইন্‌সের কাছে ওঁর এক জ্যাঠামশাই আছেন। তিনি বুঝি বৃদ্ধ বয়সে পাহাড়ের ধারে কি এক আশ্রম করেছেন। ভোলানাথবাবু এখন সপরিবারে সেইখানে থাকবেন এবং চাষবাস করে গ্রামের ছেলেদের শিক্ষা দেবেন। বুঝুন ব্যাপার! চাষ করলে যদি শিক্ষা হত তা হলে দেশের সব চাষীই তো গ্রাজুয়েট।" হা হা করে তিনি আবার হাসতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্ত পর হাসি থামিয়ে শেষ মন্তব্য জুড়ে দিলেন, "দেশের কাজ দশের কাজ করা ভাল বুঝলাম। কিন্তু এই ভাবে নিজের ক্যারিয়ার এবং নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে?"

ঘরে ফেরার পথে কৌশিকবাবুর ঘুরে ফিরে ভোলানাথবাবুর কথাই মনে হচ্ছিল। লোকটা খ্যাপাই বটে! ওঁর খদ্দর পরা, চরখা চালান আর বিচিত্র সব কথাবার্তা—সবই যেন কেমন কেমন। কিন্তু হেডমাস্টার মশাই প্রদত্ত খ্যাপার সংজ্ঞা মেনে নিলে দুনিয়াতে খ্যাপা কে নয়? কৌশিকবাবু মনে মনে চিন্তা করেন। তাঁর নিজের জীবনকাহিনী জানালে হেডমাস্টার মশাই তাঁকেও তো ঐ দলে ফেলবেন। খ্যাপামিতে ভোলানাথবাবুর সঙ্গে কেমন একটা সাদৃশ্য বোধ করলেন কৌশিকবাবু।

॥ সতের ॥

হোস্টেলের এক প্রান্তের একটি ছোট কামরায় কৌশিকবাবু থাকতেন। অনেকদিন ছিলেন না। ঘরের অবস্থা কেমন হয়েছে কে জানে? তা ছাড়া এক গ্লাস জলও খেতে হবে। সূর্য পশ্চিম গগনাভিমুখী হলেও একটা ভ্যাপসা গরমের ভাব রয়েছে। আর এই সর্পাঘাতের ফলে তিনি বেশ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছেন লক্ষ্য করেছেন। এত দিন বিশ্রাম নেবার পরও গায়ে তেমন জোর পান নি। ছাতা মাথায় থাকা সত্ত্বেও স্টেশন থেকে স্কুল এবং স্কুল থেকে হোস্টেল পর্যন্ত আসতে বেশ পরিশ্রান্ত বোধ করছেন।

শিকল খুলে কৌশিকবাবু নিজের কামরায় ঢুকলেন। তালা লাগানর অভ্যাস তাঁর নেই। একটা বড় তালা অহেতুক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর কীই বা খোয়া যাবে? সম্বল তো দুই একখানা কাপড় ও সামান্য একটু বিছানা। পার্টি সংক্রান্ত কাগজপত্র অবশ্য এমন ভাবে থাকে যা খুঁজে বার করা দেবতারও অসাধ্য। জীবনের অনেকগুলো বছর, শুধু তাই বা কেন জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবন এই ভাবেই কেটে গেল। সুতরাং এখানে এই অনিশ্চিত কালের আত্মগোপন করে থাকার পর্বে আর কি সঞ্চয় করবেন? কিন্তু এখন আর কুয়া থেকে জল তুলতে ইচ্ছা করছে না। খাটে খানিকক্ষণ চিৎ হয়ে শুয়ে তার পর যা হোক করা যাবে।

কৌশিকবাবু বিস্মিত হলেন। এবং সত্যি কথা বলতে কি একটু আনন্দও হল। তাঁর কামরাটি পরিপাটী করে ঝাড়ু দেওয়া। তক্তপোশের উপর বিছানা পাতা রয়েছে। বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়াড় ধপধপে করে কাচা। এত দিনের অনুপস্থিতির কোন ছাপ কামরার মধ্যে নেই। এক কোণে একটি কুঁজো রয়েছে। ঢাকনা খুলে দেখেন টাটকা জলে ভর্তি। সস্তা দামের একটি টেবিলের উপর তাঁর কাঁচের গ্লাসটি উবুড় করে রাখা হয়েছে। গ্লাসটিও পরিষ্কার করে ধোয়া। এখনও তার গায়ে জল লেগে রয়েছে। একটু আগেই এসব কেউ করেছে নিশ্চয়। কৌশিকবাবু ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে পরিতৃপ্তি সূচক শব্দ করলেন—আঃ! তার পর হাত পা মেলে দিয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়লেন।

চোখ বুজে আবার তিনি পূর্ব চিন্তায় ফিরে গেলেন। এই অল্প কয়েক দিনে সহকর্মী মাস্টার মশাই এবং ছেলের দল কী স্নেহ ও প্রীতির বন্ধনে তাঁকে বেঁধে ফেলেছে। এর ভিতর যেন জালাবাদ পাহাড়ের লড়াই-এর পূর্বেকার জীবনের ইঙ্গিত। তার পর এতদিন জেল নির্বাসন এবং আত্মগোপন করে

থাকার প্রচেষ্টায় কেটেছে বলে সে স্মৃতিও যেন ক্ষীণ। কিন্তু কৌশিকবাবুদের দর্শনে স্নেহ প্রীতির স্থান কোথায়? সকলেই তো স্বার্থের তাগিদে চলছে। তা হলে এসব কি? বড়দের কথা যাক, যে ছেলেটি শিশুদের স্বাভাবিক প্রবণতা খেলা ছেড়ে স্বেচ্ছায় তাঁর ঘরদোর পরিষ্কার করে কুঁজোয় জল ভরে রেখেছে অথবা যে তাঁর বিছানার চাদর ও ওয়াড় কেচে রেখেছিল, তাদের এই সব কাজের পিছনে কোন্ স্বার্থের প্রেরণা কাজ করেছে? মাস্টার হিসাবে তাঁর কাছে কোন বিশেষ সুবিধা পাবে? দুৎ, এ নেহাত কষ্টকল্পিত ধারণা।

"মাস্টার মশাই, শুয়েছেন নাকি?"

কৌশিকবাবু চোখ মেললেন। হোস্টেলেরই একটি ছেলে সলজ্জ বদনে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

"এস এস, ভিতরে এস। নাম কি তোমার?" কৌশিকবাবু এখনও সকলের নাম ভাল করে জানেন না।

এগিয়ে আসতে আসতে ছেলেটি উত্তর দিল, "আজ্ঞে রতন।"

"বেশ বেশ। তা রতন, ঘর দুয়ার কি তুমিই পরিষ্কার করে রেখেছ নাকি?"

ছেলেটি আবার একটু হাসল। হেসে আস্তে আস্তে সে বলল, "না, আমি একা নই। বাপ্পা, মহেন্দ্র, গুরুদাস—ওরা সকলেও করেছে। আমি খালি চাদর আর ওয়াড় কেচে রেখেছিলাম। যখন ফিরবেন তখন ময়লা চাদরে শুতে খারাপ লাগবে, তাই।"

কৌশিকবাবু উঠে বসে রতনকে বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরলেন। শ্যামবর্ণের শীর্ণ দেহ ছেলেটির চোখ থেকেও স্নেহ ক্ষরিত হচ্ছে। অদ্ভুত কোমল ওর দৃষ্টি।

হঠাৎ রতন একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বলল, "দাঁড়ান মাস্টার মশাই, আপনার একখানা চিঠি আছে। নিয়ে আসি। অনেক দিন হল এসেছে। আমি রেখে দিয়েছি।"

কৌশিকবাবু বিস্মিত হলেন। তাঁর এখানকার এই অজ্ঞাতবাস পর্বে তো কোন চিঠি আসার কথা নয়। উপর থেকে যা কিছু নির্দেশ আসার কথা, তার জন্য তো অন্য বন্দোবস্ত আছে। একটু চিন্তান্বিত হয়েই তিনি ভাবতে লাগলেন যে তা হলে এখানে চিঠি দিল কে?

ততক্ষণে রতন এসে পড়েছে। খামের চিঠি। কৌতূহল-তাড়িত হওয়ায় একটু অশোভন ব্যস্ততা সহকারেই তিনি খামের মুখ ছিঁড়ে ফেললেন।

দীর্ঘ কয়েক পৃষ্ঠার হাতে লেখা পত্র। তাড়াতাড়ি তিনি পাতা উলটিয়ে শেষ পৃষ্ঠায় পত্রলেখকের নাম দেখে নিলেন। কী আশ্চর্য! ভোলানাথবাবু এই দীর্ঘ পত্র দিয়েছেন। কৌশিকবাবু রতনকে বিদায় দিয়ে চিঠি পড়াতে মন দিলেন। ভোলানাথবাবু লিখেছেন :

প্রিয় কৌশিকবাবু,

কথায় বলে সত্য কল্পিত কাহিনীর চেয়েও বিস্ময়কর হয়ে থাকে। আমার বেলাতেও তাই ঘটল দেখছি। নচেৎ ওখানে সহকর্মীদের ভিতর এত জন থাকতেও নবাগত আপনি, আপনাকেই মনের কথা খুলে বলার জন্য এত বড় চিঠি লিখতে বসব কেন? বিশেষতঃ আপনার সঙ্গে যে অল্প কয়েকদিন কথাবার্তা হয়েছে, তাতে আমাদের আলোচনা যে হৃদ্যতার পর্যায়ে পৌঁছেছিল, একথা কেউ কোন মতেই স্বীকার করবে না। আমরা দুজনেই যেন কথার প্যাঁচে কথা কাটার জন্য দুই খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হতাম। কিন্তু ভুমিকা ছেড়ে দিয়ে এবার মুল বক্তব্যে আসা যাক।

এতদিনে আপনি নিশ্চয় আমার 'পাগলামি'র কথা জেনেছেন। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে ঘর করি আমি, আমার কি আর জীবনে নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা পোষায়? কথাটা আমার নয়, আমার সব শুভার্থীই ওখানে আমাকে এই বলে চাকরি ছাড়া থেকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন। আমার কিন্তু আর চাকরি করার উপায় ছিল না। কারণ? কারণ আপনি। চমকে উঠবেন না। ব্যাপারটা খুলে বলছি।

আপনার হয়তো মনে পড়বে যে আমাদের বাড়িতে শেষ যে দিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়, সেদিন উঠে আসার আগে আপনি আমার সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করেছিলেন। আমারই দেওয়া একটি উদাহরণের পুনরাবৃত্তি করে আপনি আমাকে মডার্ন কালিদাস আখ্যা দিয়েছিলেন। যুক্তি দিয়ে আমি যে শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরোধিতা করছিলাম, বাস্তব জীবনে আমার বুদ্ধি ও কর্মশক্তি তারই সম্প্রসারণের জন্য নিয়োজিত ছিল। অতএব আপনার ঐ আখ্যাকে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলব।

কথাটা তৎক্ষণাৎ এমন স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারি নি। আপনার তীক্ষ্ণ সমালোচনা সোজা গিয়ে অন্তরে ভেদ করেছিল। স্বীকার করছি আমার অহমিকা বোধ তখন আহত হয়েছিল, মনে বেশ দুঃখ পেয়েছিলাম। আপনি চলে গেলেন। আমি কিন্তু ঐ অবস্থাতেই বসে মনে মনে আপনার কথার আলোচনা করতে লাগলাম। আঘাতের প্রথম বেদনার তীব্রতা ধীরে ধীরে

কাটার সঙ্গে ক্রমশঃ বুঝতে পারলাম যে আপনি সেদিন আমার কি মহৎ উপকার করে গেলেন।

বিশ্বাস ও আচরণে যাদের সামঞ্জস্য আছে, সেই খাঁটী মানুষ। আমার জীবনে কথা ও কাজের ভিতর একটা প্রচণ্ড বিরোধ ছিল। আমার নিত্যকার জীবনে আমি আমার জীবনাদর্শকে তিলে তিলে খণ্ডন করছিলাম। আপনি সুযোগ্য ভিষগের মত আমার রোগের মূলকারণ নির্ণয় করে দিলেন। ক্রমশঃ আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে উঠল। আজ আমি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে আপনি আমার গুরুর কাজ করেছেন। তত্ত্ব নিয়ে আমাদের ভিতর যতই মতভেদ থাকুক না কেন, আপনার কাছ থেকে আমি তত্ত্বনিষ্ঠ হবার তথ্য পেয়েছি। আপনি আমাকে এক মহৎ শিক্ষা দিয়েছেন।

সেই রাত্রেই আমি চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত করলাম। এবং এও ঠিক করলাম যে নূতন যে শিক্ষার কথা গান্ধীজী বলে গেছেন, ও যার কথা আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম, হাতে কলমে তার বাস্তব রূপায়ণের কাজই আমাকে করতে হবে। এ পথে বাধা আছে প্রচুর। প্রথমতঃ নিজের পরিবার প্রতিপালন সমস্যা। দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণ এখনও পূর্ণ মাত্রায় একে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা ক্রমাগত বিকট থেকে বিকটতর হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশবাসী ও দেশনায়ক—কেউই এই সত্যটি স্বীকার করার সাহস পাচ্ছেন না যে কেবল কেতাবী বিদ্যায় আর চলবে না। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম যুগে এই শিক্ষার ফলে সৃষ্ট অনুৎপাদক বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা চাহিদার তুলনায় কম ছিল বলে তাঁদের তখন স্বর্ণযুগের আবির্ভাব হয়েছিল। আজ ব্যাপক ভাবে স্কুল কলেজ খুলে বুদ্ধিজীবীদের অতি উৎপাদন হচ্ছে বলে চাহিদা ও যোগানের নিয়মানুযায়ী তাঁদের আর সে কদর নাই। আর সহজে উৎপাদকের হারও ক্রমশঃ কমছে বলে তাদের শোষণ করে এঁরা রস পাচ্ছেন ক্রমশঃ কম মাত্রায়। তবু যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সৈনিকদের মত সকলেই ভাবছেন যে আর সকলে ধরাশায়ী হলেও তিনি বোধ হয় বেঁচে যাবেন—তাঁর কপালে বোধ হয় কোন মতে একটা অনুৎপাদক বুদ্ধিজীবীর জীবিকা জুটে যাবে। সুতরাং স্থানাভাবে প্রচলিত পাঠ্যক্রমের অনুসরণকারী স্কুল-কলেজের দরজা থেকে ছাত্র ফিরে গেলেও আমাদের পরিকল্পিত বিদ্যালয়ে বিশেষ কেউ ছেলেদের পাঠাবেন না। মহা বুদ্ধিভ্রম-সঙ্কটের পূর্ববর্তী অবস্থা। তাই কাজ আমার সহজ হবে না, একথা বুঝতে পারছিলাম।

কিন্তু কর্তব্য সহজ হক বা কঠিন হক, মানুষ কোন কাজ উচিত বলে বিবেচনা করলে, তার রূপায়ণের জন্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে, বা হওয়া উচিত। মানুষের ভিতরকার এই মৌলিক বৃত্তি—অনুভূত সত্যকে মূর্তকরণপ্রচেষ্টা তার যাবতীয় প্রগতির মূলে ক্রিয়াশীল। অতএব আমি আমার সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হলাম না। পরের দিন ভোরের ট্রেনে আমি রাখামাইন্‌স্‌ চলে গেলাম এবং প্রতিবেশী একটি ছেলের হাত দিয়ে হেডমাস্টার মশাইএর কাছে আমার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলাম।

রাখামাইন্‌স্‌ স্টেশনের কাছেই শামপুর গ্রাম। এখানে আমার জেঠামশাই শিবচরণবাবু থাকেন। উনি একদা এখানকার কেপ কপার কোম্পানিতে কাজ করতেন। যে অল্প কয়েক জন ধলভূমবাসী সেকালে এণ্ট্রান্স পাশ করেছিলেন, উনি তাঁদের অন্যতম। কেপ কপার কোম্পানি উঠে যাবার পর উনি মৌভাণ্ডারে ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশনে চাকরি করতেন। সেকালে ওঁর মত ইলেকট্রিক মিস্ত্রী এ জেলায় ছিল না বললেই চলে। তার পর অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামেই আছেন। গান্ধীজীর "ব্যাক টু ভিলেজ" আদর্শের জীবন্ত প্রতীক উনি। ছেলেরা বড় হয়ে এধারে ওধারে চাকরি করতে গেছে; কিন্তু উনি পারত-পক্ষে গ্রাম ছেড়ে যান না। গ্রামের সাঁওতাল ভূমিজ মাহাত ও গৌড় চাষী মজুরদের সঙ্গেই ওঁর হৃদ্যতা। চরখা খদ্দর আর গ্রামসেবা নিয়ে উনি আছেন। সত্যি কথা বলতে কি আমার চরখা খদ্দরের প্রথম পাঠ ওঁর কাছ থেকেই পাওয়া।

জেঠামশাইএর নিজের কিছু জমিজমা আছে। তাতে ওঁর আর জেঠীমার চলে যায়। ছেলেদের কাছ থেকে উনি সাহায্য নিতে চান না এবং তাদেরও জমির আয়ের প্রয়োজন নেই। ওঁর কাছে গিয়ে গান্ধীজীর পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থার রূপায়ণের প্রস্তাব করতে এবং বিশেষতঃ চাকরি ছেড়ে আমি এই কাজের ভার নিতে প্রস্তুত জেনে উনি হৃষ্টচিত্তে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আর বললেন ওঁর জমিতে ভাল ভাবে খাটতে পারলে আর কয়েকটা প্রাণীরও মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সুতরাং নূতন সমাজের জন্য নবীন মানুষ সৃষ্টির কাজে আমি এখানে এসে পড়েছি। আমার অগ্নিপরীক্ষার এই তো সবে শুরু। তাই সাফল্য বা ব্যর্থতার কথা এখনই বলতে পারব না। কিন্তু এর তাত্ত্বিক বনিয়াদ সুদৃঢ় বলে অটল বিশ্বাসে কাজ করে যাচ্ছি। আপনার প্রেরণাতেই আমার জীবনের স্ববিরোধ ঝেড়ে

ফেলে এখানে আসতে পেরেছি বলে একমাত্র আপনার কাছেই এত সব কথা লিখলাম।

এখানে দিন দশেক থাকার পর যখন স্ত্রীপুত্রদের আনার জন্য ধলভূমগড় গেলাম, তখনই আপনার খবর পেলাম। শুনলাম আপনি জামসেদপুরে কোন আত্মীয়ার বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। সেখানকার ঠিকানা জানি না বলে ধলভূমগড়ে চিঠি দিলাম। খুব কপালক্রমে আপনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তিনি আপনাকে দিয়ে আরও কোন মহত্তর কাজ করাতে চান নিশ্চয়। এই দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ায় আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং বিদেশে আত্মীয়বিহীন অবস্থায় আপনাকে যে শারীরিক পীড়ন সহ্য করতে হল, তার জন্য আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি। প্রার্থনা করি আপনি অনতিবিলম্বে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন।

সর্বশেষে একটা অনুরোধ করব ? একবার সুযোগ করে দুই-এক দিনের জন্য এখানে আসুন। সত্যি বলছি খুব খুশী হব। আপনার প্রভাব কেমন কাজ করছে দেখে যান একবার। রাখামাইন্‌সে জেঠামশাইএর নাম করলে যে কেউ তাঁর বাড়ি দেখিয়ে দেবে। নূতন জীবনের অনভ্যস্ত জীবনযাত্রার পরিশ্রম ও ব্যবস্থাপনার হাঙ্গাম অনেক। তাই আমি যে কবে আবার ওখানে যেতে পারব জানি না।

মাঝে মাঝে আপনার কুশল সংবাদ পেলে বড়ই আনন্দিত হব। প্রীতি-নমস্কার জানাই। ইতি—

কৌশিকবাবু পত্র পড়া শেষ করলেন। পত্রের বক্তব্য, বিশেষ করে ভোলানাথবাবুর কাজ সম্বন্ধীয় অংশ তাঁর মনে বাদবিতণ্ডার ঝড় তুলছিল। তাই এর জবাব দিতে গেলে মতভেদের কথা না লিখে উপায় নেই। কিন্তু তবু তিনি মনে মনে স্থির করলেন যে সময় করে দুই ছত্র লিখবেন। ভোলানাথবাবুর পত্রের ছত্রে ছত্রে অভিব্যক্ত আন্তরিকতা তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছে। যাই হক না কেন ওঁর ডায়নামিক অর্থাৎ প্রাণোচ্ছল স্বভাব কৌশিকবাবুকে আকৃষ্ট করেছে। একে উপেক্ষা করা যায় না। আর এই রকম লোককে যদি নিজের মতে আনা যায় তা হলে তো কথাই নেই। কিন্তু তার পূর্বে নিজের কাজের খবর নিতে হবে। যে কোন মুহূর্তে নির্দেশ এসে যেতে পারে। শেষ আঘাত হানবার জন্য তাঁদের এতদিনের

সযত্নে প্রস্তুত অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে। কৃষক ও শ্রমিক ফ্রণ্টের সঙ্গে মাঝে অনেক দিন যোগাযোগ ছিল না। তার অবস্থাও জেনে নিতে হবে।

॥ আঠার ॥

সূর্য পশ্চিম গগনপটে অস্তাচলে চলে গেছে। গোধূলির আভাস সমগ্র ধরণীর বক্ষ জুড়ে। ঊর্ধ্ব আকাশের মাঝে মাঝে স্তবকিত মেঘপুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে বিদায়ী দিবাকরের রক্তিম রশ্মির শেষ প্রভা। সোনার সিঁড়ির মত সেই সুদীর্ঘ পাণ্ডুর আলোকরেখা ঈষৎ ছায়াচ্ছন্ন ধরিত্রীর অঞ্চল স্পর্শ করার জন্য নীচে নেমে এসেছে। নীড়গামী বিহগকুলের মধুর কাকলী দিবাবসানের শেষ আরতির মত। কৌশিকবাবু পথ চলা ভুলে ক্ষণিকের জন্য মুগ্ধ নেত্রে নিসর্গ শোভার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন।

মোটরটা ঘ্যাঁচ করে কৌশিকবাবুর পাশে এসে ব্রেক করে থামল। "গুড আফটারনুন কৌশিকবাবু, কবে এলেন এখানে?" মোটর থামিয়ে হাসিমুখে এলসি প্রশ্ন করল। ডিউকও গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে মোটরের পিছন থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়েছিল। এবং তার পর বিনা ভূমিকায় কৌশিকবাবুর কোমর বরাবর সামনের পায়ের দুই থাবা রেখে তাঁর বুকের কাছে মুখ নিয়ে লম্বা জিভ বার করে হাঁপাতে লাগল। উভয়বিধ আকস্মিকতায় কৌশিকবাবু একটু হত-চকিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই এলসির ধমক শুনে ডিউক যখন আবার সুড় সুড় করে গাড়ির পিছন দিকে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল, তখন তিনি একটু স্বাভাবিক বোধ করলেন।

কিন্তু এমন অতর্কিতে এলসির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, একথা কৌশিকবাবু কল্পনা করেন নি। তবু দেখা হওয়াতে তিনি প্রসন্ন হলেন। ধলভূমগড় স্টেশনে নামার পর থেকে তাঁর জীবনদাত্রী এলসির সঙ্গে একবার দেখা করা একটা কর্তব্য বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু যাদের সঙ্গে তাঁর আজীবন সংগ্রাম—সেই ধনিক সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি এবং বিশেষ করে মোহনপুরের খাদানের মালিকদের বাড়ি যাবার কথা ভাবতেই তিনি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছিলেন। উভয়ের পৃথক ও পরস্পরবিরোধী শ্রেণীস্বার্থ যেখানে মুখ্য সম্বন্ধ, সেখানে এই মধ্যযুগীয় হৃদয়বৃত্তি সঞ্জাত

কৃতজ্ঞতাবোধ ইত্যাদিকে যে কতটুকু স্বীকৃতি দেওয়া উচিত—তা তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

তাঁদের টেকনিক হচ্ছে টোটাল ওয়ার বা সর্বব্যাপী যুদ্ধধর্মী। পুঁজিপতিদের সঙ্গে যেখানে যেখানে সংযোগের অবকাশ আসবে, সেইখানেই সংঘাত সৃষ্টি করতে হবে, আঘাত হানতে হবে। এ বিষয়ে আপস করা মানে সমগ্র বিপ্লবের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করা। এ জাতীয় প্রতিক্রিয়াশীলতা ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিস্ট আখ্যাধারী নিবীর্য বুর্জোয়া এজেন্টদেরই শোভা পায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর পার্টির শিক্ষার কথা মনে পড়ে গেল। যুদ্ধপূর্ব জার্মানীতে তাঁদের পার্টি রক্তের অক্ষরে এই জীবন-সত্যের প্রতিপাদন করে গেছে। ছদ্মবেশী পুঁজিপতিদের দালাল জার্মান সোসাল ডেমোক্র্যাটরা ছিল তাঁদের পয়লা নম্বরের দুশমন। ওদের সঙ্গে লড়ে ওদের খতম করার পরই নাৎসীদের সঙ্গে সংগ্রাম করার কথা আসে।

কিন্তু তাঁর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। এলসির প্রশ্ন শেষ হয় নি। কৌশিকবাবুকে নিরুত্তর দেখে সে আবার জিজ্ঞাসা করল, "কই, এসে কোন খবর দিলেন না তো? রাস্তায় এমনি ভাবে দেখা না হলে জানতেই পারতাম না যে আপনি এসে গেছেন।" শেষের দিকে ওর কণ্ঠস্বর কেমন যেন একটু পরিবর্তিত হয়ে গেল।

কৌশিকবাবু একটু বিস্মিত হলেন। কিন্তু সে বিস্ময়কে প্রশ্রয় না দিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি উত্তর দিলেন, "এই তো মাত্র আজ দুপুরে এসেছি। এখনও ভাল করে হাঁটতে চলতে পারছি না বলেই কোথাও যাবার কথা ভাবি নি। খবর নিশ্চয় দিতাম সময় মত। কেবল অনেক দিন চলার অভ্যাস ছিল না বলে বিকেল বেলায় হোস্টেল থেকে এইটুকু হেঁটে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। তা আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

কেমন অজান্তেই কৌশিকবাবুর মুখ দিয়ে শেষের প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল। এতখানি অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করার কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। কিসের জন্যই বা তিনি এই শ্রেণীর প্রতিনিধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে যাবেন? কিন্তু তবু একটা সহজ ভদ্রতাবোধ যেন তাঁকে দিয়ে কথা কয়টি বলিয়ে দিল।

"আমি—আমি গিয়েছিলাম আমাদের ছোটবাবুকে নিয়ে ঐ মানুষমুড়িয়ার দিকে আমাদের বুরুহাতুর খাদানের কাজ দেখতে। এইবার ফিরছি। কিন্তু এদিকে তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এই অন্ধকারে আর আপনার বেরিয়ে কাজ নেই। এবার বাড়ির দিকে চলুন।"

মোটরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। কৌশিকবাবু এক পা এগিয়ে এলসিকে লক্ষ্য করে বললেন, "হ্যাঁ ফিরব এবার। আচ্ছা আসি, তা হলে মিস মুর। গুড ইভনিং।"

"তার মানে?" এলসি অকৃত্রিম বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকাল। "এখন এই অন্ধকারের মধ্যে হেঁটে ফিরবেন নাকি? আমার গাড়ি রয়েছে কি জন্য?"

সঙ্কুচিত ভাবে কৌশিকবাবু বললেন, "না না। এইটুকুর জন্য আবার গাড়ির কি দরকার? এটুকু আমি বেশ হেঁটে চলে যেতে পারব।"

এলসি কৃত্রিম গাম্ভীর্যে অভিভাবকোচিত কণ্ঠে জবাব দিল, "আপনার দরকার না থাকলেও আমাদের দরকার আছে। আসুন গাড়িতে উঠুন।" তার পর ঈষৎ হেসে বলল, "গড ফরবিড, আবার যদি আপনাকে রাস্তায় বেহুঁশ অবস্থায় দেখি, তা হলে আমাকেই তো এখন গাড়ি নিয়ে ছুটতে হবে। আমাকে ছুটোছুটি করিয়ে আপনার কি খুব আনন্দ হবে?" শেষের কথাটা বলে ফেলার পর এলসি একটু থমকে গেল। ছিঃ, কথাবার্তা বড় বেশী ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। কি ভাববেন উনি? তা ছাড়া গাড়ির পিছনে তাঁদের একজন কর্মচারী অপর একজন পুরুষ রয়েছেন না? মাঝপথেই নিজের উচ্ছ্বাসের রাশ টানল এলসি।

কৌশিকবাবু কয়েক মুহূর্ত ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পর কি ভেবে ধীরে ধীরে সামনের দিকে চালকের আসনের পাশে গিয়ে বসলেন।

কতটুকুই বা পথ? একটানা যান্ত্রিক গর্জন শোনা ছাড়া এই সময়টুকু নীরবেই কেটে গেল। কেবল এলসির প্রসাধনের সেই মন-মাতান সুরভির মৃদু গন্ধ অবিরল প্রবাহে তাঁর নাক দিয়ে বুকের ভিতর ঢুকছিল। কিসের একটা নেশায় কৌশিকবাবু যেন বুঁদ হয়ে রইলেন।

হোস্টেলের বারান্দার সামনে গাড়ি থামল। বারান্দার উপর লণ্ঠন হস্তে কে একজন দাঁড়িয়েছিলেন। গাড়ি থামতেই তিনি মোটরের কাছে এগিয়ে এলেন। একজন নয়, জন তিনেক। লণ্ঠনধারী হেডমাস্টার মশাইএর সঙ্গে হোস্টেলের দুটি ছাত্রও ছিল।

হেডমাস্টার মশাই স্নেহমণ্ডিত ধমকের সুরে বললেন, "আপনি আবার রাতের বেলায় এই রকম ভাবে বেরিয়েছেন? নাঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। নিন চলুন এবার। যা হোক দুটি মুখে দিয়ে বেশী রাত হবার আগে ফিরে আসবেন।"

গাড়ি থেকে নামতে নামতে অনুতপ্ত কণ্ঠে কৌশিকবাবু বললেন, "কতক্ষণ এসেছেন? দেখুন তো আমার জন্য আপনাকে কত হাঙ্গাম পোয়াতে হল।" তার পর এলসির দিকে ফিরে তার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য বললেন, "আর তা হলে আপনাকে আটকে রাখব না মিস মূর।"

হেডমাস্টার মশাই প্রশ্ন করলেন, "এঁকে কোথা থেকে ধরে আনলেন মিস মূর? আপনি না নিয়ে এলে আমাকে যে আরও কতক্ষণ বসে থাকতে হত। আমার উপকার করার জন্য আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।"

এলসির সঙ্গে সকলের আলাপ না থাকলেও এখানকার শিক্ষিত মহলে সে অল্পবিস্তর পরিচিত। তার পর কৌশিকবাবুর ঐ ঘটনার পর সে শিক্ষক-সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রিয়পাত্রী।

"না না, ধন্যবাদ দেবার কি আছে? আমি বাড়ি ফিরছিলাম। পথে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাই এইটুকু পথ পৌঁছে দিলাম। তা আপনারা এখন তো আপনার বাড়িতেই যাবেন। একটু ঠেসাঠেসি করে এই গাড়িতেই চলুন না। আমাদের মোহনপুরে যাবার পথেই তো আপনার বাড়ি।"

কৌশিকবাবুকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে হেডমাস্টার মশাই বললেন, "এ তো অতি সাধু প্রস্তাব; কারণ এখন বেশী হাঁটা ওঁর উচিতও নয়। কিন্তু আপনাকে এত কষ্ট দিতে বড় সঙ্কোচ হচ্ছে মিস মূর।"

হেডমাস্টার মশাইকে উদ্দেশ করে এলসি বলল, "বাড়ি যাবার পথে আপনাদের নামিয়ে দেব, এতে আর কষ্ট কি? আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। নিন, আসুন এদিকে। কৌশিকবাবু, আপনি নিজের জায়গায় বসুন। হ্যাঁ একটু চেপে বসবেন এদিকে, হেডমাস্টার মশাইকেও সামনে নিয়ে নেব। কোন ভয় নেই। জিপে বেশী যাত্রী হলেই সুবিধা—গাড়ি চলে ভাল।"

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি হোস্টেলের বারান্দার সামনে দিয়ে এক পাক ঘুরে বড় রাস্তায় পড়ল।

দুটো হেড লাইটের জলন্ত চক্ষুর ভয়ে অন্ধকারের কাল ভূতগুলো রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সত্রাসে দূরে সরে যাচ্ছে। ওদের রাজত্ব তছনছ করে দিয়ে যন্ত্র-শকট বিপুল গর্জনে পথ চলেছে।

কৌশিকবাবু এক রকম মৌনী হয়ে বসে আছেন। কথাবার্তা এলসি এবং হেডমাস্টার মশাই-এর সঙ্গেই চলছিল। কৌশিকবাবু কদাচিৎ হ্যাঁ না জাতীয় জবাব দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। বেশী নড়ে চড়ে বসার জায়গা নেই। এলসির কাঁধের সঙ্গে তাঁর কাঁধ মিলে গেছে। স্টিয়ারিং হুইল

ঘুরোবার সময় মাঝে মাঝে তার কনুই এসে কৌশিকবাবুর বাহু স্পর্শ করছে। কী কোমল স্পর্শ! ঘাটশীলা থেকে এলসির পাশে বসে জামসেদপুর যাবার দিন প্রথম যে সুগন্ধীর সৌরভ নাকে গিয়েছিল, আজও ওর সেই অঙ্গরাগ—সেই নাম-না-জানা সুরভি থেকে থেকে মনকে মাতাল করে দিচ্ছে।

কৌশিকবাবুর মনে চিন্তার লহরী উঠছিল। কেন এলসি তাঁর সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলছে? কিসের জন্য ও তাঁর একটুখানি সুবিধা করে দিতে উৎসুক? এলসি কি কৌশিকবাবুর গোপন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন আভাস পেয়েছে?··· না, তার তো কোন সম্ভাবনা নেই। তা হলে এর অর্থ কি? তিনি সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং এলসি শোষণকারীদের মুখপাত্রী। উভয়ের মধ্যে সাধারণ মিলনভূমি থাকার তো কোন অবকাশ নেই।

"আসুন কৌশিকবাবু, নামা যাক।"

কৌশিকবাবুর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। হেডমাস্টার মশাইএর বাড়ি পৌঁছে গেছেন তাঁরা। বাড়ির সামনের বারান্দায় একটি লণ্ঠন রাখা ছিল। হেডমাস্টার মশাই তাড়াতাড়ি গিয়ে কৌশিকবাবুকে পথ দেখাবার জন্য সেটি মোটরের কাছে নিয়ে এলেন।

কৌশিকবাবু হেডমাস্টার মশাইএর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হাতে ধরা লণ্ঠনটি উঁচু করে ধরে এলসির সঙ্গে কথা বলছেন। লণ্ঠনের আলো কৌশিকবাবুর মুখে পড়েছে।

এলসি তখন হেডমাস্টার মশাইকে বলছিল, "না না, মিস্টার মুখার্জী আজ নয়। অন্য একদিন যাব আপনাদের বাড়িতে। আজ অনেক দূর থেকে আসছি। একবার স্নান করতে না পারলে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না। আজ আসি আমি। আচ্ছা, গুড নাইট মিস্টার মুখার্জী। গুড নাইট কৌশিকবাবু, গুড নাইট।"

গর্জন করে এলসির গাড়ি এগিয়ে চলল। নরসিংগড়ের শেষ প্রান্তে এসে আবার গাড়ি থামল। এলসির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিভাস পিছন থেকে নেমে পড়ল। তার পর ঈষৎ খোঁড়াতে খোঁড়াতে বড় রাস্তা ছেড়ে গলি পথ ধরে এগোতে লাগল। এরই ভিতর তার বাসা। একটা চিন্তা আজ কিছুক্ষণ হল ওর মাথায় আলোড়ন তুলেছে—রহস্যের একটা ধূম্রজাল কৌশিকবাবুকে দেখার পর মুহূর্ত থেকেই ঘুরপাক খেয়ে ওর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করার চেষ্টা

করছে। কিন্তু কেবলই কি রহস্য? তার পিছনে একটা বহুদিনের পিপাসিত হৃদয়ের আকুল আর্তি কি নেই? নিখিলদার কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গেই তো স্বাহার কথা মনে পড়ে যায়। স্বাহা, স্বাহা! কী মিষ্টি নাম, কত প্রতীক্ষায় অধীর আর কত কামনায় ব্যাকুল। গাড়ির পিছনে নিঃশব্দে বসে এতক্ষণ ও এই কথাই ভাবছিল। তালা খুলে ঘরে ঢোকার পর চিন্তাটা আরও যেন চেপে ধরল। উপায় থাকলে বিভাস আজই যেত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাই স্থির করল যে পরের দিন বিকেলে এই গ্রন্থি-মোচনের প্রয়াস করতে হবে।

এলসির গাড়ি ততক্ষণে মোহনপুরের বাঁকের মুখে মোড় ফিরছে। কিছুক্ষণ হল হঠাৎ কি একটা লঘু উচ্ছ্বাস এলসির বুকের ভিতর যেন পাক খেয়ে বেড়াতে শুরু করেছে। অনেক দিন পর লণ্ডনের ফেলে আসা শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতি বুঝি মনে পড়ে গেল। কেন যেন তার ইচ্ছা করে ছেলেবেলার মত গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে নাচতে। কিন্তু সে সব কিছু না করে সে সস্মিত বদনে শেলীর "টোয়াইলাইট" থেকে গুন্ গুন্ করে আবৃত্তি করতে থাকে:

When I arose and saw dawn,
I sigh'd for thee;
When light rode high, and the dew was gone,
And noon lay heavy on flower and tree,
And the weary Day turn'd to his rest,
Lingering like an unloved guest,
I sigh'd for thee.

॥ উনিশ ॥

ঘরের জানালা দিয়ে কৌশিকবাবু বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতির দিকে চেয়ে ছিলেন। শেষ শরতের বৃষ্টি। অল্প বর্ষণেই তার শক্তি ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি তারই প্রভাবে স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ। অপরাহ্ণের সোনালী রৌদ্রে বৃক্ষ লতা পাতা যেন বাসকসজ্জা পরেছে। দূরে মাঠে রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি খেলা দেখে উল্লসিত ধানের গাছগুলি যেন হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। রঙ্গরসে পরস্পরের গায়ে একেবারে এলিয়ে পড়ছে হরিৎশীষভারে আনত

সুপুষ্ট চারাগুলি। উপরে পেঁজা তুলার মত বর্ষণক্লান্ত মেঘের দল নিরুদ্দেশের যাত্রী।

হস্তধৃত কাগজগুলির দিকে আর একবার তাকালেন কৌশিকবাবু। পার্টির গোপন সার্কুলার। তেলেঙ্গানা নীতি ও তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সরকারী দমন যন্ত্রের পেষণে পড়ে পার্টির অবস্থা শোচনীয়। অচিরাৎ অক্টোবর বিপ্লবের মত এ-দেশেও ক্ষমতা হাতে এসে যাবে এ-আশা তেমন বলিষ্ঠ কণ্ঠে আর ব্যক্ত করা যাচ্ছে না। মত ও পথ নিয়ে পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যেই যেন বুদ্ধিভেদ দেখা দিয়েছে। ভারতীয় কমরেডদের এই দুর্দিনে চিরকালের মত আজও গ্রেট ব্রিটেনের কমরেডরা পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। কৌশিকবাবু জানেন যে কমিণ্টার্ন বা তার আধুনিক স্বরূপ কমিনফর্মের নির্দেশ বরাবরই তাঁরা লণ্ডনের মারফত পেয়ে আসছেন। সুতরাং কমরেড দত্তের যে থিসিস পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীদের কাছে এই গোপন সার্কুলার দ্বারা প্রেরিত হয়েছে, তার বিশিষ্ট মূল্যের কথা কৌশিকবাবু উপলব্ধি করতে পারেন।

কমরেড দত্তের মতে পার্টির অনেকগুলি ভুল হয়েছে। প্রথমতঃ পার্টি ভারতের প্রায় ঔপনিবেশিক অবস্থা বুঝতে পারে নি ও এ-দেশে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী শক্তিদের সংহত করতে অসমর্থ হয়েছে। পার্টি মার্কসবাদ লেনিনবাদের অর্থ যথাযথ ভাবে না বুঝে অহেতুক জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করার দাবি নিয়ে গোঁড়ামি করে সম্পন্ন চাষীদের শত্রুভাবাপন্ন করে তুলেছে। এ ছাড়া বিগত কয়েক মাসে পার্টি শ্রমিক ক্ষেত্রেও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে। ভারতীয় পার্টির সবচেয়ে বড় ভ্রম হয়েছে নূতন চীন ও কমরেড মাও-সে-তুং-এর ভ্রমাত্মক মূল্যায়ন। সুতরাং কমিনফর্মের মুখপত্রের ২৭শে জানুয়ারী ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের সেই ঐতিহাসিক নির্দেশনামার সঠিক ব্যাখ্যা করে কমরেড দত্ত প্রস্তাব করেছেন যে চীনের পথই মুক্তির একমাত্র উপায়। তা ছাড়া ভারতীয় পার্টিকে কোরিয়ার যুদ্ধ, নেহরু-স্ট্যালিন প্রস্তাব ইত্যাদি সম্বন্ধে সচেতন হতে আহ্বান করা হয়েছে এবং নেহরু ভারতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষাকারী হলেও আপাতত তাকে না খুঁচিয়ে তার চেয়েও অধিক প্রতিক্রিয়াশীল প্যাটেলের ঈঙ্গ-মার্কিন জোটে ভেড়বার গোপন অভিসন্ধি বানচাল করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পার্টির পূর্বতন সম্পাদক "ভিউ" নামক বুলেটিনে পার্টির যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তা অনেকাংশে সত্য বলে মন্তব্য করার পর কমরেড

দত্ত ইতিমধ্যে বিতাড়িত পার্টির সভ্য ও কর্মীদের সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করারও প্রস্তাব করেছেন।

দীর্ঘ সার্কুলারের পৃষ্ঠাগুলি ওলটাতে ওলটাতে কৌশিকবাবু মনে মনেই চিন্তা করছিলেন যে নিঃসন্দেহে এ এক ঐতিহাসিক মূল্যবিশিষ্ট দলিল। এখন ডিসেম্বর মাসে সেণ্ট্রাল কমিটির যে সভা হবে, তার কি নির্ণয় হয় তা-ই লক্ষণীয়।

ঠক্ ঠক্ করে ভেজান দরজার বাইরে শব্দ হল। কৌশিকবাবু চমকে উঠে অতি দ্রুত হাতের কাগজগুলি বিছানার তলে রেখে দিলেন। তার পর কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক করার প্রয়াস করে বললেন, "হ্যাঁ, ভিতরে এস।"

কোন ছাত্র নিশ্চয়; কিন্তু তবু সাবধানের মার নেই।

ঘরের দরজা খুলে গেল। কৌশিকবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখলেন যে আগন্তুক তাঁদের ছাত্র নয়। একজন যুবক। যুবকটি খোঁড়াতে খোঁড়াতে কৌশিকবাবুর দিকে এগোতে লাগল। ঠক্ ঠক্—ওর ভারী চলন সিমেণ্টের মেঝেতে প্রতিধ্বনি তুলছে।

ঠক্ ঠক্—কৌশিকবাবুর হৃৎপিণ্ডের গতি উদ্দাম হয়ে উঠেছে। নিজের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে চেয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনি মানে আপনাকে তো…"

তাঁর কণ্ঠে উত্তেজনার সুস্পষ্ট আভাস।

"আমি মিস মুরদের খাদানের ছোটবাবু বা মেট, যাই বলুন—বিভাস সোম। কাল সন্ধ্যায় মিস মুরের সঙ্গে আমিও ছিলাম। তবে গাড়ির পিছন দিকে বসেছিলাম এবং পায়ের এই অসুবিধার জন্য বেশী ওঠা নামা করতে পারি না বলে আপনি আমাকে দেখতে পান নি। আমি কিন্তু আপনাকে লক্ষ্য করেছিলাম।"

"বসুন বসুন বিভাসবাবু। আমার কাছে হঠাৎ কি মনে করে?" কৌশিকবাবু তাকে চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে বিছানার উপর বসতে বসতে অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

বিভাস ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করল। তার পর দুই এক মুহূর্ত নীরবে নড়াচড়া করে কৌশিকবাবুর মুখের দিকে ঋজু দৃষ্টিতে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, "আমাকে আপনি বলছেন কেন? আচ্ছা আমাকে কি আপনার একেবারেই মনে নেই?"

"তার মানে?" কৌশিকবাবু যেন তড়িতাহত হলেন। নিজ আসনে

একেবারে সোজা হয়ে বসে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তিনি আগন্তুকের দিকে তাকালেন। শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ার পূর্বে পশুরাজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন উন্মুখ হয়ে ওঠে, চোখের দৃষ্টি যেমন একাগ্র ও তীক্ষ্ণ হয়, তেমনি তাঁর অবস্থা।

সেই দৃষ্টির সামনে বিভাস কেমন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। সে তাড়াতাড়ি বলে, "অবশ্য কলকাতায় সেই শেষ দেখা হয়েছিল বছর পাঁচ ছয় আগে। এর পর এত দিন হয়ে গেল, তাই মনে থাকার কথা নয়। আর তা ছাড়া আপনি আমাদের স্টাডি সার্কেলে বার দুয়েকের বেশী আসেনও নি। তার পর—তার পর স্বাহা কাকদ্বীপে চলে গেল, আর আপনিও তখন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে।"

মুখে অন্তরঙ্গতার একটু হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বিভাস বলতে লাগল, "আমি অবশ্য তখন বিদ্যাসাগর কলেজের স্টুডেণ্টস সেলের ইনার সার্কেলের সদস্য এবং ফেডারেশনের কর্মী। পার্টির প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমরা সে সময় সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সভা আর শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করে চলেছিলাম। কারণ একটা পেলেই হল। ১৯শে জুন আমরা এম. বি. বি. এস. পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবিতে ইউনিভারসিটি সিণ্ডিকেটের সদস্যদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলাম। সাড়ে চার ঘণ্টা পরে পুলিস এসে কিছু ছেলেকে গ্রেপ্তার করল এবং তার পর আমরা ইঁট পাথর আর সোডার বোতল দুশমনদের উপর ছোঁড়ায় পুলিস শেষ পর্যন্ত লাঠি চার্জ করে সবাইকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। শেষের দিকে আবার কিছু ছেলে গ্রেপ্তার হয়। তা হক, আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু সফল হয়েছিল। এর প্রচারমূল্যের কথা যদি ছেড়েও দিই, তা হলেও নীট লাভ হল এই যে আমাদের ঐ দিনকার আন্দোলনের ফলে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটি বিভাগ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়ায় নূতন শোভাযাত্রী পাবার ব্যাপারে বেগ পেতে হয় নি আর।"

একটু দম নিয়ে বিভাস আবার বলল, "আমি ছিলাম গ্রেপ্তারী ছাত্রদের দ্বিতীয় দলের ভিতর। অবশ্য দমদম জেলের ভিতরও আমরা পার্টির নির্দেশ অনুসারে বিপ্লব শুরু করে দিলাম। কয়েক জন কমরেড অনশন ধর্মঘট শুরু করল এবং আমরা কয়েক জন কমরেড এক দিন সন্ধ্যায় ওয়ার্ডে বন্ধ হতে অস্বীকার করলাম। ফলে শেষ পর্যন্ত গুলি চলল।"

আবার একটু থেমে বেদনাতুর কণ্ঠে বিভাস বলতে লাগল, "আমরা

ঠিক বুঝতে পারি নি যে ব্যাপারটা এত ঘোরালো হয়ে উঠবে। যাই হক শেষ অবধি তিন তিন জন কমরেড শহীদ হল এবং আরও সতের জনের সঙ্গে আমিও আহত হলাম। তেইশ দিন পর জেল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম; কিন্তু তার পর আর সোজা হয়ে হাঁটতে পারি নি।" ছোট্ট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিভাস তার বক্তব্য শেষ করল।

"আচ্ছা, তুমি তবে আমাদের ছাত্র ফ্রণ্টের কর্মী।" কৌশিকবাবুর কণ্ঠে এতক্ষণে নিশ্চিন্ততার স্থর ধ্বনিত হল।

"হ্যাঁ, কেবল আমি নই, আমার দাদাও পার্টির কাজ করতে করতে শহীদ হয়েছেন। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে রাইটার্স বিল্ডিং-এ অভিযানকারীদের উপর যে গুলি বর্ষণ হয়, তার প্রথম শহীদ প্রভাস সোমের কথা নিশ্চয় আপনার মনে পড়বে। দাদার মৃতদেহ নিয়ে যে শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল, তাতে পার্টির অনেক নেতৃস্থানীয় কমরেডও যোগ দিয়েছিলেন।"

"ও, কমরেড প্রভাসের ভাই তুমি। মনে পড়ছে যেন এবার তোমাকে। খুব ভাল—তুমি তো আমাদেরই এক জন তা হলে।"

"কই আর এখন আপনাদের এক জন নিখিলদা?"

"শ্—শ্। ও নাম আর নেই। আমি এখন কৌশিক।" কৌশিকবাবু বিভাসকে সতর্ক করে দেন।

"ও হ্যাঁ, এখন আর পার্টির কাজ করতে পারছি কই। দমদম জেলে থাকতেই দাদা মারা গিয়েছিলেন, আর জেল থেকে ছাড়া পাবার দেড় মাস পর বাবাও হঠাৎ মারা গেলেন। স্থতরাং আমাকে সংসার চালানর চেষ্টায় কলকাতা ছাড়তে হল। মা আর ছোট ছোট ভাই বোনদের মুখ চেয়ে এই অরণ্যবাস বরণ করে নিয়েছি। কংগ্রেসী দস্যুদের গুলি আমার কেরিয়ার একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে কৌশিকদা। কত আশা ছিল যে বিপ্লবীদের দলে একদিন আমিও নিজের স্থান করে নেব। মেহনতী জনতার বিজয়-কেতন রূপে ভারত-জোড়া যে বিশাল রক্তপতাকা উড়বে, তার স্তম্ভ ধারণ-কারীদের ভিতর আমার এই হাত দুখানাও থাকবে। কিন্তু ইঙ্গমার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের দালাল কংগ্রেসী সরকার আমার সে আশা অঙ্কুরে বিনাশ করে দিয়েছে। বিপ্লবের জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ হবার পরিবর্তে আমি এখন আমার এই খোঁড়া পা নিয়ে বিদেশী পুঁজিপতি মিস মূরের মুনাফার হিসাব রাখছি।"

বিভাসকে সান্ত্বনা দিয়ে কৌশিকবাবু বললেন, "দুঃখ করো না ইয়ং কমরেড। বিপ্লবীদের অভিধানে অনুতাপ বলে কোন শব্দ নেই। আমাদের

অর্থাৎ কমিউনিস্টদের উপর একটা মহান ঐতিহাসিক দায়িত্ব বর্তেছে। আমরাই সর্বপ্রথম ইতিহাসের যথার্থ গতিপথ আবিষ্কার করেছি আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে। আমরা বুঝেছি যে সামন্তবাদের পর যেমন পুঁজিবাদের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, তেমনি সমাজের এই পুঁজিবাদী অবস্থার পর আমাদের অর্থাৎ কমিউনিস্টদের রাজত্বের অভ্যুদয়ও পূর্বনির্ধারিত ঘটনা। পৃথিবীকে পুঁজিবাদের কবলমুক্ত করার এই অবধারিত কার্যক্রমের আমরা সৈনিক। আমাদের স্ট্রাটেজিও সৈনিকদের মত—তেমনি কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও বিনা প্রশ্নে সেনাপতির হুকুম তামিল করা। আর সৈনিক প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনে হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধ করুক বা শত্রু-শিবিরে আত্মগোপন করে ওদের সংহতিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার প্রয়াস করুক, সে অভিন্ন উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ একই সেনাবাহিনীর সৈনিক। এই বিশ্বজোড়া সেনাবাহিনী অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির কাছে কোন সৈনিকই তুচ্ছ নয়। পার্টির কাঠামোর ভিতর সকলের সুষ্ঠু ও যথোপযুক্ত স্থান রয়েছে।"

"পার্টি এত দূরের কথা কল্পনা করে তার কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে?"

কৌশিকবাবু মৃদু হাসলেন। তার পর হাসিমুখে বিভাসকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার জন্য বলতে লাগলেন, "দেখ আর্থিক এবং রাজনৈতিক অবস্থাই আইডিয়ার জনক। আর পার্টি সমাজের পরিণতি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে আর এই পরিণতিকে কার্যান্বিত করার ক্ষমতাও রাখে, তা হলে এই উভয়বিধ উক্তির তর্কসিদ্ধ পরিণতি হচ্ছে এই যে পার্টি আইডিয়া সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে ও তাকে স্বীকার করার ক্ষমতা রাখে।

"যে কোন ঐতিহাসিক যুগের উপযোগী আইডিয়া সমূহই হচ্ছে সে যুগের সত্যকার আইডিয়া। অতএব পার্টি যে সব আইডিয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং যাদের মূর্ত করে তোলে, সেইগুলিই হচ্ছে সে যুগের পক্ষে একমাত্র সত্য। আবার সেই জন্য কমিউনিস্ট পার্টি জানে যে সত্যের বন্ধ বাক্স খোলার চাবিটি একমাত্র তারই হাতে আছে এবং তাই পার্টি কখনও ভুল করতে পারে না। এই জন্যই আমরা আবার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের পাথেয় স্বরূপ তাদের কাছে এই সর্ব সামান্য আইডিয়া বা পার্টি লাইন উপস্থাপিত করি। এতে তাদের স্বকীয় প্রতিভার স্ফুরণের পথ অধিকতর সহজ হয়ে যায়। যাই হক, ক্রমশঃ আমাদের ক্লাসিক যত পড়বে, পার্টি ও তার কর্মীদের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারবে। এখনকার মত ভূমিকা স্বরূপ এইটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু যা

বলছিলাম—সৈনিকেরা যে যেখানে থাকুক পার্টি আমাদের সদুপযোগ করার ব্যবস্থা করে নেয়।"

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব রইলেন। তার পর একটু ইতস্তত করে বিভাস প্রশ্ন করল, "স্বাহা—মানে কমরেড স্বাহা কোথায় আজকাল? মানে পুরোন কমরেডরা কে যে কোথায় আছে! পেটের দায়ে কলকাতা ছাড়ার পর আর তো কারও সঙ্গে যোগাযোগ নেই বিশেষ…"

"স্বাহা—ও তো কাছেই আছে—জামসেদপুরে। ওখানকার মেয়েদের স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েছে ক'মাস হল। আমি তো এই এত দিন ওর ওখানেই ছিলাম।" কৌশিকবাবু ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে জবাব দেন।

বিভাসের মুখমণ্ডল নিমেষে পাংশুবর্ণ ধারণ করে; কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। তার পর তার মনে একটা আনন্দলহরী খেলে যায়। কাছেই তো রয়েছে। যে কোন এক দিন দেখা করলেই হল। উঃ, কত দিন পর আবার দেখা হবে! কলকাতায় ছাত্রজীবনে আর পার্টির কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্বাহার সঙ্গে যে……

"কি ভাবছ কমরেড?"

বিভাস চমকে ওঠে। কৌশিকবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। স্বাহার কথা চিন্তা করতে করতে বিভাস যেন মুহূর্তে এই পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোন্ স্বপ্নালোকে উধাও হয়ে গিয়েছিল।

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে হাসি টেনে এনে বিভাস বলল, "আপনারই কথা ভাবছি কৌশিকদা। ইয়ে—কাল আপনাকে দেখার পর থেকেই ভাবছি যে আপনি মিছামিছি এখানে আত্মগোপন করে বসে নেই। আপনার এখানকার অবস্থান একটা মহত্তর মিশনের অঙ্গ। আমিও আপনাদের এক নগণ্য কমরেড কৌশিকদা। তাই আমার ঐকান্তিক আগ্রহ এই যে আমাকেও পার্টি যৎকিঞ্চিৎ কাজের ভার দিয়ে আবার আমার যোগ্যতা সপ্রমাণ করার সুযোগ দিক। খুনী কংগ্রেসীদের অত্যাচারের কথা ভুলতে পারি না। ওরা ভেবেছিল যে জনগণের শোভাযাত্রার উপর গুলি চালিয়ে বা তরুণ কমরেডদের হত্যা করে আমাদের কণ্ঠরোধ করবে। কিন্তু ওরা ভুলে যায় যে বৈপ্লবিক আইডিয়ার বিনষ্টি সাধন করার ক্ষমতা কোন সরকারের যাবতীয় অস্ত্রাগারের শক্তির বহির্ভূত। তা হলে বাস্তিল চুর্ণবিচুর্ণ হত না, তা হলে জারের বংশধরদের রক্তস্রোতে রাশিয়ার মাটি

লালে লাল হত না। অস্ত্র দিয়েই যদি আমাদের দমন করা যেত, তবে মার্কিন হাতিয়ার আজ চ্যাং-কাইশেককে টিকিয়ে রাখত। আইডিয়া দুর্জয় এবং আজকের আইডিয়ার গতিনির্ধারণকারী হচ্ছে আমাদের পার্টি।” শেষের দিকে বিভাস একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

কৌশিকবাবু শান্ত দৃঢ় স্বরে বললেন, “কোন চিন্তা করো না। তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমার কাজ সহজতর হল। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আমাদের যে রণভেরী বাজছে তার প্রতিধ্বনি ভারতের এই প্রত্যন্ত প্রদেশেও তোলার জন্য পার্টির নির্দেশে আমি এখানে এসেছি। তুমি হবে এ কার্যে আমার অন্যতম সহায়ক।”

॥ কুড়ি ॥

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সভা দুপুরে শেষ হয়ে গেছে। বিকেলে ছাত্র-সভাও সারা হল। অবশ্য এগুলিকে ঠিক সভা বলা চলে না। স্বাহারা প্রকাশ্য জনসভা অনুষ্ঠানের অনুকূলে নয়। পার্টির কাছ থেকে আপাততঃ সে রকম নির্দেশ নেই। তাঁরা করছিলেন গ্রুপ মিটিং। এতে মন খুলে ঘনিষ্ঠ ভাবে আলোচনার সুযোগ পাওয়া যায় এবং তার ফলে কর্মী সংগ্রহেও সুবিধা হয়।

চাঁইবাসায় স্বাহার এই প্রথম আগমন। সিংভূম জেলার সদর, পাহাড়ে ঘেরা ও তরুবীথিকায় ভরা এই ছোট্ট শহরটিতে ওদের পার্টির কোন কার্যকলাপ ছিল না। কিন্তু এখান থেকে মাইল কুড়ি দক্ষিণে রয়েছে ঝিঁকপানির সিমেণ্ট কারখানা। সেখানকার হাজার দুই শ্রমিকের ভিতর ওদের পার্টির কাজ শুরু হয়ে গেছে। তারও দক্ষিণে নোয়ামুণ্ডি, গুয়া এবং বড়জামদার লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজের খাদান।

জামসেদপুরের কারখানার কাজ বানচাল করতে হলে নোয়ামুণ্ডির খনি-শ্রমিকদের হাত করা দরকার। কিন্তু ওখানকার আই. এন. টি. ইউ. সি-র কর্মীদের প্রভাব স্বাহারা কিছুতেই হ্রাস করতে পারছে না। গুয়া এবং বড়জামদাতে তারা একটু একটু করে প্রবেশ লাভে সমর্থ হচ্ছে। ওখানে ঘাঁটি গড়তে পারলে বাঙলাদেশের বার্নপুরের কমরেডদেরও সুবিধা হবে। কারণ বার্নপুরের কারখানাকে লোহা পাথরের জন্য এখানকার এই দুই খাদানের উপর নির্ভর করতে হয়। চাঁইবাসার পশ্চিম দিকে রয়েছে

রেলওয়ের ডিস্ট্রিক্ট অফিস ও রেলকর্মীদের এ অঞ্চলের সর্ব বৃহৎ কলোনী চক্রধরপুর। চক্রধরপুরে স্বাহাদের পার্টির তরফ থেকে কমরেড মজুমদার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই তিনি রেলের একটা ইউনিয়নের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। আরও পশ্চিমে রয়েছে মনোহরপুর ও চিড়িয়ার ম্যাঙ্গানিজ ও বক্সাইট ইত্যাদির খাদান।

প্রকৃতি এই অরণ্যভূমি সিংভূমের উপর অকৃপণ হস্তে খনিজ সম্পদ বর্ষণ করেছে। সিংভূমের কৃষ্ণকায় হৃষ্টপুষ্ট সন্তান—কোল সাঁওতাল আর ভূমিজদেরই মত অরণ্যের গহনে লুক্কায়িত থাকে প্রকৃতির এইসব অবদান। কিন্তু এর কোনটিই এখানকার ভূমিপুত্রদের ভোগে লাগে না। এই অমূল্য সম্পদ এতদিন ভোগ করে এসেছিল বিদেশী বণিকের দল। আর এখন সুদূর রাজস্থান বোম্বাই অথবা পাঞ্জাব ইত্যাদি থেকে আগত ব্যবসায়ীরা এখানে আসে বৎসরান্তে নিজেদের পুঁজি দশগুণ করে নেবার জন্য। প্রকৃতির দুলাল সিংভূমের আদিবাসীরা পাহাড় কেটে তৈরী লাল পাথুরে মাটির ছোট ছোট ঊষর ক্ষেতের বুকে দেহের ঘাম ঝরাতে ঝরাতে সে দৃশ্য দেখে। আর লক্ষ্মীর এই ভাণ্ডার আহরণ কার্যে যদিও বা ওদের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়, তবে তা চিনির বলদ রূপে। বণিকের সিন্দুকে ওদের মুনাফার বোঝা বহন করে পৌঁছে দেবার পারিশ্রমিক তারা পায় দৈনিক বার চোদ্দ আনা মজুরি।

এদের জাগ্রত করে সুসংগঠিত করে পার্টির ছত্রছায়াতলে এনে পার্টির নির্দেশে ও নেতৃত্বে এক দিন শোষণকারীদের উপর শেষ আঘাত হানার প্রস্তুতি করার জন্য স্বাহার এখানে আগমন। এরা যুগ-যুগের অজ্ঞানতার অন্ধকারে এমন গভীরভাবে নিমজ্জিত যে এদের জাগান সহজ ব্যাপার নয়। এই কর্মের প্রথম ধাপ হিসাবে এদের নেতৃত্ব করবার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে কর্মী সংগ্রহ করতে হবে। ধীরে ধীরে এই সব কর্মী সিংভূমের আরণ্য অধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে তবেই সম্ভব হবে এদের পার্টির পতাকা-তলে সঙ্ঘবদ্ধ করা।

চাঁইবাসা এর অনুকূল স্থান। একে তো শহরটি এ অঞ্চলের প্রায় কেন্দ্রস্থলে, দ্বিতীয়তঃ এখানে বহুদিন যাবত বাঙালী মধ্যবিত্তদের একটি ভাল অংশের বাস। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হবার জন্য একদা এঁরাই উকিল মোক্তার এবং ডাক্তার ইত্যাদির পেশায় অদ্বিতীয় ছিলেন। আর সরকারী দপ্তরগুলিতেও ছিল এঁদেরই প্রাধান্য। এখন

বিহারেও ইংরাজী শিক্ষার ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের বিশেষ রাজনৈতিক সুবিধা থাকার জন্য তারা চাকরি ইত্যাদির ক্ষেত্র থেকে ক্রমশঃ বাঙালীদের সরিয়ে দিচ্ছে। ফলে শিক্ষিত বাঙালীদের ভিতর বেক রত্ব ও তৎসঞ্জাত হতাশার ভাব দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। স্বাহা জানে যে এদের ভিতর থেকে শক্তি সংগ্রহ করে পার্টির পরিপুষ্টি সাধন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। বেকার ও হতাশ যুবকরা মরিয়া হলে যে কোন হঠকারিতা করতে পরাঙ্মুখ হয় না। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি এক অপরিসীম বিদ্বেষ তাদের মনে বাসা বাঁধে। এরাই হচ্ছে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ।

স্থানীয় উকিল অনুপমবাবুর বাড়ি মীনাক্ষী ও অনন্তের সঙ্গে স্বাহা উঠেছিল। ভদ্রলোকের স্বাহাদের প্রতি সহানুভূতি আছে। অনন্ত ঘরে নেই। অনুপমবাবুর ড্রয়িং রুমে স্বাহা একটি কৌচে চুপচাপ বসে ছিল। বসে থাকলেও কিন্তু স্বাহার মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় ছিল না। কত চিন্তার তরঙ্গ একের পর এক স্বাহার চেতনার তটে আঘাত করছিল। স্বাহা ভাল ভাবেই জানে যে এই সব মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি আর ছাত্র ফেডারেশনের আলোচনা-চক্র নেহাত একটা বাহ্য ক্যামোফ্লাজ। আসল কাজ হচ্ছে বিপ্লবের বীজ বপন করা এবং তার জন্য আরও অধিক সংখ্যায় বিপ্লবী সংগ্রহ করা।

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। ভিতর দিক থেকে মীনাক্ষী ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করছে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, "আচ্ছা দিদি, আমাদের জামসেদপুরে ফেরার ট্রেনের তো এখনও ঘণ্টাদেড়েক দেরি আছে। কাছেই মেয়েদের স্কুলের হোস্টেল। কয়েকটি মেয়ে আমাকে ওদের ওখানে যেতে বলেছিল। আমি অনুপমবাবুর বোনকে নিয়ে ওখানে যাই একবার। কিছু বই বিক্রি হতে পারে।"

স্বাহা মৃদু হাস্যসহকারে ওর বক্তব্য সমর্থন করে বলল, "নিশ্চয় যাবে। এই জন্যই তো তোমাদের দুজনকেও প্রতি রবিবারে এবার থেকে আমার সঙ্গে নিয়ে বেরোব ভেবেছি। দেখি, আজ কয়জনের সঙ্গে ভাব করে আসতে পার।"

মীনাক্ষী হৃষ্টচিত্তে কাঁধে বই-এর ব্যাগ ঝুলিয়ে নিয়ে আবার ভিতর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। স্বাহার মনে হল যে ওর এই কয় মাসের জামসেদপুর বাসের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই মেয়েটি। উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এ যেন প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা। মীনাক্ষীকে দেখলেই কি যেন একটা অব্যক্ত ভাবের আবেগে স্বাহার হৃদয় পরিপ্লুত হয়ে যায়। ইচ্ছা করে মেয়েটিকে সজোরে বুকের সঙ্গে চেপে থাকে।

"স্বাহাদি, স্বাহাদি।"—অনন্তর কণ্ঠস্বর। কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে সে ঘরে ঢুকল। "এদের আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে নিয়ে এলাম। এরা সব এখানকার জেলা স্কুলের ছাত্র।"

স্বাহা ভাল করে ওদের দিকে তাকাল। অনন্তর সঙ্গে চারটি ষোল-সতের বছরের ছেলে। এক জন অপরিচিতা মহিলার সঙ্গে কথা বলতে হবে চিন্তা করে কেমন একটা নিষ্পাপ লজ্জা ওদের কিশোর মুখগুলিকে ঘিরে ছড়িয়ে রয়েছে। দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপে ওরা স্বাহার কাছে এগিয়ে এল।

"বসো, বসো তোমরা সকলে।" স্বাহা ওদের সামনের খালি চেয়ারগুলি দেখিয়ে দিল।

অনন্ত ওদের সকলের নাম ও কোন্ ক্লাসে তারা পড়ে সে খবর স্বাহাকে জানাল। তার পর বলল, "এদের মধ্যে দু জন আজ আমাদের ছাত্রসভায় ছিল। এরা কিছু কিছু কাজ করতে রাজী হয়েছে।"

"খুব ভাল কথা। তবে প্রথমে আমাদের বই পত্র কিছু পড়ে নাও। কারণ কাজে নামার পূর্বে কাজের ধরন ও তার লক্ষ্য সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হওয়া দরকার—নয় কি ?"

ওদের মধ্যে একজন অনুচ্চ স্বরে বলল, "তা তো বটেই।"

স্বাহা আবার বলল, "আর প্রথমাবস্থায় আমার মতে বিচারধারা জানাটাই একটা কাজ।"

অকস্মাৎ ব্যস্ত ভাবে অনন্ত বলল, "স্বাহাদি, এই বিমলকে না পরশু দিন পুলিস মেরেছে। এই দেখুন ওর কপালে ব্যাটনের দাগ।"

"কেন কি হয়েছিল ?" স্বাহার কণ্ঠে কৌতূহল ও সহানুভূতির সুর।

"বল না বিমল, কংগ্রেসীদের জুলুমের কথা খুলে বল।" অনন্ত তাকে তার কাহিনী বলার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

বিমল ধীরে ধীরে তার লজ্জার কাহিনী, মার খাওয়ার ইতিহাস বিবৃত করে। পরশু সকালে সে যখন বাজারে যাচ্ছিল, তখন দেখল যে করোনেশান পার্কে যাবার রাস্তার পাশে লোক জমে গেছে। রাস্তার দুই ধারে পুলিস পাহারা দিচ্ছিল। লোকজন বলাবলি করছিল যে নটার সময় এই পথে রাঁচী ও চক্রধরপুর হয়ে লাটসাহেব আসবেন। বাবার অফিসে যাবার তাড়া এবং তাকেও স্কুলে যেতে হবে। বাজার করে নিয়ে গেলে মা রান্না শেষ করবেন। তাই গভর্নর সাহেবকে দেখার জন্য তার অপেক্ষা করার সময় ছিল না।

সে তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে বাজারে যাবার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু রাস্তার পুলিসেরা তাকে বাধা দিয়ে রূঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দিল যে সে সময় রাস্তা পার হওয়া চলবে না। গভর্নর সাহেবের গাড়ি না যাওয়া পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ তাকে প্রায় ঘণ্টা খানেক দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। গভর্নর সাহেবের রাস্তা এড়িয়ে বাজারে যাবার আর একটি পথ ছিল। সেটি মাইল খানেক ঘুরে। অর্থাৎ বাজার যেতে আসতে মাইল দু-এক রাস্তা বেশী হাঁটতে হবে, পনের মিনিটের কাজের জন্য এক ঘণ্টা সময় লাগবে।

পুলিসের রূঢ় ব্যবহারে বিমলের মন বিরূপ হয়েই ছিল, তার উপর বাজারে যাবার পথে এই বাধা সৃষ্টি হওয়ায় স্বভাবতই সে বিরক্তি বোধ করল। এ কী অন্যায় ব্যবস্থা। এক জনের জন্য শত শত জনকে এই দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে! অবিচারের প্রতিবাদ করার উগ্র ইচ্ছা ওর তরুণ রক্তে আগুন ধরিয়ে দিল। টহলরত জনৈক পুলিস অফিসারকে লক্ষ্য করে সে বলল, "এ কী অন্যায় আপনাদের? আমার কাজ রয়েছে। কেন যেতে দেবেন না আমাকে রাস্তার ওপারে?"

এত বড় স্পর্ধা! এক রত্তি ছেলে সরকারের জীবন্ত প্রতিনিধি পুলিস অফিসারের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে? তাও প্রদেশের শ্রেষ্ঠ নাগরিকের সুরক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে? এ জাতীয় বেআইনী কাজকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। সরকারী কর্মচারীর কর্তব্য সম্পাদনে বাধা দান তো প্রচণ্ড রকমের কগনিজেবল অফেন্স। অতএব সরকারের মূর্ত প্রতিনিধি সরকারী কর্তব্য-পালনের পবিত্র দায়িত্বে প্রণোদিত হয়ে হাতের ব্যাটনটি দিয়ে সজোরে দুই ঘা কষিয়ে দিলেন অন্যায়ের প্রতিবাদাকাঙ্ক্ষী কিশোরটির ললাটদেশে এবং তার পর তাকে শ্লেষ ভরা কণ্ঠে বললেন, "কিঁউ, অব মালুম হুয়া কিঁউ রাস্তা বন্ধ হ্যায়?"

কথা কটি বলার সময় লজ্জায় অপমানে বিমলের চোখের কোণে জল দেখা দিল। দৈহিক ব্যথা এখন চলে গেছে, কিন্তু অপমানের বেদনা যে সহজে যায় না।

সর্বশেষে বিমল বাষ্পরুদ্ধ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, "আপনাকে কি বলব স্বাহাদি, ওখানে অতগুলো লোক ছিল; কিন্তু আমার সমর্থনে কেউ টুঁ শব্দটি করল না।"

স্বাহাও কয়েক মুহূর্ত গুম হয়ে রইল। কিশোর প্রাণের অপমানের

এ বেদনা তার হৃদয় স্পর্শ করেছিল। অবশেষে ধীরে ধীরে সে বলল, "এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা দেওয়াই তো আমাদের সাধনা। আমরা সেই দিনের আবির্ভাবের জন্য কাজ করে যাচ্ছি, যে দিন এরা সকলে এই জাতীয় অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠবে।" কথা বলতে বলতে স্বাহা নিজের আসন ছেড়ে পায়ে পায়ে বিমলের কাছে উঠে গেল। তার পর তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "এ চোখের জলকেও সঞ্চয় করে রাখতে হবে ভাই। একে বারুদে রূপান্তরিত করতে হবে। তার পর এক দিন সেই বারুদ দিয়ে অন্যায়কারীদের তাসের কেল্লাকে কুটি কুটি করে আকাশে উড়িয়ে দিতে হবে।"

সমস্ত ঘরে একটা গম্ভীর থম্‌থমে ভাব। স্বাহা ধীরে ধীরে এসে আবার নিজের চেয়ারে বসল।

আগন্তুক একটি ছেলে নিম্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে, "এত সব পুলিস দিয়ে লাটসাহেবকে ঘিরে রাখার দরকার কি?"

বিদ্রূপের ভঙ্গীতে অনন্ত বলে, "জনপ্রিয় লাটসাহেবের নিরাপত্তা!"

উত্তেজিত কণ্ঠে বিমল বলল, "নিরাপত্তা না ছাই। এই দেখ না, আমাদের এখানকার এক ভদ্রলোক পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী হয়েছেন। এর আগে তিনি অতি সাধারণ উকিল ছিলেন। পায়ে হেঁটে সারা শহরে ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী হবার পর-মুহূর্ত থেকেই তাঁর প্রাণের মূল্য কী এমন বেড়ে গেল যে তাঁর ঘরের সামনে চব্বিশ ঘণ্টা চারটে বন্দুকধারী সিপাই মোতায়েন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ল?"

অপর একটি ছেলে বলল, "এ সব সিপাই সান্ত্রীদের খরচও তো আমরাই যোগাচ্ছি।"

স্বাহা চমৎকৃত হচ্ছিল। এই তো বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ আত্মপ্রকাশ করা শুরু করেছে। ইতিহাস নিজের কাজ নিজেই করে চলেছে। পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার গলিত দুর্নীতিপূর্ণ রূপের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে বিদ্রোহী তরুণ সৃষ্টি। আর এই নূতন যুগের সঙ্গে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়িতে মত্ত শাসক দলের যোগাযোগ নেই। পুঁজিবাদীদের সংরক্ষক, সাম্রাজ্যবাদী বিলাস ও আড়ম্বরের ধ্বজাধারী কংগ্রেসী সরকার স্বয়ং নিজের মৃত্যুর আয়োজন করে চলেছে। "পুঁজিবাদীরা নিজেরাই নিজেদের কবর খনন করে"—মার্কসের এই অমর উক্তি বৃথা যাবার নয়। নচেৎ কে ভেবেছিল যে চাঁইবাসার মত ক্ষুদ্র শহরে প্রথম দিনেই এই রকম কটি

বহ্নিশিখার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। স্বাহা বেশ বুঝতে পারছে যে দেশের কোণে কোণে তরুণ সম্প্রদায়ের মনে এইভাবে স্বতঃই শত শত বিপ্লবীর জন্ম হচ্ছে। স্বাহাদের কাজ কেবল এদের সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করে শেষ নির্দেশের ক্ষণে কর্মে প্রবৃত্ত করা।

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে গাড়ি চলেছে। ট্রেনের শেষের দিকে স্বাহাদের এই কামরায় বাতি নেই। ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেনে এ দুরবস্থা নিত্যকার ব্যাপার। কামরায় বিশেষ ভিড় না থাকায় স্বাহা একটা কোণে হেলান দিয়ে বেঞ্চের উপর দুই পা ছড়িয়ে বসেছিল। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সে আকাশ-পাতাল ভেবে চলছিল।

ট্রেনটা যেন নিরুদ্দেশ-যাত্রা করেছে। সামনে পিছনে গভীর অন্ধকার। দক্ষিণ বাম—সেখানেও অন্ধকার রাক্ষসী তার অনন্ত মুখ-বিবর মেলে বিরাজ করছে। এ যাত্রার যেন কোন লক্ষ্য নেই, যতি-বিরতি-বিহীন অবিরাম অনির্দিষ্ট যাত্রা। গভীর অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে কয়েকটা আলোর স্ফুলিঙ্গ জোনাকির মত কয়েক লহমার জন্য দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এঞ্জিনের চিমনি থেকে ধোঁয়ার সঙ্গে যে জ্বলন্ত কয়লার ফুলকি ওড়ে, কতটুকুই বা তার পরমায়ু! কাল সমুদ্রের অনন্ত পরিধির সঙ্গে তুলনা করতে হলে গণিতের কোন সংখ্যা দিয়েই তো তার অস্তিত্বের ব্যাপ্তির পরিমাপ করার কথা কল্পনা করা যায় না। অদ্ভুত প্রশ্ন—তাদের ভবিষ্যৎ কি, স্বাহার নিজের ভবিষ্যৎ কি?

অনুপমবাবুর স্ত্রী রমা দেবীর মত বাঁধা ছকে তো তার জীবন চলছে না যে এর শুরু দেখেই শেষ পরিণতি সম্বন্ধে চোখ বুজে ভবিষ্যদ্বাণী করে দেওয়া যায়। স্বাহা রমা দেবীকে বাজিয়ে দেখার জন্য আজ মহিলা সংগঠনের কাজে একটু সময় দিতে অনুরোধ করেছিল। অবশ্য অনুরোধটা এমন নৈর্ব্যক্তিক ভাষায় করা হয়েছিল যে তার প্রত্যাখ্যান গায়ে না লাগে। আর কাজই বা কি? কিছুটা সময় নিজের ঘর গৃহস্থালির সঙ্কীর্ণ পরিসর ছেড়ে একটু মুক্ত হাওয়ায় আসা। এতে তাঁরই মঙ্গল; আর কিছু না হক নিত্যকার সাংসারিক ঝামেলার হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্য তো নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। কিন্তু মহিলা তাঁর প্রস্তাব এড়িয়ে গেলেন। একটু হেসে তিনি জবাব দিলেন, "আমাদের দ্বারা দিদি কি আর ও সব কাজ হবে? আমরা একেবারে সংসারের পোকা হয়ে গেছি। রান্না-বাড়ার কাজ করতে না

হলেও বাচ্চার হাঙ্গামা আর সংসারের খুঁটিনাটি সামলাতেই দিন উত্‌রে হয়ে রাত যায়। হুঁঃ, আমরা কি আর দেশের দশের কাজ করার ভাগ্য করে এসেছি?"

বললেন বটে মহিলা এ কথা; কিন্তু তাঁর কণ্ঠে মোটেই ক্ষোভের স্বর ধ্বনিত হল না। কোলের বছর দেড়েকের শিশুটির গাল টিপে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বেশ তৃপ্তিমাখা গদ্‌গদ কণ্ঠে মহিলা তাঁর সাংসারিক ঝামেলার কথা আউড়ে গেলেন। একটু বুদ্ধি থাকলে যে কেউ বুঝতে পারবে যে এ ঝামেলায় তাঁর দুঃখ তো নেই-ই, বরং স্বাহার মনে হল যে এর জন্যে তাঁর মনের এক কোণে যেন একটু প্রচ্ছন্ন গর্বের ভাবও রয়েছে।

আচ্ছা স্বাহারও যদি এমনি ভবিষ্যৎ হয়? ওদের বিপ্লব না হয় সফল হয়ে গেছে। দীর্ঘ দিন ধরে জীবনের শ্রেষ্ঠকাল যৌবনকে উপবাসী রেখে স্বাহা যে সংগ্রাম করে চলেছিল, তা না হয় সার্থক হল। তার পর কি করবে স্বাহা? ঘর করবে—কিন্তু কার সঙ্গে? পর পর দুখানি মুখ তার মনের পটে ফুটে উঠেই পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটি মুখ—যে আকুল হয়ে স্বাহাকে চেয়েছিল। স্বাহার উপেক্ষা বুকে নিয়ে সে চলার পথের কোন্ বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অপর একটি অতি পরিচিত হলে কি হবে—ও যেন মরুমায়া। যতই স্বাহা ওর কাছে ছুটে যায়, ভাবে এইবার বুঝি করতলগত হল, অমনি মোহভঙ্গ হয়। দেখা যায় মরীচিকার মত সে তেমনি দূরে। কেবল এই পশ্চাদ্ধাবনের প্রয়াসে পিপাসাই বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু ছি, ছি, ছি! নিমেষে স্বাহা লজ্জায় যেন মরে যায়। নিজের মনে এখনও বুর্জোয়া সংস্কারের ছাপ? ঘর বাঁধা? কী লজ্জা, কী ঘেন্নার কথা! তা ছাড়া কাকে নিয়ে ঘর বাঁধার দিবাস্বপ্ন সে দেখছে। না, না—স্বাহা অন্ধকারের মধ্যেই আপন মনে মাথা নাড়তে নাড়তে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল—না, না। একজন কমরেডের প্রতি অপর একজন কমরেডের যেটুকু আকর্ষণ থাকতে পারে, তার চেয়ে এক তিল বেশী টান স্বাহার নেই।

নিজের কাছেই স্বাহা নিজে ওকালতি করতে থাকে। অহেতুক টান কেন থাকবে? বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিতা স্বাহার জীবনের ধ্রুবতারা—মানবমুক্তির চেয়ে কি বিশেষ কোন ব্যক্তির কাছে বিশেষ একটা সম্বন্ধের টান বড় হবে? তা ছাড়া ঘর বাঁধার মানেই তো রমা দেবীর মত আষ্টেপৃষ্ঠে সংসারের বন্ধনে জড়িয়ে নিজের ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং শুধু তাই বা কেন,

সকল রকমের স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেওয়া। এত দিনের শিক্ষা সত্ত্বেও এই জাতীয় পাতি বুর্জোয়া চিন্তাধারা তার মনে আসা তো উচিত নয়। কিন্তু…কিন্তু ঘুরে ফিরে আবার সেই নিষিদ্ধ চিন্তা—রমা দেবীর গৃহস্থালি, নধর একটি শিশুর কথা—স্বাহাকে আক্রমণ করে কেন? যুক্তিতর্ককে বার বার পরাস্ত করে বিবরবাসী সর্পের মত ঐ দুষ্ট চিন্তা কেন স্বাহার মনে থেকে থেকে মাথা তোলে?

ঐ প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য স্বাহা বিপ্লবোত্তর ভারতের কথা ভাবতে আরম্ভ করে। স্বাহা, মানে কমরেড স্বাহা নিশ্চয় তখন কোন দায়িত্বশীল রাষ্ট্রীয় পদে নিযুক্ত হবে। একটা কি দুটো লাল তারা তার জামায় আঁটা থাকবে—স্বাহার সংগ্রামী জীবনের স্বীকৃতি। পিপলস কমিশনার? না, অত উঁচু পদের আশা সে করে না। তবে বিহার বা বাঙলার রিপাবলিকের শাসন পরিষদে একটা আসন সে নিশ্চয় পাবে। আর পার্টির ভিতরও তার একটা বিশিষ্ট স্থান থাকবে। সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজে, সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাজ অ্যাংলো-মার্কিন ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করার জন্য সোভিয়েৎ দেশের নেতৃত্বে যে বিশ্বজোড়া গণমুক্তি ফৌজের সংগঠন হচ্ছে, তাদের ভিতর কমরেড স্বাহাও একজন গণ্যমান্য সেনানী হবে। প্রয়োজন পড়লে সোভিয়েৎ-এর মেয়েদের মত সেও বোমারু বিমানের পাইলট হয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, অথবা তার ট্যাঙ্কের চাকা সাম্রাজ্যবাদীদের ভাড়াটিয়া খুনেদের পিষে মারবে।

কিন্তু তার পর? তার পরও যে একটা তার পর থেকে যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্বে কৃষক শ্রমিকদের রাজত্ব স্থাপিত হবার পর নিজের এই অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে কি করবে স্বাহা? সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজে কি সেই রোমাঞ্চ আছে, যা আজ তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? তখন কি হবে?

আর একটা চিন্তা বিষাক্ত সরীসৃপের মত স্বাহার বুকের ভিতর কিলবিল করে উঠল। কি হবে পুনর্গঠনের কাজে? তার নিজের কি লাভ এতে? স্বাহা যে সমস্ত জীবন এই ভাবে বিপ্লবের কাজ করল, তার জন্য কি একটা বিশেষ পুরস্কার সমাজের কাছ থেকে তার পাওনা হবে না? কেন সে একটু বেশী করে ভোগ করবে না? এত দিনের উপবাসের জন্য ক্ষতিপূরণ আশা করা কি অনুচিত? কিসের টানে সে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধন করবে। স্বাহা তো আর গেরুয়া কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী নয়। ওদের তত্ত্বদর্শন,

ঐ ত্যাগের বাণী সে অন্তর থেকে ঘৃণা করে—স্বাহা বৈজ্ঞানিক জড়বাদী। কেন সে তার সংগ্রামকালীন জীবনের নিরুপায়তা-জনিত কৃচ্ছ্রতার শোধ পরে সুদে আসলে তুলে নেবে না? কিসের বিনিময়ে, কোন্ আকর্ষণে?

মীনাক্ষীর উচ্চ কণ্ঠের হাস্য স্বাহার চিন্তায় ছেদ টেনে দিল। খিল খিল করে হাসতে হাসতে সে কৃত্রিম শাসনের সুরে বলছে, "এই অনন্ত, ভাল হবে না বলছি। ঐ চিমটি কাটা ভূতকে আমি চিনি। ফের যদি ও ভূত চিমটি কাটে, তা হলে অন্ধকারের মধ্যে একটা পেত্নী ঐ ভূতটাকে আঁচড়ে কামড়ে দিতে পারে।" অনন্তও মীনাক্ষীর কথা শুনে হেসে উঠল।

"কি রে মীনা, কি হয়েছে?" ওদের খুনসুটি দেখে স্বাহার কণ্ঠেও কৌতুক ভর করেছে। বেশ আছে এ দুটি। কোন চিন্তা ভাবনার বালাই নেই।

"দেখুন না দিদি এই অনন্ত না…"

"দেখুন না দিদি এই মীনাক্ষী না…"

দু জনেই সমস্বরে কথা বলতে বলতে স্বাহার পাশ ঘেঁষে বসে।

গুম্ গুম্ গুম্, গুম্ গুম্ গুম্—খড়কাই-এর পুলের উপর দিয়ে ট্রেন চলেছে। ওদিকে সাউথ পার্ক আর কদমার বাড়িগুলি বৈদ্যুতিক আলোকের সজ্জায় ইন্দ্রের অলকনন্দাপুরীর মত রূপ ধারণ করেছে। স্বাহা দুই হাতে ওদের দু জনকে জড়িয়ে ধরে সে দিকে চেয়ে রইল।

খট্ খট্ খটাং খট্। জুগসেলাই-এর লেভেল ক্রসিং পার হয়ে গেল।

স্বাহা বলল, "নাও অনন্ত, এবার দেখ আমাদের ব্যাগ দুটি ঠিক আছে কি না? ভাল কথা, মীনাক্ষীকে বার্মা মাইনসে পৌঁছে দিচ্ছ তো তুমি? আমার আর যেতে ইচ্ছা করছে না আজ।"

অনন্ত সোৎসাহে বলল, "তার জন্য আপনি কোন চিন্তা করবেন না দিদি। আমি ওকে ঠিক মত পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যাব।"

বাস থেকে নেমে সারা দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত স্বাহা ধীর পদক্ষেপে ওর কোয়াটার্সের দিকে চলল। ট্রেনের চিন্তা এখনও এলোমেলো ভাবে ওর মস্তিষ্কে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু বাগানের গেট খুলতে গিয়েই স্বাহা চমকে উঠল। ওর কোয়াটার্সের বারান্দায় অন্ধকারের মধ্যে কে বসে রয়েছে? পার্টির কারও তো আসার কথা নয়। তবে—তবে কি যাদের এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এত দিন, তারাই—পুলিস? স্বাহার শরীরের ভিতর দিয়ে একটা

হিমানী স্রোত বয়ে গেল। গেটটি দুই হাতে চেপে ধরে স্বাহা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

অকস্মাৎ আবার তার সাহস ফিরে এল। পুলিস তো এমনি প্রকাশ্য ভাবে সদর দরজায় আসবে না। আর সরকারী প্রতিনিধি একক হবে কেন? সাহসে ভর করে সে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই উপবিষ্ট লোকটি উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে বলল, "কে, স্বাহা?"

স্বাহার মস্তিষ্কের ভিতর ঝন্ ঝন্ করে কি যেন বেজে উঠল। পুরাতন স্মৃতির নির্ঘোষ। কে, কে এই আগন্তুক?

ব্যগ্র হাতে স্বাহা বারান্দার বাতিটির সুইচ টিপে দিল। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোতে জায়গাটা ভরে গেল।

বিস্মিত স্বাহা অস্ফুট স্বরে বলল, "তুমি—তুমি এখানে কি করে?"

"চিনতে পেরেছ তা হলে? আমি ভাবছিলাম যে তিন বছরের পর হয়তো বা চিনতেই পারবে না।" বিভাসের কণ্ঠে আনন্দ না অনুযোগ ঠিক বোঝা গেল না।

কামরার তালা খুলে ভিতরে গিয়ে স্বাহা বিভাসকে লক্ষ্য করে শুষ্ক কণ্ঠে বলল, "বসো। এবার বল হঠাৎ কি মনে করে? কার কাছে ঠিকানা পেলে?"

বিভাস হাসতে হাসতে বলল, "দাঁড়াও, এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করলে যে। সেই বিকেল থেকে অপেক্ষা করছি। একটু সুস্থ হয়ে বসতে দাও। তবে তো তোমার প্রশ্নের জবাব দেব।"

স্বাহা তেমনি নিরুত্তাপ ভঙ্গীতে জবাব দিল, "বড় ক্লান্ত আমি। এবার আমার বিশ্রামের প্রয়োজন।"

কথাটা কানে যেতেই বিভাসের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করল। একবার শুধু সে "হুঁ" বলে কতক্ষণ গুম্ হয়ে রইল। তার পর ধীরে ধীরে বলল, "তোমার খবর পেয়েছি কৌশিকদার কাছে। হ্যাঁ, সম্প্রতি আমিও নরসিংহগড়ে আছি একটি কাইনাইট খাদানে চাকরি নিয়ে।"

কথা বলতে বলতে বিভাসের কণ্ঠস্বর পাল্টে গেল। কষ্টকৃত নৈর্ব্যক্তিক ভাবের পরিবর্তে একটা প্রচণ্ড আবেগ এসে তাকে আক্রমণ করল। উচ্ছ্বাসে কম্পিত কণ্ঠে সে বলল, "আচ্ছা, এই এত দিন পরে দেখা হল, আর তুমি যেন আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারলেই বাঁচ। অথচ—অথচ তোমার জন্য আমি কি না করেছি? সেই লঙ্গরখানার

চাঁদা তোলা আর লপ্‌সি পরিবেশন করার দিন থেকে শুরু করে ছাত্র ফেডারেশনের আন্দোলন, তার পর পার্টির কাজ। সে সবই কি তুমি ভুলে গেলে—কিছুই মনে নেই! এই যে আজ আমাকে খোঁড়া হয়ে একজন বিদেশী পুঁজিপতির দুয়ারে অন্নের জন্য দাঁড়াতে হয়েছে, আমার এই অবস্থা দেখে তোমার কি কোন সহানুভূতি হয় না? বল—চুপ করে থেকো না। তোমার জন্য আমি কি না করেছি, আর কি না করতে পারি?” শেষের দিকে বিভাসের কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে ওঠে।

স্বাহা তীব্র দৃষ্টিতে বিভাসের দিকে তাকিয়েছিল। এবার সে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, “তোমার এই উচ্ছ্বাস আমি একেবারে অপছন্দ করি এ তো তোমাকে আগেও বহুবার বলেছি। আর তুমি আমার কাছে যা আশা কর, তা কখনও সম্ভব নয়—একথা তোমাকে প্রথম থেকেই জানিয়ে দিতে আমি ত্রুটি করি নি। আর—আর আমার জন্য এই সব দুঃখ বরণ না করে পার্টির জন্য, বিপ্লবের জন্য করলেই ভাল হত।”

কিছুক্ষণ ঘরের ভিতর নীরবতার রাজত্ব নেমে এল।

স্বাহাই আবার সেই নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, “আর কিছু বলার আছে?”

বিভাস্ আবেগাপ্লুত স্বরে জবাব দিল, “আছে—আছে—অনেক কথা আছে।”

স্বাহা বাধা দিয়ে দৃঢ় ভাবে বলল, “কমরেড বিভাস, আবার তোমাকে আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি যে তোমার সঙ্গে আমার পার্টির একজন কমরেডের অতিরিক্ত অন্য কোন সম্বন্ধ নেই এবং থাকতে পারে না। দয়া করে তুমি কতগুলো বাজে কথা বলে আমাকে বিরক্ত করো না।”

বেদনাহত বিভাস চেয়ার ধরে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল, “আমি কিন্তু অপেক্ষায় থাকব, যেমন এই এত বছর আছি। পার্টির কমরেড বলে আমরা জীবনের ক্ষেত্রে কমরেড হতে পারব না কেন?” খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বারান্দা পার হয়ে হতাশ বিভাস যেন নিজের দেহটাকে বাগানের গেটের দিকে ঘষটে টেনে নিয়ে চলল।

স্বাহা উঠে কোন মতে দরজায় খিল দিয়ে ঐ অবস্থাতেই শয্যা নিল। ওর দেহে মনে আর বুঝি শক্তি নেই।

॥ একুশ ॥

শীতের রাত্রি। সময় ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিক। এই গভীর রাত্রে চতুর্দিক যখন নীরব নিঝুম, তখনও কিন্তু সরকার-বিল্ডিংসের দোতালার এই কামরাটিতে বাতি নেভে নি। জানালার ফাঁক দিয়ে আলোক-রশ্মির ক্ষীণ রেখা যাতে বাইরে গিয়ে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারে, তার জন্য দরজা জানালায় কাল কাপড়ের পর্দা ঝুলছে। পার্টির গোপন আড্ডায় কমরেড সিংহ রাতের অন্ধকারে নিশাচরের মত এক তাড়া কাগজ ডেস্কের সামনে নিয়ে বসে আছেন।

নির্দেশ এসে গেছে। সম্মুখে রাখা ঐ কাগজের বাণ্ডিল শ্রমিক সংগঠনের ক্ষেত্রে আচরণীয় বিধিবিধান সম্বন্ধে পার্টির সার্কুলার। এর শীর্ষক হচ্ছে "অন দি কী টাস্কস অফ দি ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্ট এণ্ড ট্রেড ইউনিয়ন ইউনিটি"। দুবার পড়া কাগজগুলির দিকে তাকিয়ে কমরেড সিংহ আপন মনে কত কি ভেবে চলছিলেন।

এরই মধ্যে চরম আঘাত হানার নির্দেশ এসে যাবে, এ কথা উনি কল্পনা করতে পারেন নি। ওয়ার প্রডাক্টসের ইউনিয়ন অবশ্য ইতিমধ্যে হাতে এসে গেছে। কিন্তু ইউনিয়ন হাতে নিতে কতটুকু সময় লাগে? দিন পনের কি বড় জোর মাস খানেক যদি খুব জোর হুইস্পার প্রপাগ্যাণ্ডা চলে, আর সেই কয়দিন যদি রোজ জনসভা করে অভিধানের অন্তর্গত ও বহির্ভূত যাবতীয় গরম গরম শব্দ দ্বারা মজুরদের উত্তেজিত করা যায় এবং যদি ক্রমাগত এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায় যে কংগ্রেসের ধামাধরা আই. এন. টি. ইউ. সি.-র মালিক ঘেঁষা ইউনিয়নের বদলে লাল ঝাণ্ডাকে ইউনিয়নের পরিচালক করলে অবিলম্বে শতকরা পঞ্চাশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হবে ও ছয় মাসের বেতন বোনাস স্বরূপ পাইয়ে দেওয়া হবে, তা হলে ইউনিয়ন দখল করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়।

তবে কমরেড সিংহরা সাধারণতঃ ইউনিয়নের পরিচালনার দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক নন। তাতে বহুত হাঙ্গাম আর খাটতেও হয় প্রচুর। তাঁদের যা স্বল্পশক্তি, তাতে ইউনিয়নের পরিচালনার দায়িত্ব না নিয়ে ক্ষমতাধিরূঢ় ইউনিয়নের কর্তাদের বিরূপ সমালোচনা করলে পার্টির শক্তিবৃদ্ধি পায় বেশী। এর দ্বারা জনমতকে বেশ কিছুটা পার্টির অনুকূল করা যায় আর শ্রমিকরাও ভাবে যে কংগ্রেসের দালালগুলো ইউনিয়নের গদি আঁকড়ে ধরে পড়ে না থাকলে লাল ঝাণ্ডার দৌলতে তারা এতদিনে প্রায় রাজা

হয়ে যেত। ফলে কমরেড সিংহদের পার্টির প্রতি ওদের আকর্ষণ এবং কংগ্রেসী ইউনিয়নের প্রতি বিরূপতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইমারতের ভিতরে ভিতরে ফাটল ধরে ও যে কোন দিন ইচ্ছা করলে ইউনিয়ন হাতে এসে যায়। ওয়ার প্রডাক্টসের ইউনিয়নও এবারকার বাৎসরিক নির্বাচনের সময় এই ভাবে তাঁদের হাতে এসে পড়েছে।

কংগ্রেসীদের বোকামির কথা মনে পড়তে কমরেড সিংহের হাসি পেল। গণতন্ত্রের ঠাটটুকু আছে ষোল আনা! তা না হলে প্রত্যেক বছর এই ভাবে ইউনিয়নের নির্বাচনের মানে হয়? তাঁদের পার্টি একবার কোন ইউনিয়নের কর্ণধার হলে সেখানে আর কোন দিনই নির্বাচনের দরকার হয় না। বৈপ্লবিক গণতন্ত্র এর নাম, পুঁজিবাদী গণতন্ত্র নয়। কারণ কৃষক শ্রমিকদের নিজেদের পার্টি যেখানে ইউনিয়নের পরিচালক, সেখানে অহেতুক আর একটা নির্বাচন করার মানে সময়ের অপব্যয়। এ সব বুর্জোয়া বিলাসের কি প্রয়োজন?

যাই হক, ওয়ার প্রডাক্টসের শ্রমিকরা যে দলে দলে কংগ্রেস বিরোধী হয়ে গেছে, এ কথা কংগ্রেসীরা কল্পনাই করতে পারে নি। তা না হলে শিববাবু কি আর এত সহজে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতেন? একেবারে নিঃশব্দে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে গেল ওখানে। দীর্ঘশ্বাস মোচন করে কমরেড সিংহ ভাবেন, আহা কবে সেই সুদিন আসবে যখন এই রকম নীরবে তাঁদের পার্টির হাতে ভারতের শাসনক্ষমতা এসে যাবে।

পার্টির মনোনীত প্রার্থীরা ইউনিয়নের নূতন কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবার পর সভাপতির পদ থেকে নিত্য অনুপস্থিত জন সাহেব এবং সম্পাদকের পদ থেকে শিববাবুর মত খোকা পলিটিশিয়ানকে সরাতে আর কতটুকু সময় লাগে? কমিটির প্রথম সভাতেই সরকার-বিল্ডিং থেকে লিখে আনা প্রস্তাবের খসড়া সংখ্যাগরিষ্ঠদের সম্মতিক্রমে গৃহীত হবার পর মনিপিটের বাজারে অবস্থিত ইউনিয়নের নিজস্ব ঘরের চাবি আর অফিসের কাগজপত্র পেতে বিলম্ব হয় না। বোকা শিববাবু ইউনিয়নে তাঁর মৌরসী স্বত্ব জন্মে গেছে ভেবে ইউনিয়নের নিজের বাড়ি করিয়েছিলেন এবং ইউনিয়নের নামে ব্যাঙ্কে হাজার তিনেক টাকাও ছিল।

এক পক্ষে ভালই হয়েছে ইউনিয়নটা হাতে এসে। তাঁরা ভাবছিলেন এবার যখন এ অঞ্চলে পা রাখার জন্য নিজেদের বলতে একটা জায়গা হল, তখন পাশের টেলকো এবং ওদিকের কেবল কোম্পানি, টাটানগর ফাউণ্ড্রি

ও টিনপ্লেটে তো তাঁরা ঢুকে পড়বেনই। কিন্তু প্রস্তুতির জন্য খুব একটা সময় পাওয়া গেল না। ওয়ার প্রডাক্টস ইউনিয়ন হাতে নেবার এই দুই সপ্তাহের মধ্যেই পার্টির নূতন নির্দেশ এসে গেছে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে কমরেড সিংহ সামনে রাখা কাগজের বাণ্ডিলটি চোখের সামনে মেলে ধরলেন। জায়গায় জায়গায় লাল পেন্সিল দিয়ে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি চিহ্নিত করে রেখেছিলেন, পাতা উল্টিয়ে যাবার সময় সেগুলি তাঁর নূতন করে চোখে পড়তে লাগল। গোড়াতেই রয়েছে, "কমিউনিস্টদের কাজ করার অল্প বিস্তর আইনসম্মত পন্থা আজ খোলা থাকলেও কর্তৃপক্ষের অত্যাচার ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এবং ভবিষ্যতে এ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। সুতরাং সযত্নে ও সুকৌশলে পার্টিকে মজবুত করার আইন সঙ্গত সুযোগ সুবিধা নেবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী শ্রমিক কর্মীদের বেআইনী কার্যকলাপের দিকে বেশী করে ঝুঁকতে হবে।" ঐ নির্দেশনামার আর এক জায়গায় লেখা রয়েছে, "শ্রমিক সমাজকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতস্থ তাদের দেশী স্টুজদের উৎখাত করতে না পারলে মজুরদের অবস্থার কোন মৌলিক উন্নতি হবে না। সুতরাং কৃষক বিপ্লবের আধারে পল্লী অঞ্চলে সশস্ত্র গরিলা প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলতে হবে এবং সংগ্রামী কারখানা-মজুরদের সঙ্গে মিলে ধীরে ধীরে মুক্ত এলাকার পরিধি বাড়িয়ে চলতে হবে। এই ভাবে শেষ অবধি সরকারের উচ্ছেদ সাধন করা হবে।"

কিন্তু না, আর অলস চিন্তায় কালাতিপাত করার সময় নেই। কালই পার্টির নির্দেশ অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে দিতে হবে। এই সার্কুলার এই সময়ে আসায় এক রকম ভালই হয়েছে বলতে হবে। কারণ বেশী দিন শান্তিতে ইউনিয়নের দায়িত্ব বহন করতে হলে হয়তো তাঁরাই পুনরায় অপ্রিয় হয়ে যেতেন। এ কথা কে না জানে যে বিরুদ্ধপক্ষীয়দের ঘায়েল করার সময়ে, তাদের হাত থেকে ইউনিয়নের নেতৃত্ব নেবার সময়ে শ্রমিকদের যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তা পার্টি পূর্ণ করবে না। এর কারণ দিবালোকের মত স্পষ্ট। ও প্রতিশ্রুতি পালন করা একেবারে অসম্ভব। ঐ সব দাবি মেনে নিতে হলে মালিকদের দেউলিয়া হতে হবে। তার পূর্বেই তাঁরা কারখানা বন্ধ করে দেবেন।

তবে কমরেড সিংহদের পার্টির অবশ্য একটা সুবিধা আছে। ইউনিয়ন হাতে পেলেও তাঁরা এই বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন

যে কি আর করা যাবে? তাঁরা তো মজুরদের দাবি আদায় করার জন্য খুব লড়ছেন; কিন্তু সরকার যে খোলাখুলি মালিকদের দলে। শেষ পর্যন্ত ইউনিয়ন হাতে নিলেও এই ভাবে শ্রমিকদের মনে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করার জন্যই তাঁরা একে কাজে লাগান। তবে এরও একটা সীমা আছে। সেই সীমার অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত যদি তাঁদের হাতে ইউনিয়ন থাকে তা হলে বিপদ আছে। ব্যুমেরাংএর মত নিজেদের অস্ত্র ঘুরে নিজেদেরই আঘাত করতে পারে। সুতরাং এ নির্দেশ এসে ভালই হয়েছে। কমরেড সিংহ সরকার-বিল্ডিংএর কামরার বাতি নিভিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন।

হরতাল! হরতাল! পনের দিনের নোটিস দিয়ে হরতাল আরম্ভ করার আইন লাল ঝাণ্ডা ইউনিয়ন মানে না। আইন ভাঙবার জন্য যাদের জন্ম, তারা পুঁজিবাদী স্বার্থের সংরক্ষক কংগ্রেসী সরকারের আইন-কানুন মানবে কেন? অতএব নির্দেশপ্রাপ্তি মাত্র হরতাল। কারণ? কারণ একটা চাই বই কি। টুলস ডিপার্টমেণ্টের ফোরম্যান এক জন খালাসীকে মেরেছেন। কে বলল ফোরম্যান সে সময় সুপারিনটেনডেণ্টের সঙ্গে মেশিনশপে ছিলেন? তা হলে মেহনতী মজুররা কি মিথ্যা কথা বলছে? যাদের খেটে খেতে হয়, নেহাত প্রাণান্তকর দায়ে না পড়লে কি আর তারা ধর্মঘট করে মজুরী খোয়াবার ঝক্কি কাঁধে নেয়?

আর তা ছাড়া ফোরম্যানের চড় খেয়ে এক গাদা যন্ত্রপাতির মধ্যে পড়ে গিয়ে খালাসী অবধলালের যে মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়েছে— এটাও কি মিথ্যা? চোখের সামনেই তো দেখা যাচ্ছে যে ওর কপাল আর মুখ রক্তে মাখামাখি। অতএব আর কথা নয়, ফোরম্যান নিশ্চয় মেরেছেন। শ্রমিকের এই অপমান? এত অনাচার অবিচার ও উৎপীড়ন? সরকার-বিল্ডিং থেকে পার্টির নির্দেশ বহনকারী সাইকেলের আরোহী এসে ওয়ার প্রডাক্টস কারখানার ফটকের কাছে থামার এক ঘণ্টার মধ্যে কারখানার শ্রমিকেরা কুলি কামিন নির্বিশেষে সবাই গেটের পাহারাদারদের হতচকিত করে দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ল।

তার পর মনিপিট ময়দানে লাল ঝাণ্ডার নীচে সে কি উত্তেজনাপূর্ণ সভা! সেদিনকার হিরো টুলস প্লাণ্টের খালাসী কমরেড অবধলালের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে

কখনও গরম সুরে শ্রমিকদের তার প্রতি এ অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে আহ্বান জানাল এবং কখনও বা করুণ কণ্ঠে তাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করে মালিক পক্ষ নতজানু না হওয়া পর্যন্ত এই ইমান বজায় রাখার লড়াই চালিয়ে যেতে বলল। বক্তার পর বক্তা যখন অগ্নিস্রাবী বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিলেন, কমরেড সিংহ তার মধ্যে তাঁদের অর্থাৎ শ্রমিকদের দাবির ফিরিস্তি তৈরী করে ফেললেন।

সহজ সরল দাবি। মেহনতী মজদুরদের—সকল সম্পদের আসল স্রষ্টাদের কোন মতে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম এই দাবি। মালিক তাদের পরিশ্রমের ফল অপহরণ করে তাদের রক্ত জোঁকের মত শুষে নিত্য যে মুনাফার পেট মোটা থলিটি ভর্তি করছেন, তার সামান্য একাংশ হলেই মজুরদের এই অতীব ন্যায়সঙ্গত দাবি পূর্ণ করা যায়। ব্যালান্স শীটের অঙ্কের ধাপ্পায় আর জাগ্রত শ্রমিক সমাজকে ভুলানো যাবে না। সুতরাং অত্যাচারী ফোরম্যানকে তো অবিলম্বে কর্মচ্যুত করতেই হবে, তা ছাড়া এখনই শ্রমিকদের বেতন অন্ততঃ দেড়া করা চাই। এ ছাড়া ওয়ার প্রডাক্টস কারখানার শ্রমিকদের বছরে ছয় মাসের বেতন বোনাস স্বরূপ দিতে হবে।

মজুররা দাবির ফিরিস্তি শুনে করতালি ধ্বনির চোটে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তুলল। এত বড় প্রাপ্তির সম্ভাবনাতে কার না উল্লাস হয়? ওদের গগন বিদীর্ণকারী লাল ঝাণ্ডার জয়ধ্বনি একটু শান্ত হলে কমরেড সিংহ ঘোষণা করলেন যে এ দাবি তাঁরা আদায় করে ছাড়বেন। তাঁদের পার্টির কর্মীরা নিজেদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে শ্রমিকদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবি পূর্ণ করার জন্য লড়াই করবেন। মজদুর ভাইরা যেন খেয়াল রাখে যে এ হরতাল কেবল তাদেরই লড়াই নয়, সমস্ত বিশ্বের কৃষক মজদুর সাথীরা লাল ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হয়ে তাদের পিছনে দাঁড়িয়েছে। আসন্ন সন্ধ্যার অরুণাভায় রঞ্জিত আকাশের তলে অলক্তক-বর্ণ পতাকার সামনে দুই হাজার মজুরের সমক্ষে শপথ নিয়ে কমরেড সিংহ ঘোষণা করলেন যে এখানকার মজদুর ভাইদের জীবন-মরণে পার্টি তাদের সঙ্গে রয়েছে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ, লাল ঝাণ্ডা জিন্দাবাদ, বিপ্লবীদের পার্টি জিন্দাবাদ।

সভার শেষে শ্রমিকদের এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা ধর্মঘটের সমর্থনে ঘন ঘন নানা রকম স্লোগান দিতে দিতে ওয়ার প্রডাক্টস কারখানার কর্মচারীদের কলোনী এবং মনিপিট বাজার পরিক্রমা করল। কিন্তু কমরেড সিংহ প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সে শোভাযাত্রায় ছিলেন না। স্বাহার ঘরে পার্টি

ইউনিটের জরুরী বৈঠক শেষ করে বিদায় নেবার প্রাক্কালে কমরেড সিংহ দ্বিতীয় বার স্বাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জাহির করার জন্য সপ্রশংস সুরে বললেন, "এবার সত্যি সত্যিই আপনার বুদ্ধিটা চমৎকার ফল দিল। আপনি না থাকলে ওয়ার প্রডাক্টসে আজ এমন সুন্দর পরিণাম আশা করার উপায় ছিল না।"

মাঝ পথে বাধা দিয়ে মৃদু প্রতিবাদের সুরে স্বাহা বলল, "না, না—এতে আমার আর কৃতিত্ব কি? এর গৌরব পার্টিরই প্রাপ্য। কাকদ্বীপে আমরা পার্টির নির্দেশে এ রকম কত কেস খাড়া করেছি। চাষীদের ভিতর একটা ইস্যু দাঁড় করাবার জন্য আমাদের কমরেডরা নিজেদের মাথা ফাটিয়ে প্রচার করে বেড়িয়েছেন যে জমিদারেরা কৃষক-কর্মীদের এই দুরবস্থা ঘটিয়েছে। একবার ইসলামপুরে তো এই টেকনিক গ্রহণ করায় জনগণের লুপ্ত মর‍্যাল পুনরুদ্ধার করার কাজে আমরা অবিশ্বাস্য রকমের সাফল্য অর্জন করি।"

স্বাহার কোয়ার্টার্সের গেটের অভিমুখে চলতে চলতে সুকুমার থমকে দাঁড়াল। তার পর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্বাহার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি ব্যাপার স্বাহাদি? বলতে আপত্তি না থাকলে শোনা যাক।"

"না, আপত্তির আর কি আছে? ইসলামপুর অঞ্চলের আমাদের এক জন কমরেড পার্টি লাইন অর্থাৎ পার্টিজন ওয়ারের বিরুদ্ধে প্রচার করছে বলে খবর পাওয়া গেল। কমরেডটি ঐ অঞ্চলেরই অধিবাসী কৃষক কর্মী। স্থানীয় লোক হওয়ার ফলে স্বভাবতই নিজের এলাকায় তার প্রভাবও ছিল প্রচুর। এ রকম এক জন কমরেড পার্টিলাইনের বিরুদ্ধে স্ল্যানডার প্রচার করে বেড়ালে তার কুপ্রভাব কী রকম গভীর হতে পারে তা সহজেই অনুমান করতে পারছ। সুতরাং পার্টি অত্যন্ত সঙ্গত ভাবেই সেই পথভ্রান্ত কমরেডকে লিকুইডেট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। আর এ কাজ নিষ্পন্ন করার দায়িত্ব দেওয়া হল আমাদের সেলের উপর।"

একটু বিরতি দিয়ে স্বাহা আবার বলতে লাগল, "ঐ অঞ্চলে তখন জোতদারদের সঙ্গে কয়েকটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে, আমরা গরিলা যুদ্ধের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছি। এ দিকে জোতদারদের কর্মচারীদের অত্যাচার ও পুলিসের দমন-চক্রও পুরো দমে চলেছে। পার্টির নির্দেশানুযায়ী আমরা আরও টেরর সৃষ্টি করে যাবার নীতি গ্রহণ করলেও অত্যধিক উৎপীড়নের জন্য স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে আর লড়াই করার ক্ষমতা আছে বলে মনে হচ্ছিল না। বস্তুতঃ পূর্বোক্ত কমরেডটি এই জন্য তখনও টেররের সৃষ্টি করে যাবার বিরোধী ছিলেন। তা যাই হক,

এই অবস্থায় এল লিকুইডেট করার নির্দেশ। বাদার ধারে এক জেলেপাড়ার ভিতর সেলের সভায় ঐ ভূতপূর্ব কমরেডকে পার্টির নির্দেশ জানান হল এবং তিন জন দায়িত্বশীল কমরেড তখনই সে কাজ সেরে ফেললেন।"

"তখনই ?" বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সুকুমার প্রশ্ন করলে।

"হ্যাঁ, তখনই," স্বাহা দূর অতীতের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলে চলল, তার পর রাতের অন্ধকারে তার লাস নিয়ে যে জোতদারের সঙ্গে সবচেয়ে বেশী সংঘর্ষ চলছিল, তার বাগানের পাশে ফেলে রেখে আসা হল। সকাল-বেলায় যথারীতি হৈ চৈ। পুলিসের হাঙ্গামা মিটলে আমরা পরের দিন থানা থেকে ঐ লাস নিয়ে এসে চক ইসলামপুরে এক শোভাযাত্রা বার করলাম। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ঐ ভূতপূর্ব কমরেডের মৃতদেহ। কিন্তু তখন তিনি আর ভূতপূর্ব নেই, তাঁকে আমরা শহীদ বানিয়ে ফেলেছি। প্রায় হাজার দু-এক কৃষক নরনারী একেবারে মৌন ভাবে মৃতদেহের অনুসরণ করে শ্মশানে এল এবং তার ফলে আমাদের উদ্দেশ্যও পূর্ণ মাত্রায় সাধিত হল। সেই জোতদারকে সেবার একদানাও ফসল পেতে হয় নি এবং চক ইসলামপুর আমাদের কাকদ্বীপ অভিযানের শেষ দিন পর্যন্ত এক দুর্ভেদ্য দুর্গ স্বরূপ ছিল।"

কমরেড সুকুমার উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, "উঃ, কী রিভলিউশনারী আইডিয়া!"

"কিন্তু এবার চল কমরেড।" অক্লান্ত কর্মী কমরেড সিংহ ব্যস্ত কণ্ঠে তাগিদ দিয়ে বললেন, "আর দেরি করলে কাল সকালে ডিউটিতে যাবার সময় অন্যান্য কারখানার শ্রমিকরা আমাদের একটি পোস্টারও দেখতে পাবে না। খেয়াল রেখো ওয়ার প্রডাক্টসের আগুন সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে আমাদের। এইবার তোমার সাহিত্যিক প্রতিভার পরীক্ষা নেবার সময় এসেছে। তোমার ভাষায় কত জোর আছে দেখব এবার। আচ্ছা, আসি আমরা কমরেড। ইনক্লাব······"

কমরেড সুকুমারের হাত ধরে এগোতে এগোতে শেষের কথা কটি কমরেড সিংহ স্বাহাকে লক্ষ্য করে বললেন।

স্বাহা গেট বন্ধ করতে করতে তাঁর কথার শেষ শব্দের প্রতিধ্বনি তুলল, "জিন্দাবাদ।"

॥ বাইশ ॥

ধলভূমের এই শাল মহুয়ার গাছে ঘেরা পল্লী ধলভূমগড়েও নির্দেশ পৌঁছে গেছে। গ্রামীণ সমাজের গো-শকটের মত মন্থর জীবনে চাঞ্চল্য আনা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু এ তো কোন নূতন কথা নয়। কৌশিকবাবু এবং তাঁদের মত বিপ্লবসাধকদের সমগ্র জীবন ও ধ্যান-ধারণাই তো এর জন্য উৎসর্গীকৃত। কাজ কঠিন, এ কথা ভাল ভাবে জেনেই তো তাঁরা এ পথে নেমেছেন।

মুর সাহেবের মোহনপুরের কাইনাইট খাদানের শ্রমিক সঙ্ঘ এই তো সেদিন প্রতিষ্ঠিত হল। ইউনিয়ন রেজিস্ট্রির জন্য সরকারের কাছে দরখাস্ত করা হলেও তার মঞ্জুরী আসে নি। মালিকের স্বীকৃতি ইত্যাদি তো অনেক পরের কথা। এর মধ্যে কৌশিকবাবু এত দিন আবার অনুপস্থিত রইলেন। তাঁকে বাধ্যতামূলক বিশ্রাম নিতে হল ঘাটশীলা এবং জামসেদপুরে। ফিরে এসে তিনি ভেবেছিলেন যে বিপিন মাহাত কিনু সর্দার এবং ডমনা ভকতেরা বুঝি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে— আবার নূতন করে আগুন জ্বালতে হবে।

কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর অনুপস্থিতি তাদের শ্রমিক সঙ্ঘে চিড় ধরায় নি। কাজ বিশেষ কিছু না হলেও মাস্টারবাবু বলেছেন একটা কিছু করতে হবে এবং তাই তিনি না ফেরা পর্যন্ত তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকব সবাই—এই রকম একটা মনোবৃত্তি শ্রমিকদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মনে ক্রিয়াশীল ছিল। তাই প্রথম যে দিন কৌশিকবাবু জামসেদপুর থেকে ফেরার পর ওদের সঙ্গে মিলিত হলেন, ধলভূমের এই অশিক্ষিত অর্ধনগ্ন কৃষ্ণকায় মানুষগুলি অত্যন্ত হৃদ্যতা সহকারে তাঁকে গ্রহণ করল। যেন তাদেরই এক জন দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করে ফিরে এসেছে, এই ভাবে সকলে তাঁর সঙ্গে আচরণ করল। মাঝে মঝে কৌশিকবাবুর মনে হয় ধলভূমের এই গ্রাম্য মানুষগুলির রূঢ়তা ও আচারব্যবহারের স্থূলতার বাহ্য আবরণটি যদি সরান যায়, তবে তার নীচে স্নেহ মমতা ও অপূর্ব দরদে পরিপূর্ণ সুসংস্কৃত মনের দেখা পাওয়া যাবে।

ফেরার পর আবার শ্রমিক সঙ্ঘ দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছিল এবং বাস্কে মাঝির নেতৃত্বে কৃষক সভার মাতব্বরদের একত্র করে কৌশিকবাবু বনবিভাগের কাছে তাঁদের দাবির ম্যাগনাকার্টাও তৈরী করার কাজে নেমেছিলেন। ধলভূমে জমিদারী প্রথা থাকলেও তার প্রত্যক্ষ পীড়ন ছিল না। খাজনা এমন একটা বেশী নয় যে তাই নিয়ে কোন আন্দোলন শুরু করা যেতে পারে।

সেচের কোন খাল বিলের বালাই নেই,তাই তার কর হ্রাস করার জন্য কোন আন্দোলন খাড়া করা সম্ভব নয়।

তা ছাড়া জমিদারের সঙ্গে প্রজাদের খুব বেশী প্রত্যক্ষ সম্বন্ধও নেই। গ্রামে গ্রামে প্রধান আছে। এরা জমিদারের গ্রাম্য প্রতিনিধি। কিছু নিষ্কর জমি এবং অপরাপর কয়েকটি সুবিধার বিনিময়ে জমিদারের পক্ষ থেকে খাজনা সংগ্রহ এবং জমি বন্দোবস্ত দেওয়া ইত্যাদি কাজ এরা করে থাকে। গ্রামের মধ্যে একটু লিখতে পড়তে জানা চালাক চতুর লোক এরাই। এক কথায় এদেরই হাতে গ্রামের নেতৃত্ব। ধলভূমের গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক সাধনের একমাত্র যোগসূত্র এই সব প্রধানরাই। জমিদারের সঙ্গে কোন সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হতে গেলে তাই সর্ব প্রথম এদের সঙ্গে বিবাদ লাগবে। অথচ এদের সহায়তা ছাড়া কৌশিকবাবুর পক্ষে কিষাণ সভার সংগঠন করা বা এমন কি শ্রমিক সংগঠন করাই এক রকম অসম্ভব ব্যাপার। অতএব কৌশিকবাবুকে অন্য কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল। জমিদারদের পরিবর্তে তাকে তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বানাতে হয়েছিল সরকারকে।

অবশ্য এর সুবিধাও অনেক। একে তো প্রথম থেকেই প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করা যায়। কারণ তাঁদের পার্টি যেখানেই জমিদার বা পুঁজিপতির বিরুদ্ধে হল্লা করুক না কেন, এ সব আসলে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার ভূমিকা মাত্র। এই সব ছোটখাটো সংগ্রামে হাত পাকিয়ে তাঁরা শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে চান। এ এক রকম তাঁদের ল্যাবরেটারি স্টেজ। কৌশিকবাবুরা তাই ধলভূমের কৃষকদের মুখ্য সমস্যা—জঙ্গলের সমস্যা হাতে নিয়েছেন।

আরণ্যভূমি ধলভূমে পূর্বে জঙ্গলের উপর ধলভূমবাসীর পূর্ণ অধিকার ছিল। যখন খুশী তারা জঙ্গলের যে কোন কাঠ পাতা বা ফল সংগ্রহ করতে পারত। কিন্তু সরকারী আয় বৃদ্ধির জন্য বন সংরক্ষণের নামে ইংরেজ আমল থেকেই জঙ্গল রিজার্ভ করার প্রথা শুরু হয়। সে সময় বড় বড় পাহাড়ের উপরিস্থিত জঙ্গল সরকারের হাতে চলে যায় ও সরকার প্রত্যেক বৎসর এতে "কুপ" করে প্রচুর টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন ঠিকাদারকে এর থেকে কাঠ কাটার অধিকার দেয়। ধলভূমের অধিবাসীদের বাসভূমির সম্পদ তাদের চোখের সামনে দিয়ে বাইরে চলে যায়।

বাকী যেটুকু জঙ্গল জমিদারদের অধীনে ছিল, দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস সরকার সেগুলিকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বহস্তে নিয়ে

নিয়েছেন। ধলভূমবাসীর কতকগুলি অতীব প্রাচীন অধিকার সরকার কাগজে কলমে মেনে নিলেও জঙ্গল বিভাগের কর্মচারী ও ঠিকাদারদের যোগসাজসের ফলে ধলভূমবাসী তা থেকে বঞ্চিত। অতএব জনসাধারণ তাদের ন্যূনতম অধিকার হারিয়েছে এবং এ অধিকার সাধারণ ব্যাপার নয়। কারণ কৃষির দৃষ্টিকোণ থেকে অপেক্ষাকৃত উষর ধলভূমের অধিবাসীদের কাছে জঙ্গল-সম্পদ প্রাণবায়ুর সমতুল্য।

সুতরাং কৌশিকবাবুরা এইখানে আঘাত দিতে মনস্থ করেছেন। কৃষক সমিতির দ্বারা জঙ্গলের অধিকার পাইয়ে দেওয়া হবে—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁরা তাঁদের প্রতিষ্ঠানকে মজবুত করছেন। সৌভাগ্যক্রমে এ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। কংগ্রেসের অনেকে স্বয়ং জঙ্গল ঠিকাদার। কেউ কেউ আবার জেলা বোর্ডের বিবিধ প্রকারের ঠিকাদারি নিয়ে অনেক ঘুর-পাক খাচ্ছেন। তার উপর কংগ্রেসের পুরাতন ঘরোয়া ঝগড়া তো আছেই—বিহারের দুই সিংহ শ্রীকৃষ্ণ ও অনুগ্রহনারায়ণের বিবাদ। ব্যক্তিগত নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষার জন্য যে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল, আজ তা সমগ্র বিহারের ভূমিহার ও রাজপুতের দ্বন্দ্ব রূপে দেখা দিয়ে এক দিকে সঙ্কীর্ণ জাতিগত বিভেদের সৃষ্টি করছে এবং অন্য দিকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান উপদলীয় চক্রান্তের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

পাটনার কংগ্রেসী নেতাদের প্ররোচনায় থানা এমন কি গ্রামের স্তরের কংগ্রেস কর্মীরাও দুই দলে বিভক্ত এবং যেন তেন প্রকারেণ মাথা পিছু চার আনা করে পয়সা যোগাড় করে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য তালিকা স্ফীত করিয়ে নিজের নিজের দলের লোক দিয়ে থানা জেলা ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি দখল করার জন্য আজ সবাই উন্মত্ত। কংগ্রেসের ঠিকাদারী স্বার্থ এবং উপদলীয় চক্রান্তের প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্তের ফলে জনসাধারণের দিকে তাকাবার সময় কংগ্রেসীদের আর নেই। এর ফলে কৌশিকবাবুদের অত্যন্ত সুবিধা হয়ে গেছে। তাঁদের সম্মুখস্থ ময়দান ফাঁকা, দ্বিতীয় কোন পক্ষ নেই সেখানে।

আজ জাহাতুতে বিপিন মাহাতর দরজার সামনে বসে তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে কৌশিকবাবু বিগত দিনের স্ট্রাটেজি একটু ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন। বিপিন খাদান থেকে ফিরে এসেই কৌশিকবাবুকে দেখেছিল। তাঁকে বসতে খাটিয়াটি পেতে দিয়ে সে ভাত খেতে ভিতরে গিয়েছিল। সেই কোন্ সকালে কালকের বাসী ভাত খেয়ে সে কাজে গিয়েছিল। এত বেলা পর্যন্ত

আর কিছু মুখে না দিয়ে কঠিন পরিশ্রম করার ফলে আবার একবার পেট ভরে না খেলে তাদের মত মজুরদের আর খাড়া থাকার উপায় থাকে না।

কৌশিকবাবুর কাছে উপরের নির্দেশ এসে গিয়েছিল—অবিলম্বে মোহনপুরেও হরতাল করতে হবে এবং কিষাণ সভার মারফত একটা পার্টিজন ওয়ার বা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে অবতীর্ণ হতে হবে। এ যাবত বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা অস্পৃষ্ট ধলভূমের গ্রাম্য জীবনে গণ-ক্রান্তির লেলিহান শিখা ছুটে বেড়াবে। চৈত্র সন্ধ্যায় সমস্ত দিনের প্রখর সূর্যতাপে শুষ্ক নীরস বৃক্ষ লতা তৃণ এবং ঝরা পাতার দলে যেমন দাবানল জ্বলে ওঠে এবং সেই জ্বলন্ত বহ্নির পদ্মরাগ-মালিকা যেমন ধলভূমের এক পর্বতশিখর থেকে অপর পর্বতশীর্ষে জীবন্ত হয়ে ছুটে বেড়ায়, তেমনি করে পার্টির ইচ্ছাকে সাকার করে আগুন জ্বালতে হবে এই অরণ্যভূমিতে। জঙ্গল নিয়ে সরকারের সঙ্গে টক্কর দেবার আয়োজন করতে কয়েকটা দিন লাগবে; কিন্তু খাদানে তো এখনই ধর্মঘট শুরু করা যায় এবং তারই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার জন্য আজ কৌশিকবাবু খবর পাওয়া মাত্রই ছুটে এসেছেন জাহাতুতে।

বিপিনের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। আঁচাতে আঁচাতেই সে কৌশিকবাবুকে উদ্দেশ করে উচ্চ কণ্ঠে বলল, "এই হামি আলি মাস্টরবাবু। আমার হঁই গেলছে।"

"পরদেশিকা সঙ হলদিকা রঙ। হুঁশিয়ার সব হুঁশিয়ার···"

কৌশিকবাবু শিউরে ওঠেন। একি তাঁকেই উদ্দেশ করে নাকি? তবে কি তাঁর মনের গোপন বার্তা প্রকাশ পেয়ে গেছে?

"ঝটকে ম্যা—র‍্যাল পাতেঁছিস কি মরেঁছিস।"

না, সেই পাগলা বুড়োটা। ঐ তো আসছে এদিকে। উঃ, খুব চমকিয়ে দিয়েছিল যা হোক। বাবা কী বিকট স্বর আর কী ভীষণ চেহারা! টলতে টলতে ভূতের মত এগিয়ে আসছে বিপিনের আজা বুড়া।

বিপিন এবং পাগলা দু জনেই প্রায় একই সঙ্গে কৌশিকবাবুর কাছে এসে দাঁড়াল। পাগলা তার ঝাঁকড়া চুল নেড়ে আরক্তিম দৃষ্টিতে কটমট করে কৌশিকবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "কে—কে বটিস তুই?"

বিপিনই কৌশিকবাবুর হয়ে জবাব দিল, "বলেঁছি না, হামদের মাস্টরবাবুই। তুই ঘরকে যা ক্যান্ না। ই খানকে ক্যানে?"

পাগলা আবার হুংকার ছাড়ল, "মিছাটা—পরদেশিকা সঙ, হলদিকা রঙ।" তার পর শূন্যপানে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে গর্জন করে উঠল, "দেখে লুব, সব

ব্যাটাকে দেখে লুব। ঝটকে ম্যা।” তার শরীরটা পূর্ববৎ দুলতে দুলতে বিপিন মাহাতর কুঁড়ে ঘরের নীচু আগড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কৌশিকবাবু একটু স্থির হয়ে বসার পর বিপিন প্রশ্ন করল, “বলেন মাস্টরবাবু কি খবর ?”

কৌশিকবাবু জবাব দিলেন, “হ্যাঁ, খবরের জন্যই তো এসেছি।” তার পর একবার গলাটা ঝেড়ে নিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, “বুঝলে বিপিন, এবার হরতাল করার সময় এসে গেছে। মুনাফাশিকারী পুঁজিপতিরা অনেক রক্ত চুষেছে তোমাদের। খুনেদের বাড়ি গাড়ি আর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স তোমাদেরই শোষণ করে দিন দিন ফুলে ফেঁপে উঠছে। এবার আর নয়। এবার তোমাদের ন্যায্য দাবি চেঁচিয়ে চাও এবং হাতের জোরে তা আদায় কর।”

কথার মাঝখানে আরও কজন এল। কিষু সর্দার, ডমনা ভকত, লাহু মাঝি এবং বাস্কে। ওদের আসার জন্য খবর পাঠিয়েছিলেন কৌশিকবাবু। মোহনপুরের কাইনাইট খাদানে ধর্মঘট করতে হলে মজুরদের এই মুখিয়াদের প্রথমে হাত করতে হবে। এদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাতে না পারলে, এরা দলে না এলে শ্রমিক ধর্মঘট অসম্ভব ব্যাপার। কৌশিকবাবু গোড়া বেঁধে কাজ করার জন্য আজ জাহাতুর বিপিন মাহাতর ঘরে এদের সকলকে একত্র হবার জন্য খবর পাঠিয়েছিলেন।

প্রাথমিক কুশল সমাচার বিনিময়ের পর আগন্তুকদের মুখপাত্র রূপে কিষু বলল, “বলেন মাস্টার মশায় কি বলতেছিলেন। ইবার হামরা সব আসেঁছি।”

কৌশিকবাবু মৃদু হাসলেন। কয়েক হাত দূরে রাখা কেরোসিনের ল্যাম্পটা আলোর চেয়ে ধোঁয়া উদ্গীরণ করছিল বেশী। তারই অস্পষ্ট আলোকে দেখা গেল তাঁর শুভ্র দন্ত পঙক্তি ঝক্ ঝক্ করে উঠল। ঈষৎ হেসে কৌশিকবাবু আবার শুরু করলেন, “এই তোমাদেরই কথা হচ্ছিল কিষু। সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর তোমরা কত পাও—এক টাকা, আঠার আনা বা যে খুব বেশী পেল তার মজুরী পাঁচ সিকা। দিন-মজুরীতে কাজ কর বা ঠিকায় চৌকা ভরাও—ওদের হিসাবের মারপ্যাঁচে আর এর চেয়ে বেশী হবার উপায় নেই। আর মিস মুর, মানে তোমরা যাকে এলসি মেমসাহেব বল, তাঁর পিয়ারের কুকুরটির খোরাক দৈনিক পাঁচ সিকের অনেক বেশী। এই যে বিদেশ থেকে এরা এসে এমনি ভাবে এখনও তোমাদের লুটে পুটে খাবে—এ তোমরা আর কতদিন মুখ বুজে সহ্য করবে ?”

কৌশিকবাবুরা আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী হলেও এখানে একটু জাতীয়তার শরণ নিলেন। কুশলী যোদ্ধা বিরুদ্ধপক্ষকে ধরাশায়ী করার জন্য তূণের তীক্ষ্ণতম শরটিই ধনুকে যোজনা করে লক্ষ্য সন্ধান করেন। কৌশিকবাবু জানেন যে এখনও আন্তর্জাতিকতার চেয়ে জাতীয়তাবাদই প্রবলতর শক্তি। স্থান কাল পাত্র বুঝে এর দুই এক ডোজ দিতে পারলে অতি সহজে কার্যোদ্ধার হয়ে যায়। এই কারণে আদর্শচ্যুত হচ্ছেন বলে কৌশিকবাবু কখনও মনে করেন না। কারণ মহান লেনিন বহু পূর্বেই বিপ্লবীদের নৈতিকতার মানদণ্ড সম্বন্ধে ঘোষণা করে গেছেন। যা লক্ষ্যের সমীপবর্তী করে, তাই তাঁদের কাছে সত্য। এ তো আর বুর্জোয়া মরালিটি নয় যে এর এক চুল নড়চড় হতে পারবে না। আর তা ছাড়া তাঁরা তো শেষ অবধি শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী। ঘৃণ্য পুঁজিপতিদের সঙ্গে শ্রমিকদের আন্তর্জাতিকতার এই মহান আদর্শের সঙ্গে কিসের সম্বন্ধ ?

বাস্কে বলল, "তা মাস্টরবাবু ঠিকই বলিছেন। উয়ারা হামদের মুলুকে আসি লুটি করি খাবে ক্যানে ? সেদিন মৌভাণ্ডার হাটে হামদের জাতের একটা মিটিন ছিল। হামি যাঁইছিলি। হামদের আদিবাসী লিডার আসেঁছিল রাঁচীরলে। উয়ারা বললেক যে ইবারকে ই মুলুকেরলে গোরা রাজ খতম হঁই গেল। ইবার দিকুগুলাকে ভাগালে হামদের আদিবাসীদের রাজ—ঝাড়খণ্ড হবেক। আর তখনকে বীরসা ভগবানের কথা ফলবেক।"

উল্টা সুর শুনে একটু চমকে উঠলেও বীরসা এবং তাও আবার ভগবান —এই অভিধাটি কৌশিকবাবুকে একটু কৌতূহলী করে তুলল। তিনি প্রশ্ন করলেন, "উনি কে বাস্কে ?"

বাস্কে লাহ্‌ বিপিন ডমনা ইত্যাদি সকলে বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। ধলভূমে থেকে বীরসা ভগবানের কথা জানে না ? এই বিশাল ঝাড়খণ্ড এলাকা অর্থাৎ ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণাকে কেন্দ্র করে এক দিকে ময়ূরভঞ্জ কেঁওঝোর ও বোনাই গড়জাত এবং এর পশ্চিমে সরগুজা ঝাসখণ্ডি—এই সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের কোন্ অধিবাসী আদিবাসী সমাজের পরম পূজ্য বীরসা মুণ্ডা বা বীরসা ভগবানের নাম জানে না ? কেবল তাই বা কেন, বাঙলা মুলুকের বাঁকুড়া বীরভূম মেদিনীপুর আর বর্ধমানের সাঁওতাল, ওড়িয়া মুলুকের বালেশ্বর এবং আরও অনেক দূরে এমন কি পটনা বলাঙ্গীর ইত্যাদির হো মুণ্ডা ওরাঁও আর সাঁওতালেরা তো বীরসা ভগবানের স্বপ্ন সফল করার জন্য দিন গুনছে। এই যে খরসোঁয়াতে

বছর কয়েক আগে কয়েক শ আদিবাসী বন্দুকের সামনে প্রাণ দিল, সে কিসের জন্য ? মারাং গোমকে জয়পাল সিং-এর উপর বীরসা ভগবানের ভর হয়ে খেরতাল বংশের সকলকে তাদের নিজেদের রাজত্ব নিতে সরাইকেলাতে যেতে বলেছিল বলেই না ? ছোটনাগপুরের অমর গাথা, আদিবাসীদের সর্বশঙ্কানাশন নাম—বীরসা ভগবানের কথা বলতে লাগল লাছু মাঝি।

বীরসা ভগবানের জন্ম হয় রাঁচীর এক মুণ্ডা পরিবারে—আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে। খ্রীস্টান পাদ্রীরা তখন দূর দূর পল্লী এবং এমন কি পাহাড় জঙ্গলের লোকেদেরও ইসাই করে ফিরছে বলে রাঁচী জেলাতেও তাদের প্রবল প্রতিপত্তি। দলে দলে আদিবাসী খ্রীস্টান হয়ে যাচ্ছে। কেবল তাই নয়, ইসাই পাদ্রীদের পিছু পিছু আসছে ডাকঘর টেলিগ্রাফ থানা আর কাছারী। আর আসছে সরকারী খাজনার পেয়াদা। ওরা আদিবাসী সমাজের চিরাচরিত প্রথা মানকী মুণ্ডাদের মানে না বলে মহারাণীর রাজত্বে থানা কাছারীরই হুকুম চলবে। তাই খাজনা দিতে কারও গাফিলতি হলে গরু ছাগল হাঁস মুর্গী ক্রোক করে আর থানায় বেঁধে নিয়ে গিয়ে মারে।

যুবক বীরসা পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরলেও চোখ কান খোলা রেখে সব দেখে। দেখে আর দুঃখ হয়, দুঃখ হয় আর ভাবে যে এই সব পাদ্রী আর গির্জা এবং তার পিছু পিছু আদিবাসী সমাজকে আক্রমণকারী থানা আদালত কাছারী জমিদার মহাজন—এ সবের কী দরকার তাদের সমাজের পক্ষে ? ভাবতে ভাবতে ওর মনে ধিকি ধিকি করে আগুন জ্বলে উঠে। আর তার পরই ওর উপর ভগবানের ভর হয়। ভগবান বলে, যা ব্যাটা—এবার তুই আমার কথা প্রচার কর গিয়ে।

বীরসা ভগবান রাঁচী শহর থেকে দূরে এক নিভৃত উপত্যকায় মুণ্ডা সমাজের মুরুব্বীদের একত্র করে ঘোষণা করে যে স্বপ্নে ভগবান তাকে প্রত্যাদেশ দিয়েছেন। এইবার ঐ বিদেশী ইসাই—ঐ দুষ্টু দিকুদের সঙ্গ ছাড়তে হবে। মুণ্ডা সমাজের উন্নতি বিধান করতে হবে। বীরসার নির্দেশে দলে দলে রাঁচীর আদিবাসীরা নেশা করা ছাড়ে, মাংস খাওয়া ছাড়ে ও পৈতা দেয় গলায়। আদিবাসীদের এই ভাবে সংগঠিত হতে দেখে সরকারের জুলুম বাড়ে। আর থানা পুলিসের যত অত্যাচার হয়, আদিবাসীদের মধ্যে বীরসা ভগবানের প্রভাবও ততই বাড়ে। ততই ওরা আরও সংগঠিত হয়ে দিকুদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বীরসা ভগবানের হুকুমে আদিবাসীরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে।

তার পর—তার পরই যেন ঘি পড়ে আগুনে। থানা পুলিস আর জমিদার হাকিমদের অত্যাচার চরমে উঠতে থাকে। আর আদিবাসীরাও তাদের কাঁড় বাঁশ আর টাঙ্গি নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। বহু খণ্ডযুদ্ধ হয় যত্র তত্র। এমনি এক সংঘর্ষের পর বীরসা ভগবানকে মহারাণীর ফৌজ কয়েদ করে, কয়েদ করে রাঁচীর জেলখানায় বন্ধ করে রাখে। কিন্তু যার উপর ভগবানের ভর হয়েছে তাকে আটক রাখা কি এতই সোজা? সেই রাত্রেই বোঙাদের ইশারায় আকাশ বাতাস পাগল হয়ে উঠে। প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে জেলখানার পাঁচিল ধসে পড়ে।

এর পর বীরসা ভগবানের শিষ্যরা দিকুদের সড়ক পুল টেলিগ্রাফের তার সব নষ্ট করা শুরু করে। থানা ডাকঘর কাছারী সব ভেঙে তছনছ করে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আর উর্দি পরা সরকারী লোক দেখতে পেলে আদিবাসীরা তাদের জ্যান্ত ফিরে যেতে দেয় না। কত শত লড়াই হয়ে গেল ফৌজ আর আদিবাসীদের মধ্যে তার লেখা-জোখা নেই। আর কত যে মানুষ মরল দু তরফে তারই বা হিসাব কে রেখেছে।

অবশেষে আদিবাসীদের মানকী মুণ্ডাদের রাজত্ব আবার ফিরিয়ে দিতে হল এবং ওদিক হাজারিবাগ জেলে বীরসা ভগবানও দেহ রাখলেন। ধীরে ধীরে তাই আদিবাসীদের আন্দোলন শান্ত হয়ে এল। কিন্তু যত দিন দিকু আর ওদের কোর্ট কাছারী থানা পুলিস রয়েছে ততদিন বীরসা ভগবানের আশা পুরো হয়েছে—এ কথা বলা যায় না। তাই বীরসা ভগবান সরকারকে ঠকাবার জন্য দেহটা হাজারীবাগে ছেড়ে দিলেও এখনও বেঁচে আছে। বীরসা ভগবান ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাড়খণ্ডের এই বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে। ঘুরে ঘুরে সে আদিবাসীদের কানে দিকু খেদানর মন্ত্র দিচ্ছে। জয় হোক বীরসা ভগবানের।

কাহিনী সমাপ্ত হলে ওরা সবাই বীরসা ভগবানের উদ্দেশে হাত জোড় করে জোহার করল। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত পরিবেশ থম্-থমে হয়ে উঠল। কারও মুখে কোন কথা নেই। ঊর্ধ্ব আকাশে কেবল কয়েকটি নক্ষত্র যেন সেই বিয়োগান্তক কাহিনীর মর্মবেদনা বুকে নিয়ে মিট মিট করছে।

কৌশিকবাবু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। এদের দৃষ্টি আসন্ন ধর্মঘট থেকে অন্য দিকে সরে যাওয়া ক্ষতিকর হবে। তা ছাড়া তাঁদের বদলে এই সব সাম্প্রদায়িক দল, যারা আদিম যুগের কুসংস্কারকে পুঁজি করে মধ্যযুগীয়

মনোবৃত্তি চালিত হয়ে রাজনীতির আসরে নেমেছে, তাদের প্রভাব যদি ধলভূমের এই সব আরণ্য সন্তানদের মনে প্রবল হয়, তা হলে কৌশিক-বাবুদের ভবিষ্যৎ কি? শূন্য—শূন্যই বলতে হবে নিশ্চয়।

কৌশিকবাবু তাই বললেন, "তা হলে ঐ ধর্মঘটের কথাই ঠিক তো?"

বিপিনরা মোটামুটি সম্মতি জানালেও ওদের মনে একটা কথা কাঁটার মত খচ্ খচ্ করে বিঁধছিল। ধর্মঘট চললে তো সাত দিনের দিন হপ্তা পাওয়া যাবে না। ধলভূমের কৃষকদের অবস্থা কে না জানে? যা দু-চার পুড়া ধান হয়, তাতে সারা বছর অধিকাংশ লোকেরই খাওয়া চলে না। বাইরে মজুরী খেটে এইভাবে দু-দশ টাকা যারা রোজগার করতে না পারে, তারা প্রায়ই এক বেলা খায়। অনশন ও অর্ধাশন এখানে কোন কল্পিত কাহিনী নয়, একেবারে রূঢ় বাস্তব।

কিন্তু কৌশিকবাবু ওদের ভরসা দিয়ে বললেন, "কোন ভয় নেই কমরেড। কেবল তোমরা নও—সারা ভারতবর্ষে দেখতে দেখতে সব কাস্তে লাঙ্গল হাতুড়ি আর বেলচা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জামসেদপুরে তার কোম্পানির চিম্‌নী দিয়ে আর ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। টাটা কারখানার শেডেও তালা ঝোলাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। এ দিকে মুসাবনী আর মৌভাণ্ডারও বাদ যাবে না। ওখানকার সাহেবদেরও বিলাতে পাড়ি দেবার জন্য বাক্স বিছানা বাঁধতে হবে। দুনিয়ার সব চাষী মজুর তোমাদের সঙ্গে। কোন চিন্তা নেই, তিন তুড়িতে কাজ সারা হয়ে যাবে। ভরসা রাখ আমার উপর আর বিশ্বাস রাখ তোমাদের লাল ঝাণ্ডার উপর।"

কিছু বলল, "উটা কি আর বইলবার কথা মাস্টরবাবু, উ কি হামরা জানছি নাই? হামদের ভালর লেগেই তো আপনি এত কষ্ট করছ গো।"

ডমনা জিজ্ঞাসা করল, "হঁ মাস্টরবাবু, উটা কি বইললে আপুনি? কম্ ...কম্..."—কথাটা ডমনা ঠিক মত উচ্চারণ করতে পারছে না।

"ও, কমরেড?"

"হঁ হঁ উহেই বঠে— কমরেড। তাই কথাট'র অথ কি আইজ্ঞা মাস্টরবাবু?"

কৌশিকবাবু ওঠার মুখে আবার জাঁকিয়ে বসলেন। মনোমত বিষয় পেয়েছেন তিনি। আবেগোচ্ছল কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন, "কমরেড? কমরেড মানে কমরেড।" কথাটার জুত সই বাঙলা প্রতিশব্দ না পেয়ে একটু যেন বিব্রত হয়ে পড়লেন কৌশিকবাবু। তার পর হঠাৎ মনে পড়ে যেতে

উৎসাহিত ভাবে বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ, পেয়েছি—মানে সাথী আর কি। কমরেড মানে সঙ্গী অথবা সহকর্মীও বলতে পার। কৃষক মজতুর রাজ কায়েম করার জন্য, এই পৃথিবীতে এক নূতন সভ্যতা—সাম্যবাদ স্থাপন করার জন্য যারা এক সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে, তারাই কমরেড। এই যেমন ধর আমরা সবাই। কি চাই আমরা? না—এই ভারতবর্ষে পুঁজি-পতিদের বর্তমান শোষণ সমাপ্ত হয়ে মেহনতী মজুরদের, কিষাণ ও শ্রমিকদের নিজেদের রাজত্ব স্থাপিত হক। কেউ ছোট কেউ বড়—এ ভেদাভেদ মিটে যাক। এই জন্যই তো তুমি আমি বিপিন বাস্কে—এই আমরা সকলে মিলে কাজ করছি। তাই নয় কি?"

ডমনা এবং আর সকলের চোখে মুখেও উৎসাহের পরশ লেগেছে। ডমনা বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "হঁ হঁ—তা তো বটেই। ই তো লিজ্যস কথা।"

কিনু সাগ্রহে প্রশ্ন করল, "হঁ মাস্টর মশাই—ইখানকেও এমন হবেক? আমরা আর আপনারা—না, না, আমরা আর তুই ইন্দুবাবুরা সমান সমান হঁই যাব? ইটা কি তুনিয়ার কুথাও হঁইছে?"

"কে বলল হয় নি? নিশ্চয় হয়েছে। পৃথিবীর প্রথম সমাজবাদী রাষ্ট্র সোভিয়েৎ রাশিয়াতে সেই ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে এই ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। আমাদের প্রতিবেশী বয়সের ভারে চির অথর্ব চীনেও সেদিন এই ব্যবস্থা চালু হওয়ায় নব জীবনের সুত্রপাত হয়ে গেছে। আমরা তো ওদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি। সব এক, ছোট বড়র ভেদ মিটে গেছে। কেউ বেকার নেই, কারও খাওয়া পরার অভাব নেই, যার যা কিছু দরকার—সব রাস্ট্র দিচ্ছে। ক্রমে সমস্ত বিশ্বে এই সাম্যবাদ ছড়িয়ে পড়ল......"

বলতে বলতে আবেগ ও উত্তেজনায় কৌশিকবাবুর চক্ষু অর্ধ নিমীলিত হয়ে উঠল, মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে উত্থিত হয়ে সেই অনাগত সুদিনের আবির্ভাব ঘোষণাকারী জয়কেতনের মত আবর্তিত হতে লাগল।

ডমনা বলল, "বাবা, তবে তো পিথিবীতে স্বগ্‌গ আইসে যাবেক।"

কৌশিকবাবু আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু ভিতর থেকে বিপিনের ছেলে একটি থালা হাতে বেরিয়ে এল। বিপিন হাসি মুখে বলল, "লিন মাস্টরবাবু, ঘরে গুড় পিঠা হতেছিল। আমি বলেছিলি যে ভাজা হঁই গেলে আজ মাস্টরবাবুকে খাওয়াতে হবেক। গরীব লোক। কোন দিনই তো

আপ্নাকে কিছু খাওয়াতে পাইরলম নাই।" তার পর বিপিন তার বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে বলল, "লাও হে, তোমরাও সব টুএক টুএক লাও।"

"লুব লুব—ই কথা আর বইলতে?"

ওরা সাগ্রহে এক একটি গুড় পিঠা নিয়ে মুখে পুরল। পিঠা চিবাতে চিবাতে বাস্কে প্রশ্ন করল, "বড় ভাল বাসাছে তো। তেল কুথারলে আইনলে হে বিপিন খুড়া?"

"আনব ক্যানে—ঘরে পেড়ালাম। ছানাগুলা বৈশাখ মাসে কচড়া জমা করিছিল। উগাই এত দিনে পেড়ালম।"

কৌশিকবাবু চমকে উঠলেন। কচড়া মানে মহুয়ার ফল। অর্থাৎ মহুয়া তেলে ভাজা এই গুড় পিঠা। ভেলি গুড়ের সঙ্গে চাল গুড়ি মেখে তেলে ভাজলে যে বস্তু হয়—তাই ধলভূমের দরিদ্র কৃষকদের পরম উপাদেয় মিষ্টান্ন গুড় পিঠা। পালে পার্বনে এই সুখাদ্য তৈরী হয় এবং বিশিষ্ট অতিথিদেরই কেবল ওরা এই পিঠা খাওয়াবার কথা চিন্তা করতে পারে। কৌশিকবাবু এক টুকরা পিঠা ভেঙ্গে মুখে দিলেন। কেমন একটা বোটকা গন্ধ—আর স্বাদও কটু। মহুয়া তেল খেতে যারা অনভ্যস্ত তাদের কাছে এ বিস্বাদ লাগবে। কিন্তু এরা ভালবেসে দিয়েছে। আর এ পরীক্ষায় অসফল হলে জনগণের এক জন—ধলভূমের কৃষক কর্মী হিসাবে নিজেকে ব্যর্থ ঘোষণা করতে হবে। পিঠার টুকরাটি মুখে নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে করতে কৌশিকবাবু অকূলে পথ সন্ধান করতে লাগলেন।

ওরা কিন্তু ইতিমধ্যে নিজেদের ভাগ শেষ করে ফেলেছে। হঠাৎ কৌশিকবাবুর দিকে নজর পড়াতে লাদু বলল, "ক্যানে মাস্টরবাবু, হামদের পিঠা ভাল লাগছে নাই নাকি?"

কৌশিকবাবু তাড়াতাড়ি ঢোক গিলে মুখের পিঠাটুকু ভিতরে পার করে দিয়ে বললেন, "না না, তা নয়। মানে রাত্রে আমার এত সব বেশী খাবার অভ্যাস নেই কিনা—তাই।" তার পর কাউকে আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে পিঠাগুলি তাতে জড়াতে জড়াতে অপ্রতিভের মত ঈষৎ হেসে তিনি বললেন, "নিয়ে যাচ্ছি। কাল সকালে খাব। আজ রাত হল। উঠি তা হলে।"

স্বাভাবিকের চেয়েও একটু দ্রুত পদক্ষেপে তিনি পা চালাতে লাগলেন। ওরা কি ভাবছে কে জানে? তবে কৌশিকবাবু জানেন যে তাঁর মনে কোন দ্বিধা নেই। কৃষক মজুরদের রাজত্ব মানে তো এদের দুর্বলতা বা অনগ্রসরতা

বজায় রাখা নয়। তাঁদের রাজত্ব হলে এই সব আনসায়েন্টিফিক ফুড হ্যাবিটস বদলে দিতে হবে। কিন্তু এখন এসব কথা এদের বলা চলে না। সে দিন পরে আসবে।

॥ তেইশ ॥

সিংভূম জেলার শান্তি পরিষদের প্রকাশ্য অধিবেশন হচ্ছিল সাকচীর অন্ধ্র ক্লাবের হলে। হলের প্রবেশ পথে বড় বড় হরফে লেখা "শান্তি ঔর দোস্তি।" তার উপর একটি পাখীর কাট্ আউট। পাখীটি পায়রাও হতে পারে আবার ঘুঘু হওয়াও বিচিত্র নয়। গেটে অনন্তের নেতৃত্বে বুকে ব্যাজ আঁটা ছেলের দল দ্বাররক্ষকের কাজ করছিল। মেয়েদের গেটে মীনাক্ষী তার দলবল নিয়ে মোতায়েন। কেবল গেটই নয়, হলের ভিতরে শান্তি-রক্ষা, শুভেনিয়র বিক্রি ইত্যাদি কাজও ফেডারেশনের ছেলেমেয়েরা সানন্দে করার দায়িত্ব নিয়েছিল। এই সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্য তারা ফেডারেশনের তরফ থেকে জামসেদপুরের স্কুলগুলিতে আবেদন জানিয়েছিল। এর ফলে প্রায় পঞ্চাশ জন ছেলে মেয়ে নাম দেয় এবং তাদের দিয়েই এই সম্মেলনের কাজ চালাচ্ছে অনন্ত ও মীনাক্ষীরা।

বলাই বাহুল্য এ সবের পিছনে কিন্তু স্বাহা। স্বাহা জানে যে এই ভাবে সম্মেলন উপলক্ষ্যে কিছু নূতন ছেলে-মেয়ে রিক্রুট করা সহজ। কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীরা কিছু কাজ করতে চায়। তাদের অতিরিক্ত কর্মোদ্যম কেবল পড়াশুনার চার দেওয়ালের মধ্যেই তাদের থাকতে দেয় না। ওরা আরও কাজ চায়। কি কাজ করছি, কেন করছি এবং এর ফল কি—এ সব কথা খুঁটিয়ে বিচার করার মত মানসিক পরিপক্কতা একটি-আধটি ছেলে মেয়েরও আছে কিনা সন্দেহ। ওরা কিছু কাজ করলেই খুশী। গড়ার কাজ পায় ভালই, না পেলে ভাঙ্গবে। কিন্তু চুপচাপ ওরা বসে থাকবে না। যুব সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তির এই গোপন রহস্যটি স্বাহাদের জানা আছে বলে সে এত সহজে অধিবেশনের ব্যবস্থাপনা করার ভার নিয়েছিল। এই পঞ্চাশ জনের ভিতর অর্ধেকও যদি টিকে যায় তা হলে ফেডারেশনকে এখানে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠা করে যাবে স্বাহা। আজ তাই স্বাহার খুশী হবার কারণ আছে বই কি।

হলের ভিতর স্টেজের সামনের দিকের সারিতে বসে স্বাহা এই কথাই

ভাবছিল। বক্তৃতার প্রতি ওর কান নেই ; কারণ ও সব কথা ওর কাছে নূতন নয়। স্বাহা হলের ভিতরকার দৃশ্য দেখছিল। ভিতরেও সুন্দর ভাবে সাজান। দেওয়ালের চতুর্দিকে নানা ভাষায় "শান্তি ঔর দোস্তি" লেখা। হল নর-নারীর ভিড়ে গম্ গম্ করছে। বসার সব চেয়ার ভরে গেছে। উপরন্তু কিছু দর্শক এদিক ওদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশ ভাল টিকিট বিক্রি হয়েছে বলতে হবে। হাজার কয়েক টাকা নিশ্চয় পার্টির আমদানি হবে আজ।

শান্তির জন্য জামসেদপুরের লোক আকুল উন্মাদনায় ছুটে এসেছে! স্বাহার ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপহাস্য ফুটে উঠল। স্বাহা জানে এই সব সুবেশধারী নর-নারীদের অধিকাংশই এসেছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখার জন্য। স্বাহারা আজকের অনুষ্ঠানে কলকাতার গুটি কয়েক গায়ক গায়িকাকে আনিয়েছে। নচেৎ সর্ব নিম্ন টিকিট যেখানে এক টাকা, সেখানে এত ভিড় হত না। এ তো আর সমাজবাদী দেশ নয় যে কালচারই লোকের ধ্যান জ্ঞান হবে।

তা ছাড়া স্বাহাদের আরও একটা কাজ করতে হয়েছে। জামসেদপুরে আজকাল নাচ গানের হিড়িক কম নয়। সব পাড়ার মাতব্বর এবং অবস্থাপন্ন বাড়ির মেয়েরাই নাচ গানের স্কুলে যাচ্ছে। ওদের মধ্যে থেকে বাছাই করে করে দুই-একটি প্রোগ্রামও আজ রাখতে হয়েছে। বৈচিত্র্যের জন্য তা হলে অনুষ্ঠান বেশ জমবে এবং তা ছাড়া বিভিন্ন পাড়ার প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের মেয়েরা অনুষ্ঠানে আছে বলে তাঁদের মারফত উঁচু দামের টিকিট-গুলিও সহজে বিক্রি হয়ে গেছে। আর সর্বোপরি লাভ হচ্ছে এই যে এই রকম এক সুনির্বাচিত দর্শকমণ্ডলীকে আজ শান্তির কথা শোনান হচ্ছে। এ কি কম লাভ? সাত-আট শ লোককে এক চোটে ইনডকট্রিনেট করা গেল! এক ঢিলে দুই পাখী মারার কথা আছে। স্বাহারা তিন পাখী মারতে পারছে বলে আবার একটু হাসি ওর ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিল।

সভাপতি একজন বয়োবৃদ্ধ অথচ পশারবিহীন স্থানীয় উকিল। স্বাহারা এ সব ব্যাপারে খোলাখুলি সামনে আসে না। পিছন থেকে অবশ্য ব্যবস্থা-পত্র করে দিতে অসুবিধা নেই। উকিল ভদ্রলোক বিনা মেহনতে সভাপতির পদ পাওয়ায় অতীব হৃষ্ট। স্টেজের মাঝখানে একটি টেবিলের পিছনে মালা গলায় দিয়ে বসে প্রসন্ন হাস্যে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে চেনা লোকেদের খুঁজছিলেন। দেখুক একবার সকলে যে তিনিও কম যান না। স্বাহারা

জানে যে পোকা জালে পড়েছে। এবার সময় মত ধীরে ধীরে মাকড়সার নীতিতে তার রস শুষতে আরম্ভ করলেই হল।

এই প্রসঙ্গে স্বাহার বিগত অক্টোবর মাসে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত শান্তি সমিতির বিশেষ বৈঠকের কথা মনে পড়ে গেল। ঐখানে সমিতির আগামী প্রকাশ্য অধিবেশনের প্রস্তুতি কমিটি যাঁদের নিয়ে গঠিত হয়, তাঁদের অধিকাংশই প্রকাশ্য ভাবে পার্টির কর্মী নন। ঐ সব সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের দেখে শান্তি সমিতির পিছনে পার্টির হাতের কথা সাধারণতঃ কেউ ধারণাই করতে পারবে না। স্টকহলমের শান্তি আবেদনে দস্তখত করার ডাকেও এই রকম লোকেদেরই নাম স্বাহাদের পার্টি ব্যবহার করেছিল। তার ফলেই না স্বাহারা প্রায় সাত লক্ষ জ্ঞানী গুণীর সই সংগ্রহ করে সমস্ত দেশ থেকে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে প্রতিক্রিয়াশীল ভারত সরকারের বিষদৃষ্টি এত করেও এড়ান যায় নি। নচেৎ গত মার্চ মাসে দিল্লীতে শান্তি কংগ্রেসের প্রস্তাবিত বৈঠক নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়! সম্মেলনে সমাজবাদী দেশগুলি থেকে বহু সংখ্যক প্রতিনিধি ছাড়াও পুঁজিবাদী দেশের অনেক প্রগতিশীল ও শান্তির জন্য সংগ্রামকারী কর্মী আসতেন। ভারতে স্বাহাদের পার্টি কত প্রেরণা, কত উপদেশ পেত ওঁদের কাছ থেকে। এই আশায় পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটির বৈঠকও ঐখানে করা হবে স্থির ছিল। কিন্তু সরকার মুখ চিনে চিনে ভিসা দেবার নীতি গ্রহণ করায় বিদেশী প্রতিনিধিদের আনার আর কোন অর্থ রইল না। তাই অবশেষে বোম্বেতে ঐ অধিবেশনের কাজ এক রকম নমো নমো করে সারতে হয়। ঐখানেই তো ভারত-চীন মৈত্রী সংসদ গঠন করা হয় এবং বার্লিনের বিশ্ব শান্তি পরিষদের ফেব্রুয়ারী মাসের ঘোষণাকে এ দেশে জনপ্রিয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ভারতে শান্তি পরিষদের বৈপ্লবিক কার্যক্রমের জন্য পার্টির একজন হিসাবে স্বাহা গর্ব বোধ করে। পার্টির সার্কুলার অনুযায়ী শান্তি পরিষদ কংগ্রেসী আর ডলার দিয়ে কেনা জয়প্রকাশের চ্যালাদের অপপ্রচার সত্ত্বেও জনসাধারণকে এ কথা বুঝিয়ে চলেছে যে তিব্বতের মুক্তি যুদ্ধবাজদের কুপ্রচেষ্টাকে বানচাল করে দেবার অভিমুখে এক প্রগতিশীল পদক্ষেপ। আর সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার ভাড়াটে দালাল সিংম্যান রী-র এশিয়াকে বিকিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রকে লোকচক্ষে প্রকট করার জন্যই উত্তর কোরিয়ার হয়ে চীনা সেচ্ছাসেবকেরা ৩৮তম প্যারালাল পার হয়েছে।

কিন্তু মূল বক্তা উত্তর প্রদেশের পণ্ডিত হরিলালজী তাঁর বক্তৃতার উপসংহার পর্বে পৌঁছেছেন বলা যায়। ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে গুণীজন। আগ্রার কোন্ কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঐ প্রদেশের কংগ্রেসের কর্তাব্যক্তি ছিলেন একজন। জেলেও গিয়েছিলেন কয়েকবার। ইংরেজ চলে যাবার পর যখন কংগ্রেসের হাতে শাসনভার এল, উনি তখন উত্তর প্রদেশের এক জন মন্ত্রী হবেন—এই রকম একটা কথাও উঠেছিল। কিন্তু তার পর কি হল কে জানে, উনি ক্রমশঃ কংগ্রেস থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন। কিছু দিন কংগ্রেসের সরকারী দল বা যে গোষ্ঠীর হাতে কর্তৃত্ব, তাদের সমালোচনা করলেন নানা ব্যাপারে। তার পর এই বছর শান্তি কমিটির তরফ থেকে চীনে পাঠান হল ওঁকে। সেখান থেকে ফেরবার পর ভদ্রলোক একরকম "চীন্ময়" হয়ে গেছেন বলা চলে। ঘুরতে ফিরতে সর্বদাই কারণে অকারণে চীনের জয়গান। ভদ্রলোকের উচ্ছ্বাসের মাত্রা এর পর এত বেড়ে গেছে যে গত ১৯শে নভেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে উনি লেনিন ও স্ট্যালিনকে গান্ধীর চেয়েও বড় শান্তিবাদী বলে ঘোষণা করেছেন। এত তাড়াতাড়ি এই ভদ্রলোকের এতটা উন্নতি হবে একথা স্বাহাদের পার্টির অনেকেই আশা করতে পারেন নি।

সুতরাং পণ্ডিতজীর ঐ ঘোষণার পর তাঁকে অবিলম্বে শান্তি সংসদের তরফ থেকে সোভিয়েৎ রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের সমাজবাদী দেশগুলিতে এক শুভেচ্ছা মিশনে পাঠান হয়। পণ্ডিতজীর মস্কোতে অবস্থান কালে স্বয়ং মহান স্ট্যালিন পাঁচ মিনিটের জন্য একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। এ দিকে স্বাহাদের পার্টি ঐ সাক্ষাৎকারের সময়কার হাস্যমুখ ফোটো সংগ্রহ করে এ দেশের খবরের কাগজগুলিতে তার বিশদ বিবরণ সহ ফলাও করে প্রচার করে। ফলে পণ্ডিতজী দেশে ফেরার পর থেকেই এক রকম নাওয়া-খাওয়া ভুলে চীন সোভিয়েৎ দেশ ও পূর্ব ইউরোপের নূতন গণতন্ত্রগুলির প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। বলতে বলতে আবেগে তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যায়, চক্ষু সজল হয়ে ওঠে।

সুবক্তা হিসাবে পূর্বেই পণ্ডিতজীর খ্যাতি ছিল। এখন ভাষার সঙ্গে নাটকীয় আবেগ সংযুক্ত হওয়ায় তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে চিত্রার্পিতের মত অভিভূত করে রাখেন। নূতন চীনের কৃতিত্ব ও সাফল্যের কথা পণ্ডিতজীর অননুকরণীয় ভাষায় শুনে শ্রোতারা তাঁরই সঙ্গে গর্ব ও উল্লাসে হাসতে থাকে। আবার নূতন চীন ও সমাজবাদী দেশগুলির বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া যে

ষড়যন্ত্র চলছে, তার কথা যখন পণ্ডিত হরিলালজী বাষ্পাকুল নেত্রে বর্ণনা করেন, দর্শকজনও তখন রোষে ক্ষোভে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু মোচন করতে থাকে। স্বাহারা ভাল ভাবেই জানে যে পণ্ডিতজীর মত যে কয় জনকে তারা সম্প্রতি রাশিয়া ও চীন ইত্যাদি ঘুরিয়ে এনেছে, তারা পার্টির বিশিষ্ট সম্পদ। শান্তি আন্দোলন নিয়ে এত হৈ-চৈ ও তোড়জোড় করার নীট পুরস্কার।

পণ্ডিতজী আবেগোচ্ছল গদগদ কণ্ঠে বলছিলেন, "বন্ধুগণ, আমি সেই সোনার দেশ দেখে এসেছি—যে দেশে বেকার সমস্যা নেই, রোগ মহামারী ও দারিদ্র্য যেখান থেকে চিরনির্বাসিত, একটি মশা মাছি বা শস্যের ক্ষতিকারক চড়ুই পাখিও আর দেখতে পাবেন না সেখানে। নূতন চীনে খাওয়াপরার জন্য আর কাউকে চিন্তা করতে হয় না। রাষ্ট্র সকলকে কাজ দেয় এবং তার বিনিময়ে প্রচুর অন্ন বস্ত্র ও অন্যান্য ভোগ্য উপকরণের সংস্থান করা হয়। সেখানকার জীবনমানের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, খাওয়া থাকার যে প্রাচুর্যের দৃশ্য আমাদের চোখে পড়েছে, তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে নূতন চীন তার নব-সমাজ-গঠন-প্রক্রিয়া গ্রহণ করে এক অলোকসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে। এবং তাই তারা শান্তি চায়। দেশকে আরও ভাল ভাবে গড়ে এত দিনের দলিত শোষিত চীনকে জগৎ সভায়···"

স্বাহার মনোযোগ বাধা পেল। স্বাহার ঠিক পিছনেই এক জন বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে উঠল, "দূৎ, যত সব গাঁজা।" বেশ স্পষ্ট স্বর। আশেপাশের সবাই শুনতে পেয়েছে নিশ্চয়।

আর এক জনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "কি বাজে বলছ, পণ্ডিতজী নিজে দেখে এসেছেন।"

প্রথমোক্ত জন নিরস্ত না হয়ে বলল, "যা দেখিয়েছে তাই দেখেছেন এবং যা শুনিয়েছে তাই শুনেছেন। পণ্ডিতজী কি আর চীনা ভাষা জানেন নাকি? সরকারী দোভাষীর সাহায্যে সরকারী বক্তব্য শুনে এসেছেন। আমাদের দেশেও যে সব মান্য গণ্য বিদেশী অতিথি আসেন, তাঁদের এই ভাবে ভারতদর্শন করান হয় এবং তাঁরাও উচ্ছ্বসিত ভাষায় আমাদের তারিফ করেন। আমি বাপু অর্থনীতির ছাত্র। এ শাস্ত্রে ম্যাজিকের স্থান নেই।"

"তার মানে?"

"মানে এই যে, যে জাতির দুই তিন বছর পূর্বেও ভাঁড়ে মা ভবানী ছিল, তারা এ ভাবে রাতারাতি বড়লোক হয়ে উঠতে পারে না।"

"পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় পারে না, কিন্তু কমিউনিজমে খুবই সম্ভব।"

উত্তরটা স্বাহার কানে যেন মধু বর্ষণ করল। তাদের প্রচেষ্টা সার্থক হচ্ছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু আনন্দ ভাল ভাবে উপভোগ করার পূর্বেই এক আঘাত। প্রথমোক্ত বক্তা এ উত্তরে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট না হয়ে তীব্র কণ্ঠে বলল, "এই আর এক নম্বরের গাঁজা। রুল অফ থ্রি—অর্থাৎ বাঙলায় যাকে ত্রৈরাশিক বলে শুনেছ তার কথা?"

"হ্যাঁ, কেন?"

"শোন বলি। রাশিয়া ও চীন ভারতের মত অনুন্নত ছিল—এই হচ্ছে এক নম্বরের বক্তব্য। এরা এখন কমিউনিজম গ্রহণ করে দুধ ঘি-এর সমুদ্রে সাঁতার কাটছে—এই হল দুই নম্বরের বক্তব্য। এবার বল ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কোন্ পন্থা গ্রহণীয়? আরে বল না—চুপ করে আছ কেন? ত্রৈরাশিকের ফরমুলা অ্যাপ্লাই কর, সহজ জবাব।"

"ভারতকেও কমিউনিজম গ্রহণ করতে হবে।"

"বা, বা! চমৎকার হয়েছে। এক শ'র মধ্যে এক শ'-ই দিলাম—ফুল মার্কস। এই উত্তরটি সকলের মনে আর ঠোঁটের ডগায় এনে দেবার জন্য রাশিয়া ও চীনে পাঠানর জন্য এত সাধাসাধি এবং তার পর ফিরে এলে সকলের কানে মন্ত্র দেবার জন্য সভাসমিতিতে এত ধরাধরি। নাও চল এবার।" শেষ দিকে বক্তার কণ্ঠে বিরক্তি ফুটে উঠল।

"না, না—এখনই যাব কেন? আসল আইটেম, মানে গান-বাজনা তো এর পরে।"

"তা শোনা যাবে না হয়। কিন্তু এখন একটু বাইরে ঘুরে আসি। এই বাঁধা বুলি শুনতে শুনতে মাথা ধরে গেছে।"

স্বাহার পিছন দিয়ে ওরা জুতোর মচ মচ্ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল।

এ দিকে ঘন ঘন করতালি ধ্বনির মধ্যে পণ্ডিতজীর বক্তৃতা শেষ হয়েছে। তার পর যবনিকা পড়ল এবং সে পর্দা ফের উঠেও গেল। স্টেজের উপর নাচ হচ্ছে—এগ্রিকো কারখানার সুপারইনটেনডেণ্ট মিস্টার বাসুর বিদুষী কন্যা মালতীর ভুখা নৃত্য।

অন্ধ্রের রয়ালসীমা অঞ্চলের কৃষকদের দুর্দশার কাহিনী নৃত্যের উপজীব্য বিষয়। এক দিকে জমিদারের শোষণ এবং অন্যদিকে সরকারের জুলুম। এর মধ্যে পিষ্ট রয়ালসীমার কৃষাণ সম্প্রদায়। ঘোষালবাবুর বেহালায় একটা করুণ সুরের মূর্ছনা উঠেছে, সেতার তার সঙ্গে তান মিলিয়েছে। প্রশান্ত

ঘোষের দরাজ গলার কণ্ঠ-সঙ্গীত—কেবল একটা সকরুণ হাহাকার ঘরের মধ্যে মুক্তিকামী বন্দী বিহঙ্গের মত ছটফট করছে। ডুগি তবলা বিলম্বিত লয়ে সঙ্গত করছে এবং তার তালে তালে মালতীর অনিন্দ্যসুন্দর দেহবল্লরী রয়ালসীমার বেদনার্ত নিপীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনকে রূপ দিচ্ছে। স্টেজের দুই পাশ থেকে রঙীন আলোর ফোকাস পড়েছে মালতীর উপর। স্পট লাইট ঘুরে ঘুরে ওর নৃত্যরত দেহের অনুসরণ করছে। সেলোফিন কাগজে ছাঁকা রঙ বেরঙ-এর আলোতে মালতীর হাতের সোনার চুড়ির গোছা ও গলার হার ঝিকমিক করছে। ফিকে নীল শিফনের শাড়ি আর বেগুনী নাইলনের চোলির অন্তরাল থেকে মালতীর গৌরবর্ণ দেহকান্তি যেন ফুটে বেরোচ্ছে। কত বিভিন্ন মুদ্রা ও বিচিত্র দেহভঙ্গিমার সাহায্যে মালতী রয়ালসীমার ভুখা কিষাণীর আকুতিকে দর্শকজনের হৃদয়ে পৌঁছে দেবার প্রয়াস করছে। স্টেজের বাকী সব অন্ধকার, অডিটোরিয়ামও অন্ধকারে ডুবে গেছে—কেবল জেগে আছে মালতীর নৃত্যরত দেহভঙ্গিমা আর প্রশান্ত ঘোষের উদাত্ত মেঘমন্দ্র কণ্ঠের হাহাকার।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান ভোজপুরী গান খুব জমে উঠল। জন কয়েক পুরুষ ও রমণী ভোজপুরী পোশাক পরে স্টেজের উপর অর্ধচন্দ্রাকারে বসে আছে। মেয়েরা হাততালি দিয়ে গাইছে এবং দুটি ঢোলক ও কয়েকটি করতাল নিয়ে পুরুষরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বহু কণ্ঠের সমবেত সঙ্গীতে হল যেন গম্ গম্ করছে। এ জাতীয় লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে সহজ তাল এর সুর প্রকাশের মাধ্যম হওয়ায় যে কেউ ইচ্ছা মাত্র এ গানে যোগ দিতে পারে। আর হাঁটু চাপড়ে বা শুধু দুই হাতে তাল দেওয়া তো অতীব সরল ব্যাপার। তবে স্বাহারা নিছক লোকসঙ্গীতেব ব্যবস্থা করে নি, "ফাগুয়াকে রাতমে পীয়া কাঁহা হো" অথবা এমন কি "ধোবিনীকে বেটিয়া হাতমে রসরিয়া পানীয়া ভরনে যায় হো" জাতীয় ঠেট দেহাতী কবিদের রচিত বসন্ত বর্ণন কিংবা প্রেমের গান গেয়ে স্বাহাদের কি হবে? লোক-সঙ্গীতের প্রকাশভঙ্গী অবলম্বন করে ওরা চাষী-মজুরদের সুখ দুঃখের কথা ব্যক্ত করছে। গায়ক-গায়িকারা তখন গাইছিল:

হমরী বড়ী বা সসৃতিয়া এহ রজিয়ামে না,
'কার' মৈ চড়িকে মনৃতিরি ঘুমৈ হমরে নাহি জুতা।
ভুখল বেটওয়া রোবৈ, ওনকর দুধ পিয়ালা কুত্তা।
তনিকো লজিয়া ন বাটৈ এহি রজিয়া মে না!

হম কৈসে শ্রমদান করী জব ঘর মে বাটৈ ফাঁকা,
হমরে মেহনত পর মজহুরী পড় ই কৈসন ডাকা ?
ভৈয়া আগিয়া ন লাগৈ এহি রজিয়া মে না !

গানের একটি চরণ শেষ হবার পর মুল গায়েন মাথার উপর মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত তুলে চীৎকার করে উঠল : "বোলে ভাই লাঠি গোলি কী সরকার।" বাকী প্রত্যেকটি গায়ক-গায়িকা সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠল, "মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ"। এক বার হু বার তিন বার—এই প্রক্রিয়া চলল। শেষের বারে মুল গায়েনের বজ্র নির্ঘোষের পর দর্শকদের একাংশ গায়ক-গায়িকাদের স্বরে স্বর মিলিয়ে চাপা স্বরে বলে উঠল, "মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ।"

স্বাহা খুব খুশী হল। তা হলে হাতে হাতে ফল দেখা যাচ্ছে। খুব ভেবে চিন্তেই স্বাহারা আজকের অনুষ্ঠানে এই হোলি গানের আয়োজন করেছিল। ওয়ার প্রডাক্টসের ধর্মঘট একটা গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলছে। দেখতে দেখতে ধর্মঘটের বত্রিশটা দিন পার হয়ে গেল। কোম্পানির নরম হবার লক্ষণ নেই, আর সরকারও মুখে তালা দিয়ে বসে আছে। এখন শহরের জনমত স্বাহাদের স্বপক্ষে আনা দরকার, অন্যান্য কারখানার মজুরদেরও সক্রিয় ভাবে সংঘর্ষের মধ্যে টানতে হবে। নচেৎ স্বাহাদের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। অতএব যত রকমে পারা যায় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াতে হবে।

কিন্তু স্বাহা ভোজপুরী গানের শেষ পর্যন্ত শুনতে পেল না। স্বাহাদেরই একটি মেয়ে নিঃশব্দে এসে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "কমরেড সিংহ ডাকছেন বুকিং অফিসের সামনে।" এ নির্দেশ পেলে দেরি করার উপায় নেই। স্বাহা হাতের ব্যাগটি কোলের উপর থেকে তুলে নিয়ে হুই সারি চেয়ারের মাঝখান দিয়ে গেটের দিকে এগিয়ে চলল। মুল গায়েন তখন বাঁ হাত বাঁ কানে চেপে ডান হাত সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে ঢোলক ও করতালের তালে তালে মাথা হুলিয়ে গাইছিল :

হমহুঁ মুড় কটবলী জেহল কটলী ওনকে সাথে,
বিপতি বঁটাইল হমরী ওর, সম্পতি ওনকে হাথে।
আংগরেজওঁ সে বঢ়িকে কাংগরেসিয়া বা না !

অইসন ধক্কা মার ভাই এনকর গদ্দী উলটে,
কামরেড বনি আগে আও তোহর কিস্মত পলটে।
ভৈয়া ! কব তক বৈঠব ওবরিয়া মে না !

স্বাহা বাইরে যেতে যেতে শুনল গানের দ্বিতীয় চরণের শেষে এবার সারা হল ঘর যেন গর্জন করছে, "লাঠি গোলি কী সরকার—মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ।" একটু পূর্বের সঙ্কোচের কথা ভুলে অত্যন্ত পুলকিত চিত্তে স্বাহা বুকিং অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কমরেড সিংহ চাপা গলায় বললেন, "সরকার বিল্ডিংস-এ যেতে হবে। চিলির নির্বাসিত কবি পাবলো নিরুডার নাম জানেন তো। সাহিত্যিকদের ফ্রন্টে ওঁর দোসর মেলা ভার। প্রাগের ওয়ার্লড ব্যুরোর তরফ থেকে ওঁকে শান্তি আন্দোলন পরিচালনার জন্য পাঠিয়েছে। ওঁর সঙ্গে ইনার সেলের কমরেডদের একটা বৈঠক রেখেছি।"

বিনা বাক্যব্যয়ে আর কয়েক জনের সঙ্গে স্বাহাও কমরেড সিংহের অনুসরণ করল।

* * *

অনুষ্ঠানের শেষে দর্শকরা কলগুঞ্জন করতে করতে বেরিয়ে গেছে। হল খালি বললেও চলে। অনন্ত সমবেত স্বেচ্ছাসেবকদের লক্ষ্য করে বলল, "আচ্ছা তোমরা তা হলে এস এবার সবাই। পরিচয়টা যখন হয়ে গেল, তখন ভবিষ্যতে নূতন কাজকর্মের মাধ্যমে যোগাযোগ নিশ্চয় থাকবে—কি বল সব?"

ছেলেরা সমস্বরে জবাব দিল, "তা তো নিশ্চয়, সে কথা আর বলতে?"

ওরা চলে যাবার পর মীনাক্ষীর দিকে ফিরে অনন্ত প্রশ্ন করল, "মেয়েদের গেটের খবর কি?"

মীনাক্ষী হাসি মুখে জবাব দিল, "জন কয়েক নূতন কর্মী পাওয়া যাবে বলে আশা করছি। মোট কথা অবস্থা বেশ আশাজনক।"

"আচ্ছা চল এবার। তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"যাবে—দরকার ছিল না কিন্তু।"

দুষ্টু হাসি হেসে অনন্ত বলল, "সত্যি তো?"

মীনাক্ষী ক্রোধের অভিনয় করে মাথা দুলিয়ে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি। কতবার বলতে হবে?" তার পর খিল খিল করে হাসতে হাসতে বলল, "নাও, চল এবার। দেখছ না সকলেই চলে গেছে।"

বারী ময়দানের পাশ দিয়ে দামোদর রোড ধরে ওরা দু জনে গল্প করতে করতে এগোচ্ছিল। অনন্তর ডান হাতে তার সাইকেল ধরা এবং মীনাক্ষী ওর বাঁ পাশে। ডান দিকে মাঠের ওপাশে টাটা কারখানার সুউচ্চ পাঁচিল।

ঘেরার মধ্যে পশ্চিম দিক ঘেঁষে ব্লাস্ট ফার্নেসের বিরাট ট্যাঙ্ক ও তার উপরের চিমনীগুলি আগুনের আভায় রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। জমাট অন্ধকার-পিণ্ডের ভিতর রক্তিমাভ চিমনীগুলি যেন এক বিরাটকায় দানবের অনল নিঃসারী নাসারন্ধ্রের মত মনে হচ্ছে। এত দূরেও কারখানার যন্ত্রপাতির শব্দ ভেসে আসছে—ঝক্ ঝক্ ঝর্ ঝর্ ঝম্ ঝম্। আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা দৈত্য রুদ্ধ আক্রোশে ক্রুদ্ধ গর্জন করছে যেন। নৈশ প্রকৃতির নিস্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে দিয়ে সুতীক্ষ্ণ শব্দে কোথাও একটা হুইসিল বেজে উঠল।

মীনাক্ষী চমকে উঠেছিল। ত্রস্ত ভাবে সে এদিক ওদিকে চকিত দৃষ্টিপাত করল। অনন্ত একটু হেসে বলল, "দেখে ফেলেছি কিন্তু।"

রুষ্ট কণ্ঠে মীনাক্ষী বলল, "কি দেখেছ?"

সোজা জবাব না দিয়ে অনন্ত আবার বলল, "বিশ্বে সর্বহারাদের বিপ্লব সফল করার নেত্রী হবে যে কমরেড, তার এত সহজে চমকে উঠলে চলে?"

মীনাক্ষী এবার হেসে ফেলল। বলল, "নাও, খুব হয়েছে। এক মনে একটা কথা ভাবছিলাম বলে হঠাৎ ঐ হুইসিলের শব্দে চমকে উঠেছিলাম।"

উৎসুক ভাবে অনন্ত প্রশ্ন করল, "কি ভাবছিলে?"

"ভাবছিলাম যে মিস ওয়াং চী এবং ওয়াং উ লুকে স্বাহাদিকে বলে এখানে নেমন্তন্ন করে আজকের মত একটা ফাংশন করলে কেমন হয়। জান বোধ হয় চীন থেকে ঐ দু জন কমরেড মাদ্রাজে এক চিকিৎসক সম্মেলনে যোগ দেবার নাম করে এসেছেন। এই রকম একটা ব্যাপার না দেখালে ভারত সরকার আবার ভিসা নিয়ে গণ্ডগোল করে কিনা। যাই হক, ওঁরা পৌঁছাবার পর মাদ্রাজের ছাত্র ফেডারেশনের তরফ থেকে ওঁদের দু জায়গায় সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে এবং উভয় উপলক্ষেই ওঁরা পার্টির বেশ খানিকটা প্রচার করেছেন। তা ছাড়া এই সেদিন অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী মাসের ন তারিখে জলন্ধরে পাঞ্জাবের ছাত্র ফেডারেশনের যে সম্মেলন হল, তাতে যোগ দিয়ে এই কথা বলেন যে ভারতের বর্তমান অবস্থাও বিপ্লবপূর্ণ চীনের মত এবং তাই ছাত্রদের তাঁরা বিপ্লবী চীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এই রকম দু জন কমরেডকে অন্ততঃ এক দিনের জন্যও পেলে এখানে ছাত্রদের মধ্যে আমাদের প্রভাব আরও বেড়ে যেত।"

অনন্ত বলল, "কিন্তু আমি কি ভাবছিলাম জান?"

"কি?"

"বার্লিনে বিশ্ব যুব সম্মেলন হবে। ভারতবর্ষ থেকে পার্টির একশ জন

ডেলিগেট ছাড়াও একটি সাংস্কৃতিক ও একটি খেলাধুলার দল পাঠান হবে ওখানে। খরচ অবশ্য ওরাই দেবে। আমাদের যাওয়ার সৌভাগ্য হবে না; কিন্তু স্বাহাদি গেলে কী সুন্দর হত!"

"স্বাহাদি কি যাবেন? উনি তো বলেন যে এখানে থেকে কাজ করাই ওঁর মিশন। কিন্তু ভাল কথা, তোমাদের স্বাক্ষর অভিযান কেমন চলছে?"

"ফেডারেশনের সার্কুলার পাবার পর আমরা ও কাজে লেগে পড়েছি। বার্লিনের বিশ্বশান্তি সংসদের প্রস্তাবানুযায়ী বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভিতর শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করার আবেদন জানিয়ে ছাত্র শিক্ষক, সাংস্কৃতিক কর্মী ইত্যাদির কাছ থেকে আমরা সই সংগ্রহ করছি। এ যাবত প্রায় চারশ সই সংগ্রহ হয়ে গেছে। এটায় কোন অসুবিধাও নেই। প্রায় ছেলেরাই বিনা বাক্য-ব্যয়ে সই করে দেয়।"

মীনাক্ষী বলল, "আচ্ছা তোমার কি মনে হয়? এই সব সই-এ কোন কাজ হবে?"

"আরে আর কিছু না হক এই সই সংগ্রহ করার অভিযানের মারফত আমরা নূতন কিছু রিক্রুট তো পাব। একটা মস্ত বড় গণ-সংযোগের কার্যক্রম এ—এই কথা জেনে রেখো।"

কথা বলতে বলতে ওরা কিং জর্জ ফিফ্‌থ মেটারনিটি হাসপাতালকে ডান হাতে রেখে মোড় ফিরল। এবার ওরা সাকচী থেকে স্টেশনগামী রাস্তার উপর এসে পড়েছে। ও দিকে দূর পূর্বাকাশে টিনপ্লেট, কেব্‌ল্‌ কোম্পানি ও টাটানগর ফাউণ্ড্রির আলো লালিমার ছোপ ধরিয়ে দিয়েছে। পিছন ফিরলে উত্তরপূর্ব দিকে এগ্রিকোর আলোও চোখে পড়বে। কিন্তু বড় রাস্তা হলে কি হবে, এ দিকটা অন্ধকার। মহুলবেড়া পর্যন্ত জনবসতি নেই বলে রাস্তার আলোগুলিও দূরে দূরে। লোহা বার করে নেবার পর তরল লোহা-পাথরের যে গাদ আর ময়লা ছোট ছোট মালগাড়িতে টেনে এনে টাটা কারখানার এই মহুলবেড়ার পাঁচীলের ধারে একটা ছোটখাটো পাহাড়ের মত ঢিপি করে ফেলা হয়, তার এঞ্জিনের আলোও আজ জ্বলছে না।

পথ এক রকম জনবিরল। মাঝে মাঝে দুই একটা মোটর রক্তচক্ষুর ছটায় ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে সাঁ সাঁ করে চলে যাচ্ছে। মীনাক্ষী প্রশ্ন করল, "কটা বাজল বল তো? একটা বাস পেয়ে গেলে ভাল হত।"

অনন্ত হাত ঘড়িটা দেখে বলল, "নটা চল্লিশ। কিন্তু বাস কি এখন পাবে? ওদের শিফট বদলাবার সময় হয়ে এল।"

মীণাক্ষী এবার আতঙ্কিত স্বরে বলল, "সর্বনাশ হয়েছে! বাবা দশটার সময় ডিউটি সেরে ফিরে আসবেন। এত রাত্রেও আমাকে ঘরে না দেখতে পেলে আর রক্ষা থাকবে না। বাবার হুটো দশটা ডিউটি ছিল বলেই না এমন নিশ্চিন্ত ভাবে এ সপ্তাহটা বিকেলের দিকে কাজ করতে পেরেছি।"

অনন্ত চিন্তিত ভাবে বলল, "তাই তো, তা হলে তো ভাবনার কথা। একে জামসেদপুরের বাস, তার উপর আবার এই শিফট বদলানর সময়।"

মীনাক্ষী পায়ের গতি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আর কথা নয়, এখন তাড়াতাড়ি চল।"

অনন্ত বলল, "দাঁড়াও একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে। তোমাকে দশ মিনিটের মধ্যে ঘরে পৌঁছে দেব।"

"কি করে?"

"এই এমনি করে।" কথা বলতে বলতে অনন্ত অসতর্ক মীনাক্ষীর কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে নিজের সাইকেলের সামনের রডে বসিয়ে দিয়ে নিজেও এক লাফে সাইকেলে চড়ে বসল। হুবার প্যাডেল ঘোরাতেই অনন্তর সাইকেল তীব্র বেগে ঢালু রাস্তা ধরে মহুলবেড়ার দিকে এগিয়ে চলল।

বিভ্রান্ত অবস্থা সামলে নিতে মীনাক্ষীর সময় লাগল। কয়েক সেকেণ্ড জড়বৎ বসে থাকার পর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে রুষ্ট কণ্ঠে সে বলল, "ছি ছি, কী হচ্ছে? কে দেখে ফেলবে এক্ষুনি। নামিয়ে দাও আমাকে।"

সাইকেলের গতি বিন্দুমাত্র হ্রাস না করেই অনন্ত জবাব দিল, "এমন করলে হু জনেই সাইকেল সুদ্ধ চিৎপাত হয়ে রাস্তার উপর পড়ব। তোমার তো তাড়াতাড়ি পৌঁছান দরকার। তবে কিসের এত আপত্তি?" একটু অস্বস্তি বোধ হলেও অগত্যা মীনাক্ষীকে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে স্থির হয়ে বসে থাকতে হল। অনন্ত দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস ফেলতে ফেলতে সাইকেল চালাচ্ছে। ওর উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শ মীনাক্ষী তার মাথার চুলে, গণ্ডের পাশে ও গ্রীবাদেশে স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে।

সাইকেল চলেছে চড়াই ভেঙ্গে। ডান দিকে রাস্তার পাশে কারখানার পাঁচিল। মহুলবেড়া ছাড়িয়ে পথ এবার খাড়া উঠে গেছে বার্মামাইন্‌স্ পর্যন্ত। খাড়া রাস্তা বেয়ে ওঠার জন্য অনন্ত সামনের দিকে ঝুঁকে প্যাডেল করছিল। অনন্তর চিবুক কয়েক বার মীনাক্ষীর মাথা ছুঁয়ে গেল। মাঝে মাঝে হু জনার বুকে পিঠে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল। মীনাক্ষী ছটফট না করলেও তার অস্বস্তির ভাবটা কাটে নি। তাই আবার সে বলল, "লক্ষীটি অনন্ত,

এবার সাইকেল থামাও। নিজেদের পাড়ার কাছে এসে পড়েছি। এখান থেকে একলাই হেঁটে চলে যেতে পারব।"

কিন্তু অনন্তর মাথায় ভূত চেপেছে। হয়তো শিভ্যালরী, হয়তো বা অন্য কিছুর ভর হয়েছে। সে বিদ্রূপ করে বলল, "আহা, কী আমার সাহসিকা রে! মনে মনে ষোল আনাই তো ইচ্ছা যে বাড়ি পৌঁছে দিই, অথচ মুখে উল্টো কথা। তোমার সাহস আমার জানা আছে। তাও যদি একটু আগে কারখানার হুইসিল শুনে চমকে না উঠতে।"

মীনাক্ষী সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের উপর রাখা অনন্তর দক্ষিণ করমুষ্টিতে একটি কিল মেরে প্রতিবাদের স্বরে বলল, "বার বার ভীরু বলবে না বলে দিচ্ছি। তুমিও যে কত সাহসী পুরুষ তা আমার জানা আছে।"

অনন্তর মাথায় যেন চন্ করে রক্ত চড়ে গেল। অকস্মাৎ কোথা থেকে প্রচণ্ড সাহস নয়, দুঃসাহস এসে ওর কাঁধে ভর করল। মীনাক্ষীর প্রাথমিক প্রতিরোধ ও পরবর্তী আত্মসমর্পণ ওকে অনেকটা দুঃসাহসী করে দিয়েছিল। এবার মীনাক্ষীর এই কথা এক ধাক্কায় ওকে বহু দূরে এগিয়ে দিল। কোথা দিয়ে কি ঘটল বোঝার পূর্বেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, "দেখবে সাহস আছে নাকি?" এবং চাপা কণ্ঠে কথা কটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সে সাইকেল চালনরত অবস্থায় বাঁ হাতে মীনাক্ষীর থুতনি তুলে ধরে ওর মুখমণ্ডলে প্রচণ্ড আবেগে চুম্বন করল। কিন্তু তার পরক্ষণেই দুঃসহ লজ্জা ও সঙ্কোচে সে একেবারে এতটুকু হয়ে গেল। ছি ছি, এ কী করল সে? এমন হবে এ কথা তো অনন্ত এক মুহূর্ত পূর্বেও ভাবে নি। অনন্ত দুরু দুরু কম্পিত বক্ষে বজ্রপাতের অপেক্ষা করতে লাগল। ওর পায়ের আবর্তন আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে গেছে।

মীনাক্ষীও এক ঝটকায় সাইকেল থেকে নেমে পড়েছে। তীর বেগে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সে অনন্তর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তার পর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "ছি অনন্ত, তুমি…তুমি…"—ওর গলা দিয়ে আর স্বর বেরোল না।

॥ চব্বিশ ॥

ওয়ার প্রডাক্টস কারখানার অধিকাংশ শ্রমিক হপ্তা পায়। তাই ধর্মঘটের প্রথম সপ্তাহে তাদের কোন কষ্ট হয় নি। বিগত সপ্তাহের মজুরীর টাকা দিয়ে চালিয়ে নিয়েছে। দ্বিতীয় সপ্তাহও কোন ক্রমে ধার দেনা করে টেনে টুনে

চলে গেছে। ইউনিয়নের নেতারা ভরসা দিয়েছিলেন যে দেখতে দেখতে মালিক পক্ষ অর্থাৎ সর্দার ইন্দ্র সিং আর আজব সিং মজুরদের কাছে নতি স্বীকার করবেন এবং তার পর ইউনিয়ন তাঁদের কাছে যে শর্ত পেশ করেছে সেগুলি তাঁরা মেনে নিতে বাধ্য হবেন। কিন্তু ধর্মঘটের তৃতীয় সপ্তাহেও মালিক পক্ষের কাছ থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। তাদের এই ঘাপটি মেরে থাকা পুরাতন শ্রমিকদের কাছে ভাল লক্ষণ বলে মনে হল না। কি জানি ওঁরা কি কলকাঠি নাড়ছেন ভিতরে ভিতরে।

নানা গুজবে ওয়ার প্রডাক্টস কারখানার কলোনী ছেয়ে গেল। কেউ বলল, মালিক পক্ষ ভিতরে ভিতরে অন্য জায়গা থেকে মজুর আনিয়ে কাজ চালু করার ব্যবস্থা করছেন। কেউ রটাতে লাগল যে মালিকরা নাকি বলেছে যে তারা ছয় মাসের আগে কারখানার ফটক খুলবে না। তাদের তো আর কারখানার রোজগারে খেতে হয় না যে দু-চার সপ্তাহ কারখানা না চললে পেট চলবেনা। ওঁরা এখন বসে বসে খাবেন এবং দেখবেন যে কত দিনে মজুরদের বিষ দাঁত ভাঙ্গে। কোথাও কোথাও শোনা গেল যে সর্দার ইন্দ্র সিং এই সব ঝামেলায় বিরক্ত হয়ে কারখানা বিক্রি করে দেবেন বলে স্থির করেছেন। শ্রমিকদের মধ্যে দুশ্চিন্তা আর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। ঘরেও পয়সা নেই, আর কোন খবরও তাদের অনুকূল নয়।

ইউনিয়নও ধর্মঘটের চতুর্থ সপ্তাহ থেকে মিটিং করা কমিয়ে দিল। তাদের নূতন করে বলারই বা কি আছে? মালিক পক্ষ ও সরকারকে গালাগালি দেবার তো চূড়ান্ত হয়ে গেছে। জন সাহেব এবং আই. এন. টি. ইউ. সি-র দালালরা ধর্মঘট ভাঙ্গার চেষ্টা করছে বলে সবাইকে শাসন ও সতর্ক করা— এও তো বহু দিন চলল। এর পর কি বলা যায়? নেহাত ইউনিয়নের অন্ধ সমর্থক ছাড়া আর সব শ্রমিকরাই কিন্তু বুঝে গেল যে অনতিবিলম্বে কোন ব্যবস্থা না হলে ধর্মঘট ভাঙ্গতে কোন দালালের দরকার হবে না, নিজেদের পেটের খিদেই তাদের দিয়ে ধর্মঘট ভাঙ্গাবে।

ইউনিয়নের অন্ধ ভক্তরা অবশ্য এখনও সরকার বিল্ডিংস-এর বাবুদের উপর ভরসা রেখে অপেক্ষা করছিল। কারণ তারা শুনেছে যে সমস্ত ভারতের কৃষক ও মজুররা লাল ঝাণ্ডার নেতৃত্বে ওয়ার প্রডাক্টসের জঙ্গী শ্রমিকদের সাহায্য করার জন্য টাকা তুলছে। শীঘ্রই হাজার হাজার টাকা এসে পড়বে, আর তখন তারা মালিকবৃন্দ দালাল ও সরকারকে এক হাত দেখে নেবে। কিন্তু ইতিমধ্যে কি করা যায়? ঠিক তখন নিজেদের সহকর্মী মজদুর ভাইদের

বোঝানর মত ভাষা ওদের কাছে নেই। তাদের শুষ্ক বিভ্রান্ত চেহারা দেখলে ইউনিয়নের চরম ভক্তদেরও ভাষা কেমন যেন হারিয়ে যায়। আর উভয় তরফেরই পেট উপবাসী বলে বেশীক্ষণ যুক্তি-তর্কের পথে চলার ধৈর্যও কারও নেই। একটুতেই চটাচটি হয়ে যায় বহু দিনের সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে।

ধর্মঘট ষষ্ঠ সপ্তাহে পড়েছে। সরকার বিল্ডিংস-এ পার্টি সেলের জরুরী বৈঠক চলছিল। কমরেড সুকুমার শ্রমিক বস্তি ঘুরে খবর এনেছে যে আগামী বুধবার থেকে এক দল মজদুর কাজে যাবার গোপন বন্দোবস্ত করছে। ওয়ার প্রডাক্টস কলোনীর কথা সকলের কাছে বর্ণনা করে সে তার রিপোর্ট দাখিল করার পর মন্তব্য করল, "আমরা মজুর কেরানী ইত্যাদি সব শ্রেণীর শ্রমিকদের ঘরে ঘরে ঘুরে তাদের সঙ্গে আলাপ করে বুঝেছি যে ধর্মঘট আর চালিয়ে যাবার ক্ষমতা তাদের নেই। আর একবার কিছু সংখ্যক লোক এই ভাবে কাজে গেলে বাদ বাকীদেরও ধরে রাখা যাবে না।"

কমরেড সিংহ অধীর ভাবে বললেন, "কাজে যেতে দেওয়া চলবে না ওদের। প্রচার করে দাও যে ধর্মঘটের আসন্ন বিজয় মুহূর্তে যারা ইউনিয়নের বিনা অনুমতিতে কাজে যাবার কথা ভাবছে, তারা মালিকদের ভাড়াটিয়া দালাল আই. এন. টি. ইউ. সি আর কংগ্রেসের স্টুজ এবং ব্ল্যাকশিপ।"

সুকুমার উত্তর দিল, "এতে কিন্তু বিশেষ কাজ হবে বলে মনে হয় না। এই স্ট্রাটেজি ওখানে পুরান হয়ে গেছে। ওদের পরিবারের সবাই উপোসে রয়েছে যে। খাবার না পেলে এ মিথ্যায় আর এক দিনও ওদের ভুলিয়ে রাখা যাবে না।"

"কমরেড সুকুমার!" কমরেড সিংহ তর্জন করে বললেন, "বুর্জোয়া ভাষা এখনও ছাড়তে পারলে না তুমি। মিথ্যা কাকে বলছ? মিথ্যা বলে কোন চিরকালের স্ট্যাণ্ডার্ড আছে নাকি? পার্টির প্রয়োজনে বার বার যে কথা বলবে তা-ই সত্য—এক মাত্র সত্য।"

সুকুমার সঙ্কুচিত হয়ে কৈফিয়তের সুরে বলল, "না না, আমারই ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু আমি বলছিলাম যে ওখানকার অবজেক্টিভ কনডিশান হচ্ছে এই যে ওদের খাবার-দাবারের কিছু সংস্থান না করলে আর ধর্মঘট চলবে না।"

ইউনিয়নের সেক্রেটারী ব্রজকিশোর পাণ্ডের দিকে তাকিয়ে কমরেড সিংহ প্রশ্ন করলেন, "সরকারের তরফ থেকে সালিশী বসাবার কোন খবর এল নাকি?"

পাণ্ডেজী বিমর্ষ ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "সেই যে লেবার ডিপার্টমেন্ট লিখেছে যে উপযুক্ত নোটিস না দিয়ে বেআইনী ভাবে যে ধর্মঘট শুরু করা হয়েছে, অবিলম্বে বিনা শর্তে তা প্রত্যাহার করে না নিলে সরকার কিছুই করবে না, তার পর আর কোন নূতন কথা বলেন নি ওঁরা।"

কমরেড সিংহ উষ্মা ভরে মন্তব্য করলেন, "তা বলবে কেন? আমাদের পার্টির ইউনিয়ন যে। হত যদি কংগ্রেসের দালাল জন সাহেবের ইউনিয়ন, তা হলে কোন্ কালে সরকার একটা ফয়সালা করে দিত।"

বিষণ্ণ কণ্ঠে পাণ্ডেজী আবার প্রশ্ন করলেন, "এখন উপায় কি তা হলে কমরেড? হরতাল ভেঙ্গে গেলে এই দেড় হাজার মজুর আর তাদের ছেলেপুলে—সব মরে যাবে। আর তা ছাড়া এর পর আর কোন দিন যে আমাদের কারখানায় ইউনিয়ন চালান যাবে, তার ভরসাও নেই। এখন দেখছি ও ভাবে হরতাল করাটা ঠিক হয় নি।"

পাণ্ডেজীকে বাধা দিয়ে কমরেড সিংহ তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট সুজয়বাবুকে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা ওয়ার প্রডাক্টসের মজুরদের সমর্থনে অন্যান্য কারখানায় ধর্মঘট শুরু করা যায় না? অন্ততঃ আপনাদের টাটা কারখানায় যদি একটা ধর্মঘট বাধে তা হলে বিহার সরকারের নিষ্ক্রিয়তা তো যাবেই, সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারেরও টনক নড়বে।"

সুজয়বাবু উত্তর দিলেন, "এ প্রস্তাব মন্দ নয়। আর আমরা যে এত দিন টাটার মজুরদের ভিতর হুইসপার প্রপাগ্যাণ্ডা চালালাম, তার পরিণতিটাও একবার পরখ করে দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু নিছক তার কোম্পানির ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্য ওখানে ধর্মঘট শুরু হবার এত দিন পর কি টাটার মজুরদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাবে? একটা 'ইস্যু' থাকলে, একটা সিচুয়েশন সৃষ্টি করতে পারলে কাজ সহজ হত।"

স্বাহা এতক্ষণ নীরবে তার নখ দিয়ে সামনের টেবিলটির উপর আঁচড় কাটছিল। সকলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবার সে মুখ খুলল। বলল, "সুজয়বাবুর কথা ঠিকই এবং কমরেড সিংহের প্রস্তাবও অতীব সমীচীন। আমার তো মনে হয় যে কেবল টাটার শ্রমিক নয়, সমগ্র জামসেদপুরে সর্বাত্মক হরতাল করে এখানকার সমস্ত কাজকর্ম পর্যুদস্ত করে দিতে হবে। আর আমি যে পরিকল্পনার কথা ভাবছি তাতে একটু বিপদের ঝুঁকি থাকলেও এর পরিণামে সমস্ত জামসেদপুর আমাদের হাতে এসে যেতে পারে।"

সাগ্রহে সকলে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, কি ? কি সেই পরিকল্পনা ?"

স্মিত হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে স্বাহা উত্তর দিল, "কাকদ্বীপের স্ট্রাটেজি। অসুর-দলনে যখন দেবতা যক্ষ রক্ষ সবাই পরাভূত, তখন যুদ্ধস্থলে মহামায়ার আবির্ভাব হয়েছিল না ?......"

সকলে আরও কাছাকাছি সরে এলেন।

* * *

বুধবার। কমরেড সুকুমার ঠিক খবরই এনেছিলেন। ওয়ার প্রডাক্টসের প্রায় দেড়শ জন মজুর যে আজ কাজে যাবে, এ কথা সোমবার বিকাল থেকেই প্রায় সকলে জানত। ইউনিয়নের ভক্তদের অনুরোধ উপরোধ এবং অবশেষে তর্জন-গর্জনেও কাজ হয় নি। এমন কি হকিস্টিক ও ছয় ফিট লাঠি শোভিত স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে ওদের বাড়ির চতুর্দিকে দেড় দিন টহল দেওয়ানতেও ঐ দেড় শ জন নিরস্ত হয় নি। ওরা বোধ হয় আই. এন. টি. ইউ. সি-র নেতাদের পরামর্শে পুলিস ও মালিকদের কাছে লিখিত ভাবে জানিয়েছিল যে তারা আজ থেকে কাজে যোগদান করতে চায় এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য যেন ব্যবস্থা করা হয়। অতএব ওয়ার প্রডাক্টসের ধর্মঘটী শ্রমিকদের ইউনিয়ন এবং তার স্বেচ্ছাসেবকবর্গ ঐ দেড় শ মজুরকে পথে আনার জন্য এর চেয়ে সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারে নি।

কাল থেকে উর্দিধারী পুলিস মাঝে মাঝে ওয়ার প্রডাক্টসের কলোনীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারখানার ফটকের কাছে ধর্মঘটের শুরু থেকে যে সশস্ত্র পুলিস পাহারায় ছিল, মঙ্গলবার দিন দেখা গেল তাদের সংখ্যা অন্ততঃ পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। খবর পাওয়া গেল যে কর্মে যোগদানেচ্ছুক শ্রমিকদের যাতে কেউ বাধা দিতে না পারে, তার জন্য এই ব্যবস্থা। চতুর্দিকে একটা থম্ থমে পরিস্থিতি, কি হয় কি হয় ভাব। তবে এ কথা আর গোপন নেই যে আজকের এই দেড় শ শ্রমিক কাজে যোগ দিলে কাল পাঁচ শ কাজে যাবে এবং ওয়ার প্রডাক্টসের সব শ্রমিক কাজে ফিরে যেতে তার পর দু-চার দিনও লাগবে না।

বুধবার সকাল। ওয়ার প্রডাক্টস কলোনীতে যেন ঝড়ের পূর্বাভাস। আকাশে বাতাসে কিসের একটা কানাকানি, চারিদিক থেকে যেন চাপা ফিসফিসানি উঠছে। কারখানার দীর্ঘ চিমনিগুলি নীল আকাশের বুকে তাদের তর্জনী উঠিয়ে সকলকে শাসাচ্ছে। আর শ্রমিক মহল্লাতেও যেন একটা বেপরোয়া মরীয়া ভাব। মুখ ফুটে কেউ না বললে কি হবে, মনে মনে

সকলেরই ইচ্ছা যে যা হক একটা কিছু এসপার ওসপার হয়ে যাক। শূন্য পেটে ক্ষুধার্ত সন্তানদের কান্নার কলরোলের মাঝে আর এ অনিশ্চয়তা সহ্য করা যায় না। ধর্মঘটের ছেচল্লিশ দিনের ধকলে লোহা পেটান ইস্পাতের মত মানুষগুলি যেন নেতিয়ে পড়েছে। সমস্ত শরীরের ভিতর কেবল চোখ দুটি জ্বলছে ধক্ ধক্ করে!

ওয়ার প্রডাক্টস কারখানার প্রধান ফটক উত্তর-পূর্ব মুখো। পূর্ব দিকে ফটকে ঢোকার রাস্তার পাশে মস্ত একটা খেলার মাঠ। আর পশ্চিম দিকে অফিসারদের বাঙলোর সারি। ত্রিভুজের এক বাহুর মত সাকচী থেকে টেলকো গামী পাকা সড়ক অফিসারদের বাড়িগুলির শেষ প্রান্ত এবং খেলার মাঠের সীমানা ছুঁয়ে চলে গেছে। এই পাকা সড়কের ওপারে মালিকের ছেলে ও কারখানার বর্তমান হর্তা কর্তা বিধাতা সর্দার আজব সিং-এর প্রাসাদোপম অট্টালিকা।

কর্মে যোগদানেচ্ছুক শ্রমিকরা যে কখন কোন্ দিক দিয়ে আসবে কে জানে? মালিক পক্ষ তাদের কাজে নিতে প্রস্তুত এবং পুলিসও দেখবে যে তাদের যেন কেউ বাধা না দেয়। কিন্তু তা বলে ইউনিয়ন কি চুপচাপ বসে আছে? লাল ঝাণ্ডারা অত সহজে দমে যাবার পাত্র নয়। তাদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দু-চার জন করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে সারা কলোনী সাইকেলে চড়ে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। সাইকেলের সঙ্গে আটকান ওদের ছোট ছোট লাল ঝাণ্ডার সঙ্গে বড় বড় লাঠি অবশ্য কারও চোখ এড়াবে না। সাইকেলে কলোনী পরিক্রমার সময় ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকরা এক-একবার কারখানার ফটকের পাশ দিয়েও ঢুঁ মেরে যাচ্ছিল, তবে তারা সেখানে দাঁড়াচ্ছিল না। কারণ পুলিস ফটকের সামনে ও বড় রাস্তা থেকে যে পথটি খেলার মাঠ ও অফিসারদের কোয়াটার্সের মাঝখান দিয়ে প্রধান ফটকে এসে মিশেছে, তার পাশে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। প্রহরারত পুলিস কাউকে সেখানে ভিড় করতে দিচ্ছিল না। যা কিছু ভিড়, যা কিছু জটলা সব বড় রাস্তার ওপাশে। সেখানে জন কয়েক ইউনিয়ন ভক্ত লাল ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে হাতের চোঙ্গা মুখের সামনে ধরে "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" "হরতাল জিন্দাবাদ" "কংগ্রেসী সরকার মুর্দাবাদ" ইত্যাদি প্রাণপণ চীৎকারে ঘোষণা করছিল। কিন্তু কেন যেন আজকে দু-চার জন ছাড়া বিশেষ কেউ ঐ ধুয়োর সঙ্গে গলা মেলাচ্ছিল না। অধিকাংশ মজদুর দর্শক একটা শ্রান্ত ক্লান্ত ও শীতল দৃষ্টিতে রাস্তার ওপাশে ফটকের দিকে তাকিয়ে ছিল।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হল এবং দুপুর ধীরে ধীরে অপরাহ্নের দিকে এগিয়ে চলল। কই, কাজে যারা যোগদান করবে, তাদের তো দেখা নেই। একদল দর্শক ক্লান্ত হয়ে চলে যায়, অপর দল আবার একে একে এসে জমা হয়। কিন্তু অর্জুন মিস্ত্রি ও তার লোকেরা কি ইউনিয়নের এই উদ্যোগ আয়োজন দেখে পিছিয়ে পড়ল? মাঝে মাঝে ভিড়ের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন ওঠে। ঝিমিয়ে পড়া লোকগুলি যেন আরও নিস্তেজ হয়ে যায়।

আচম্বিতে গর্জন করে তিনটি ট্রাক এসে কারখানার প্রধান ফটকে পৌঁছাবার পথের মুখে থামল। টেলকোর দিক থেকে এসেছে ট্রাকগুলি। তিনটি ট্রাকেই মানুষ বোঝাই। মানুষগুলি চোখের নিমেষে লাফিয়ে নিচে নেমে পড়ল। তার পর দেখতে দেখতে ট্রাকগুলি আবার পেট্রোলের ধোঁয়া ছেড়ে টিনপ্লেট কোম্পানির দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জনতা চিনতে পেরেছে। ঐ-ঐ তো ওদের মধ্যে অর্জুন মিস্ত্রি, বনোয়ারী সিং, দীঘা পাঁড়ে ও আরও কত জন। লাল ঝাণ্ডার হাতে ইউনিয়ন যাবার পূর্বে ওরাই তো ইউনিয়নের মুরুব্বী ছিল। এদিকে অপেক্ষমাণ জনতা জানে যে ছেচল্লিশ দিনের ধর্মঘট শেষ করে যারা কাজে ফিরে যেতে ইচ্ছুক, তাদের নেতা ঐ অর্জুন মিস্ত্রী, বনোয়ারী সিং আর দীঘা পাঁড়ে। অর্জুন মিস্ত্রি এদিকের মজুরদের সম্বোধন করে কেবল বলল, "ভাইসব, আমাদের বিবি বাচ্চার জান বাঁচাবার জন্য কাজে যাচ্ছি। হরতাল আর চালান যাবে না। তোমরাও কাজে এস।" তার পর ওরা বেশ মাথা তুলেই দ্রুতপদে কারখানার ফটকের দিকে এগোল। এদিকে জনতার মাঝে আবার গুঞ্জন উঠল এবং চঞ্চলতাও দেখা দিল একটু। চোঙ্গা মুখে দিয়ে যারা চেঁচাচ্ছিল এই কয় মুহূর্তের জন্য তারাও কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। একটু সম্বিৎ ফিরে পেতেই তাদের দলপতি হেঁকে উঠল, "ইনক্লাব।" দু-একজন হাঁ হাঁ করার পূর্বেই চোঙ্গাধারী বাকী কয়জন তোতাপাখীর মত তার প্রতিধ্বনি তুলল, "জিন্দাবাদ।" সূর্য তখন অনেকটা পশ্চিম আকাশের দিকে ঢলে পড়েছে। অস্তগামী রবির অরুণ ছটায় দেখা গেল যে দেড় শ লোকের শেষ ব্যক্তিটিও বড় রাস্তা ছেড়ে খেলার মাঠ আর অফিসারদের বাঙলোর মাঝের রাস্তাতে ঢুকে দ্রুতপদে কারখানার প্রধান ফটকের দিকে এগিয়ে চলেছে।

আবার হাঁক উঠল, "ইনক্লাব জিন্দাবাদ, ওয়ার প্রডাক্টস ইউনিয়ন জিন্দাবাদ।" কিন্তু কী আশ্চর্য, এ শব্দ এল ওদিক অর্থাৎ অফিসারদের বাঙলোগুলির দিক থেকে এবং এ ধ্বনি যারা তুলছে, তারা পুরুষ নয়, নারী।

বড় রাস্তার ধারে দণ্ডায়মান শ্রমিকদের ভিড়ের সবাই স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে সেই সম্মিলিত নারী কণ্ঠের গর্জন। ধৈর্যের বাঁধ আর বজায় রইল না, পুলিসের ধমক ভুলে গেল সবাই। হুড়মুড় করে দৌড়ে তারা বড় রাস্তা পার হয়ে কারখানার প্রধান ফটকে যাবার পথের মুখে এসে জমা হল।

অদ্ভুত দৃশ্য! চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। জনা ত্রিশেক রেজা আর কামিন লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে অর্জুন মিস্ত্রির দলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আরও কয়েকজন পুলিস-বেষ্টনী ভেদ করে অফিসারদের বাঙলোগুলির পাশ দিয়ে আসছে। রেজারা পরম ঔদাসীন্যে পুলিসদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে কারখানার ফটকে ঢোকার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় পুলিসের দল বন্দুকধারী হলেও নিশ্চল পুতুলের মত।

কয়েকজন পুলিস অফিসার ফটকের দিকে এগিয়ে এলেন। হাত মুখ নেড়ে তাঁরা রেজা ও কামিনদের পথ ছেড়ে দিতে বললেন। জবাবে তারা কেবল চীৎকার করে উঠল, "ইনক্লাব জিন্দাবাদ, ওয়ার প্রডাক্টস ইউনিয়ন জিন্দাবাদ।" এই কারখানারই কামিন হলে কি হবে, ইতিমধ্যেই তালিম দিয়ে ওদের বেশ রপ্ত করা হয়েছে।

অর্জুন মিস্ত্রীর দল হেঁকে উঠল, "না খেয়ে মরছি আমরা, আর তোরা শেখান বুলি শোনাচ্ছিস, তোদের আমরা চিনি না? মানে বুঝিস এ সব কথার? এই করে আমাদের আটকান যাবে না। আজ একটা বোঝাপড়া করেই যাব। চল ভাই সব। এগোও ফটকের দিকে।" ধ্বনি আর পাল্টা ধ্বনিতে চারিদিক সরগরম হয়ে উঠল; কিন্তু তারই মধ্যে অর্জুন মিস্ত্রীর দল এগোতে লাগল। বেশ বোঝা যেতে লাগল যে রেজা ও কামিনদের ভিড়টা মাঝখানে পাতলা হয়ে দু পাশে চেপে যাচ্ছে।

তার পর আর কিছু বোঝার পূর্বেই ধপাধপ ইঁট পড়তে লাগল। এ তল্লাটে কোথাও ইঁট পাথর নেই, অথচ সমান ভাবে ইষ্টক ও প্রস্তরবৃষ্টি হয়ে চলেছে। অর্জুন মিস্ত্রীর দলের কজন মাথা চেপে বসে পড়ল। দু-তিন জন পুলিসের পাগড়ি ছিটকে পড়ল। তাদের ভিতর কারও কারও কপাল বেয়ে রক্তের ধারা নামছে; কিন্তু তখনও প্রস্তরবর্ষণের বিরাম নেই। ঠিক কোন্ দিক থেকে পাথর আসছে বোঝা না গেলেও এ ব্যাপারটা চোখে পড়ল যে মার খাচ্ছে অর্জুন মিস্ত্রীর দল ও পুলিসের লোকেরা। কয়েক মিনিট হৈ হুল্লোড় ও হট্টগোলের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল এবং তার পর কি হচ্ছে বোঝার পূর্বেই গেটের দিকে ফট্ ফট্ করে আওয়াজ হতে

লাগল। কয়েকজন আর্তনাদ করে উঠল, "গুলি চলছে, পালাও ওদিক থেকে।" গুলি নয়, টিয়ার গ্যাস। খক্ খক্ করে কাশতে কাশতে কে কোন্ দিকে পালাচ্ছে। চোখ বুজে এদিক ওদিকে ধাক্কা খেতে খেতে সবাই দৌড়োতে লাগল। আর তার মাঝে দেখা গেল পুলিস মেয়েদের ঘিরে ফেলে এক দিকে নিয়ে চলেছে।

খট্ খট্ খটা খট্, খট্ খট্ খটা খট্। গোলমুরির দিক থেকে একদল অশ্বারোহী পুলিস দ্রুতবেগে ঘটনাস্থলে হাজির হল। এখানকার পুলিস অফিসার বেতারে বুঝি খবর পাঠিয়েছিলেন। তাই অশ্বারোহীদের আবির্ভাব। ঘোড়ার চলার তালে তালে তারা জিনের উপর লাগাম হাতে দুলতে দুলতে ডাইনে বাঁয়ে হাতের ব্যাটন চালিয়ে যাচ্ছে আর মুখে হাঁক ছাড়ছে, "হটো হটো, হট যাও সব।" বিশৃঙ্খল জনতার ভিড়ের মধ্যে তাদের ঘোড়া এলোমেলো ছুটতে লাগল আর টিয়ার গ্যাস ও ব্যাটন চার্জের আতঙ্কে বিভ্রান্ত সেই জনসমাবেশের মধ্যে রোল উঠল, "পালাও পালাও।" ধাক্কাধাক্কি গুঁতোগুঁতি করতে করতে অশ্রুসজল চোখে কখনও হোঁচট খেয়ে কখনও আছড়ে পড়ে তারা বাঁচি কি মরি করে আসন্ন অন্ধকারের মধ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগাল। টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়া, ঘোড় সওয়ার পুলিসদের হুংকার আর পলায়মান জনতার আর্তনাদে জায়গাটা কয়েক মিনিটের জন্য নরক-সদৃশ হয়ে উঠল এবং তার পর দেখা গেল যে পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার একদল কামিন রেজা ছাড়া ঘটনাস্থলে আর কোন সাধারণ নাগরিক নেই। বাকী সকলেই পালিয়েছে।

*　　*　　*　　*

পালাও পালাও—অনন্তও ছুটে চলছে। তাদের ছাত্র ছাত্রী বাহিনী যেখান থেকে পুলিস আর অর্জুন মিস্ত্রীর দলের উপর ইষ্টক বর্ষণ করছিল, টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়া সে জায়গাতেও হানা দিয়েছিল। একে চোখে জ্বলুনির ঠেলায় চোখের পাতা ভাল করে খোলবার উপায় নেই, তার উপর অন্ধকার নেমে এসেছে। অফিসারদের কোয়ার্টার্স ছাড়িয়ে লোকালয় বর্জন করে সে ওয়ার প্রডাক্টস কারখানার পশ্চিম দিকের পাঁচিলের ধার দিয়ে ফাঁকা মাঠ ভেঙ্গে মনিপ্পিটের দিকে দৌড়োচ্ছে। আর সব কে কোথায় রইল কে জানে? তবে স্বাহাদিকে সে রেজা কামিনদের দলে পুলিস কর্তৃক পরিবেষ্টিত হতে দেখেছে এবং তার পরই কে যেন তার ভেতর থেকে তাকে ওখান থেকে পালাতে বলল ও অন্তরের সেই নির্দেশের তাড়নায় সে প্রাণপণে

ছুটে চলেছে। দু বার অন্ধকারে ছোট ছোট দুটি ডোবার মধ্যে পড়ে গিয়েও তার গতি রুদ্ধ হয় নি। পিছনের হট্টগোল আর অশ্বারোহী পুলিসদের বাহন ঘোড়াগুলির পায়ের খুরের খটাখট শব্দ তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে।

হুড়মুড় করে কার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ল অনন্ত। "কে, কে?" সে চীৎকার করে উঠল। ভয়ে তার কণ্ঠস্বর বিকৃত।

"কে, অনন্ত না?" মীনাক্ষীর গলার স্বর। কিন্তু তার আওয়াজও শুকনো।

"মীনা নাকি? থামলে কেন—দৌড়োও।" থমকে দাঁড়িয়ে অনন্ত বলল।

"চোখের জ্বালায় কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আর পায়েও চোট লেগেছে। তাই ভাল করে চলতে পারছি না।" মীনাক্ষীর কণ্ঠস্বর কাতরতায় করুণ।

দূরে পিছন থেকে চীৎকার উঠল "হো-ও-ও-হো।" একটা জোরালো টর্চের আলোর রেখা অনন্তদের মাথার উপর দিয়ে ফাঁকা মাঠটা পরিক্রমা করে এক পাক ঘুরে গেল।

মীনাক্ষীর হাত ধরে টেনে তুলে অনন্ত আবার দৌড়োন শুরু করল। ছুটতে ছুটতে বলল, "কষ্ট করে এই মাঠটুকু পার হও। তার পর মনিপিট বাজারে পৌঁছাতে পারলে ইউনিয়নের অফিসে যেতে আর বেশী দেরি লাগবে না।"

অনন্তর টানে মীনাক্ষী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দৌড়োতে লাগল। আঘাতের যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে কেবল ওর মুখ দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ বেরোচ্ছিল।

* * *

ইউনিয়ন অফিস খোলা, কিন্তু কোন জনমানব নেই সেখানে। অনন্তদের অতীব সন্তর্পণে ইউনিয়নে পৌঁছাতে হয়েছে। কারখানার পাঁচিলের সংলগ্ন ফাঁকা মাঠটুকু ছাড়িয়ে প্রায় পাঁচ মিনিটের পথ তাদের হাঁটতে হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে প্রায় দুই তিন জন পুলিস তাদের চোখে পড়েছে। ভাগ্য ভাল ওদের উপর কোন নজর পড়ে নি।

মনিপিট এলাকা একেবারে আদর্শ শ্রমিক বস্তি! বিষ্টুপুর সাকচী বা গোলমুরি টেলকো দেখলে মনিপিটের অবস্থা কল্পনা করা যাবে না। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের পর ইতিহাস যেন আর এগোয় নি এপাড়ায়। রাস্তার মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক আলো বসালে কি হবে, বস্তির ঘরগুলিতে এখনও কেরোসিনেরই রাজত্ব। আর নর্দমা জঞ্জাল ও আবর্জনার কথা না তোলাই ভাল। মুখ্যতঃ ওয়ার প্রডাক্টস এবং সর্দার ইন্দ্র সিং-এর আর একটি কারখানা—জেমকোর স্বল্প

বেতনের শ্রমিকদের বাস এখানে। আবছা আলোর মধ্যে নালা নর্দমা ডিঙিয়ে অনন্ত ও মীনাক্ষী ইউনিয়ন অফিসে এসে পৌঁছেছে; কিন্তু তা হলেও এখানটা নিরাপদ মনে হচ্ছে না। মনিপিটে এ ভাবে পুলিসের টহল দেওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা। আর ইউনিয়ন ঘরের আশেপাশে যে সব দোকান ছিল, সেগুলির ঝাঁপ বন্ধ। অন্যান্য দিন এ সময় বস্তির হৈচৈ ও হট্টগোলে জায়গাটা মাত্ হয়ে থাকে; কিন্তু এই সন্ধ্যা সাড়ে ছটা সাতটার মধ্যেই আজ চতুর্দিক নিস্তব্ধ নিঝুম।

অনন্ত কি করবে ভেবে পেল না। মীনাক্ষী ভয় উত্তেজনা ও পরিশ্রমে কাতর। পথের ক্ষীণ আলোতে অনন্ত লক্ষ্য করেছে ওর কপালের কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে। চটি কোথায় পড়ে গেছে বলে ওকে খালি পায়েই হাঁটতে হচ্ছে। আর শাড়িও ধুলো কাদায় একাকার। অনন্তর নিজের অবস্থাও মীনাক্ষীর চেয়ে খুব ভাল নয়। অথচ এখনই সোজা বার্মামাইন্‌স্ রওনা হওয়া সমীচীন হবে বলে মনে হচ্ছে না। ওয়ার প্রডাক্টস কলোনী এড়িয়ে বার্মামাইন্‌সে যাবার রাস্তা অবশ্য একটা আছে। রামদাস অয়েল মিলের পাশ দিয়ে গেলে জেমকো থেকে বার্মামাইন্‌স্ যাবার পাকা পিচ ঢালা সড়ক পাওয়া যায়। কিন্তু প্রায় আড়াই মাইল হাঁটতে হবে তা হলে এবং পুলিসের হাত এড়িয়ে কোন মতে মনিপিট এলাকা পেরোলেও রামদাস অয়েল মিলের পর বাকী মাইল দুয়েক রাস্তা ভাল নয়। ও অঞ্চলটা একেবারে ধূ ধূ করছে নির্জন। কোন কলকারখানা বা জনবসতি নেই মনিপিট আর বার্মামাইন্‌সের মাঝে। রাতের বেলা ঐ পথে মেয়েদের নিয়ে চলা নিরাপদ নয়, এ কথা অনন্ত জানে।

"স্বাহাদি কোথায়?" এতক্ষণে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে মীনাক্ষী প্রশ্ন করল।

"গ্রেপ্তার হয়েছেন নিশ্চয়। পুলিস ওঁদের ঘিরে ফেলেছিল দেখেছি।"

"তা হলে কালকের ছাত্র ধর্মঘট আর মিছিলের কি হবে অনন্ত?" মীনাক্ষী অনন্তের গা ঘেঁষে বিপন্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করে।

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অনন্ত তাকে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার বন্ধু ইলা বেলা—ওরা সব কোথায়?"

"জানি না। গ্যাসের ধোঁয়ায় কিছু কি আর দেখতে পেয়েছি? কিন্তু স্বাহাদির কি হবে অনন্ত।" কথার শেষ দিকে এবার মীনাক্ষীর গলায় স্পষ্ট কান্নার সুর।

"এই চুপ কর। এখন কাঁদার সময় নাকি?" অনন্তর চাপা কণ্ঠ বেশ দৃঢ় স্বরে উচ্চারণ করে কথা কটি। এখন তাকে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হচ্ছে। কিন্তু তার আগে একটা দেশলাই পেলে ভাল হত, ইউনিয়নের লণ্ঠনটা জ্বালান যেত। তবে তাই বা কোথায় পাওয়া যায়?

কয়েক জোড়া ভারী পায়ের শব্দ ভেসে এল। কারা যেন ভারী পা ফেলে এ দিকেই এগিয়ে আসছে। অনন্ত চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি মীনাক্ষীর হাত ধরে অন্ধকারের মধ্যেই হাতড়ে হাতড়ে ছাদে ওঠার সিঁড়িটা ধরে ইউনিয়ন ঘরের ছাদে উঠে পড়ল ওরা দু জন।

হ্যাঁ, পায়ের শব্দ ইউনিয়ন অফিসের দরজার সামনেই থামল। তার পর টর্চ জ্বলে উঠল। কারা ভিতরে ঢুকছে।

"কোই নহী হ্যায় য়হা। দোনো কামরোঁমে অন্ধেরা হ্যায়।

নাল ঠোকা বুট জুতার শব্দের ফাঁকে ফাঁকে কথাগুলি ভেসে এল।

"উপর কোই ছিপা নহী তো?"

অনন্তর হৃৎপিণ্ড যেন বক্ষপঞ্জরে আছড়ে পড়বে। সমস্ত শরীরের ভিতর ভীষণ শিহরণ। কিন্তু—কিন্তু এখন হার মানলে চলবে না। মীনাক্ষী অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিল। অনন্ত সজোরে তার মুখ চেপে ধরল। জলদি জলদি—প্রতিটি মুহূর্ত এখন অমূল্য। ছাদের এক পাশে কয়েকটি ভাঙ্গা প্যাকিং বাক্সের তক্তা পড়েছিল। দূরস্থ কারখানার অস্পষ্ট আলোয় অনন্ত সেগুলি দেখতে পেয়েছে। বিদ্যুৎগতিতে সে তার মধ্যে থেকে দুখানা তক্তা নিয়ে পাশের দোকান-ঘরের ছাদের আলসের সঙ্গে লাগিয়ে দিল এবং তার পর মীনাক্ষীকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বেপরোয়ার মত সেই তক্তা বেয়ে পাশের দোকান-ঘরের ছাদের উপর পৌঁছাল।

তক্তাখানা সরিয়ে নিতে নিতে সে শুনতে পেল যে নীচে থেকে ভারী পায়ের আওয়াজগুলি তালে তালে উপরে উঠে আসছে। অত্যন্ত ক্ষিপ্র পদে অনন্ত মীনাক্ষীকে এক রকম পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বাড়ির ছাদের অপর প্রান্তের চিলে কুঠির অন্তরালে চলে গেল।

চিলে কুঠির দেওয়ালে হেলান দিয়ে অনন্ত শুনতে পেল উপর থেকে এক জন হেঁকে বলছে, "নহী, কোই নহী হ্যায়। চলো সব, অব জলদি থানামে খবর দেনা হ্যায়।"

খট্ খট্ করে নাল ঠোকা বুটের শব্দ আবার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। ঝনাৎ করে আর একটা শব্দ হল। অনন্ত বুঝল ইউনিয়নের দরজায়

বাইরে থেকে শিকল লাগান হল। তার পর আর একটা শব্দ। তালা বন্ধ করছে নিশ্চয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই খট্ খট্ করতে করতে সবগুলো পায়ের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল।

বিপদ আপাততঃ কেটে গেছে বুঝলেও অনন্ত তখনও স্বাভাবিক হতে পারে নি। সে লক্ষ্য করল যে উপবিষ্ট অবস্থাতেও তার পা দুটি থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। বুকের কাছটা ভারী ঠেকল। এতক্ষণে অনন্তর হুঁশ হল যে মীনাক্ষী তার বুকে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। ওর বেশবাস বিস্রস্ত, এলায়িত কেশপাশের নিম্নভাগ ছাদের ধুলাতে লুটোপুটি খাচ্ছে। মীনাক্ষী সংজ্ঞাহারা হয়েছে কিনা অনন্ত ঠিক বুঝতে পারল না, তবে ওর হাত দুটি দিয়ে সে দৃঢ়ভাবে অনন্তকে জড়িয়ে ধরেছিল এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মীনাক্ষীর বুকের ধুক্ ধুক্ শব্দ অনন্তর বক্ষে অনুরণন সৃষ্টি করছিল।

মীণাক্ষীর পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অনন্ত কোমল কণ্ঠে ডাকল, "মীনা, মীনু, মীনাক্ষী—ওঠ এবার, আর চিন্তা নেই।"

কান্নার আবেগে মীনাক্ষীর দেহটা কেবল দুলে উঠল একবার। কোন সাড়া দিল না সে।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। অনন্ত চতুর্দিকে চেয়ে দেখল। পিছনে ওয়ার প্রডাক্টস এবং উত্তর দিকে টিনপ্লেট আর কেবল্ কোম্পানির চিমনীর আলোর রক্তিমচ্ছটা। আরও দূরে টাটার ডুপ্লেক্স প্ল্যাণ্টের ব্লাস্টিং-এর আভায় সমস্ত আকাশ থেকে থেকে আলোয় আলো হয়ে উঠছে। তবে আলোর রঙ পুরোপুরি লাল নয়, কেমন একটু নীলাভ ছোঁয়াচ আছে তার সঙ্গে। পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকের আকাশ অন্ধকার—একেবারে কালোয় কালো। মনিপিটের অল্প কয়েকটি দোকান সন্ধ্যা থেকেই আজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চতুর্দিক নিস্তব্ধ। নির্জনতার এই অসীম সমুদ্রের মধ্যে দুটি প্রতিবেশী দ্বীপের মত জেগে আছে অনন্ত ও মীনাক্ষী। কেবল নীল নভের তারা কটি যেন বিজন জনপদের এই নিশিথাভিসারের সতর্ক প্রহরী। আর সবই ডুবে গেছে অতলান্ত মৌনের মাঝে। আকাশে চাঁদও নেই। আজ কোন্ তিথি তা কেই বা জানে।

মীনাক্ষী তখনও ফুলে ফুলে কাঁদছে। গভীর স্বরে অনন্ত তাকে বলল, "কাঁদছ কেন মীনা, কি হয়েছে বলবে না আমায়?" কথা বলতে বলতে সে দুই হাতে মীনাক্ষীর মুখমণ্ডল বেষ্টন করে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে ওর অশ্রুসিক্ত গণ্ড ওষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিল। বাঁধভাঙ্গা

জলরাশির দুর্বার বেগে তরুণ অনন্তর বহু প্রতীক্ষায় পিপাসিত সোহাগ তরুণী মীনাক্ষীকে বুঝি আজ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

মীনাক্ষীর আর নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা বা ইচ্ছা নেই। সে প্রতিবাদ করল না, বাধাও দিল না। চক্ষু মুদ্রিত অবস্থাতে অশ্রুরুদ্ধ মৃদু কণ্ঠে সে কেবল বলল, "বড় ভয় করছে অনন্ত।"

অপরিসীম আবেগ সহকারে মীনাক্ষীর কটিদেশ বাম বাহু দ্বারা বেষ্টন করে ওর কম্পমান দেহলতিকাকে নিজ বক্ষ-সংলগ্ন করতে করতে অনন্ত কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল, "ভয় কি? আমি তো আছি। আমাকে বিশ্বাস হয় না?"

॥ পঁচিশ ॥

পরের দিন বেলা প্রায় এগারটা। শাকচীর আর. ডি. টাটা হাইস্কুলের প্রথম ঘণ্টা। সব ক্লাসে তখনও শিক্ষক উপস্থিত হন নি। তাই স্বভাবতই ছেলেরা কলরব করছিল। কিন্তু সে গোলমালকে চাপা দিয়ে অকস্মাৎ আর এক হট্টগোল শোনা গেল। এক দল ছেলে চেঁচাতে চেঁচাতে ক্লাসের বাইরে ছুটে বেরিয়ে গেল। স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে তারা কোথাও থামল না। গেট পেরিয়ে বড় রাস্তার উপর গিয়ে তারা অপেক্ষমাণ জন কুড়ি লোকের সঙ্গে মিলিত হল। বাইরের সেই অপেক্ষারত লোকেরা গুটি কয়েক বড় বড় লাল ঝাণ্ডা এবং ফেস্টুন নিয়ে তৈরীই ছিল। ছেলেরা যেতেই তাদের সারি সারি দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাদের হাতে ফেস্টুন দিয়ে দেওয়া হল। কোন ফেস্টুনে লেখা আছে—ছাত্রদের দাবি কলেজ চাই, কোনটাতে লেখা—আমাদের দাবি ছাত্র-বেতন কম হক। কয়েকটিতে কেবল লেখা—ছাত্র ফেডারেশন জিন্দাবাদ। অনেকগুলি বড় বড় পিজবোর্ডের টুকরার সঙ্গে বাঁশ লাগান। সেই সব পিজবোর্ডে মোটা মোটা হরফে লেখা—"লাঠি গোলী কী সরকার, মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ", "নারী নিগ্রহকারী কংগ্রেসী সরকার, নিপাত যাক" ইত্যাদি।

এর পর সেই ছোট্ট শোভাযাত্রা স্লোগান দেওয়া শুরু করল। "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" এবং "আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে" থেকে শুরু করে ফেস্টুন ও ব্যানারে যা যা লেখা ছিল তা এবং তা ছাড়া আরও নানাবিধ গরম গরম স্লোগানে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে সব ক্লাস খালি করে ছেলেরা স্কুলের বারান্দায় এবং তার সম্মুখস্থ

ফাঁকা জায়গাতে এসে দাঁড়াল। বোধ হয় পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত ক্লাস খালি হয়ে গেল। তখন বাইরের সেই শোভাযাত্রায় ছেলেরা কয়েকটি চোঙ্গা মুখে নিয়ে স্কুলের ছেলেদের উদ্দেশে চীৎকার করে বলল, "চলে এস তোমরা সব; ধর্মঘট হয়েছে, শিগ্‌গির স্কুল থেকে চলে এস।"

ওধারে স্কুলের বারান্দায় দণ্ডায়মান ছেলেদের মধ্যে গুটি কয়েক পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিল। তারা এবার ছেলেদের ভিতর থেকেই হেঁকে উঠল, "চল্ চল্, বাইরে চল্ সব। ধর্মঘট হয়ে গেছে।" কথা বলতে বলতে তারা আশেপাশের দু-চার জনের হাত ধরে টানতে টানতে এগোতে লাগল। আর তাদের পিছনে পিছনে ভোজবাজির মত স্কুলের অধিকাংশ ছেলে বাইরে এসে শোভাযাত্রার সঙ্গে মিশে পড়ল। কেন এই ধর্মঘট, কে করতে বলেছে, এর পর কি করা হবে—এ সব কথা কেউ চিন্তাও করল না। যেন একটা নূতন খেলা জুটেছে এই ভাবে হুড়মুড় করে সব ছেলে বিভ্রান্ত শিক্ষকদের পিছনে ফেলে রেখে ছুটে বাইরে গিয়ে শোভাযাত্রায় যোগ দিল। শোভাযাত্রার পুরোভাগ থেকে হাঁক উঠল, "ইনক্লাব"। আর সেই বালক-বাহিনী গর্জন করে উঠল, "জিন্দাবাদ"। সামনের লোকেরা এগোতে লাগল। ছাত্রের দল হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে ধীর পদে তাদের অনুসরণ করল। বিরাটকায় অজগরের মত শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল।

অনন্ত তার সঙ্গী দু-জনকে উদ্দেশ করে বলল, "বেশ প্ল্যান অনুসারে কাজ হয়ে গেছে কি বল?" তারা সমর্থন সূচক মাথা নাড়ল। তার পর অনন্ত পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছে ফেলে সাইকেলে চড়ে বসল। ওর সঙ্গী দুজনের হাতেও সাইকেল। শোভাযাত্রার পাশ দিয়ে যেতে যেতে অস্ফুট স্বরে অনন্ত উচ্চারণ করল, "এবার গিয়ে কে. এম. পি. এম-কে তৈরী করতে হবে। গার্লস স্কুলে তো মীনাই আছে। ওখানকার জন্য চিন্তা নেই।" ওরা তিনজন দ্রুতবেগে সাইকেলে প্যাডেল করতে লাগল। কিন্তু তখনও শোভাযাত্রীদের কলরব ও স্লোগান দূর থেকে ভেসে আসছে—"লাঠি গোলী কী সরকার—মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ," "খুনে কংগ্রেসীদের শাস্তি চাই, শাস্তি চাই।"

কে. এম. পি. এম. হাইস্কুলেও ঠিক ঐ ভাবে ধর্মঘট হয়ে গেল। শোভা-যাত্রা যখন সাকচী থেকে বিস্টুপুর পৌঁছাল তখন কেবল দেখা গেল যে আর. ডি. টাটা. হাইস্কুলের গেটে সর্বপ্রথম যে জন কুড়ি বাইরের লোক এসেছিল, বিস্টুপুর পৌঁছোতে পৌঁছোতে তাদের আর কেউ দলে নেই। কিন্তু

ওদের একে একে চলে যাওয়া অভিনবত্বের উল্লাসে কলরবরত ছাত্রদের চোখে পড়ে নি। কে. এম. পি. এম-এর ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে সেই বিরাট কিশোর বাহিনী পাশের গার্লস হাইস্কুলের দিকে এগোল।

মেয়েদের কাছ থেকেও অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল। বিশেষতঃ স্বাহাদি যে ক্লাসের ক্লাস-টীচার—সেই ক্লাস টেনের কাছ থেকে। শোভাযাত্রীদের প্রথম হাঁক—"ওয়ার প্রডাক্টসে মেয়েদের উপর লাঠি চালাল কারা" এবং তার জবাবে "খুনে ঐ কংগ্রেসীরা কংগ্রেসীরা" শোনা মাত্র ক্লাস টেনের মেয়েরা হুড়মুড় করে তাদের বই খাতা হাতে করে বাইরে চলে এল। মীনা এইভাবে এদের তৈরী রেখেছিল দেখে অনন্তরা খুব খুশী হল। ক্লাস টেনের মেয়েদের পর অন্যান্য মেয়েদের আসতেও আর দেরি লাগল না। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গার্লস স্কুলের ক্লাসঘরগুলিতে শূন্য বেঞ্চি ও বোবা ব্ল্যাকবোর্ড ছাড়া আর কিছুই রইল না। শোভাযাত্রা একটু এগিয়ে "মিলনী"র পাশ দিয়ে ডান হাতি মোড় ঘুরে রিগ্যাল সিনেমার সামনে আজাদ ময়দানে গিয়ে হাজির হল।

এরপর কয়েকটি তরুণ বক্তা উঠে ওজস্বিনী ভাষায় তাদের দাবি পেশ করল এবং মুহুর্মুহু করতালি ধ্বনিদ্বারা বক্তা ও তাদের বক্তব্য শ্রোতৃবর্গদ্বারা অভিনন্দিত হল। কিন্তু অনন্ত বা মীনাক্ষীদের কাউকে বক্তৃতা দিতে দেখা গেল না। ছাত্রদের দাবি হল এই যে টাটা কোম্পানিকে অবিলম্বে কলেজ করে দিতে হবে, ছাত্রদের বেতন কমাতে হবে এবং শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। দর্শন সিং নামে একটি শিখ ছেলে তো ঘোষণা করে দিল যে তারা খুন কী নদী বইয়ে এ দাবি আদায় করবে। সভা যতক্ষণ চলল, ততক্ষণ কিন্তু স্লোগানের বিরাম ছিল না।

এর পর একটু বিপদ হল। শোভাযাত্রীরা কার কাছে দাবি পেশ করে আসবে—এই নিয়ে দলের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। প্রায় হাজার খানেক ছেলে-মেয়ে এর মধ্যে জুটে গেছে। ধর্মঘট করার পর কি করতে হবে সে সম্বন্ধে কোন পূর্ব পরিকল্পনা নেই এবং এই ছাত্রবাহিনীকে চালনা করার জন্য কোন সুব্যবস্থিত পরিচালন ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে নি। অনন্তরা জন কয়েক এক দিকে জটলা করে হাঁক ছাড়ল, "চল চল, এবার জেনারেল অফিসে চল। টাটা কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারকে আমরা আমাদের দাবি জানিয়ে আসব।" অন্য দিকে আর জন কয়েক এর বিরোধিতা করল। তাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে টাটা কোম্পানিতে শিক্ষার ব্যাপারের জন্য এডুকেশন

অফিসার রয়েছেন। তাঁর কাছেই ছাত্রদের দাবি জানান উচিত। জেনারেল ম্যানেজারের কাছে গিয়ে কি হবে? খানিকক্ষণ গণ্ডগোল চলল এবং ক্রমশঃ দেখা গেল যে এডুকেশন অফিসারের কাছে যাওয়ার পক্ষই দলে ভারী। এরা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করলেও অনন্ত মীনাক্ষী ইত্যাদিরা ও সবের দিকে না গিয়ে কেবল, "চল চল, জেনারেল ম্যানেজারের কাছে চল"—হাঁক ছাড়তে লাগল। দেখতে দেখতে ছাত্র সমাবেশ প্রায় দুটো দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং ইতস্ততঃ সঞ্চয়মাণ ছাত্র-প্রবাহের মধ্যে অনন্তদের কেন্দ্র করে জনা পঞ্চাশেক ছেলে মেয়ের বেশী রইল না।

চতুর্দিকে গণ্ডগোল এবং বিশৃঙ্খলা। কতক ছাত্র বুঝে এবং অধিকাংশই না বুঝে হট্টগোল করছে। শোভাযাত্রার কি যে পরিণতি হবে বোঝা যাচ্ছে না। এর মধ্যে এক জন ছুটে এসে অনন্তর গা ঘেঁষে নিম্ন কণ্ঠে বলল, "এখন দল ভেঙো না। জেনারেল অফিসের ব্যাপার কাল দেখা যাবে। কমরেড সুকুমার সকলকে এক সঙ্গে নিয়ে যেতে বললেন।" কথা কটি বলেই সে দূরে সরে গেল। গোলযোগের মধ্যে তার কথা অনন্ত ছাড়া বিশেষ কেউ শুনতে পেল না। অনন্ত এবার দ্বিগুণ উৎসাহে হেঁকে উঠল, "চল চল, এডুকেশন অফিসারের কাছে চল। ইনক্লাব জিন্দাবাদ—ছাত্র ধর্মঘট জিন্দাবাদ।" প্রবল জলতরঙ্গের মত ছাত্রদল এডুকেশন অফিসের দিকে চলল।

সেখানে বিপত্তিকর আর কিছু ঘটল না। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী অফিসের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্লোগান হেঁকে চলল এবং ইতিমধ্যে শোভাযাত্রা ও ছাত্রসভার যারা নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এই রকম জনা ছয়েক ছেলে-মেয়ে এডুকেশন অফিসারের কামরায় ঢুকে পড়ে তাদের দাবি জানিয়ে এল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এদের মধ্যে অনন্তরা কেউ ছিল না। শোভাযাত্রা এডুকেশন অফিসে পৌঁছাবার পরই ওদের আর কোথাও দেখা গেল না। যাই হক অন্য সময় ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই এডুকেশন অফিসারের মুখোমুখী হতেই ভয় পায়; কিন্তু আজ সঙ্ঘশক্তির বলে ভয় ডর কেটে গেছে। তাই অকুতোভয়ে তারা এডুকেশন অফিসারের টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের দাবির সনদ পেশ করে এল। এডুকেশন অফিসার তাদের দাবি নোট করে নিয়েছেন এবং যে সব ছাত্র-ছাত্রী তাঁর কাছে গিয়েছিল, তাদেরও নাকি নাম ধাম লিখে নিয়েছেন। পরে নাকি এই সব ছাত্র প্রতিনিধিদের কাছে তিনি তাঁর বক্তব্য জানাবেন। এর পর আর কয়েক

মিনিট বাইরে জটলা করে ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা ভঙ্গ হল। ছাত্র-ছাত্রীরা এবার এই অপ্রত্যাশিত ছুটির বাকিটুকু উপভোগ করার পরিকল্পনা করতে করতে ঘরমুখো হল।

* * *

ঠিক সেই সময়ে জেনারেল অফিসের সংলগ্ন আমিনের রেস্টুরেন্টের একটি নিভৃত কেবিনে কমরেড সিংহ ও সুকুমার একটি টেবিলের দুই দিকে মুখোমুখী হয়ে বসেছিলেন। কমরেড সুকুমারের আনত মস্তক টেবিলের উপর প্রায় ঝুঁকে পড়েছিল। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে কমরেড সিংহ ভর্ৎসনা-মাখা কণ্ঠে বললেন, "কমরেড স্বাহা থাকলে আজ এমন হত না। ছেলেদের দল দিয়ে একবার জেনারেল অফিস ঘেরাও করাতে পারলে কি একটা ফায়ারিং না হয়ে যেত? সুজয়বাবু এখানে সব ব্যবস্থা তৈরী রেখেছিলেন। আর কয়েকটা ছেলে মেয়ে শহীদ হলে আমাদের কেস কত স্ট্রং হত বোঝ। তা হলে ওয়ার প্রডাক্টস কেন, সারা জামসেদপুরেই আমরা ফোরফ্রন্টে আসতে পারতাম। তুমি আজ ওদের জেনারেল অফিসে আনতে না পেরে মুভমেণ্টকে যে কত দিনের জন্য পিছিয়ে দিয়েছ তা কে বলবে?"

অপরাধীর মত কমরেড সুকুমার বলল, "কি করব বলুন? আপনি তো জানেনই যে আমার কোন হাত ছিল না। হঠাৎ আজাদ ময়দানের মিটিং-এর পর ওরা আমাদের লীডের বাইরে চলে গেল। ঐখানেই একটা প্রকাশ্য রিফ্‌ট যাতে না আসে, আমি তাই তখনকার মত দলের একতাটা বজায় রাখতে চেয়েছিলাম। কালকে দেখবেন আর এমন হবে না। জেনারেল অফিসের সামনে ডালহৌসি স্কোয়ার না করে ছাড়ব না।"

শূন্য চায়ের পেয়ালা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গাত্রোত্থান করতে করতে কমরেড সিংহ বললেন, "তোমার দোষে হয়েছে বলছি না, তবে আর একটু ট্যাক্‌টফুল হলে আজ অবস্থা অন্য রকম হয়ে যেত। যাক্, কালকের জন্য এখন থেকেই আপ্রাণ চেষ্টা কর। এখন কোন্ দিকে যাবে তুমি?"

কমরেড সুকুমার উঠে দাঁড়িয়ে কমরেড সিংহকে অনুসরণ করতে করতে বললেন, "প্রথমে সরকার বিল্ডিংসেই যাব। অনন্ত ও মীনাক্ষী কালকের স্ট্রাটেজি জানার জন্য অফিসে অপেক্ষা করছে। আমাদের আলোচনায় আপনার থাকা হয়ে উঠবে কি?"

মাথা নেড়ে কমরেড সিংহ জবাব দিলেন, "উঁহু, সম্ভব হবে না। জেনারেল লাইন তো জানই, সেই ভাবে একটা প্ল্যান তৈরী কর। আমাকে

একবার কোর্টের দিকে যেতে হচ্ছে। কমরেড স্বাহার জামিনের ব্যবস্থা করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। আমাদের উকিলকে দিয়ে 'পিটিশান করিয়েছি, এখন দেখি এখানে এস. ডি. ও. বা ডেপুটি কমিশনার রাজী না হলে পুরুলিয়ায় যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

ওঁরা দুজনে বেরিয়ে গেলেন।

॥ ছাব্বিশ ॥

স্বাহার জীবনে এ এক অগ্নিপরীক্ষা। ফ্রেজার দ্বীপে যাবার অভিজ্ঞতার চেয়ে কম কিসে জামসেদপুরের জেলের এই কয় ঘণ্টার ইতিহাস? ফ্রেজার দ্বীপ—নামটা মনে পড়তেই স্বাহা বর্তমানকে ভুলে গেল। মনশ্চক্ষুর সম্মুখে বারতলীর গাঙের সেই ভয়াল ভয়ঙ্কর রূপ, প্রলয় নৃত্যে মত্ত অযুত কোটি ঊর্মিহস্তের খল করতালির দৃশ্য ভেসে উঠল। জীবনে মধুর ও ভীষণ, আনন্দ ও আতঙ্কের এমন বিচিত্র সমন্বয়ের অভিজ্ঞতা স্বাহার আর হয় নি। প্রাণের উল্লাস ও মৃত্যুর হাতছানি আর কখনও এমন ভাবে অনুভূতির আকাশে একই মুহূর্তে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় নি।

পূর্ণিমার সেই মোহিনী রাত্রে মৃত্যুতাড়িতা হয়ে শেষ শক্তিবিন্দুটুকু দিয়ে গলুই-এর বাতা চেপে ধরার অনুকরণে হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করে স্বাহা থমকে দাঁড়াল। সাকচী জেলের ফিমেল ওয়ার্ডের ছোট্ট উঠোনটুকু থেকে এক নিমেষে স্বাহা নোনামাটি আর ঘোলা জলের দেশে পৌঁছে গেছে।

কাকদ্বীপে তখন বিপ্লবের অগ্নিশিখা সহস্র জিহ্বা মেলে সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। জমিদার আর জোতদারদের কাছারী বাড়ি আর ধানের গোলার সঙ্গে সঙ্গে থানা এবং পুলিস ফাঁড়িও জ্বলছে। প্রতিটি রাত্রেই প্রায় কোথাও না কোথাও বহ্ন্যুৎসব লেগে আছে। বিপ্লবের অন্যতম নায়িকা স্বাহার উপর এক নূতন দায়িত্ব পড়েছে—কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার দায়িত্ব। হৃষ্টচিত্তে স্বাহা তাই ফ্রেজার দ্বীপে গিয়ে সেখানকার কৃষক-সংগঠন করার ভার নিয়েছে। এরই জন্য ফাল্গুনের এক অপরাহ্ণে তাকে রওনা হতে হল সেখানে।

সঙ্গী কেবল পার্টির একটি তরুণ কর্মী। কমরেডটি ঐ অঞ্চলেরই ছেলে। স্টীমারে যাওয়া চলবে না; কারণ চতুর্দিকে পুলিসের সতর্ক প্রহরা। যেতে হবে নৌকায়। মালবাহী পালের নৌকা একটি ঠিক করে রাখার

কথা ছিল।" কিন্তু স্বাহার সঙ্গী তরুণ কমরেডটি ঘাট থেকে খবর আনল যে সেব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি, কারণ ঘাটে আজ কোন ব্যাপারী নৌকা নেই। তবে সে বলল যে জেলে ডিঙ্গি আছে কয়েকটা। তাতেও বেশ আরামে যাওয়া যাবে, যদি না স্বাহা ভয় পায়।

ভয়! মনে মনেই স্বাহা হেসে উঠল। কলকাতা শহরের যে মেয়ে এই বুনো শুয়োর আর কুমিরের দেশে জমিদার জোতদার ও পুলিসের সঙ্গে সমান ভাবে তাল দিয়ে দীপক রাগিণীর আলাপ করে চলেছে—তার আবার ভয় কি? হেসে সে জবাব দিল, "তোমার যদি ভয় না করে তা হলে চল।"

তরুণ কমরেডটি লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি আবার ঘাটের দিকে এগোল। স্বাহা তার পিছনে।

কাকদ্বীপ থেকে ফ্রেজার দ্বীপ। দক্ষিণের দিকে দীর্ঘ পথ। গঙ্গার এ দিক থেকে ও দিকে দৃষ্টি চলে না। ছলছল নৃত্যরত ঘোলা জল, আর ধূসর আকাশ দূর দিগন্তে একাকার হয়ে মিশে গেছে। ফুরফুরে দখিনা বাতাস বইছে আর স্বাহাদের জেলেডিঙ্গি তরতর করে এগিয়ে চলেছে ফ্রেজার দ্বীপের দিকে। একটু পরেই জলের বুক ভেদ করে চাঁদ উঠল—বিশাল হেমময় চক্রের মত। স্বাহার মনে পড়ল আর একদিন পরেই পূর্ণিমা, আজ ত্রয়োদশী। দেখতে দেখতে সমগ্র পৃথিবী জ্যোৎস্নাধারায় প্লাবিত হয়ে গেল। জলের বুকে লক্ষ লক্ষ চাঁদ, আর তাই দেখে বরুণ শিশুরা যেন আনন্দে উল্লসিত হয়ে লক্ষলক্ষ ক্ষুদ্র হাতে করতালি দিয়ে উঠল। বসন্তের প্রাণ-মাতান ঝিরঝিরে হাওয়া আর উপর নিচে সর্বত্র চাঁদের অতুলনীয় শোভা—স্বাহা যেন পাগল হয়ে যাবে এই নয়নাভিরাম নৈসর্গিক দৃশ্য দেখার আনন্দে। তরুণ কমরেডটি সঙ্গে না থাকলে স্বাহা হয়তো আজ চেঁচিয়ে গান গেয়ে উঠত।

জলের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে স্বাহা অনুচ্চকণ্ঠে গুন্‌গুন্ করছিল। ছলাৎ ছলাৎ করে ছোট ছোট ঢেউ এসে ডিঙ্গির গায়ে আছড়ে পড়ছে, আর নৌকা দুলে দুলে জল কেটে বিরাট একটা পানকৌড়ির মত গন্তব্যস্থানের দিকে এগোচ্ছে। এখনও অর্ধেক পথ শেষ হয় নি। হাত ঘড়িতে স্বাহা দেখছে রাত নটা বাজে প্রায়। মাঝি বলল বারতলীর গাঙে নৌকা পড়েছে এবার।

হঠাৎ একটা বুক কাঁপান গর্জন উঠল—গোঁ গোঁ গোঁ, গোঁ ওঁ ওঁ। সমুদ্র-দানবের লৌহপেষণে পড়ে অযুত সহস্র প্রাণী যেন মৃত্যুযন্ত্রণায় হাহাকার

করছে। সকল করুণ আর্তনাদ ছাপিয়ে কিন্তু বিদেশী দানবের খল ক্রুর উল্লাস ফেটে পড়ছে —গোঁ ওঁ ওঁ। স্বাহাদের নৌকা ঝড়ের মুখে পড়া হাল্কা তৃণখণ্ডের মত চক্ষের নিমেষে কয়েকটা পাক খেয়ে প্রবলভাবে টলমল করে উঠল। প্রৌঢ় মাঝি শক্ত হাতে বৈঠা চেপে ধরে সামাল সামাল হাঁক ছাড়ল। জোয়ার আসছে মা ঠাকরন, শক্ত হাতে গলুইএর বাতা ধরেন। ডিঙ্গি উল্টালেও ভয় নাই, আবার তাকে সোজা করা যাবে ; কিন্তু হাত ছাড়লেই সর্বনাশ।

হাত ছাড়লেই সর্বনাশ! সে কথা আর বলতে? স্বাহার ইনস্‌টিন্‌ক্ট সে কথা পুর্বেই বলে দিয়েছে বলে নৌকা পাক খাওয়া মাত্র স্বাহা প্রাণপণ শক্তিতে সামনের বাতাটিকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরেছিল। প্রচণ্ড এক দোলা দিয়ে অকস্মাৎ ডিঙ্গিটি যেন ডানা মেলে শূন্যে উঠে গেল। প্রায় ফুট দশেক উঁচু ঢেউএর চূড়ায় উঠে গেছে আরোহীসহ স্বাহাদের জেলেডিঙ্গি। তার পর মাধ্যাকর্ষণের টানে আচম্বিতে নৌকা নদীবক্ষে নেমে এল। আবার ফেনিল তরঙ্গশীর্ষে, পুনর্বার নদীবক্ষে। আবার—আবার—আবার। জেলে ডিঙ্গিটিকে নিয়ে উন্মত্ত জলরাশি যেন মর্মান্তিক কৌতুকে মেতে উঠেছে। চতুর্দিকে ক্ষিপ্ত লহরীমালার ওঠা পড়ার প্রচণ্ড গর্জন। থেকে থেকে প্রবল জলের ঝাপ্টা ডিঙ্গির আরোহীদের ভিজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঐ কয়েক পলের জন্য মনে হচ্ছে এই বুঝি শেষ, আর চেতনার রাজ্যে ফিরে আসতে হবে না। পরমুহূর্তেই আবার ঢেউ-এর আকর্ষণে দোতলা সমান উঁচু জলতরঙ্গের শিখরে ডিঙ্গিসহ লাফিয়ে ওঠা ও দেখতে দেখতে আবার শরীরের সমস্ত স্নায়ু ও অনুভূতিকেন্দ্রে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ঝাঁকুনির সঙ্গে নীচে পড়া।

বারতলীর গাঙের জোয়ার যেন স্বাহাদের ডিঙ্গিটিকে নিয়ে মোচার খোলার মত লোফালুফি করছে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কোন কিছু নেই—আছে কেবল দৃঢ় মুষ্টিতে ধৃত গলুই-এর বাতাটি, আর—আর অবিশ্বাস্য হলেও সত্য উৎক্ষিপ্ত গর্জনকারী জলরাশির উপর মেঘমুক্ত আকাশের উজ্জ্বল কৌমুদীর অনির্বচনীয় সৌন্দর্য।

এক দিকে আসন্ন মৃত্যুর আতঙ্কশিহরণ, অপর দিকে নৈসর্গিক শোভা-দর্শনের পুলকাবেগ। একদিকে সমগ্র চেতনাকে সংহত করে বাতা ধরে বেঁচে থাকার প্রয়াস, অপর দিকে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত আদিগন্ত বিস্তৃত গঙ্গার গলিত কাঞ্চন বর্ণের শোভা, যার রসের পরিপূর্ণ উপভোগ আত্মবিস্মৃত হলেই করা সম্ভব। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে করতে

রুদ্ধ নিশ্বাসে সিক্ত দেহে বাতা চেপে ধরে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা, আর সঙ্গে সঙ্গে উর্মিশীর্ষে আরোহণ ও অবরোহণ করতে করতে নিসর্গের ভীষণ ভয়াল সৌন্দর্যের অনুভূতি। সত্য সত্যই স্বাহার জীবনের এক বিচিত্র অবর্ণনীয় পরস্পর-বিরুদ্ধ বৃত্তির আকস্মিক সমন্বয়ের লগ্ন ছিল ফ্রেজার দ্বীপে যাবার সেই অদ্বিতীয় অবিস্মরণীয় রাতটি।

কিন্তু সাকচী জেলের অভিজ্ঞতাই বা কম কিসে? বারতলীর গাঙে ভয়ের সঙ্গে ছিল আনন্দ। আর এখানে? ফিমেল ওয়ার্ডের সামনের ছোট্ট এক ফালি যে বারান্দা রয়েছে, সেখানে পায়চারী করতে করতে স্বাহা ভাবে—এ যেন জীবন্ত নরক। চাঁদের শোভা এখানে নেই। প্রতি মুহূর্তে নিকষ ঘন কাল অন্ধকার চতুর্দিক থেকে সর্বগ্রাসী থাবা মেলে যেন মানুষের চেতনাকে পরিপাক করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে।

দশ বার পা হাঁটতে না হাঁটতেই স্বাহার গতি রুদ্ধ হয়। বারান্দার শেষ। স্বাহা মাথা নীচু করে হাঁটছিল, এবার মুখ তুলল। আকাশ জুড়ে অপরাহ্নের বিদায়-ক্ষণের বিষণ্ণ ইঙ্গিত। সূর্য অস্ত গেছে কিনা, মাথা উঁচু করেও স্বাহার পক্ষে তা দেখা সম্ভব নয়। তবে আকাশে বাতাসে দিনশেষের পাণ্ডুর রবিচ্ছটা দেখে অনুমান করা যায় যে সন্ধ্যা হতে আর বিলম্ব নেই।

যে কোন মুহূর্তে এবার ঝনাৎ করে একটি শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে জেনানা ফটক খুলে যাবে এবং কোমরে চাবির গোছা ঝুলিয়ে হেড ওয়ার্ডার প্রৌঢ় তেওয়ারীজী ঢুকবে ভানসাকী বা রান্নাঘরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়েদীদের সঙ্গে। একখানা পুরান কালচে রঙের এলুমিনিয়ামের থালায় তারা দুপুরের মত লাল কাঁকুরে চালের দু হাতা ভাত এবং এক হাতা কিসের যেন ডাল ও একটা পাঁচমিশালী তরকারি দিয়ে দেবে। তার পর আবার জেনানা ফটকের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আধ ঘণ্টার মধ্যে খেয়ে-দেয়ে বাসন মেজে রাখার কথা। কারণ তার পরই তাদের গুনতি করে রাতের মত ওয়ার্ডের মধ্যে বন্ধ করে রাখা হবে। ওয়ার্ডের মোটা মোটা গরাদ দেওয়া লোহার দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে বন্ধ হলে তেওয়ারীজী ঘটাং ঘট্ শব্দে একটা বিরাট তালা ঝুলিয়ে দেবে তার গায়ে এবং "এক দো তিন চার—ঠিক হ্যায়" বলে তাদের চার জনকে গুনে নাল ঠোকা বুটে খট্ খট্ শব্দ তুলে বেরিয়ে যাবে। ভিতর থেকেই কমরেড স্বাহা বাইরের দরজা—জেনানা ফটক বন্ধ হয়ে যাওয়ার আওয়াজ পাবে।

আর কয়েক ঘণ্টা হলে পুরো একটি দিন পার হয়ে যাবে। একটি দিন—

শুনতে কত অকিঞ্চিৎকর ; কিন্তু অবস্থা বিপাকে স্বাহার আজ তা দুর্বিবহ বোধ হচ্ছে। কী আশ্চর্য রকমের দীর্ঘ তার এই কারাবাসের দিনটি। মহান লেনিন ও স্ট্যালিনকে কত দীর্ঘ কাল কঠোর কারা-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, এ কথা আজ বার বার নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও স্বাহা কোন সান্ত্বনা পাচ্ছে না, কোন ভরসার সুর ধ্বনিত হচ্ছে না তার মনোরাজ্যে। কী অদ্ভুত নিঃসঙ্গ লাগছে আজ নিজেকে। নিঃসঙ্গ ? হ্যাঁ, সাথী—ওয়ার প্রডাক্টস কারখানার তিনটি নারী শ্রমিক তার সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও স্বাহার একাকীত্ব বিন্দুমাত্র ঘোচে নি। স্বাহা এই এক দিনেই উপলব্ধি করেছে যে ওরা যেন অন্য দুনিয়ার মানুষ। সুগী বুধনী আর এতোয়ারীর জগৎ স্বাহার বিশ্ব থেকে ভিন্ন।

বড় উৎকট ভাবে এই সত্য স্বাহা বুঝতে পেরেছে। সকালে উঠেই স্বাহা লক্ষ্য করল যে ওরা ওয়ার্ডটিকে একেবারে নোংরা করে রেখেছে। তেওয়ারীজী সকালে এসে দরজা খোলা পর্যন্ত স্বাহা যে কত কষ্টে বমি আটকে রেখেছে, তা সেই জানে। দরজা খোলা পেয়েই সে বাইরে গিয়ে নালির সামনে বসে পড়ল। মুখ হাত ধুতে ধুতে কলের কাছ থেকে স্বাহা শুনতে পেল যে ঘর নোংরা করার জন্য তেওয়ারীজীর ধমকানি শুনে ওরা খিল খিল করে হেসে চলেছে—যেন মস্ত একটা রসিকতার কাজ করেছে। এদের সঙ্গে থাকতে হবে ভেবে তখনই স্বাহার অন্তরাত্মা শিউরে উঠেছিল। তার পর জলখাবারের গুড় ছোলা নিয়ে ওদের কী কলহ ! মুখ ধোয়ার বালাই নেই—গোগ্রাসে গিলে চলেছে। কাল দাগ পড়া ও ইতস্তত পোকায় খাওয়া ছোলার চেহারা দেখে স্বাহার তা খাবার রুচি চলে গিয়েছিল। তার অংশ থেকে কে কতটা নেবে, এই নিয়ে ওদের প্রায় হাতাহাতি হবার যোগাড়।

স্বাহা ভেবেছিল স্নান করলে শরীরটা একটু ঝরঝরে হবে। কাল সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার হবার পর থেকে শরীর ও মনের উপর দিয়ে ধকল তো কম যায় নি ! কিন্তু স্নান-ঘরের দরজা নেই, আর এমন বাড়তি কাপড়ও নেই যা স্নানের পর পরা চলে। স্বাহার চোখ ফেটে জল আসবে যেন। মাথায় জল ঢেলে স্বাহা আঁচল দিয়ে মাথা মুছে নিল এবং তার পর সেই ভিজে আঁচল গা হাত পায়ের উপর বুলিয়ে নেওয়া। তার সঙ্গিনীদের কিন্তু এ সবের বালাই নেই। যে ভাবে তারা কলের নীচে বসে চান করছিল, তার দিকে দৃষ্টি পড়ায় নারী হওয়া সত্ত্বেও স্বাহাকে লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিতে হল। ঐ সময়েই স্বাহার একটা কথা মনে হয়েছিল। কথাটা হয়তো মনের বিরূপতার অভিব্যক্তি ;

কিন্তু একেবারেই কি সত্য নেই ওতে ? মজত্বরদের দুঃখ এবং অভাব নিয়ে স্বাহারা যতটা হায় হায় করে, বা ওদের যতটা কষ্ট হচ্ছে বলে স্বাহাদের মনে হয়, বাস্তবে বোধ হয় ওরা স্বয়ং অতটা অনুভব করে না। নচেৎ একেবারে ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা মনে হওয়ায় যার অভাববোধ স্বাহাকে পীড়িত করছে, ওদের সে সম্বন্ধে কোন অনুভূতি আছে বলেও তো মনে হয় না। কিন্তু না, এই জাতীয় অ্যান্টিপার্টি লাইন চিন্তা ভাল নয়। সুতরাং স্বাহা ও কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দুপুরের কথায় ফিরে গেল। দুপুরেও স্বাহা খেতে পারে নি। বাসন, পরিবেশনকারী এবং আহার্য—এই তিনেরই চেহারা ক্ষুধানাশের অমোঘ ঔষধ। স্বাহার সঙ্গিনীরা স্বাহার খানাও চেটেপুটে শেষ করে কতক সময় জেল কর্তৃপক্ষের দেওয়া কুটকুটে কম্বলের উপর শুয়ে, কতক সময় হেসে খেলে গল্প করে এবং বাকী সময় ঝগড়া করে কাটিয়ে দিয়েছে।

জেনানা ফটক খুলে তেওয়ারীজী সদল বলে ভিতরে প্রবেশ করল। ওর সঙ্গীরা ওদিকে খাবার দিচ্ছে। তেওয়ারীজী স্বয়ং স্বাহার কাছে এসে জানাল যে অফিসে যেতে হবে তাকে। স্বাহা একটু বিস্মিত হল। এ সময় অফিসে কেন ? জেলারবাবু তো থাকেন না এখন। তেওয়ারীজীর সঙ্গে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে স্বাহা চিন্তা করতে লাগল যে তবে কি ছাড়া পাবার খবর এসেছে নাকি ? কিন্তু তা হলে তার একার ডাক পড়বে কেন ?

স্বাহার জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। অফিসে ঢুকতে না ঢুকতেই সুজয়বাবু তাকে অভ্যর্থনা করলেন, "আসুন আসুন আরতি দেবী—বসুন।"

জেলের কেরানীবাবুও বললেন, "বসুন না ঐ চেয়ারটায় আরতি দেবী।"

স্বাহা চমকে উঠল। বিদ্যুৎ ঝলকের মত তার মনে পলকের জন্য একটা কথা উদিত হল—তবে কি ভারতবর্ষে বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হয়ে গেছে এবং লাল কেল্লার উপর লাল ঝাণ্ডা উড়ছে নাকি ?

চমকে উঠে সে চতুর্দিকে চেয়ে দেখল। জেলারবাবুর টেবিলের সামনে গান্ধীর ফটো তেমনি অটুট।

দীর্ঘশ্বাস গোপন করে স্বাহা বাস্তব জগতে ফিরে এল। অফিসে কর্তৃপক্ষদের তরফ থেকে কেরানীবাবু একাই রয়েছেন। আবার তিনি বললেন, "ঐ চেয়ারটায় বসুন আরতি দেবী।"

আরতি দেবী! তার নিজেরই হাসি পেল। আবার একটা নূতন নাম নিতে হয়েছে। নামটি তার নিজেরই আবিষ্কার। কাল গ্রেপ্তার হবার পর গোলমুরি থানাতে এই নামই লিখিয়েছিল সে। আর স্কুলের ঠিকানা

তো দেওয়া যায় না। তা হলে টাটা কোম্পানির স্কুলে তত্ত্বতল্লাসী হবে। আর তার পর কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। সুতরাং গোড়া বেঁধে কাজ করাই ভাল।

সুজয়বাবু বললেন, "এখানে জামিন হল না আরতি দেবী। নিন, চট্ করে সই করুন এখানটায়। এখনই আবার পুরুলিয়া যেতে হবে। ওখানে নিশ্চয় জামিন হয়ে যাবে। আশা করছি কাল সকাল, নচেৎ দুপুর নাগাদ তো নিশ্চয়ই জামিনের হুকুম নিয়ে ফিরতে পারব। হয়ে গেছে, হ্যাঁ—ঠিক আছে। আর বেশী কষ্ট পেতে হবে না আপনাকে। ব্যবস্থা হচ্ছে এবার।"

কিন্তু স্বাহার মনে বাইরের চিন্তা প্রবল। ধর্মঘটের কি হল? মেয়েদের লাঠি চার্জের সম্মুখীন করার পরিকল্পনা কি বাঞ্ছিত সুফল প্রসব করেছে? নিছক বীরত্ব দেখানর জন্য তো স্বাহা কারাবরণ করে নি। আর সত্যি কথা বলতে কি স্বাহার নিজের জেলে আসার ইচ্ছাও ছিল না। কারণ সেধে জেলে যাবার গান্ধী নীতিতে তাদের আস্থা নেই। সে চেয়েছিল যে ওয়্যার প্রডাক্টস নারী-শ্রমিকদের সামনে এগিয়ে দিয়ে সে স্বয়ং গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে এক দল পুলিস পিছন ও পাশ দিয়ে এসে সবাইকে ঘেরাও করায় তার ইচ্ছা ফলবতী হয় নি। স্বাহা মনের উৎকণ্ঠা দমন করতে পারল না। নিম্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "ও দিকের খবর ভাল তো?"

সুজয়বাবু উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, "ভাল? মানে অত্যন্ত ভাল। কালকের লাঠি চার্জের ফোটো তুলে আর আহত মেয়েদের জবানবন্দি ও আহত অবস্থার ফোটো নিয়ে রাত্রেই কলকাতায় লোক চলে গেছে। আজকের সব পত্রিকায়......"

সুজয়বাবুর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে স্বাহা ব্যস্ত ভাবে টেবিলের তলা দিয়ে তাঁর পা মাড়িয়ে দিল এবং চোখের ভঙ্গীতে কেরানীবাবুর দিকে ইশারা করল।

স্বাহার দিকে তাকিয়ে সুজয়বাবু ঈষৎ হাসলেন। অভয় মুদ্রা ফুটে উঠল তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডলে। তার পর শার্টের একটা বোতাম খুলে ফের তা বন্ধ করতে করতে স্বর ঈষৎ নামিয়ে বললেন, "চিন্তা করবেন না, রুপোর লাগাম লাগান আছে। তা না হলে আমি এখানে বসে কথা বলতে পেতাম?"

স্বাহা দেখল কেরানীবাবু তাঁর টেবিলের উপর রাখা কাগজপত্রের স্তূপের মধ্যে আরও যেন ডুবে গেলেন।

পূর্ব বক্তব্যের জের টেনে সুজয়বাবু বলতে লাগলেন, "সারা ভারতবর্ষের

খবরের কাগজে একটা হৈ-চৈ পড়ে যাবে। আর ঐ সব ফোটো ও ঘটনার বিবরণ দিয়ে জামসেদপুরের শ্রমিকদের কাছে সর্বাত্মক হরতাল পালন করার আবেদন জানান হবে। এর মধ্যে ছেলেমেয়েগুলোদের নিয়ে যদি একটা কিছু লাগিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে তো সোনায় সোহাগা। ভাল কথা, আজকের ছাত্র ধর্মঘট পূর্ণমাত্রায় সফল হয়েছে। অনন্ত আপনার উপযুক্ত শিষ্য হয়ে উঠছে।”

মৃদু প্রতিবাদের সুরে স্বাহা বলল, “আমার, না তার বাবার?”

সুজয়বাবু হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। তার পর বললেন, “কিন্তু না, আর দেরি করলে চলবে না। কাল বাইরে গিয়ে সবিস্তারে সব শুনবেন। চলি এখন।” শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা ফুটে উঠল।

অফিস ঘর থেকে বেরোবার মুখে সুজয়বাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে কেরানীবাবুকে লক্ষ্য করে বললেন, “তা হলে শাড়ি গামছা আর খাবার······”

কেরানীবাবু অভয় দিয়ে বললেন, “নিয়ে যান উনি। কোন চিন্তা নেই।”

সুজয়বাবুর কেরানীবাবুকে নমস্কার করে বললেন, “চলি তা হলে।”

কেরানীবাবু ঈষৎ হাস্যে প্রতিনমস্কার করলেন।

সুজয়বাবুর সঙ্গে সঙ্গে স্বাহাও কয়েক পা এগিয়ে গেল। টেবিল থেকে তুলে নেওয়া হাতের মোড়ক দুটির দিকে ইশারা করে সপ্রশংস কণ্ঠে সে বলল, “আপনি তো দেখছি অসাধ্য সাধন করেছেন।”

প্রধান ফটকের তালা খোলার শব্দ হয়। সেই অবকাশে স্বাহার দিকে ভ্রূভঙ্গী করে সুজয়বাবু নিম্ন কণ্ঠে বলেন, “এই যে মোটা পাঁচিল দেখছেন, এতেও কিন্তু ফাটল ধরেছে। দিন আগত ঐ।”

দরজা খুলে গেছে। বাইরে বেরোতে বেরোতে সুজয়বাবু বলেন, “কোন ভাবনা করবেন না, কালই ছাড়া পেয়ে যাবেন নিশ্চয়। আচ্ছা আসি, নমস্কার।” সুজয়বাবু বড় রাস্তায় পড়ার জন্য বাঁ দিকে বেঁকে গেলেন।

কেমন অন্যমনস্ক ভাবে স্বাহা নিজের ওয়ার্ডে ফিরে আসে। সারা দিন না খেলেও খিদের প্রকোপ স্বাহা অনুভব করতে পারছে না। ফাটল ধরেছে! ফাটল ধরেছে!! থেকে থেকে কথাটা তার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অল্প কিছু মুখে দিয়ে স্বাহা নিজের বিছানার কাছে এল। বিছানা মানে অবশ্য দুটি কম্বল। একটি পাতার জন্য ও অপরটি মাথার বালিশের কাজ করে। কাল থেকে একই শাড়ি পরে আছে স্বাহা। ঘামে ধুলোয় গা যেন

ঘিন্ ঘিন্ করছে। শাড়ি বদলে স্বাহা অনেকটা তৃপ্তি পেল। ওর সঙ্গিনীরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। উৎকট ঐকতানের মত ওদের তিন জনের নাক সমস্বরে গর্জন করে চলেছে। অন্ধকারের মধ্যেই স্বাহার মুখমণ্ডল ওদের প্রতি বিরূপতায় ক্ষণকালের জন্য বিকৃত হয়ে উঠল। ছাড়া শাড়িটি স্বাহা মেঝেতে পাতা কম্বলের উপর বিছিয়ে দিল। যাক্, আজ অন্ততঃ কম্বলের রোঁয়াগুলি গায়ে ফুটবে না। বাইরে জেলের পাঁচিলের উপর জোরালো বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। তারই এক ফালি এসে স্বাহাদের ওয়ার্ডের দরজার উপর পড়েছে বলে গরাদের ছায়াগুলি দীর্ঘ হয়ে ঘরের ভিতরের দিকে দেওয়ালের উপর প্রতিফলিত হয়েছে। খুট্ খুট্ খুট্—কিসের শব্দ? স্বাহা পাশ ফিরে তাকাল। পরিত্যক্ত খাদ্যকণার লোভে ইঁদুর এসেছিল, স্বাহার সাড়া পেয়ে দৌড়ে পালাল। কিন্তু এই দুর্গের মত মজবুত ঘরের মধ্যে ইঁদুর এল কোথা থেকে? "ফাটল ধরেছে—দিন আগত ঐ", স্বাহার মনে পড়ে গেল কথাটা। পরিতৃপ্ত ভাবে আবার সে পাশ ফিরল।

॥ সাতাশ ॥

কিন্তু পরের দিন জামসেদপুরের ছাত্র-সমাজ আশানুরূপ সাড়া দিল না। তাই বা কেন, বিন্দুমাত্র দিল না বললেই বোধ হয় সত্যের মর্যাদা অধিকতর মাত্রায় রক্ষিত হয়। পূর্ব দিবসের আকস্মিক ছাত্র ধর্মঘটের কথা প্রত্যেক অভিভাবকেরই কানে গেছে এবং তাঁদের ভিতর অধিকাংশই নিজের নিজের বাড়ির ছেলেদের কঠোর ভাবে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে আর যেন এ রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। কারণ টাটা কোম্পানিকে দিয়ে যা করাতে হবে, তা কোম্পানির শ্রমিকেরা তাদের ইউনিয়ন মারফত করাবার চেষ্টা করবেন। এ সম্বন্ধে ছেলেদের কোন বক্তব্য থাকতে পারে না এবং তারা যদি পূর্ব দিনের মত কোন অনধিকার আন্দোলন করেও তবু কোম্পানির কর্তৃপক্ষ যে ছেলেদের কথায় কর্ণপাত করতে বাধ্য নন, এ কথা সাধারণ বুদ্ধিতে প্রত্যেকটি অভিভাবকই বুঝেছিলেন। আর ছাত্র-ছাত্রীদের বেশীর ভাগই অনন্তদের ফেডারেশনের প্রভাবাধীন ছিল না। হঠাৎ দলে পড়ে কালকে ঝোঁকের মাথায় একটা হট্টগোল পাকালেও শান্ত ভাবে বিচার করার পর তারা আজ ধর্মঘটের অযৌক্তিকতা বুঝতে পেরেছে। তা ছাড়া ভয়ও ছিল একটা। কারণ কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে যে কালকে যারা এডুকেশন অফিসারের

কাছে গিয়েছিল এবং যাদের নাম তিনি লিখে নিয়েছিলেন, তাদের সবাইকে নাকি অবাধ্যতার অভিযোগে স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হবে। সুতরাং অনন্ত এবং দর্শন সিংদের প্রাণপণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আর. ডি. টাটা এবং কে. এম. পি. এম. হাইস্কুল থেকে সর্বসাকুল্যে সাত-আট জনের বেশী ছেলে পাওয়া গেল না।

তবুও অনন্তরা একেবারে হাল ছেড়ে দিল না। হয়তো মীনার প্রভাবে মেয়েদের স্কুলে সফল হওয়া যেতে পারে—এই ভেবে তারা ঐ কয়জনই তাদের পতাকা ও ফেস্টুন নিয়ে গার্লস স্কুলের প্রবেশ-দ্বারের গোড়ায় হানা দিল। মেয়েরা তখন দু-পাঁচ জন করে স্কুলে আসছে। দুজন ছেলে চটপট "ছাত্র ফেডারেশন জিন্দাবাদ" লেখা ফেস্টুনটি মেলে ধরে ফটকের দুই ধারে দাঁড়াল। এবং দর্শন সিং ইত্যাদি বাকী আর কয়েক জন আড়াআড়ি ভাবে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়তে লাগল—ইনক্লাব জিন্দাবাদ, লাঠি গোলি কী সরকার—মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ, ছাত্র ধর্মঘট সফল হোক।

কয়েকটি মেয়ে ফটকের বাইরে থমকে দাঁড়াল। কয়েক জন পথচারীও জমে গেল ঐ জায়গাটিতে। অনন্ত পিকেটারদের কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে ঐ জটলার মধ্যে ভিড়ে গেল।

এদিকে ফটকের ছেলেদের স্লোগান শুনে স্কুলের ভিতরের মেয়েরাও একে একে জমায়েত হল ফটকের কাছে। পিকেটারদের থেকে বেশ কয়েক হাত দূরে জটলা পাকিয়ে তারা ঘটনার গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে লাগল।

গেটের সামনে আটক মেয়েদের ভিতর তখন কলরব চলছে—ভিতরে যাবে কি যাবে না। আর যাবার ইচ্ছা থাকলেও পিকেটারদের বাধা অতিক্রম করে যাবে কি করে? অনন্ত দেখল মীনা তার কাজ করে চলেছে। যে সব মেয়েরা এসে ক্রমশঃ গেটের সামনে জমা হচ্ছে, মীনার প্রভাবে তারা অনেকে স্কুলে না ঢোকার পক্ষেই মত দিচ্ছে। যারা স্কুলে যেতে ইচ্ছুক, তারা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প না হলেও তেমন মুখর নয়। মনের ইচ্ছাকে জোর গলায় বলতে শেখে নি ওরা। অতএব ছাত্রীদের ঐ ভিড়ে মীনাদের অর্থাৎ ধর্মঘটকারিনীদের অভিমতই যেন প্রাধান্য লাভ করছে। ঐদৃশ্য দেখে অনন্ত মনে মনে বেশ প্রসন্নতা বোধ করল।

কিন্তু ওকি? কয়েক জন যে আবার গেটের দিকে এগোচ্ছে। ওরা

কে. রোডের ওদিক থেকে এসে কেবল এক মুহূর্তের জন্য মেয়েদের জটলার পাশে দাঁড়াল। এর মধ্যে যেন ঘটনার গতি-প্রকৃতি বুঝে নিল ওরা এবং তার পর দৃপ্ত পদক্ষেপে পিকেটারদের অভিমুখে এগিয়ে গেল। ওদের মধ্যে দুজনকে অনন্ত চিনতে পারল—ছাত্রী সংসদের হাসি ও দুলালী। বসুধাদি ওদের মুরুব্বী।

গটমট করে গিয়ে ওরা পিকেটারদের সম্মুখীন হল। তার পর দৃঢ়কণ্ঠে তাদের বলল, "পথ ছেড়ে দাও আমাদের, আমরা ভিতরে যাব।"

পিকেটারদের ভিতর দর্শন সিং ছাড়া আর সবাই এক রকম নূতন। তারা এ রকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। কেমন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ওরা। কিন্তু দর্শন সিং চালাক ছেলে, ফেডারেশনের স্ট্রাটেজিতে বেশ রপ্ত। সে হাঁক ছাড়ল, "ছাত্র ফেডারেশন!" অন্যান্য পিকেটার এবং মীনাদের কয়েকজন প্রতিধ্বনি তুলল, "জিন্দাবাদ"। আবার দর্শন সিং চীৎকার করল, "ছাত্র ধর্মঘট"! অন্যেরা ধুয়ো তুলল, "সফল হক, সফল হক।" ভিড়টা চতুর্দিক থেকে গেটের কাছে এসে জমাট হয়ে যেন চাপ বাঁধল।

কিন্তু হাসিদের এতে নিরস্ত করা গেল না। ওরা কজন দর্শন সিংএর একেবারে মুখোমুখি হয়ে তীব্র স্বরে বলল, "সরে যাও তোমরা, আমরা ধর্মঘট করি নি, করবও না। আমাদের আটকাবার চেষ্টা করছ কেন?"

ওদের দৃঢ়তা দেখে এবার দর্শন সিংও একটু বিচলিত হয়ে পড়ল। তাই তো, কি করা যায়! চকিতে একবার সে অনন্তর দিকে তাকাল। অনন্তর ইশারায় সুস্পষ্ট নির্দেশ। আজকের এ ধর্মঘট তাদের জীবনমরণ ব্যাপার। এখানে পিছপাও হওয়া চলবে না। দর্শন সিং এবং তার দলবল দৃঢ় পদে নিজেদের জায়গায় দাঁড়াল।

"রাস্তা ছাড়বে না তা হলে?" হাসিরা কঠিন স্বরে ওদের লক্ষ্য করে কথা কটি উচ্চারণ করল। ওদের তীব্র কণ্ঠের হিস্‌হিসানি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তার পর পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করে দুলালী বলল, "চল, তোমরা কে কে স্কুলে যাবে। দেখি কে আমাদের আটকায়।" কথা বলতে বলতে ওরা একেবারে পিকেটারদের উপর চড়াও হল। কয়েকটি ছেলে ওদের ঐ রুদ্ররূপ দেখে ঘাবড়ে গেল। সম্মোহিতের মত তারা এক পাশে সরে যেতেই হাসি দুলালী ও তাদের পিছন পিছন আর একটি মেয়ে তীব্র বেগে ভিতরে ঢুকে গেল।

কিন্তু দর্শন সিং হঠাৎ ছুটে এল। মেয়েদের যে দল বাঁধভাঙ্গা জল-স্রোতের মত পিকেটারদের মাঝের ঐ ছোট ফাঁক দিয়ে স্কুলে ঢোকার চেষ্টা করছিল, দুই হাত মেলে দিয়ে দর্শন সিং তাদের কয়েক জনকে ধরে ফেলল। একটা ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল ওখানে। আরও দুই এক জন মেয়ে দর্শন সিং-এর হাত ছাড়িয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেও অধিকাংশই বাইরে আটকা পড়ে গেল।

এ দিকে স্কুলের ঘেরার ভিতরে মেয়েদের জটলার পিছনে কয়েক জন শিক্ষয়িত্রীও একে একে এসে সমবেত হয়েছিলেন। অফিস ঘর থেকে হাসি ও দুলালীদের পিছনে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীও বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে ভিতরের ছাত্রীরা মাঝখান থেকে সরে গিয়ে পথ করে দিল। গম্ভীর থম্‌থমে মুখে তিনি পিকেটারদের কাছে আসতেই উত্তেজিত কণ্ঠে হাসি বলল, "এই যে দিদিমণি—ঐ ছেলেটি আমাদের গায়ে হাত দিয়েছে।"

হেডমিসট্রেস চতুর্দিকে চাইলেন। তার পর চশমাটা একবার খুলে আবার পরে নিলেন। অবশেষে একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, "কেন তোমরা আমার মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছ, কে বলেছে তোমাদের এ ভাবে পথ আটকাতে? সরে যাও তোমরা সব গেট থেকে।" কথা শেষ করে উত্তেজনায় তিনি হাঁপাতে লাগলেন।

দর্শন সিং আবার অনন্তর দিকে চাইল। চোখে চোখে ইশারা হয়ে গেল। এ সব ক্ষেত্রে আলোচনা বা তর্ক করতে যাওয়া বৃথা। দর্শন সিং প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কথার উত্তর না দিয়ে হাঁক ছাড়ল, "ইনক্লাব জিন্দাবাদ, ছাত্র সত্যাগ্রহ জিন্দাবাদ, কোম্পানিকা দালাল—মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ।" পিকেটারদের উচ্চ কণ্ঠে চতুর্দিক গম্‌গম্ করে উঠলেও এবার মীনাদের কারও কণ্ঠস্বর শোনা গেল না।

হেডমিস্‌ট্রেস কঠোর দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকালেন। ক্রোধ এবং উত্তেজনায় তাঁর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। তিনি পিছনে ফিরে তাঁর অফিসের দিকে দ্রুতপদে হাঁটা শুরু করলেন। মুরমের বুকে তাঁর পদধ্বনি মিলিয়ে যাবার পরই অফিসের ভিতর থেকে শোনা গেল তিনি টেলিফোন করছেন, "হ্যালো—পুট মি টু দি বিস্টুপুর পুলিস স্টেশন প্লীজ।"

এ দিকে দর্শন সিংদের মুহুর্মুহু উল্লাসধ্বনি তখন গগনভেদী হবার উপক্রম করেছে। ওরা বীর বিক্রমে গলা ফুলিয়ে স্লোগান হাঁকছে, "ছাত্র ফেডারেশন জিন্দাবাদ, ছাত্রধর্মঘট সফল হক, কোম্পানিকা দালাল—মুর্দাবাদ

মুর্দাবাদ।" রাস্তার ভিড় বেড়ে তখন জে. রোডে কোন যানবাহন চলা কঠিন করে তুলেছে।

পি-ই-ই-প্, পি-ই-প্। একটি খাকি রঙের ভ্যান এগিয়ে আসছে বড় রাস্তার দিক থেকে। ভিড়ের কাছে এসে ভ্যানটি ব্রেক করে দাঁড়াল।

পুলিস! পুলিস! কলগুঞ্জন উঠল ভিড়ের মধ্যে। কয়েকজন লাঠিধারী পুলিস লাফিয়ে নীচে নামল এবং তার পর তারা স্কুলের ফটকের দিকে এগিয়ে গেল।

দেখতে দেখতে গেটের কাছ থেকে ভিড় সরে গেল। পুলিস দর্শন সিং এবং ফেস্টুন হাতে অন্য ছেলে দুটিকে ধরে ভ্যানে তুলে নিয়ে চলে গেল। মেয়েরা সবাই হুড়মুড় করে স্কুলে ঢুকে পড়ল। "জে." রোডের অবস্থা স্বাভাবিক হতে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগল না।

পরাজয়— পরাজয়— প্রচণ্ড পরাজয়! একবার নয়, পর পর দুবার। কি করে কমরেড সুকুমার ছাত্র ফ্রণ্টের এই ব্যর্থতার কাহিনী কমরেড সিংহকে জানাবে? স্বাহাদির অবর্তমানে সাহিত্য-সংস্কৃতি ফ্রণ্ট ও ছাত্র ফ্রণ্ট এক রকম একই হয়ে গেছে। এই ধর্মঘটের উপর তাদের পার্টি কতখানি আশা-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তা তো কমরেড সুকুমারের অজানা নয়। আজকের এই ঘটনার পরিণাম স্বরূপ বড় বেশী হলে তারা তাদের পার্টির কাগজগুলিতে "নিরীহ ছাত্র সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিস ও কর্তৃপক্ষের অমানুষিক জুলুম"—এই শিরোনামা দিয়ে খবর প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী আর কিছু তো হল না। অথচ ধর্মঘটটা সফল হলে কী না হতে পারত! ছাত্রছাত্রীদের উপর গুলি চালান হলে তো কথাই নেই, একটা লাঠি চার্জও যদি হত, তবে তার কোম্পানির ধর্মঘটের অবস্থা আমূল বদলে যেত হয়তো।

আফসোসে কমরেড সুকুমারের নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কাকেই বা দোষ দেওয়া যায়? সামনে অপরাধীর মত দণ্ডায়মান অনন্তকে দেখে কমরেড সুকুমারের বড় মায়া হল। কালকে কমরেড সিংহের সামনে তার নিজের যেমন মনে হচ্ছিল, তার স্মৃতি কমরেড সুকুমারের মনে পড়ে গেল। ছেলেটি পরিশ্রমের তো কোন ত্রুটি করে নি। তবে কেন এমন হল? কমরেড সুকুমারের মনে হল যে এইখানে এসেই কি মানুষ নিয়তিবাদে বিশ্বাসী হয় নাকি?

অনন্ত বলল, "আর একটা বিপদ হয়েছে সুকুমারদা— এই দেখুন।" কথা বলতে বলতে সে নিজের জামার বুক পকেট থেকে একটি ছাপান ইস্তাহার বার করে কমরেড সুকুমারের হাতে তুলে দিল।

কয়েক মুহূর্ত উভয়েই নীরব। কমরেড সুকুমারের ব্যগ্র দৃষ্টি এর মধ্যে ইস্তাহারটি পাঠ করে নিয়েছে। তার পর মুখের উপর থেকে ইস্তাহারটি সরিয়ে নিয়ে আবার সুকুমার যখন অনন্তের দিকে তাকাল, তখন সে দৃষ্টিতে উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা স্পষ্ট ফুটে বেরোচ্ছে। থম্‌থমে গলায় অনন্তকে সম্বোধন করে সুকুমার বলল, "কারা এটা বার করেছে বলে মনে হয়?"

"খুব সম্ভব ছাত্র সংসদের ওরা। কারণ ওদের ছেলেমেয়েরাই এগুলি বিলি করেছে খবর পেলাম।"

"উঃ, কী শয়তানী বুদ্ধি! আমাদের সৃষ্টি করা এই ছাত্র আন্দোলনটা কংগ্রেসের দালাল ঐ শৈলেশবাবু এই ভাবে হাতিয়ে নেবে? বুঝতে পারছ না, তা না হলে আজই ছাত্র-সভা আহ্বানের অর্থ কি? আর ইস্তাহারের ভাষা লক্ষ্য করেছ? এমন ভাবে কালকের ঘটনার কথা লিখেছে যেন ওরাই সব কিছু করিয়েছে। ইস্, মাতব্বরি দেখ না। বলছে কালকের ঘটনার পর কি ভাবে এগোতে হবে, তার জন্য আজ বিকেলে অ্যাকশান কমিটির তরফ থেকে ছাত্র-সভা ডাকা হয়েছে। কী ভয়ঙ্কর! এই ভাবে আমাদের টেকনিক ওরা কাজে লাগাচ্ছে?"

"এখন উপায় সুকুমারদা?"

"হ্যাঁ, তাই তো ভাবছি। এ দিকে সাড়ে চারটে বাজতে আর বেশী দেরিও তো নেই। আমাদের যেতেই হবে ওখানে। নচেৎ ওরা ওদের দলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে সভায় মেজরিটি হয়ে যা ইচ্ছা তাই প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেবে এবং এত কষ্টে আমরা যে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলেছি এবং যার দ্বারা এখানে পার্টি সংগঠন মজবুত করার পরিকল্পনা করছি—তা একেবারে আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে। ভাল কথা, তুমি কজন ছেলে যোগাড় করতে পার?"

"ভরসা করে কিছু বলতে পারছি না সুকুমারদা। অভ্র ক্লাবের শো-এর পর যারা আমাদের একটু কাছে এসেছিল এবং যাদের অল্পবিস্তর ইনডক্‌ট্রিনেট করা গিয়েছিল, তাদের সবাই তো প্রায় তার কোম্পানির গেটের আন্দোলন ও গার্লস স্কুলের আজকের ব্যাপারে কোন না কোন ভাবে দমননীতির শিকার হয়েছে। আর তার পর ওদের অধিকাংশই আমাদের

আওতা থেকে দূরে সরে গেছে। এখন এই অল্প সময়ের মধ্যে খুব বেশী ছেলে যে যোগাড় করতে পারব, তা তো মনে হচ্ছে না। দর্শন সিংরা আজ গ্রেপ্তার হবার পর একেবারে একলা হয়ে গেছি মনে হচ্ছে।"

"উপায় নেই। চেষ্টা করতেই হবে। ছাত্র যোগাড় না হলে শেষ পর্যন্ত বাইরের লোকই দু-দশজন নিয়ে যেও। কে আর কাকে চিনছে? আমিও যে দু-চারজনকে পারি খবর দিয়ে অন্ধ্র ক্লাবের কাছেই থাকব। চল, বেরিয়ে পড়া যাক এখন। হাতে আর সময় নেই।"

* * *

অনন্তরা কজন সোয়া চারটের সময় অন্ধ্র ক্লাবে উপস্থিত হয়ে দেখল যে তাদের পূর্বে প্রায় জনা চল্লিশেক ছাত্র এসে সভাগৃহে বসে আছে। সাড়ে চারটে বাজার পূর্বে আরও কয়েকজন এল। অনন্ত কিন্তু বৃথাই তার সন্ধানী দৃষ্টি চতুর্দিকে নিক্ষেপ করছিল। জানাশোনা এমন আর একজনও কাউকে চোখে পড়ছে না, যাকে এখানে সে নিজের দলের বলে মনে করতে পারে। অবশ্য সত্যি কথা বলতে কি তাদের দলে কোন সময়েই বেশী ছেলে মেয়ে থাকে না; কিন্তু তাদের টেকনিকের জন্য সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও সর্বদাই তারা সব ব্যাপারে সামনের সারিতে থাকে। তবে এই রকম ভাবে প্রকাশ্য শক্তি পরীক্ষার সুযোগ বিশেষ আসে না, আর ওরা এটা এড়িয়েও চলে। কারণ তারা জানে যে এ টেকনিকে তারা সুবিধা করতে পারবে না। এবং পার্টি থেকেও হয়তো এইজন্য খোলাখুলি কাজ করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করা আছে।

"তা হলে এবার কাজ আরম্ভ করা যাক।" কে একজন সামনের দিক থেকে বলল। অনন্তর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। যদিও তার সঙ্গীসাথী কজন ইতিমধ্যে ছাত্রদের ভিতর ছড়িয়ে বসে পড়েছে, তবু সে খুব ভরসা পাচ্ছে না। কারণ সে যে টেকনিকের কথা ভেবেছে, তাতে জনসভার ডায়াস দখল করা যায় বা হয়তো তেমন বেগতিক বুঝলে সভা পণ্ড করে দেওয়া যায়। কিন্তু এই বন্ধ ঘরের মধ্যে যেখানে আর সকলে বেশ তৈরী হয়ে এসেছে মনে হচ্ছে, সেখানে কি আর এ পদ্ধতি কার্যকরী হবে?

"আমি প্রস্তাব করছি আজকের সভায় শৈলেশদা সভাপতিত্ব করুন।" উৎকণ্ঠিত অনন্ত দেখল প্রস্তাবকারী কে. এম. পি. এম-এর ছাত্র গোপাল লাহিড়ী। গোপাল তো ঠিক ছাত্রসংসদ মার্কা নয়, ওকে বরং অনন্ত এতদিন আর. এস. পি-দের ছাত্রকংগ্রেস-পন্থী বলেই ভাবত। কারণ টক্ক

বিল্ডিংএ গোপালের বেশ যাতায়াত ছিল। আজ এ কি হচ্ছে? সবাই জোট পাকিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে কেন?

"আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করছি।" ছাত্রসংসদের এক পাণ্ডা ললিত চ্যাটার্জি লাফিয়ে উঠে এর সমর্থন করল। সামনের দিকে সম্মিলিত কলরব শোনা গেল—আমরা আমরা, আমরাও সমর্থন করছি। উৎপল উজ্জ্বল বরুণ ভবানী নীরেন কমল ইত্যাদি ছাত্রসংসদের পাণ্ডাদের উল্লাস অনন্তকে যেন শেলবিদ্ধ করতে লাগল।

এদিকে শৈলেশবাবু দৃঢ়পদে অগ্রসর হয়ে সভাপতির জন্য নির্দিষ্ট চেয়ার দখল করেছেন। অনন্ত বুঝতে পারল যে অর্ধেক যুদ্ধ এইখানেই শেষ হয়ে গেল এবং একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে এর পরিণাম তাদের বিরুদ্ধেই গেল। অনন্তদের অপর কোন নাম প্রস্তাব করার সুযোগ না দিয়ে ওরা নিজেদের মনোমত সভাপতি বেছে নিল।

তার পর বিস্ময় বিমূঢ় অনন্তর চোখের সামনে একের পর এক যেন ছায়াছবির দৃশ্য অভিনীত হতে লাগল। বরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। সে বলে চলেছে, "কালকের সফল ধর্মঘটের পর এখন আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে এবং ছাত্র-সমাজকে ছাত্র সংহতির শত্রু নানারকম দল ও মেকী প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে থাকতে হবে। কারণ আমাদের এই অভাবনীয় সাফল্য দেখে অনেকেই এখন এই সংহতিকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজে লাগাবার পরিকল্পনা করছে বলে আমরা খবর পেয়েছি। বন্ধুগণ, আপনারা তাই এই অ্যাকশান কমিটির নির্দেশ না পেলে অপর কারও কথায় যেন কোনরকম পদক্ষেপ না করেন।"

একটু দম নিয়ে বরুণ আবার বলতে লাগল, "এইবার দেখা যাক আমাদের দাবি কি কি? প্রথমতঃ এখানে একটি কলেজ চাই। এ কথা সবাই বোঝেন যে কোম্পানিকে দিয়ে কলেজ করান বা অন্য কোন ভাবে কলেজ গড়ার শক্তি একা ছাত্রসমাজের নেই। আমরা তাই স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধ করে প্রথমতঃ একটি কলেজ কমিটি গঠন করার···"

"চুপ করে শুনছ কি অনন্ত? আর বলতে দিলে কোন দিনই আমরা আমাদের কথা বলতে পারব না।" চমকিত অনন্ত তাকিয়ে দেখে সুকুমারদা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা কটি বললেন। কখন যে উনি নিঃশব্দে ওর কাছে এসে বসেছেন কে জানে!

অনন্ত হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং চীৎকার করে বলল, "আমরা এর প্রতিবাদ করছি।"

এই জাতীয় নাটকীয় ব্যাপারের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। উপস্থিত ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই অদলীয়। ইস্তাহারে ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর কথা আলোচনা হবে বলে খবর থাকায় তারা এ সভায় যোগ দিয়েছিল। এ সবের পিছনে যে রাজনীতি চলেছে, সে সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাদের মধ্যে একজন বলল, "এ কথার মধ্যে প্রতিবাদের কি আছে। বরুণ তো ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর কথাই বলছে।"

"না, না, আমরা প্রতিবাদ করছি—ভীষণ প্রতিবাদ করছি।" অনন্ত আবার মুখর হয়ে উঠল। ওর পায়ে সুকুমার চিমটি কেটে ইঙ্গিত করেছে। এ দিকে অনন্তর দেখাদেখি ওর সঙ্গীসাথী কজনও উঠে দাঁড়াল এবং তারাও হেঁকে উঠল, "আমরাও প্রতিবাদ করছি, তীব্র প্রতিবাদ করছি।"

ছাত্র সমাবেশের ভিতর এদিক ওদিক থেকে পাঁচ-ছয়জন এই ভাবে বাধা দিয়ে ওঠায় বরুণের বক্তৃতা থেমে গিয়েছিল এবং যে কোন সাধারণ পর্য-বেক্ষকই এ অবস্থায় মনে করতেন যে সমস্ত সভাগৃহই বুঝি বক্তার প্রতিকূলে। বক্তার পক্ষে তাই নার্ভাস হয়ে বসে পড়া খুব স্বাভাবিক। শৈলেশবাবু কিন্তু পাকা রাজনীতিবিদের শিষ্য। তিনি কেবল একটু হাসলেন এবং তার পর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "প্রথম বক্তার বক্তব্য শেষ হলে প্রতিবাদকারীরাও তাঁদের কথা বলবার সুযোগ পাবেন। এখন এঁর কথার মাঝখানে বাধা দেবেন না।"

ভরসা পেয়ে বরুণ আবার বলা শুরু করল, "হ্যাঁ, আমরা তাই প্রথমতঃ একটি কলেজ কমিটি গঠন করার চেষ্টা করব এবং তার পর······"

অনন্তের পায়ে আবার চাপ পড়েছে—না, থামলে চলবে না তো! অনন্ত তাই চীৎকার করে বলল, "না, প্রথমে আমাদের কথা শুনতে হবে।" অনন্তের সঙ্গীরাও তার কথার প্রতিধ্বনি তুলল. "হ্যাঁ, এখনই শুনতে হবে। আমাদের সকলেরই এই দাবি।"

শৈলেশবাবু আবার একটু হেসে বললেন, "ছাত্র বন্ধুগণ, এই বন্ধু কয়জন যদি এমনিভাবে সভাপতির নির্দেশ অমান্য করে সভার কাজে বাধা দেন, তা হলে কাজ করা মুশ্‌কিল। আপনারা নিজেরাই তাই বলুন কে কে প্রথম বক্তার কথা প্রথমে শুনতে চান। হ্যাঁ, হাত তুলুন দেখি আপনারা।"

অনন্তরা ঐ কয়জন ছাড়া আর সবাই সভাপতির বক্তব্যের সমর্থনে হাত তুলল। বিপক্ষে হাত উঠল কেবল অনন্ত ও তার সঙ্গী ছয় জনের।

তার পর শৈলেশবাবু দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করলেন, "সভায় উপস্থিত ছাত্রদের অধিকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ যদি সভার কাজে বাধা দেন, তবে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি তাঁদের সভা থেকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হব।" কথার শেষে বরুণের দিকে ফিরে তিনি বললেন, "এবার তোমার বক্তব্য বল তুমি।"

অনন্তরা এবার "ইনক্লাব জিন্দাবাদ, ছাত্র ফেডারেশন জিন্দাবাদ" বলে হাঁক ছাড়তে ছাড়তে সভাপতির চেয়ারের দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু কয়েক পা এগোতে না এগোতে বাকী ছাত্ররা দৃঢ়ভাবে তাদের বাধা দিল। চল্লিশ-পঞ্চাশজন দুর্ভেদ্য দেওয়ালের মত সামনে দাঁড়িয়ে পড়লে ছয়জন আর কতটা এগোবে ?

ললিত ভবানী উৎপল প্রমুখ কয়েকজনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "এরা মারপিট করে সভা ভাঙ্গতে চায়। ছাত্রবন্ধুগণ, হুঁশিয়ার।"

কমরেড সুকুমার ফিস ফিস করে অনন্তের কানে কানে বলল, "এখানে সুবিধা হবে না। ফিরে চল।"

দেখতে দেখতে ওরা কয়জন "ইনক্লাব জিন্দাবাদ, ছাত্র ফেডারেশন জিন্দাবাদ, কোম্পানিকা দালাল—মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ", হাঁকতে হাঁকতে নাটকীয় ভঙ্গীতে অন্তর্হিত হয়ে গেল। কমরেড সুকুমার ও অনন্তর মনে একই চিন্তা—বার বার এই পরাজয়ের অন্তিম পরিণাম কি ?

॥ আঠাশ ॥

চীনেমাটির প্লেটে চামচের মৃদু টুংটাং সুর ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। এলসি নিঃশব্দেই প্রাতরাশ সমাধা করছিল। অবশ্য একা একা আর কার সঙ্গেই বা কথা বলবে ? পরিজের চামচ অন্যমনস্কভাবে মুখে তুলে দিতে দিতে সে মাথা নীচু করে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল : কিন্তু তার সে দৃষ্টি অর্থহীন। স্পষ্ট বোঝা যায় যে ওর মন রয়েছে অন্য এক জগতে, আহারপর্ব সে সমাপ্ত করে চলেছে বটে, তবে তা যন্ত্রচালিতের মত।

"এসব কি শুনছি মাই গার্ল ? হোয়াটস্ দ্য হেল অল দিজ ?" উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলতে বলতে মূর সাহেব সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। একটু লক্ষ্য করলেই তাঁর জড়িত গতিচ্ছন্দ নজরে পড়ে।

এলসি চমকে উঠেছিল ; কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল। বাবার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস তার বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে

এল। মুর সাহেবের চোখমুখে অস্বাভাবিক রকমের রক্তিমাভা। উচ্চারণ স্পষ্ট নয়।

ঘোলাটে দৃষ্টি এলসির দিকে তুলে পুনর্বার তিনি কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "ইস ইট অল ট্রু—বল সত্যি কি না?" কথা বলতে বলতে এলসির খাবার টেবিলের সামনে এগিয়ে এসে তিনি একটা চেয়ার ধরে টাল সামলে নিলেন।

ব্যস্তভাবে এলসি বলল, "চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসো ড্যাডি ডিয়ার।" মুর সাহেব সশব্দে চেয়ারটা টেনে নিয়ে ধপ্ করে তার উপরে বসে পড়লেন। তার পর রুমাল বার করে মুখটা একবার মুছে নিয়ে পুরাতন কথার জের টেনে বললেন, "শুনছি নাকি আমাদের খাদানে স্ট্রাইক হয়েছে—লেবারগুলো আর কাজে আসছে না?"

এলসি মাথা নীচু করেই জবাব দিল, "হ্যাঁ বাবা। আজ দু সপ্তাহ হল কাজ বন্ধ।"

মুর সাহেব আবার উত্তেজিত ভাবে গর্জন করে উঠলেন, "বল কি মাই গার্ল—দু সপ্তাহ? আর তুমি আমাকে কোন খবর দাও নি! কেন, সিসিল মুর কি মরে গেছে নাকি? আমার চাবুক কৈ, কোথায় আমার বন্দুক? ইউ—রহমান……" চীৎকার করে ক্রুদ্ধ মুর সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেলেন; কিন্তু টাল সামলাতে না পেড়ে হুমড়ি খেয়ে টেবিলের উপর পড়তে পড়তে কোন ক্রমে সামলে নিলেন। চীনেমাটির বাসনপত্রগুলি ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল।

এলসি তাড়াতাড়ি নিজের আসন ছেড়ে দ্রুত পদে গিয়ে বাবাকে ধরে বসাল। হাঁক ডাক শুনে রহমান ও মালী দৌড়ে এসেছিল। এলসি ইশারায় তাদের চলে যেতে বলে মুর সাহেবের পাশে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। তার পর তাঁর চুলে হাত বুলোতে বুলোতে কোমল কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "ড্যাডি, মাই সুইট ড্যাডি—অমন করো না লক্ষীটি।"

মুর সাহেব কিন্তু ফুঁসতে থাকেন। স্বর একটু খাদে নামলেও তেমনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি বলেন, "চিরকাল যারা আমার খেয়ে এল, আজ হঠাৎ তাদের এ দুঃসাহস হয় কোথা থেকে? এক্ষুনি থানায় খবর পাঠিয়ে ওদের রিং লিডারদের অ্যারেস্ট করার ব্যবস্থা কর। ইনটলারেবল, ইনটলারেবল—এরকম স্পর্ধা অসহ্য।"

এলসি ভাবে সে তার বাবাকে নিয়ে কি করবে? কি করে তাঁকে

বোঝাবে যে এ দেশে মজুরদের দিয়ে কাজ করানর ব্যাপারে তাঁদের সে দিন-কাল আর নেই। তখন ধমক আর চাবুকে কাজ চলত; কিন্তু আজকের মালিক ও সব কথা চিন্তা করলেই কাজ অচল হয়ে যাবে, তাঁকে আর ব্যবসা চালাতে হবে না। এলসির চোখ ফেটে যেন জল বেরিয়ে আসে। ধর্মঘটের এই শত দুশ্চিন্তা এবং ঝামেলা, আর তার উপর অবুঝ বাবা। কোথায় এ সময় কারও সাহায্য পাবে, কেউ বুদ্ধি পরামর্শ দেবে; কিন্তু কী যে কপাল করে এসেছে এলসি, তাই জীবনের নীরস বোঝা বইতে হবে একেবারে একা একা, একান্ত নিঃসঙ্গ ভাবে! কোন্ দিক সামলাবে সে—ব্যবসা, না এই অর্ধোন্মত্ত পিতাকে? একাকিনী এই গুরুভার বহন করা আর যে সম্ভব হয় না।

মূর সাহেব সমান ভাবে তর্জন করে চলেছেন, "দেখে নেব সব প্রভোকেটারদের। কাল থেকে আমিই আবার সব কাজকর্ম দেখাশুনো করব। বুঝেছ মাই গার্ল—কালই ডেপুটি কমিশনারের কাছে আমার চিঠি নিয়ে যাবে। তাঁকে আমার সেলাম দিয়ে বলবে······"

বাবার বক্তৃতাস্রোতে বাধা দিয়ে কান্না মাখা-কণ্ঠে এলসি বলে, "সে যা হয় কালকে হবে বাবা, এখন তো তুমি তোমার কামরায় চল। এখন তোমার একটু বিশ্রাম দরকার। আমি যে আর এ জ্বালা সইতে পারছি না বাবা।" শেষের দিকে কান্নার আবেগে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যায়।

কনুই-এ ভর দিয়ে ধীরে ধীরে মূর সাহেব মাথা তোলেন। আস্তে আস্তে মুখ তুলে তিনি অশ্রুসজল এলসির দিকে তাকান। তার পর মৃদু কণ্ঠে যেন অপরাধীর মত বলেন, "অ্যাম আই ড্রাঙ্ক টু মাচ—খুব বেশী নেশা হয়ে গেছে নাকি? যত ভাবি আর না, তবু তো পারি না। কিন্তু শান্তি পাই কই—মাই পুওর গার্ল শান্তি পাই কই? জার্মান বোম্বার যে শান্তি কেড়ে নিল, তা আর ফিরে আসছে কোথায়? অন্ততঃ যদি ভুলতেও পারতাম······" টলতে টলতে তিনি উঠে দাঁড়ান এবং তার পর চলা শুরু করেন। এলসি তখনও টেবিলে মুখ গুঁজে আছে।

কয়েক পা যাবার পরই তিনি আবার ফিরে আসেন। এলসির চেয়ারের একটি হাতল বাঁ হাতে ধরে ডান হাত তার পিঠে বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন, "আচ্ছা মাই ডিয়ার গার্ল, খাদান বিক্রী করে দিয়ে হোমে চলে গেলে কেমন হয়— কাজ কি এত ঝামেলায়?"

এলসি মাথা তুলে রুমালে চোখ মুছে নেয়, তার পর বাবার দিকে তাকিয়ে

হাসে। ক্লিষ্ট করুণ সেই হাসি একখানি সুন্দর অথচ বেদনার্ত মুখের পটভূমিকায় প্রতিপদের ক্ষীণ চাঁদের মত ফুটে ওঠে। তার পর বলে, "সে তো পরের কথা ড্যাড। কিন্তু তার আগে এই হাঙ্গামার একটা সুরাহা তো হক। এ রকম গোলমেলে ব্যবসা কি কেউ কিনতে চাইবে নাকি?"

"ওঃ অল রাইট, অল রাইট। ঠিক বলেছ তুমি। তবে কি জান শান্তি নেই, কোন কিছুতেই শান্তি নেই……", কথা বলতে বলতে মূর সাহেব দরজার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যান।

বেশীক্ষণ এলসির আত্মমগ্ন হয়ে থাকা সম্ভব হল না। মালী সামনে এসে দাঁড়াল। এলসি তার দিকে মুখ তুলে তাকাতে সে জানাল যে খাদানের বিভাসবাবু এসেছেন, মিসিবাবাকে সেলাম পাঠিয়েছেন।

এলসি বলল, "বসতে দাও ওঁকে, আমি এখনই আসছি।"

কয়েক মুহূর্ত পরে এলসি যখন বাইরের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল, তখন তার চোখ-মুখে আর পূর্বেকার ঘটনার ছাপ নেই। এলসির বৈশিষ্ট্য—কুশলী হাতের হাল্কা প্রসাধনে তার রমণীয় তনু আরও রমণীয় হয়ে উঠেছে। ওর সর্বাঙ্গ ঘিরে রয়েছে মৃদু সুরভির সুবাস। রাজেন্দ্রাণীর মত ধীর পরিমিত পদক্ষেপে বাইরের ঘরে প্রবেশ করল এলসি।

বিভাসবাবু উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে বসতে বলে একটু দূরে আর একটি চেয়ারে আসন গ্রহণ করল এলসি। তার পর বলল, "কি খবর বিভাসবাবু?"

বিভাস উত্তর দিলো, "ওদের তো ঐ একই রকম অবস্থা দেখছি। কেউ তো শীঘ্র আসবে বলে ভরসা হচ্ছে না।"

উদাস কণ্ঠে এলসি বলল, "ওদের ইচ্ছা। হঠাৎ অত দাবি করলে আমিই বা কি করব? ওদের অভাব আছে মানি; কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও তো ওদের সব দাবি পূর্ণ করা যায় না। আমাকে বাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। ওদের সব দাবি মানতে গেলে পাথর তোলার খরচ এত বেড়ে যাবে যে তার ফলে আমাদের নিজে থেকেই খাদান বন্ধ করে দিতে হবে।"

"অথচ এদিকে ভাইজাগপট্টমের সেই বড় অর্ডারটা হাতে রয়ে গেছে। আরও দেরি হলে হয়তো ওরা অর্ডার বাতিল করে দেবে।"

"সবই বুঝছি বিভাসবাবু; কিন্তু আমার হাত পা বাঁধা। দু-চার আনার ব্যাপার হলে বিবেচনা করা যেত। আমাদের পার্সেণ্টেজ কম হয়ে গেলেও

তার জন্য চেষ্টা করতাম; কিন্তু মজুরী একেবারে দেড়া করা কোন মতেই সম্ভব নয়। আচ্ছা, ওদের চলছে কি করে বলুন তো?"

এলসির প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "শুনলাম ইউনিয়ন বাইরে থেকে চাঁদা যোগাড় করছে। সেই টাকা দিয়ে ওদের খাওয়াবে।"

"ইউনিয়ন—হঠাৎ এই ইউনিয়ন কোথা থেকে এল বলুন তো বিভাসবাবু? আমাদের মজুররা কোন কালে এ সব ব্যাপার জানত না। কে তাদের এ বুদ্ধি দিল, আর কেই বা ওদের চালাচ্ছে এখন? আপনি কিছু জানেন নাকি?"

বিভাসবাবুর মুখে একটা ধূর্ত হাসি খেলে গেল; কিন্তু বিচলিতা এলসির চোখে তা ধরা পড়ল না। তিনি পূর্ববৎ নিরীহ কণ্ঠে বললেন, "কে জানে কারা এসব করছে। আমি তো ঠিক জানি না।"

ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে এলসি বলল, "একটু খবর করুন আপনি। কী বিচিত্র ব্যাপার! কেন ওরা এ কথাটা বুঝছে না যে খাদান দু-চার মাস বন্ধ থাকলেও আমরা খেতে পাব, আমাদের খাবার অভাব হবে না। কিন্তু মজুররা কি অত দিন টিকে থাকতে পারবে? এই ধর্মঘট করে কার কি লাভ?"

"ঠিক বলেছেন।" আড় চোখে এলসির দিকে তাকিয়ে বিভাসবাবু জবাব দেন।

এলসি বলে চলে, "এর চেয়ে ওদের বুদ্ধিদাতা নেতা যদি আমার কাছে এসে হিসেব দেখতে চাইতেন এবং তার পর বাজারের ওঠা নামা, ক্ষয় ক্ষতি ইত্যাদি সব দিক বিবেচনা করে মজুরদের ন্যায্য দাবি কি হওয়া উচিত তা বলতেন, তা হলে সে কথা বিচার করে দেখা যেত। এ ভাবে কাজ বন্ধ রেখে কার উপকার হচ্ছে কে জানে?"

"তা তো বটেই, তা তো বটেই"—বিভাসবাবু আবার সায় দেন। তার পর কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ বসে থাকেন, কারও মুখে কোন কথা নেই।

অবশেষে বিভাসবাবুই আবার নীরবতা ভঙ্গ করেন। একটু নড়ে চড়ে বসে তিনি একবার ধীরে গলা-খাঁকারি দিয়ে নেন। তার পর বলেন, "একটা নিবেদন ছিল আমার।"

এলসির উত্তেজনা আর নেই। পূর্বের মত নিরুত্তাপ স্বরে সে বলে, "বলুন।"

একটু ইতস্তত করে বিভাসবাবু বলেন, "আমার কিছু টাকার দরকার ছিল। আমরা তো স্থায়ী কর্মচারী......আর মানে আমরা তো ধর্মঘট করি নি...... "

লজ্জিত কণ্ঠে এলসি বলল, "এই দেখুন, বড় ভুল হয়ে গেছে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত বিভাসবাবু, অত্যন্ত দুঃখিত। ধর্মঘটের এই হাঙ্গামায় আপনার মত বিশ্বস্ত কর্মচারীর অসুবিধার কথা একেবারে খেয়াল হয় নি, বসুন আপনি। আমি এখনই আসছি।"

এলসি টাকা আনতে ভিতরে গেল। বিভাসবাবু আবার মুচকি হাসলেন।

* * * *

বিভাসবাবুর অপস্রিয়মাণ মূর্তির দিকে এলসি তাকিয়ে ছিল। বিভাসবাবু ঈষৎ খোঁড়াতে খোঁড়াতে ধীরে ধীরে দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলেন। সামনে অসীমবিস্তার মাঠ ধু ধু করছে। সে প্রান্তর এলসির জীবনের মতই বন্ধুর, উপলাকীর্ণ। মাঝে মাঝে কয়েকটি নিঃসঙ্গ নিরাভরণ মহুয়ার গাছ ভিখারীর মত আকাশের দিকে সহস্র বাহু তুলে ধরে কিসের জন্য যেন প্রার্থনা করছে। কি তাদের যাচ্ঞা? শেষ বসন্তের কিশলয়-সজ্জা, না ফলের আকূতি? কেন যেন এলসির মনে হয় নিষ্ফল মধুমাসের শূন্যতায় ভরা তার জীবনের সঙ্গে মহুয়াগাছগুলির কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য আছে। মে মাসের মেঘমুক্ত আকাশে এরই মধ্যে সূর্য বেশ প্রখর হয়ে উঠেছে। বাঁ দিকে রাস্তার ওপাশে উঁচু টিলাটির উপর এলসিদের ম্যাগাজিনের চূড়াটিতেও ঐ উজ্জ্বল রবিকর প্রতিফলিত হয়েছে। ইংলণ্ডে এমনি বসন্ত শেষের উজ্জ্বল প্রভাতে কে আর ঘরে বসে থাকে? কিন্তু এখানে এখনই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, পাওয়া যাচ্ছে তার তীব্র দাহের আভাস। তবু এলসি সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সে গাড়ি ব্যাক করল। কাজ নেই তেমন। অথচ চুপচাপ ভালও লাগে না। এতদিনের অভ্যস্ত কর্মজীবন! আর কাজ নিয়েই তো সে নিজেকে ভুলে ছিল। কাজের প্রচণ্ড বোঝার নীচে তার বত্রিশ বৎসরের ব্যর্থতার বেসাতি, তার শূন্যতার পসরা চাপা দিয়ে সে নিজেকে ভোলার চেষ্টা করে এসেছে এত দিন। কিন্তু এখন কর্মবিহীন অলস দিনগুলির যান্ত্রিক আবর্তন বড় ভীষণভাবে তাকে তার জীবনের নিঃসঙ্গতার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এলসি কোথাও পালিয়ে যেতে পারলে যেন

বাঁচে—এই সুদীর্ঘ বাধ্যতামূলক কর্মবিহীনতার অবাঞ্ছিত আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য জনকোলাহল না হক, অন্ততঃ অপর আর এক জনের সাহচর্য সে কামনা করে। যার সঙ্গে নিছক সৌজন্য বা ভদ্রতার সম্পর্ক থাকবে না, যার কাছে নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দেওয়া যাবে, নিজের সীমাহীন একাকীত্বের শ্বাসরোধকারী চাপ যার সঙ্গের উষ্ণ পরশে গ্রীষ্ম-দিনের তুষারের মত গলে যাবে, তার সান্নিধ্য কামনা করে এলসি। কিন্তু জীবন-মরুর এই খাঁ খাঁ নির্জনতার মাঝে কোথায় প্রাণের সেই মরুদ্যান ?

ঘৌ ঘৌ ঘৌ—এলসির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ডিউক প্রাণপণে চীৎকার করে চলেছে। এলসি ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, "তুমিও যাবে নটি ক্রিচার! চল তবে।" চক্ষের নিমেষে ডিউক লাফ মেরে জীপের পিছনের দিকে চড়ে বসল এবং তার পর এলসির বসার আসনের পিছনে মুখ ঘষতে ঘষতে কুঁই কুঁই করতে লাগল। ওটা ওর আদর জানাবার পদ্ধতি।

নিজের মনে গাড়ি চালাতে চালাতে কখন যে এলসি খাদানের দিকে চলে এসেছে খেয়াল নেই। এলসি মনে মনে হাসল। বহু দিনের অভ্যাসে গাড়িটা বোধ হয় নিজে নিজেই চলে এসেছে। কি যেন কি মনে হল এলসির, তাই কাজ না থাকলেও গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। ডিউকও চলল তার পিছু পিছু।

এধারে ওধারে পাথরের স্তূপ পড়ে রয়েছে। কোথাও আকার অনুসারে সাজান—খাদানের চলতি ভাষায় বলে সাইজ করা। কোথাও খাদান থেকে বড় বড় চাঙড় বার করে ঢিপ করা রয়েছে। এগুলোকে এবার ছোট ছোট হাতুড়ি দিয়ে কালপাথরে কোঁদা দেহ নারী শ্রমিকেরা প্রয়োজন মত আকারে টুকরো টুকরো করে ভাঙবে। অন্য সময় এ জায়গাটা পঞ্চাশটা হাতুড়ির সমবেত ঐকতানে মুখর থাকত। ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্, ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্—রাশি রাশি পাথর ভাঙ্গা হত। পাথর ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে কামিনদের মুখও চলত সমান তালে। কেউ কেউ আবার গলা ছেড়ে গান গাইত :

একটি পানের লেগে এত অপমান।
দুয়ারে লাগায়ে দিব পানের বাগান॥

এলসিকে দেখে মাঝ পথেই ওদের গানে ছেদ পড়ত। লজ্জায় জিভ কেটে ওরা উচ্ছল কণ্ঠে হেসে পরস্পরের গায়ে গড়িয়ে পড়ত। ওদিকে মেট সাইজ করা পাথরের চৌকা সাজাত। চৌকোণ কাঠের ফ্রেমের ভিতর ঝুড়ি

ঝুড়ি পাথরের টুকরা পড়ত ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ শব্দে। কত কিউবিক ফিট পাথর হল, তার হিসেব রাখা হত এই ভাবে। কিন্তু আজ সব নীরব, সমস্ত কলরব আর কর্মমুখরতা নিস্তব্ধ। কেবল সেই জনবিহীন শূন্য প্রান্তরে এলসির জুতোর শব্দ চতুর্দিকে নিঃসঙ্গ প্রতিধ্বনি তুলছে।

একটি চিলের তীক্ষ্ণ চীৎকারে এলসির চিন্তাজাল ছিন্ন হল। মাথার উপর রৌদ্রদগ্ধ আকাশে চক্রাকারে উড়তে উড়তে চিলটি কর্ণপটাহ বিদীর্ণকারী ডাক ছাড়ছে—চিঁ হিঁ হিঁ, চিঁ হিঁ হিঁ। রুমাল দিয়ে আলগা ভাবে মুখের ঘাম মুছে অনেকক্ষণ এলসি উড়ন্ত চিলটির দিকে তাকিয়ে রইল। দুই পাখায় ভর করে অনন্ত আকাশ জয় করতে বেরিয়েছে ঐ তীক্ষ্ণ-কণ্ঠ পক্ষীবর। ক্ষুদ্রাকার হতে হতে উড্ডীয়মান চিলটি একটি বিন্দুতে পরিণত হল এবং অবশেষে নীল-নভের সুবিন্দুতে মিলিয়ে গেল সেই বিন্দুটি।

এলসির বক্ষ ভেদ করে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ধীরে ধীরে তার গগনবিহারী দৃষ্টি ধরিত্রী-অভিমুখী হল। পায়ের কাছে খাদানের বিরাট বিরাট গর্তগুলি মুখ ব্যাদান করে পড়ে আছে। আঘাতে জর্জর ক্ষতবিক্ষত ধরণী আস্য বিস্তার করে ক্লান্ত নিঃশ্বাস নিচ্ছে যেন। মাটির কোন ফোকরে হাওয়া ঢুকে একটানা গর্‌র্ গর্‌র্ শব্দ উঠছে। কোথাও কোথাও খাদানের গহ্বরে জল জমেছে। আর কিছুদিন এই অবস্থা চললে খাদানে ধ্বস নামবে এবং তা হলে বেশ কিছুদিন খাদানের কাজ বন্ধ রাখতে হবে। মজুররা কাজে এলেও খাদান পরিষ্কার না হলে কাজ করার কোন উপায় থাকবে না। আর এ বাবদে বাড়তি খরচ যা হবে, তাও কম নয়। এই সব খরচ ও লোকসান তো খাদানের পাথর থেকেই পুষিয়ে নিতে হবে। এলসির আবার মনে হল যে তা হলে ধর্মঘটে লাভ হল কার ?

অন্যদিন খাদানের এই দিকটা গাঁইতির শব্দে মুখর থাকে। ঠন্ ঠন্ ঠন্—তীক্ষ্ণ মুখ লৌহাস্ত্রধারী মানব বসুন্ধরার বহু যুগ সঞ্চিত রত্নপেটিকা লুণ্ঠন করছে। কৃষ্ণবর্ণ হারকিউলিসের মত মানুষগুলো দুই পায়ের অগ্রভাগে ভর করে প্রচণ্ড বেগে হাতের গাঁইতি চালাত প্রস্তরকঠিন মৃত্তিকাবক্ষে। গাঁইতি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের মুখ দিয়ে একটা চাপা শব্দ বেরোত—হঁঃ হঁঃ হঁঃ। আর ওদের ঘর্মাক্ত ব্ল্যাক মার্বেলের মত দেহে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়ে ইস্পাতের ফলার মত ঝক্ ঝক্ করত। এলসিকে দেখে ওরা মুহূর্তের জন্য কর্মে বিরতি দিয়ে বলত, "সেলাম মেমসাহেব, সেলাম।" আজ সব খালি, সব

শূন্য। জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ববিহীন এই প্রেতপুরীর অন্ধিসন্ধিতে পদচারণা করে বেড়াচ্ছে শূন্যতার মূর্ত প্রতীক রুদ্ধবাক্ এলসি মুর। আর সহ্য হয় না এলসির। পালাতে হবে—এই মৃতের রাজ্য থেকে বহু দূরে যেখানে মানুষ একাকী নয়, যেখানে মানুষের আপন জন তার সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে চিরসাথী।

এলসির গাড়ি মোহনপুরের এলাকা ছাড়িয়ে ঘাটশীলার রাস্তায় এসে পড়ল। অভ্যাস বশে স্টিয়ারিং বাঁ দিকে ঘুরে গেল। গাড়ি নরসিংগড়ের পথ ধরল। গোঁ গোঁ শব্দে গর্জন করতে করতে জীপ এগিয়ে চলেছে। এলসি গুম্ হয়ে বসে যন্ত্রচালিতের মত গাড়ির যন্ত্র সঞ্চালন করছে। তার মনে কত চিন্তা মুহুর্মুহু লহরী তুলছে। ডান দিকে লাল রঙের মুরম ও পাথর-কুচির ছোট ছোট স্তূপ—ইন্দুবাবুর পাথরের খাদান। একটা ট্রাক গর্জন করে খাদান থেকে বেরিয়ে আসছে। এলসিদের খাদানে হরতাল না হলে এই রকম মাল ভর্তি ট্রাক তাদের খাদান থেকে সাইডিং অভিমুখে চলত। আরও ওদিকে একটু দক্ষিণ ঘেঁষে শরের জঙ্গল। বুক সমান উঁচু শর গাছের আড়ালে রেল লাইন। ঝক্ ঝক্ করতে করতে একটা মালগাড়ি চলেছে কলকাতা অভিমুখে। অধিকাংশ ঢাকা বিহীন কে. ও. ওয়াগন। বোধ হয় লোহা পাথর বোঝাই করা। এখান থেকেই পাথরের গাঢ় খয়েরে রঙের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। নিশ্চয় গুয়া কিম্বা বড়জামদা থেকে আসছে। যাবে কোথায়? হয়তো শালিমার, কিম্বা খিদিরপুর অথবা একেবারে ভাইজাগে এবং সেখান থেকে জাপান।

পি-ই-ই-প্, পি-প্, পি-প্—নরসিংগড় এসে গেছে। ডান দিকে হাটতলা, তার গা ঘেঁষে কিসের যেন মন্দির। বাঁ দিকে নাথুনী শেঠের মুদিখানা। গাড়ির গতি একটু কমিয়ে দিল এলসি। ঐ—ঐ তো ডান হাতি হাইস্কুলের ঘর দেখা যাচ্ছে। হোস্টেল রাস্তা থেকে দেখা যায় না—আড়ালে পড়ে। এলসির হঠাৎ ইচ্ছা হল যে গাড়ি ডান দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে হোস্টেলের সামনে গিয়ে দাঁড় করায়। কিন্তু পরক্ষণেই সে ইচ্ছা তার মন থেকে ঝেড়ে ফেলল। ছি ছি—লোকে কি বলবে? আর নিজের কাছেই বা সে কি কৈফিয়ত দেব, কিন্তু আশ্চর্য লোক ঐ কৌশিকবাবু। কৃতজ্ঞতাবোধ না হয় না-ই রইল, কিন্তু একটু সাধারণ ভদ্রতা জ্ঞান কি থাকতে নেই? আর একবার কি তাঁর এলসির সঙ্গে দেখা করা উচিত ছিল না? সে দিন ও ভাবে পথে দেখা না হয়ে গেলে তো এলসি তাঁর এখানে ফেরার খবরও পেত না।

কি বলবে সে এ রকম লোককে? অহঙ্কারী, দাম্ভিক—না উদাসী? যাই হক না কেন, কীই বা সম্বন্ধ তাঁর সঙ্গে এলসির? এলসি কৌশিকবাবুর চিন্তা মন থেকে দূর করার চেষ্টা করল। এলসির একান্ত নির্বান্ধব জীবনের ম্লান ছায়াচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে অপর কারও চরণপাতে গতানুগতিকতার পরিবেশ কেটে গিয়ে মুক্ত বায়ু-প্রবাহ আসার কল্পনা তো দিবাস্বপ্ন মাত্র। কী প্রয়োজন তার অবাস্তব সম্ভাবনার মিথ্যা জাল বুনে বৃথা কাল হরণ করার?

মিলিটারী আমলের রাস্তাটা বাঁ হাতে পড়ে রইল। মুসলমানদের ছোট্ট মসজিদ ও তৎসংলগ্ন পেয়ারাবাগান পিছনে ফেলে এলসি এগিয়ে চলল। গাড়ি রিজার্ভ শাল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলেছে। নবীন পত্রদলে সুশোভিত শাল বীথিকার শীতল ছায়ামণ্ডিত ঋজুপথ দিয়ে গাড়ি চালাতে বেশ লাগে। কিচিমিচি করে কত পাখী কলগুঞ্জন করছে। জঙ্গলের ভিতর থেকে দুটি কোকিলের অক্লান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কূজন করে চলেছে প্রণয়ীযুগল। এলসির হঠাৎ "টু এ স্কাইলার্ক" কবিতাটির কয়েকটি ছত্র মনে পড়ে গেল। গুন্ গুন্ করে সে আবৃত্তি করতে লাগল:

Hail to thee, blithe spirit!
Bird thou never wert!
That from Heaven, or near it,
Pourest thy full heart
In profuse strains of unpremeditated art.

আবৃত্তি করতে করতে মনে পড়ে গেল স্টুয়ার্টের কথা। একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে সে ভাবল কোথায় চলে গেল সেই স্বপ্নরঙে রঙিন দিনগুলি! ব্যাকুল বসন্তের আহ্বানে সাড়া দেবার উপায় তার আর নেই। যে স্টুয়ার্টকে অবলম্বন করে তার প্রেম ব্রততীর মত ঊর্ধ্বগামী হয়ে উঠেছিল, এক ভীষণ প্রলয় ঝটিকায় তার শরণস্থল, তার আশ্রয়—সেই মহীরুহ সমূলে উৎপাটিত হয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। মত্ত প্রভঞ্জনের চরণ-চিহ্ন-লাঞ্ছিত এই সংসারারণ্যে এলসি কেবল পড়ে রয়েছে বিগতশ্রী ছিন্নভিন্ন লতিকার মত নিরালম্ব ও ধূলিধূসর হয়ে। এলসির ওষ্ঠাধর মৃদু মৃদু স্পন্দিত হতে লাগল। ধীরে ধীরে সে আত্মগত ভাবে উচ্চারণ করল, "ঘুমোও, ঘুমোও প্রিয়তম আমার—যেখানেই থাক, শান্তিতে তুমি ঘুমোও।"

খ্যাঁচ—এলসি ব্রেক চেপে গাড়ি প্রায় থামিয়েই ফেলেছিল। কিন্তু

পরক্ষণে ডান পা ব্রেক থেকে সরিয়ে নিয়ে আবার এক্সিলারেটরের উপর রাখল। ফার্স্ট গীয়ার, সেকেণ্ড গীয়ার, থার্ড গীয়ার—গাড়ি আবার চলতে লাগল স্বাভাবিক গতিতে। আকস্মিক ভাবে ব্রেক চাপার ফলে পিছনে উপবিষ্ট ডিউকও চমকে উঠে ঘেউ ঘেউ করে উঠেছিল। গাড়ি আবার সহজ গতিতে চলা আরম্ভ করায় ডিউকের চীৎকার শান্ত হল।

ততক্ষণে এলসি নিজেকে সামলে নিয়েছে। কৌশিকবাবুকে সাপে কামড়াবার জায়গাটা। কিছু দিন পূর্বে এক অন্ধকার রাত্রে ঐখানে এলসি আবিষ্কার করেছিল সর্পবিষে জর্জর কৌশিকবাবুর অচেতন দেহটাকে। উঃ, সে রাত্রির কথা এলসি কিছুতেই ভুলতে পারে না। ঘাটশীলার হাসপাতালের দৃশ্য তার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ডাক্তার বোসের অপরিসীম যত্নের কথা এলসি কোন দিন ভুলবে না। তার পর কৌশিককে নিয়ে জামসেদপুর যাত্রা—সেই গোধূলির ঈষদন্ধকারে কালিকাপুরের কাছে সাঁওতাল যুবক-যুবতীদের প্রণয় নিবেদনের দৃশ্য! দূর থেকে মাদলের মন মাতান মিঠে বোল ভেসে আসছে—ধিং ধিং ধিংতা, ধিতা ধিতা ধিংতা। ভুড়িডির ফটকের কাছে এসে দেখে ঘুমন্ত কৌশিকবাবুর শিথিল মাথা তার কাঁধে এসে পড়েছে। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! এত দিন পরও সে কথা ভাবতে এলসির সর্বাবয়ব সির্ সির্ করে উঠল। সুন্দরনগর না পৌঁছান পর্যন্ত কৌশিকবাবু ঐ ভাবে তার গায়ে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে পরম নির্ভরতার সঙ্গে শুয়ে ছিলেন। কেমন অসহায় দেখাচ্ছিল ভদ্রলোককে। কপালে দু একটি বলিরেখা পড়েছে—কানের পাশের চুলে ঈষৎ সাদার প্রলেপ। কিন্তু ছিঃ, আবার এ কী চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছে। স্টিয়ারিং ধরা অবস্থাতেই এলসি একবার গা ঝাড়া দিয়ে নেয়। কৌশিকবাবুর চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলে দেবে এবার।

ঐ তো একটু দূরে দেখা যাচ্ছে ধলভূমগড় স্টেশনে যাবার মোড়। সামনের রাস্তা চাকুলিয়া চলে গেছে, আর ডান দিকে ফিরলেই স্টেশন। বেশ কয়েক দিন সে বুরুহাতু যায় নি। কাজকর্ম কেমন চলছে কে জানে? একবার ওখানে যাওয়া নেহাতই প্রয়োজন। কিন্তু কেমন যেন একটা আলস্যের ভূত তার কাঁধে চেপে বসেছে আজ। কোন কাজ করতে ভাল লাগছে না। নিজেকে ভুলে থাকা যায় এমন কোন জায়গায়, এমন কারও কাছে যেতে চাইছে মন। কি হবে কাজ করে? কর্তব্য—শুধু নীরস শুষ্ক কর্তব্যকে কেন্দ্র করে অনুবর্তন করতে মন আজ রাজী নয়। এলসি ডান হাতি

মোড় ঘুরল। আজ ইন্দুবাবুর বাড়ি যাওয়া যাক। বীণা দেবীর পরিপূর্ণ সংসারের পরিতৃপ্তির কিছুটা ছোঁয়া লাগান যাক নিজের অশান্ত চিত্তে।

॥ উনত্রিশ ॥

বাদিয়ার ঘাটে কৌশিকবাবু যখন সুবর্ণরেখা পার হলেন, ঘন কৃষ্ণ আকাশের পটভূমিকায় শুকতারা তখনও জ্বল জ্বল করছে। উঁচু নীচু মাঠ ভেঙে পায়ে চলা পথ ধরে তিনি দ্রুত বেগে নরসিংগড়ের দিকে এগিয়ে চললেন। এখনও মাইল তিনেক পথ তাঁকে হাঁটতে হবে। বেশী বেলা হলে লোকে বিশ্বাস করতে চাইবে না যে তিনি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। অথচ তিনি যে রাত দুটোর সময় মুসাবনী থেকে বেরিয়েছেন, এ কথা প্রকাশ পাওয়া কোন দিক থেকেই কাম্য নয়। কারণ একে তো তাতে মুসাবনীতে অবস্থিত তাঁদের যে কয়টি শুভানুধ্যায়ী গোপনে তাঁকে মোহনপুরের ধর্মঘটী মজুরদের জন্য অর্থসাহায্য করেন, তাদের অস্তিত্ব জাহির হয়ে যাবে। আর তা হলে কি তাঁরা আর ভবিষ্যতে কোন সাহায্য দিতে পারবেন? বরং ওখানকার আই. এন. টি. ইউ. সি-র ইউনিয়ন, কোম্পানি এবং সরকার—সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় কৌশিকবাবুদের পার্টির সঙ্গে সম্বন্ধিত থাকার জন্য ও কজনের চাকরি যাওয়াও কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। কিন্তু এর চেয়েও বড় ব্যাপার হচ্ছে এই যে খবরটা জানাজানি হয়ে গেলে স্বয়ং কৌশিকবাবুর পরিচয়ও কি গোপন থাকবে? তাঁকে গ্রেপ্তার করার উপযুক্ত সংবাদ দেবার জন্য কে যে সেই এক হাজার টাকার পুরস্কারটা পাবে, কে জানে? কৌশিক-বাবুর ওষ্ঠে মৃদু হাসি খেলা করে ওঠে।

আর এ অবস্থায় কৌশিকবাবু মরেও স্বস্তি পাবেন না। মোহনপুরের ব্যাপারটার একটা কিনারা না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই তিনি শান্তি পাচ্ছেন না। তিনি আশা করেছিলেন যে মোহনপুরের পরই মুসাবনীর তামা পাথরের খাদানে ধর্মঘট হবে এবং তার পর ঘাটশীলার কপার করপোরেশনের কারখানাই বা আর কদিন চলবে। কিন্তু সে আশা আপাততঃ পূর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। জামসেদপুরের ওয়্যার প্রডাক্টস কারখানার হরতাল তাঁদের পার্টির গলায় কাঁটার মত আটকে আছে। অন্যান্য কারখানায় ধর্মঘট শুরু করে জামসেদপুরের স্বাভাবিক জীবনকে পর্যুদস্ত করা তো দূরের কথা, এখন কোন মতে ওয়্যার প্রডাক্টসের ব্যাপারের একটা

সুস্রাহা হলে সকলে রক্ষা পায়। শ্রমিক ধর্মঘট ও তৎসঞ্জাত শ্রমিক বিক্ষোভের ফলে মজদুর বিপ্লব ঘটিয়ে শাসন-যন্ত্র করতলগত করার পরিকল্পনা আজ অন্ততঃ সুদূরপরাহত।

তা ছাড়া আর একটা ব্যাপার কৌশিকবাবু লক্ষ্য করেছেন। এই মাস খানেক ধর্মঘট চলার পরই মোহনপুরের শ্রমিকদের প্রতিরোধ-শক্তি ভেঙে পড়ছে। তাই বা কেন, ওয়্যার প্রডাক্টস শ্রমিকেরা আরও কিছু দিন বেশী হরতাল চালালেও তাদেরও তো ঐ অবস্থা। স্বাহা অতখানি বিপদের ঝুঁকি নেওয়া সত্ত্বেও অবস্থার মোড় ফেরান যায় নি। স্বাহা অবশ্য জামিনে ছাড়া পেয়ে গেছে ; কিন্তু ওখানকার ধর্মঘটের সর্বশেষ খবর হচ্ছে এই যে ওদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক মজুর কাজে যাচ্ছে এবং এখন প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শ্রমিক কাজে যোগদান করেছে।

ক্ষুধার জ্বালায় ও অভাবের তাড়নায় এখানকার শ্রমিকেরা এখন যে কোন শর্তে কাজে ফিরে যেতে ইচ্ছুক বলে কৌশিকবাবুর মনে হচ্ছে। নেহাত তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব এবং মুসাবনী ও মৌভাণ্ডার থেকে মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য পেয়ে যাবার জন্য ওরা এখনও টিকে আছে। পার্টি ফাণ্ডের সব পয়সা নাকি পার্টি সংগঠনের জন্য খরচ হবে, শ্রমিকদের তার থেকে কোন সাহায্য দেওয়া চলবে না—উপর থেকে এই খবর এসেছে। সুতরাং এ অবস্থায় মোহনপুর খাদানের মজুরদের কাছ থেকে আর কীই বা আশা করা যায়? ওদের সকলের অবস্থাই তো কৌশিকবাবুর জানা আছে। দু-চার জন ছাড়া অধিকাংশেরই সারা বছর দু বেলা পেট ভরে নুন ভাত জোটে না। এদের প্রতিরোধ-ক্ষমতার উপর আর কতখানি আশা করা যায়?

কৌশিকবাবু শহরে থাকলেও এ যাবত মূলতঃ ইনটেলেকচুয়ালদের মধ্যেই কাজ করেছেন। শ্রমিক বা কৃষকদের প্রত্যক্ষ অবস্থার সঙ্গে পরিচয় ছিল না। সুতরাং এ দেশের প্রলেটারিয়েটরা যে কী ভীষণ অবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করছে, এ কথা আজকের মত এমন নগ্ন ভাবে কোন দিন তিনি বোঝেন নি। আজকের অধিকাংশ শহরবাসী বুদ্ধিজীবী কমরেডদের মত তাঁরও একদা নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে এদেশের সর্বহারাদের সম্বন্ধেও ম্যানিফেস্টোর সেই অমর বাণী প্রযোজ্য—"হাতে পায়ের শিকল ছাড়া তাদের হারাবার মত আর কিছুই নেই" এবং তাই তারা মরীয়া হয়ে জীবন পণ করে শোষকদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আজ কিন্তু মোহনপুরের মজুররা কৌশিকবাবুর সামনে একটা প্রচণ্ড জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্বরূপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কৌশিকবাবু হঠাৎ চমকে উঠলেন। এ কি—এ তো তিনি ভোলানাথবাবুরই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি তুলছেন যেন। কালই ভদ্রলোকের আর একটি চিঠি পেয়েছেন কৌশিকবাবু। প্রথম চিঠিটির একটি সৌজন্যমূলক জবাব দিয়েছিলেন তিনি। আর স্বভাবতই জবাব দিতে গিয়ে ভোলানাথবাবুর কোন কোন উক্তির প্রতিবাদ করতে হয়েছিল। ঠিক প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে প্রতিবাদ করেন নি। আসলে ওঁর কথা আর অভিমত এমন অবিশ্বাস্য রকমের অদ্ভুত যে ইচ্ছা না থাকলেও কলমের ডগা দিয়ে আপনিই যেন প্রতিবাদ সূচক লেখা বেরিয়ে আসে। যাই হক, প্রথমে ভোলানাথবাবু লিখেছেন, "আমাকে নবজীবনে প্রবর্তনকারী হিসাবে আপনার প্রাপ্য গৌরব আপনি নিতে অস্বীকার করলে কি হবে, আমাকে তো ঋণ স্বীকার করতেই হবে। কোন মহিলার মুখে 'বেলা যায়' শুনে লালাবাবু সংসার-ত্যাগী হবার প্রেরণা পেয়েছিলেন। ঘটনাটিকে কাকতালীয়বৎ বা অন্য যা কিছুই বলুন না কেন, লালাবাবুর জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই অজ্ঞাত মহিলার অসম্পৃক্ত উক্তির অবদান কম নয়। সুতরাং আপনি বিনয় বশতঃ এড়াতে চাইলেও আমার পক্ষে সত্য স্বীকার না করে উপায় নেই।"

ভূমিকা সেরে ভোলানাথবাবু লিখেছেন, "আপনি শিক্ষার দ্বারা সমাজ-পরিবর্তনের নীতিতে বিশ্বাসী নন বলে আভাস দিয়েছেন। আপনি ইশারা করেছেন শ্রেণী সংগ্রামের প্রতি, যাতে মরীয়া সর্বহারারা শোষণকারীদের নিঃশেষ করে দেবে। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে সোভিয়েট রাশিয়া বা চীন—কুত্রাপি তো নিছক সর্বহারাদের দ্বারা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো কথিত পদ্ধতিতে বিপ্লব সংসাধিত হয় নি। ও সব জায়গায় বিপ্লবের পিছনে ট্রাম্পকার্ড বা সব চেয়ে জোরালো হাতিয়ার ছিল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দ্বারা কুক্ষিগত সেনা বিভাগ এবং শেষ পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীই তদানীন্তন শাসকদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হেনে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়েছে। পূর্ব ইউরোপের তথা কথিত নয়া গণতন্ত্রগুলিতেও এই একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি হয়েছে এবং এসিয়ার যেখানে যেখানে শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসীরা কৃষক মজদুর রাজ কায়েম করার জন্য আন্দোলন করেছেন, তাঁরাও এই হাতিয়ারেরই শরণ নিয়েছেন বা নেবেন। এক মাত্র প্যারিস কমিউনকে যদি এর ব্যতিক্রম বলেন তা হলেও জিজ্ঞাস্য থেকে যায় যে সেখানকার শিক্ষা কি? সেনাবাহিনী পিছনে না থাকার জন্যই কি ঐ গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয় নি?

"যাক, এবার আমার আসল বক্তব্যে আসি। এই ভাবে সৈন্য-শক্তির সাহায্যে ক্ষমতা দখল হবার পর কিসের প্রেরণায় সেনা বিভাগ নিজেদের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে কৃষক মজুরদের হাতে তা সঁপে দেবে? এই রকম আশা পোষণ করা কি লোকচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের পোষায়? যদি বলেন যে কেন—সৈন্যদের মধ্যে অধিকাংশই তো সর্বহারা, তা হলে তার জবাবে বলব যে সেনাবাহিনীর আসল নিয়ামক অযুত সংখ্যক সাধারণ সৈনিক নয়, এর মস্তিষ্ক হচ্ছে মুষ্টিমেয় পদস্থ কর্মচারীর দল এবং তাদের কেউ সর্বহারা শ্রেণী থেকে উদ্ভূত নন। তাঁরা একেবারে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। আর একটা কথা। শ্রেণী সংগ্রাম অর্থাৎ হিংসার পথে যে ক্ষমতা হস্তগত হবে, তা বজায় রাখতেও তো হিংসার শরণ নিতে হবে। কারণ আপনিও নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে ক্ষমতা দখল করার চেয়ে ক্ষমতা কায়েম রাখা অধিকতর কঠিন কর্তব্য। আর হিংসা শক্তির প্রয়োগকারীদের ভিতর সৈন্যদের চেয়ে অধিকতর কুশলী আর কারা হতে পারে? তা হলে দেখা যাচ্ছে যে শ্রেণী-সংঘর্ষের সহায়তায় যে 'নববিধানে'র বনিয়াদ রচিত হবে, কোন দিনই তা সমাজজীবন থেকে হিংসা ও সৈন্যদলের প্রভাবকে নির্বাসন দিতে তো পারবেই না, পক্ষান্তরে ঐ দুই শক্তিরই প্রতিপত্তি হবে সব চেয়ে বেশী। কারণ সাঁতার দিয়ে খাল পার হবার ক্ষমতা যার নেই, তার পক্ষে সাঁতরে সমুদ্র পার হবার কথা বলা অর্থহীন নয় কি?

"এই বার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে কেন আমরা বিপ্লবের আদি মধ্য ও অন্ত—সর্বাবস্থায়ই অহিংসার উপর জোর দিই? অহিংস বিপ্লবের প্রক্রিয়া অর্থাৎ হৃদয় পরিবর্তনের মূলাধার হচ্ছে শিক্ষা। ঘুরিয়ে বললে শিক্ষার দ্বারা হৃদয় পরিবর্তন। আসল কথা হচ্ছে এই যে নূতন মানুষ না হলে নূতন সমাজ হবে কি করে? পুরাতন মূল্যবোধে ওতপ্রোত মানুষ নবীন সমাজ গড়তে পারে কিনা, আপনিই তা বিবেচনা করে দেখুন।"

কৌশিকবাবু চিন্তার জাল বোনা ছেড়ে দিয়ে আকাশের দিকে তাকান। না তাকিয়ে উপায় নেই। গ্রীষ্ম রাত্রের গুমোট ভাবটা কেটে গিয়ে এখন মৃদু মন্দ দখিনা বাতাসে শরীর মন স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে এবার প্রত্যূষের পূর্বাভাস দেখা দিচ্ছে। অত্যন্ত ফিকে একটা গোলাপী আভা উদয়াচলের দিকে দেখা যায়। খুব ক্ষীণ—ভাল করে লক্ষ্য না করলে চোখেই পড়ে না। কিন্তু সমগ্র আকাশে বাতাসে এক মহা জ্যোতির্ময়ের আগমনবার্তা সুপরিস্ফুট। কৌশিকবাবু এবার হাতের টর্চটি জ্বালান বন্ধ করলেন।

সাঁ সাঁ শব্দে মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক বাদুড় উড়ে গেল। ওদের চরার পালা শেষ হয়েছে। দূরের ঐ ঝাঁকড়া মাথা গাছের ডালে ডালে পাখীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছে। বিহঙ্গকুলের পক্ষবিধূনন আর কলগুঞ্জনের রেশ কৌশিকবাবু অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন। পথ আর বেশী নেই। আর একটু গেলেই রেল লাইন এবং লাইনটা পেরোলেই নরসিংগড় থেকে ঘাটশীলা যাবার পাকা রাস্তা। একবার রাস্তাতে পড়তে পারলে তিনি যে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন—এ বিশ্বাস জাগান মোটেই শক্ত হবে না। তাই শীঘ্র এই মাঠটুকু পার হতে হবে।

"ঝটকে ম্যা"—কৌশিকবাবুর বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল এই জনমানবশূন্য আদিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরভূমিতে একমাত্র তাঁর নিজের পদধ্বনি ছাড়া এ যাবৎ মানবের অস্তিত্বের প্রমাণ কোথাও ছিল না। আচমকা ভূতের কণ্ঠস্বর শোনার মত কোথা থেকে এ চীৎকার ভেসে এল—ঝটকে ম্যা!

"ঝটকে ম্যা!" এতক্ষণে কৌশিকবাবু দেখতে পেয়েছেন। আবছা অন্ধকার ভেদ করে একটা নরমূর্তি রেল লাইন বরাবর পূর্বমুখে এগিয়ে চলেছে। প্রত্যুষের অস্পষ্ট আলোকে তাকে পর্দার উপর ছায়াছবির মত মনে হয়, ওর দেহের খুঁটিনাটি চোখে পড়ে না। "ঝটকে ম্যা—রেল পাতেঁছিস কি মরেছিস। ছুব নাই ভালুকবিঁধায় তুদের রেল পাততে।" বিপিনের আজা বুড়ো পাগলা কিন্তু মাহাত হাত তুলে কোন্ অদৃশ্য শত্রুদের শাসাতে শাসাতে রেল লাইন ধরে দুলে দুলে এগিয়ে চলেছে। বয়সের ভারে তেমনি তার দেহ সম্মুখপানে আনত। চলার তালে তালে বুড়ার হাতের লাঠি রেল লাইনের মধ্যে পাতা নুড়িগুলির উপর পড়ে আওয়াজ তুলছে—ঠক্ ঠক্ ঠক্, ঠকা ঠক্ ঠক্। ভালুকবিঁধার প্রধান তার প্রধানী এলাকা পরিক্রমা করছে। ঐ তো পশ্চিম দিক ঘেঁষে দেখা যাচ্ছে রেলের লেভেল ক্রসিং। ঐখানেই তো একদিন ভালুকবিঁধা গ্রাম ছিল।

কিন্তু ও কি? পূর্ব দিক থেকে গুম্ গুম্ করে আওয়াজ আসছে। হ্যাঁ, তাই তো! গুম্ গুম্ গুম্, গুম্ গুম্ গুম্—ট্রেন আসছে। ঐ তো সুদূর পূর্ব প্রান্তের অন্ধকার ভেদ করে ইঞ্জিনের সার্চলাইটটা রক্তচক্ষু দানবের চোখের মত ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে। ঠক্ ঠক্ ঠক্, ঠক্ ঠক্ ঠক্—নির্জীব ইস্পাতের রেলও লৌহদানবের আগমনের আশঙ্কাজনক বার্তা পেয়ে থেকে থেকে শিহরিত হয়ে উঠছে। শোঁ শোঁ শোঁ—ভয়ার্ত টেলিগ্রাফের তারগুলি

চাপা স্বরে ফিস ফিস করে উঠল—আসছে, আসছে। হ্যাঁ, আসছেই তো। দিক দিগন্ত মুখর করে তার মেদিনী প্রকম্পিতকারী অযুত পদের অবিশ্রান্ত আগমনধ্বনি শোনা যাচ্ছে—গুম্ গুম্ গুম্, গুম্ গুম্ গুম্।

অথচ পাগলা বুড়োর তো লাইন থেকে সরে দাঁড়াবার লক্ষণ নেই! কৌশিকবাবু বিস্মিত ও আতঙ্কিত হন। তাঁর কাছ থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে এ কোন্ বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হতে চলেছে? স্থানকাল ভুলে তিনি তাকে সাবধান করার জন্য চেঁচিয়ে উঠলেন—"এই বুড়ো, নেমে দাঁড়াও লাইন থেকে।"

কিন্তু কে নেমে দাঁড়াবে? ট্রেনের সাড়া পেয়ে কিনু মাহাতর পরাক্রম যেন দ্বিগুণিত হয়ে উঠল। হাতের লাঠিটা ট্রেনের ইঞ্জিন লক্ষ্য করে বাগিয়ে ধরে সে হেঁকে উঠল "ঝটকে ম্যা। আজ আর ছাড়ব নাই। রেল পার্তেছিস কি মরেছিস।" চীৎকার করতে সে যেন চুম্বকাকর্ষিত লৌহখণ্ডের মত ইঞ্জিন লক্ষ্য করে ধেয়ে চলল।

এক দুই তিন। গম্ গম্ গম্, গম্ গম্ গম্। ভালুকবিঁধার প্রধানের পরোয়ানা উপেক্ষা করে নাগপুর প্যাসেঞ্জার আপন বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল। কিনু মাহাতর ছিন্নভিন্ন দেহটা মুহূর্তের মধ্যে ইঞ্জিনের বাফারে ধাক্কা খেয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে লাইনের ওপাশে ছিটকে পড়ল। আর তাকে চেনার উপায় নেই। হাতের লাঠিটা কোথায় গেছে কে জানে? তার পরিধানের শতছিন্ন কোট আর কৌপিন এবং মাথা ভরা রুক্ষ চুলের রাশি ও ঝাঁকড়া দাড়ি গোঁফ রক্ত মাংসের সঙ্গে মিলে গিয়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও বিজয়োদ্ধত ভঙ্গীতে হুংকার ছাড়তে ছাড়তে যে এগিয়ে চলছিল, এখন কেবল একতাল রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডরূপে তার দেহাবশেষ পড়ে রয়েছে। শেষ সংগ্রামে ধলভূমের গ্রাম্য জীবনের স্বপ্নসাধ পরাভূত হয়েছে, বিজয়ী প্রগতির রথচক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হয়েছে এক অত্যাচারিত উৎপীড়িত মানবাত্মার প্রতিশোধ স্পৃহা। রণক্লান্ত জীবনের অবসানে ভালুকবিঁধার শেষ প্রধান অন্তিম শয্যা নিল এসে তার বংশপরম্পরার অধিকারভুক্ত ভালুকবিঁধার মাটিতেই। শিহরিত কৌশিকবাবু আতঙ্কে চোখ বুজলেন।

পূর্বাকাশে প্রভাতরবির প্রথম কিরণের লালিমা দেখা দিয়েছে। আর যেন আকাশের ঐ পাটলবর্ণের খানিকটা জমাট বেঁধে পড়ে রয়েছে কৌশিকবাবুর চোখের সামনে, কয়েক হাত দূরে। দূরে ঘাটশীলার দিকে তখনও অপস্রিয়মাণ

নাগপুর প্যাসেঞ্জারের রক্তিম বর্ণ আলোকবিন্দু দেখা যাচ্ছে। মদমত্ত রক্তচক্ষুর শাসানির সঙ্গে তার সহস্র চক্রের একটানা ক্ষুধার্ত দাবি কানে বাজছে—যাকে পাব তাকে খাব, যাকে পাব তাকে খাব।

মহান লেনিনের একটা উক্তি কৌশিকবাবুর মনে পড়ে গেল—"হিংসাই প্রগতির ধাত্রী"। চোখের সামনে তিনি আজ কথাটার যথার্থতার প্রমাণ পেলেন। প্রগতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মিথ্যা প্রচেষ্টার পরিণাম কিন্তু মাহাতর ভবিতব্যের মত হতে বাধ্য। প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং পুঁজিবাদী শোষণের যাবতীয় প্রকরণ এমনি ভাবে দলে পিষে নিঃশেষ করে প্রগতি ও বিপ্লব তার পথ করে নেবে। এর জন্য শোকের অবকাশ কোথায়, আর তার সার্থকতাই বা কি? কিন্তু নাঃ, আর দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে এ দৃশ্য দেখার সময় নেই। কৌশিকবাবু সাক্ষী দেবার হাঙ্গামায় পড়তে চান না। সুতরাং পাকা রাস্তার জন্য তিনি দ্রুতপদে পা চালিয়ে দিলেন।

॥ ত্রিশ ॥

স্বাহার মনে এই কয় সপ্তাহ শান্তি ছিল না। জামিন পেলে কি হবে, মামলার ঝামেলা তো শেষ হয় নি। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। তা পুলিসের পাল্লায় পড়লেও সেই অবস্থা। এই জন্য স্বাহা আত্মগোপন করেছে। এই ব্যাপারের সূত্র ধরে যদি কোন মতে কাকদ্বীপের সংবাদ জামসেদপুরের পুলিসের কানে যায়, তা হলে সমূহ সর্বনাশ। লয়ালগঞ্জকে লালগঞ্জে রূপান্তরিত করার অন্যতম নায়িকা এবং জোতদারের কাছারী বাড়িকে লালবাগান নাম দিয়ে তার উপর লাল পতাকা উড়িয়ে দেবার সেই ঘটনার অগ্রণী, ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের শুরু থেকে দেড় বৎসর পর্যন্ত কাকদ্বীপের দেবী চৌধুরাণী স্বাহার তো প্রচলিত পিনালকোড অনুযায়ী বহুবার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। অতএব জামানতের যত টাকাই বরবাদ হক না কেন, একবার লাল পাগড়ির হাত থেকে ছাড়া পেলে আর তার ত্রিসীমানার মধ্যে যাওয়া আদৌ বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। সুতরাং স্বাহা আত্মগোপন করাই স্থির করেছিল এবং পার্টির অতীব অন্তরঙ্গ পৃষ্ঠপোষকদের বাড়িতে পর্যায়ক্রমে কিছুদিন করে থাকছিল।

কদমার এমনি এক সাময়িক বাসস্থলের একটি কামরায় বসে স্বাহা পূর্বাপর করছিল। চিন্তা চাকরির জন্য নয়। পার্টির কাজের সুবিধার জন্য

স্কুলে চাকরি নিয়েছিল, পার্টির জন্য তা না হয় যাবে। একটি ছাত্রীকে দিয়ে হেডমিস্ট্রেসের কাছে একটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে স্বাহা ও বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। কোয়ার্টারে সামান্য জিনিসপত্র যা ছিল, তার জন্যও ভাবনা নেই। উদ্বেগ ছিল তার কাকদ্বীপ পর্বের চিরসাথী ছোট্ট অগ্নি-নালিকাটির জন্য। হাতের মুঠোয় গোপন করা যায় এত ছোট ঐ সাইলেন্সার লাগান অটোমেটিক রিভলভারটির প্রতি স্বাহার সত্য সত্যই একটা মমতা আছে। স্বাহার কত নির্দেশই না পালন করেছে ঐ ক্ষুদ্র যন্ত্রটি। তর্জনীর ঈষৎ ইশারায় ওর গুলি ইপ্সিত লক্ষ্য ভেদ করে স্বাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছে।

ওটিকে কাছছাড়া করতে স্বাহার খুব একটা ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে এখন ওটিকে এখানে আনা বা সঙ্গে রাখা চলে না। তাই বুদ্ধি করে ওটিকে একটি নিরাপদ জায়গায় রেখে দিয়েছে স্বাহা। রিভলভারটি এখন খদ্দরপরা অহিংস বসুধাদির কোয়ার্টারে একটি সুটকেসের মধ্যে নির্ভাবনায় রয়েছে। হয়তো বা বসুধাদির বাক্স চরকাটির নীচেই রয়েছে পিস্তলভরা স্বাহার সুটকেসটি।

পরিকল্পনাটির কথা মনে পড়তে স্বাহার আবার হাসি পেল। জরুরী কাজের জন্য স্বাহা রাত্রেই বাড়ি গেছে এবং ছুটির দরখাস্তটি হেডমিস্ট্রেসকে পাঠানর সময় ঐ সুটকেসটি বসুধাদির বাড়িতে রাখতে দিয়ে গেছে—স্বাহারই নির্দেশে এই কথা বলে স্বাহার ঘনিষ্ঠা বান্ধবী ওদের সহকর্মী সুপ্রিয়াদি সুটকেসটি বসুধাদির কাছে গছিয়ে দিয়ে এসেছে। সুপ্রিয়াও স্বাহার প্রভাবে পার্টিতে এসেছে। সুতরাং এ পরিকল্পনা কার্যকরী করতে বিশেষ অসুবিধা হয় নি। আপন মনে মুচকি হেসে স্বাহা ভাবল যে ভালই হয়েছে—ভাল মানুষ বসুধাদি স্বাহার উপকার করেছেন।

যাই হক, স্বাহার চিন্তা ওসব কারণের জন্য নয়। সে ভাবছিল ওয়্যার প্রডাক্টস কারখানার ধর্মঘটের কথা। ধর্মঘটের আড়াইমাস পুরো হয়ে গেছে। কত শীঘ্র কেটে গেল দিনগুলি। ওয়্যার প্রডাক্টস কারখানার গেটে তাদের নারীবাহিনীর অভিযান ও স্বাহার গ্রেপ্তার, সাকচী জেলের সেই আট-চল্লিশ ঘণ্টার নরকবাস এবং তার পর মুক্তিলাভই তো একমাসের পুরাতন ঘটনা হয়ে গেল।

কিন্তু স্বাহার দিন যত দ্রুত কেটে গেছে বলে মনে হয়, ধর্মঘটীদের অবস্থাও কি সেই রকম? না—একেবারে বিপরীত। নিত্য ওয়্যার প্রডাক্টস থেকে হতাশাজনক খবর আসছে। অর্জুন সিংহের দেড় শ বিদ্রোহী

এখন প্রায় সাত শ'তে উপনীত হতে চলল। ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে মাথা নিচু করে সব এবার কাজে যাচ্ছে। কাউকে কিছু বলতেও হচ্ছে না। এখনও যে কয়েকজন মজুর টিকে আছে, তাদের মধ্যে ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় পার্টির গোঁড়া সমর্থকদের বাদ দিলে বাকী সবাই যে কোন মুহূর্তে আত্মসমর্পণ করতে পারে। কী অগৌরবজনক পরিসমাপ্তি অপেক্ষা করছে তার কোম্পানির সংগ্রামী মজুরদের ভাগ্যে। কারখানার খবর এই যে, ইউনিয়নের নাম নেওয়া বা দাবিদাওয়ার কথা বলা তো দূরের কথা, সব শ্রমিক একান্ত বাধ্যের মত এক পায়ে খাড়া হয়ে কাজ করছে। জল খাবার জন্য পর্যন্ত কাজে কামাই করতে কেউ সাহসী নয়। কি চিন্তা করে স্বাহারা কাজে লাগল আর কি তার পরিণতি হতে চলেছে! অথচ পার্টির লাইন তো তারা যথাযথভাবে অনুসরণ করে চলেছে।

স্বাহার মনে পড়ল কাকদ্বীপ থেকে চলে আসার পরও সে এমনি সংশয় দোলায় দুলেছিল বেশ কিছু দিন। কিন্তু ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বরে পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটির কয়েকজন বিশিষ্ট কমরেডের স্বাক্ষরিত যে বিবৃতি পার্টির কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়, তাতে তার মনের সন্দেহের ভাব কেটে যায়। সেণ্ট্রাল কমিটির কমরেডরা দ্ব্যর্থহীন ভাষাতে ঘোষণা করেছিলেন যে পার্টির কৃষক আন্দোলনকে ক্রমশঃ অধিকতর মাত্রায় সশস্ত্র যুদ্ধের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। তেলেঙ্গানার মত পার্টির ইঙ্গিতে লড়াই করতে ইচ্ছুক জঙ্গী বাহিনী গড়ে তুলে স্থানে স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করতে হবে এবং ঐ সব ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে জনসাধারণকে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের জন্য সংগঠিত করতে হবে। সকল সন্দেহের নিরসন করে দিয়ে সেণ্ট্রাল কমিটির কমরেডরা ঘোষণা করেছিলেন যে তেলেঙ্গানার সংগ্রামপদ্ধতি বর্জন করার কোন কথাই ওঠে না, পক্ষান্তরে সমগ্র দেশে একাধিক তেলেঙ্গানা সৃষ্টি করাই পার্টির কার্যক্রম।

ঐ ঘোষণারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল পলিটব্যুরোর ১৫ই নভেম্বরের গোপন প্রস্তাবে। পলিটব্যুরো জানিয়ে দিল, "জাতির মুক্তি-সংগ্রামের বর্তমান মুহূর্তে বিপ্লবী কৃষকদের জন্য সশস্ত্র সংঘর্ষই যে মুখ্য হাতিয়ার—এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝে নেবার দিন এসে গেছে।" তা ছাড়া সুযোগ সুবিধামত, "আর্থিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মঘট, শোভাযাত্রা, শ্রমিক সংঘর্ষ, শান্তির জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ ইত্যাদি যে কোন এক বা একাধিক সম্মিলিত কর্মসূচী গ্রহণ করা চলবে।"

পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা সরিয়ে নেবার জন্য সরকারকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যেই অবশ্য প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশ রচিত হয়েছিল। কারণ তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই-এর মত পুঁজিবাদের মিত্র ও ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টের চোখে ধুলো দিতে হবে তো। এই জন্যই গত বছর ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের পার্টিকে বুদ্ধি দেবার জন্য গ্রেট ব্রিটেনের যে কমরেডটি এসেছিলেন তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, "কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য হচ্ছে কোরিয়া এবং পারমাণবিক বোমার ব্যাপারে নেহেরুর দৃষ্টি-ভঙ্গিকে এক্সপ্লয়েট করা—কাজে লাগান। আর সশস্ত্র সংগ্রাম সম্বন্ধে আমাদের পূর্বেকার পত্রেই আমরা বলেছি যে শেষ অবধি ভারতবর্ষে বিপ্লব যে এই পন্থাতেই মূর্ত হয়ে উঠবে, এ সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ নেই।" স্বাহা ভেবে চলে। বাইরে শান্তির কথা প্রচার করে ভিতরে ভিতরে তারা তো পার্টির আদর্শ কর্মী হিসাবে সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি করে চলেছে। তবে কোথায় গোলমাল হল? হঠাৎ এমন বেসুরো রাগিণী বাজছে কেন চতুর্দিকে?

ঠক্ ঠক্, ঠক্ ঠক্। কয়েক মুহূর্ত থেমে শুধু একবার ঠক্। পরিচিত সিগন্যাল। নিজেদেরই কেউ নিশ্চয়। স্বাহা তবুও নিশ্চিন্ত হবার জন্য বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে ভিতর থেকে তার গায়ে দুটো টোকা দিল। বাইরে আবার মৃদু টোকা পড়ল—ঠক্ ঠক্. ঠক্ ঠক্। তার পর কয়েক মুহূর্ত থেমে শুধু একবার ঠক্। স্বাহা এবার নির্ভাবনায় দরজার একটি পাল্লা খুলে দিল।

মীনাক্ষী ভিতরে ঢুকেই অর্গল বন্ধ করল। তার পর বলল, "ভাল আছেন তো দিদি?"

"আছি এক রকম। তুমি ভাল আছ তো মীনা?" মীনাক্ষীর হাত ধরে স্বাহা তার খাটে নিজের পাশে বসাতে বসাতে প্রশ্ন করল।

মীনাক্ষী কোন কথা না বলে শুধু একটু হাসল। স্বাহার কেন জানি মীনাক্ষীর উপর বিশেষ একটা আকর্ষণ জন্মে গেছে। একে মায়া না স্নেহ কি যে বলবে তা সে জানে না, তবে কিছু দিন ওকে না দেখলে মনছটফট করে এবং মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়ালে ওকে কোলে টেনে নিতে ইচ্ছা করে। স্বাহা লক্ষ্য করেছে যে মীনাক্ষীর গায়ে পিঠে স্নেহ ভরে হাত বুলিয়ে দেবার সময় ওর সমস্ত অন্তর এক অনির্বচনীয় পুলকের আবেগে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এটা নিছক কমরেডশিপ না তার বেশী কিছু, স্বাহা ঠিক বুঝতে পারে না।

মীনাক্ষীকে পাশে বসিয়ে তার হাত দুটি ধরে স্বাহা কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল। নিজের মনে মনেই সে ভাবল যে এই অল্প বয়সে মেয়েটা যা কাজের হয়েছে, তাতে এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা করা যায় নিশ্চয়। স্বাহা ওর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে মীনাক্ষীর কেমন অস্বস্তি বোধ হল। সে একটু সলজ্জ হাসি হেসে বলল, "কি দেখছেন দিদি?"

"দেখছি পার্টির জন্য খেটে খেটে তুমি কত রোগা হয়ে যাচ্ছ। চোখের কোণে যেন কালি পড়েছে। চেহারাটাও কেমন রুক্ষ। খুব কাজ পড়েছে না? কি খবর বল তোমাদের।"

"বড় হাঙ্গামা দিদি। সে দিন যারা যারা শোভাযাত্রীদের হয়ে এডুকেশন অফিসারের সঙ্গে দেখা করে, তাদের সকলকে জরিমানা করা হয়েছে। তবে ভাগ্য ভাল যে সুকুমারদা আমাদের সকলকে সময় মত আটকে দিয়েছিলেন। প্যাঁচে পড়েছে ছাত্র সংসদের ছেলেমেয়েগুলি। ওরাই মাতব্বরি করে এডুকেশন অফিসারের সামনে গিয়েছিল বলে এখন ফ্যাসাদে পড়েছে। জরিমানার টাকা এমাসের পনের তারিখের মধ্যে না দিলে শুনছি স্কুল থেকে সবার নাম কেটে দেওয়া হবে। ছাত্র-ছাত্রী মহলে মহা হৈ চৈ এ নিয়ে······", কিন্তু মীনাক্ষী কথাটা শেষ করতে পারল না। মাঝ পথে সে হঠাৎ বিকৃত মুখে উঠে পড়ল। তার পর মুখে হাত চাপা দিয়ে দ্রুতপদে ঘরের ভিতরের দিকের দরজা খুলে বাথরুমের গোড়ায় গিয়ে বসে পড়ল। ঘরের ভেতর থেকে স্বাহা শুনতে পেল যে মীনাক্ষী বমি করার চেষ্টা করছে।

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তার পর স্বাহাও এক দৌড়ে গিয়ে মীনাক্ষীর পাশে বসে এক হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল এবং অন্য হাতটি দিয়ে তার মাথায় চাপড় মারতে লাগল। আরও বার কয়েক ওয়াক্ ওয়াক্ করার পর বমির ভাবটা কেটে গেল।

মীনাক্ষী একটু সামলে নিতে স্বাহা ঘরের কুঁজো থেকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে তার মুখের কাছে ধরল। কুলকুচি করে মুখে চোখে জল দিয়ে মীনাক্ষী একটু সুস্থ হতে ওরা ঘরে চলে এল। পাখাটা পূর্ণবেগে চালিয়ে দিয়ে স্বাহা আবার মীনাক্ষীর পাশে বসল। তার পর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "হঠাৎ এমন হল যে? খাওয়া-দাওয়ার কোন গোলমাল হয় নি তো?"

মীনাক্ষী লজ্জিতভাবে ঈষৎ হেসে বলল, "না দিদিমণি, আজ পাঁচ-ছ দি তো একরকম কিছু খাই নি বললেই চলে। কিছু খেতে ইচ্ছেই হয় না আর—।"

স্বাহা চমকে উঠল। তার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। সে আবার প্রশ্ন করল, "আর—আর কি হয়?"

মীনাক্ষী মাথা নীচু করেছিল। স্বাহার এ ভাবান্তর তার চোখে পড়ল না। পূর্ববৎ ধীর কণ্ঠে সে বলতে লাগল, "মাঝে মাঝে মাথা ঘোরে আর শরীরটা খুব ম্যাজ ম্যাজ করে দিদি, বড় ক্লান্ত বোধ হয় সব সময়। ইচ্ছা হয় খুব ঘুমোই। অথচ জ্বর-টর কিচ্ছু নেই।"

স্বাহার দৃষ্টি প্রদীপ্ত অঙ্গারের মত জ্বলে উঠল। দাঁত দিয়ে অধর দংশন করে দুই হাত দিয়ে সে মীনাক্ষীর দুই কাঁধ ধরে এক ঝটকায় নিজের দিকে টেনে নিল। তার পর উত্তেজিত ভাবে বলল, "বাড়িতে কাউকে বলেছ? মা জানেন?"

স্বাহার এই আকস্মিক উত্তেজনা এবং হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে ঐ ভাবে তাকে টেনে নেবার অর্থ মীনাক্ষী বুঝতে পারে না। কিন্তু একটা অস্বাভাবিক কিছুর অনুমান করে সেও আতঙ্কিতা হয়। ভীতিজড়িত কণ্ঠে সে বলে, "না দিদি, কাউকে বলি নি। মা আবার তা হলে ডাক্তারবাবুকে ডাকাবেন, ওষুধ খেতে বলবেন। বাইরে বেরোতে দেবেন না……"

স্বাহার নাসারন্ধ্র উত্তেজনায় বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। মীনাক্ষী তার ভ্রূতলয়ের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের উষ্ণ স্পর্শ পায়। মীনাক্ষীকে পূর্ববৎ কঠিন হস্তে ধরে থেকে ওর চোখের দিকে নিজের জ্বলন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চাপা কণ্ঠে স্বাহা উচ্চারণ করে, "কাছে এস আরও। যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দিও ঠিক মত।"

বিমূঢ় মীনাক্ষী স্বাহার মুখের কাছে কান এগিয়ে নিয়ে যায়। এক অজ্ঞাত বিপদের সম্ভাবনায় ওর বদনমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে। স্বাহার প্রশ্ন শুনে সে ধীরে ধীরে মাথা নীচু করে এবং কয়েক মুহূর্ত মৌন থাকার পর ডাইনে বামে মস্তক আন্দোলিত করে। নেতিবাচক উত্তর।

চাপা স্বরে স্বাহা আর্তনাদ করে ওঠে, "এ কী সর্বনাশ বাধিয়েছিস রে পোড়ারমুখী? বল্, বল্ কে তোর এ সর্বনাশ করল? বল্ শিগ্‌গির।" স্বাহা উন্মত্তের মত মীনাক্ষীর দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে থাকে।

মীনাক্ষীর সমস্ত দেহ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত কেঁপে উঠে। সেই কুহকিনী রাত্রির কথা চকিতে তার মনে পড়ে যায়। পুলিসের ভয়ে সে আর অনন্ত ওয়্যার প্রডাক্টস ইউনিয়নের পাশের বাড়ির ছাদে আশ্রয় নিয়েছে। নিরন্তর উত্তেজনা সঙ্গে নিয়ে অন্ধকারে দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করার পরিশ্রমে ক্লান্ত

কম্পমান তার দেহবল্লরী অনন্তর দেহসংলগ্ন হয়ে কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে। তার পর—তার পর সেই নির্জন নিশীথের মোহিনী মায়া দুই অপরিণত-বুদ্ধি যুবক যুবতীকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করল। নিশিথাভিসারের অন্তিমলগ্নে প্রকৃতির বিজয়বার্তা ঘোষিত হল।

সেদিন রাতের সেই ঘটনা চলচ্চিত্রের চেয়েও দ্রুতগতিতে মীনাক্ষীর মানস-পটে ফুটে উঠে। তার পর তার চতুর্দিকের বিশ্ব যেন এক প্রচণ্ড দোলায় দুলতে থাকে। সব আশ্রয়, সমস্ত অবলম্বন আজ জীবন থেকে সরে যাচ্ছে। মীনাক্ষীর মনে হল যে সে যেন এক কক্ষচ্যুত উল্কার মত ভীমবেগে কোন্ মহা অজানার অভিমুখে ছুটে চলেছে। সে চীৎকার করে কাঁদতে চাইল। কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোল না। শুধু দর দর ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ল তার দুই চক্ষু দিয়ে এবং তার পর দুই হাতে স্বাহাকে জড়িয়ে ধরে ক্রন্দন-জড়িত বিকৃত স্বরে সে উচ্চারণ করল, "দিদিমণি—দিদি গো!" উবুড় হয়ে স্বাহার কোলে পড়ে সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। কান্নার আবেগে তার সমস্ত শরীর থেকে থেকে প্রকম্পিত হচ্ছে। স্বাহা শিলীভূত মূর্তির মত ওর পিঠে হাত দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখ পানে তাকিয়ে রইল।

॥ একত্রিশ ॥

এ দুটো দিন যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গেছে। তবে আশা কুহকিনীর মধুর মায়ার পরশ ছিল না এর ভিতর—ঘোর দুঃস্বপ্ন এ। এর আতঙ্ক ও ত্রাসে মীনাক্ষীর সমগ্র সত্তা যেন মুহুর্মুহু কোন্ এক ভীমকায় মুষলের আঘাতে দলিত পিষ্ট হয়েছে। জাগরণের প্রতিটি দণ্ড পল কোন্ এক জিঘাংসাকামী প্রেতাত্মার মত সহস্র বাহু মেলে তার পশ্চাদ্ধাবন করছে। নিশীথেও তার করাল কবল থেকে নিষ্কৃতি নেই। কী যেন মহামন্ত্র প্রভাবে তার চক্ষুপল্লব থেকে নিদ্রাহরণ করে বিনিদ্র রজনীর প্রতিটি অনুপল বিপলে মায়াবিনী তার বিকট দ্রংষ্ট্রা-শোভিত বদন-গহ্বরে মীনাক্ষীকে নিক্ষেপ করার জন্য তার পিছু ছুটে বেড়িয়েছে। মীনাক্ষী যে কেন মায়ের কাছে ধরা পড়ে নি, তা সে নিজেই জানে না। এখনও যে কি করে স্বাভাবিক ভাবে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, তা সে নিজেও বুঝতে পারছে না। কিন্তু আর বুঝি এই স্বাভাবিকতার মুখোশ বজায় থাকে না। এবার বুঝি তার অভিনয়, তার প্রতারণা ধরা পড়ে যাবে। দু রাত্রি ঘুম নেই, নেহাত অভিনয়ের জন্য

খাবার থালার সামনে যেটুকু বসা এবং তার পর অহোরাত্র সেই ভীষণ দুশ্চিন্তা! আর কতক্ষণ মানুষের স্নায়ু যথাযথ ভাবে কাজ করে? মানুষের করে না, বোধ হয় মেয়েমানুষ বলেই মীনাক্ষী এত দীর্ঘকাল এ ভাবে আত্ম-পীড়ন নীরবে সহ্য করেছে। প্রকৃতি সম্ভবতঃ নারীদের তার নিজের মত সহনশীলা করে সৃষ্টি করেছে।

এ দুঃখ-দুর্ভাবনার ভাগ কাউকে দেওয়া যায় না। কারও কাছে কেঁদে মনের বোঝা হাল্কা করাও চলে না। আর বার্মামাইনসের ছোট কোয়ার্টারে এমন নিভৃত স্থান নেই যেখানে সঙ্গোপনে অশ্রুমোচন করে হৃদয়ের জমাট বেদনাকে তরল করা চলে। নিদ্রাবিহীন রাত্রে উপাধানে মুখ ঢেকেও মনের চিন্তা-ভাবনার বন্যা খুলে দেওয়া চলে না। কি জানি যদি ঘরের কেউ কান্না শুনে ফেলে? নিঃশব্দ রাত্রির শব্দবহনক্ষমতা অতীব প্রবল। রাতের বেলার তুচ্ছ একটি শব্দ সহস্র গুণ হয়ে কর্ণপটাহে প্রতিধ্বনিত হয়। মীনাক্ষী তাই বিষকন্যার মত নিজের গরলের জ্বালায় নিজেই জ্বলে মরে। স্বেচ্ছায় হঠকারিতা বশে যে হলাহল সে পান করেছে, তারই রোমন্থন করে সে কেবল দণ্ডপ্রহর গুণে চলে।

ঠক্ ঠক্, ঠক্ ঠক্। কয়েক মুহূর্ত থেমে শুধু একবার ঠক্। ও টোকা স্বাহাদির দরজায় পড়ছে না, যেন মীনাক্ষীর হৃৎপিণ্ডের উপর মুষলাঘাত হচ্ছে। চমকিতা মীনাক্ষী চকিতে নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে ছোট্ট ঘরটির এক কোণে ঠেস দিয়ে গুটিসুটি হয়ে বসল। উপায় থাকলে সে বোধ হয় ঘরের দেওয়ালের মধ্যে ঢুকে যেতে চেষ্টা করত। দেওয়ালের গায়ে নিজের শরীরকে এলিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু চোখে সে কিছুই দেখছে না তখন, কেবল উৎকর্ণ হয়ে পাশের ঘরের শব্দ শোনার চেষ্টা করছে!

এই ছোট্ট ঘরটির ওদিকে স্বাহাদির কামরা। স্বাহাদি বাইরে থেকে এর দরজায় শিকল তুলে দিলেও দুই দেওয়ালের মাঝখানে এক ছোট জানালা রয়েছে। এ ঘরের বাক্স প্যাঁটরা আর হাঁড়ি-কুড়ির মধ্যে নিজের অস্তিত্ব গোপন করে ও ঘরের কথাবার্তা শোনার পথে কোন অন্তরায় নেই। এই ভাবে স্বাহাদি অনন্তর বাবা সুজয়বাবুর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা শোনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ওঃ, স্বাহাদির ঋণ মীনাক্ষী সারা জীবনেও ভুলতে পারবে না। তার জীবনের এই চরম বিপদের লগ্নে স্বাহাদির এই স্নেহাশ্রয় না থাকলে এ ব্যাপার বুঝতে পারার পর মুহূর্তেই তাকে আত্মহত্যা করতে

হত। এ পোড়ামুখ তো আর কারও কাছে দেখাবার উপায় নেই। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় অনুসন্ধান করা তো অনেক দূরের কথা।

ঐ তো স্বাহাদি ভিতর থেকে দরজার গায়ে দুটো টোকা দিলেন। হ্যাঁ— ঠিক। বাইরে থেকে আবার চারটে টোকা পড়ল। স্বাহাদি খিল খুলে দিলেন। ভারী জুতোর আওয়াজ তুলে কে এলেন? নিশ্চয় সুজয়বাবু। ওঁরই তো এ সময় আসার কথা।

কোন রকম ভূমিকা না করেই সুজয়বাবু বললেন, "দেখুন কমরেড স্বাহা, কাল আপনি যা বলেছিলেন, তা সত্যি। আমি অনন্তকে জিজ্ঞাসা করেছি।" ওঁর কণ্ঠস্বর কেমন গুরুগম্ভীর এবং হয়তো একটু বিরসও।

"তা হলে ওদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হয়।" স্বাহাদির কণ্ঠ। মীনাক্ষী আবার চমকে উঠে নিজের মুখে হাত চাপা দিল। কিন্তু নিজের হাতও যেন আর বশে নেই। সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে। কীসের আবেশে প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করছে। দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে মীনাক্ষী দু হাতে নিজের মুখ চেপে ধরে তার দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক করার প্রয়াস করতে লাগল।

"কি যে বলেন! তা কি করে হয়? অনন্তর সমস্ত কেরিয়ার পড়ে রয়েছে। এই বয়সে সংসারী হওয়া চলে? আপনার মত একজন প্রগতি-শীলা কমরেড কি ভেবে এ রকম প্রস্তাব করেন বুঝতে পারলাম না।"

"তা হলে—তা হলে উপায় কি? মীনার কি হবে?" বিচলিত কণ্ঠে স্বাহা প্রশ্ন করে।

সুজয়বাবু পূর্ববৎ গম্ভীর স্বরে বলেন, "দেখুন কমরেড, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। চলতে চলতে হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেলে ঐ ধরাশায়ী অবস্থাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে তাই রাজী হতে পারি না। একটা দুর্ঘটনা হয়েছে তো কি হয়েছে? খরচ-খরচার ভার আমার। অনেক ডাক্তারই উপযুক্ত ফি পেলে এ সমস্যার সমাধান করে দেবে। এবং আশা করি এ প্রস্তাবে আপনার মত এক জন এনলাইটেনড কমরেড মরালিস্টদের মত অবৈজ্ঞানিক আপত্তি তুলবেন না।"

স্বাহা চুপ করে রইল। কিছুক্ষণের জন্য ঘরের ভিতর নীরবতার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। সুজয়বাবুই আবার মৌনতা ভঙ্গ করে বললেন, "মাপ করবেন কমরেড। আপনি এ ব্যাপারে এখনও সেন্টিমেন্টের উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি

বলে আশঙ্কা হচ্ছে। আমাদের মত সোশাল রিভলিউশনারীরা তো কাজকর্ম বাদ দিয়ে পার্টি অফিসটাকে একটা মেট্রিমোনিয়াল ব্যুরোতে পরিণত করতে পারে না। একটু অবজেক্টিভ দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে দেখুন। তা হলেই সব সহজ হয়ে যাবে।”

“সাবজেক্টিভ মনোভাব বা মরালিস্ট দৃষ্টিকোণের কথা নয় সুজয়বাবু। আমি ভাবছি মীনার কথা। আপনার প্রস্তাবের পরিণাম ওর ভবিষ্যৎ জীবনের উপর কি হবে? কমিউনিস্ট হলেও আমি মেয়েমানুষ একথা ভুলবেন না। মেয়েদের বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে আমাকে তাই মেয়েদের দৃষ্টিকোণ থেকেও ভাবতে হয়।” শেষের কথাগুলি স্বাহা কাটা কাটা ক্ষুব্ধ স্বরে উচ্চারণ করে। তার পর কয়েক মুহূর্ত বিশ্রাম নিয়ে বলে, “সে যাই হক, অনন্ত কি বলে এ সম্বন্ধে? তার সঙ্গেও আমি কথা বলতে চাই।”

“অনন্ত? ওর আবার এ ব্যাপারে বলার কি থাকতে পারে? আর তা ছাড়া সে তো জামসেদপুরে নেই। কাল রাত্রে সে ওর মামার সঙ্গে পুণা চলে গেছে। ঐখানেই পড়াশুনা করবে এবার। ওর কেরিয়ারের কথা চিন্তা করে এই ব্যবস্থা করতে হল। আর ঘটনাক্রমে আমার ছোট শালাও ওখান থেকে এসেছিল এবং তারও কালকে ফিরে যাবার কথা ছিল। সুতরাং তার সঙ্গে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি।” অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ভাবে অনন্তর খবর ব্যক্ত করেন সুজয়বাবু।

মীনাক্ষীর দেহে মনে আর শক্তি নেই। ওর শেষ ভরসাও লুপ্ত হয়ে গেছে। ছোট্ট ঘরের অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়ে ওকে গ্রাস করার জন্য চতুর্দিক থেকে ছুটে আসে। দেহের স্নায়ুতে স্নায়ুতে মস্তিষ্কের কোষে কোষে তড়িৎগতিতে হিমপ্রবাহ ছুটে চলে। ওর শিথিল অবশ দেহ মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে। মীনাক্ষীর সকল চেতনা এবং সংজ্ঞার শেষ বিন্দুটুকুও বুঝি লুপ্ত হয়ে গেছে। মনে প্রাণে সে প্রার্থনা করে যে আর যেন তার চেতনা না ফেরে। কিন্তু কার কাছেই বা সে প্রার্থনা করবে। ভগবান? —ও নাম তো বহুদিন সে উচ্চারণ করে নি। স্বাহাদি যুক্তি তর্ক দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে ভগবান বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। ওটা গরীব শোষণ করার জন্য বড়লোকদের এক অতি পুরাতন সৃষ্টি—জনগণকে ঐ আফিঙ-এর নেশায় বুঁদ রেখে তাদের বিপ্লবী শক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার বুর্জোয়া ফন্দি।

"ও, তা হলে তো আপনি সব ব্যবস্থাই করে ফেলেছেন।" স্বাহার কণ্ঠের তিক্ততা গোপন থাকে না।

তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে সুজয়বাবু তেমনি লঘু ভাবে উত্তর দেন, "সেন্টিমেণ্টাল হবেন না কমরেড। পার্টি লাইনে চিন্তা করলে সহজেই বুঝতে পারবেন যে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হতে পারত না। আর সত্যি কথা বলতে কি পার্টির সিদ্ধান্তও এই। পার্টির মত নিয়েই আমি এ ব্যবস্থা করেছি। যাই হক, এখন মেয়েটিকে তিন-চার দিনের জন্য নিয়ে আসুন। ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েই আছে। ওঁর ক্লিনিকে ঐ কটা দিন ওকে থাকতে হবে। আর তার পর অ্যাজ ক্রেশ এস এভার। ওকে নিয়ে এসে বুঝিয়ে পড়িয়ে ক্লিনিকে থাকতে রাজী করানর ভার পার্টির তরফ থেকে আপনার উপর পড়েছে।"

॥ বত্রিশ ॥

চিঠিটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে মীনাক্ষী চিত্রার্পিতের মত বসেছিল। বাবা এখন বাড়ি নেই—দুটো পর্যন্ত ডিউটি তাঁর। মা রান্না-ঘরে ব্যস্ত। থেকে থেকে রান্না-ঘর থেকে হাতা খুন্তি নাড়ার শব্দ ভেসে আসছে। ছোট ভাইটি বোধ হয় কোথাও খেলতে গেছে। মাঝের ভাই-বোনেরা এই একটু আগে হুড়মুড় করে স্নান খাওয়া শেষ করে স্কুলে গেল। বেলা দশটা থেকেই বার্মা মাইনসের এই বীণা রোড়ের দিকে কেমন একটা ক্লান্ত আলস্য আর শৈথিল্যের ছাপ পড়েছে। সূর্যও বুঝি এ পাড়ায় এখন প্রাতঃকালের গতিবেগ সম্বরণ করে বিলম্বিত মন্থর লয়ে নিজের পরিক্রমার পথে কোন মতে গড়িয়ে চলেছে।

কতক্ষণ এক ভাবে কেটে গেল কে জানে? আর সেই ঘণ্টা-খানেক পূর্বে পোস্টম্যান আসার পর থেকে কতবার যে মীনাক্ষী চিঠিটা পড়েছে, তা সে নিজেও বলতে পারবে না। জানালা থেকে উদাস দৃষ্টি সরিয়ে এনে আবার নিজের করমুষ্টির দিকে চক্ষু নিবদ্ধ করল মীনাক্ষী। দলা পাকান ছোট্ট চিঠির কাগজটিকে খুলে আর একবার চোখের সামনে মেলে ধরল। অনন্তর চিঠি। খাম খুলে অধীর আগ্রহে প্রথমবার পড়া মাত্রই মীনাক্ষীর সব উত্তাপ, সকল উত্তেজনা জুড়িয়ে গেছে। মাঝে মাঝে যন্ত্রবৎ হস্তধৃত এই কাগজের টুকরাটির উপর চোখ বোলালেও চিঠিটির প্রতি আর কোন

আগ্রহ নেই মীনাক্ষীর। কারণ যে সংবেদনা, যে আশা ও ভরসার বাণীর অপেক্ষায় সে প্রথমবার রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চিঠিটি পড়েছিল, সেই প্রাণস্পর্শ কোথাও খুঁজে পায় নি মীনাক্ষী। অনন্তের এ পত্রে জীবনের উত্তাপ নেই, আছে মর্মান্তিক মৃত্যুর হিমশীতল ইঙ্গিত।

আবার চিঠিটি পড়তে লাগল মীনাক্ষী। অনন্ত লিখেছে:

মীনা,

আমি খবর পেয়েছি। কিন্তু কোন কিছু করার আগে বাবা জোর করে আমাকে ছোট মামার সঙ্গে পুণা পাঠিয়ে দিলেন। বিলাসপুর স্টেশন থেকে এই চিঠি লিখছি। বেশি সময় নেই। বোম্বে মেল কয়েক মিনিট পর ছেড়ে দেবে।

আমি বিয়েতে রাজী হতাম; কিন্তু আমার কথা কে-ই বা শোনে? বাবা মাকে বললেন নর্দান টাউনে বার্মা মাইনসের মেয়ে বউ হয়ে আসে না। ডেলি রেটের লোককে বেয়াই বলতে তিনি পারবেন না—ওতে পোজিশান থাকে না। ফোরম্যান হলেও না হয় কথা ছিল। তা ছাড়া বাবার বহুদিনের ইচ্ছা আমাকে বিলাতে পাঠান। এখনই ঘর-গৃহস্থালির মধ্যে জড়িয়ে পড়লে বিলাত যাব কি করে? আর ভাল কেরিয়ার তৈরী করা তো তুমিও সমর্থন করবে।

আমি তো তাই কোন উপায় দেখছি না আর। আবার যে কবে দেখা হবে, তা-ও জানি না। তাই বাবার কথায় রাজী হয়ে যাও। জানই তো জীবন সম্বন্ধে কোন স্পিরিচুয়াল বা মরাল সেন্টিমেন্টের প্রয়োজন নেই। প্রাণ হচ্ছে ম্যাটারের বিশেষ একটা রূপ, প্রোটিন ম্যাটারের। কারখানা তৈরীর জন্য ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় উড়িয়ে দেবার ভিতর যেমন কোন মরালিটি বা ইম্‌মরালিটির প্রশ্ন উঠতে পারে না, এ ক্ষেত্রেও তাই। আশা করি তুমি সত্যকার কমরেডের মত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় দেবে।

পুণা যাচ্ছি বটে; কিন্তু তোমার জন্য কী যে দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে যাচ্ছি, তা আমিই জানি। ওখানে গিয়ে ঠিকানা দেব। ভাল হবার খবর দিও। আর দেরি করব না, তা হলে মামা হয়তো খুঁজতে আসবেন। ভালবাসা। ইতি।—

মীনাক্ষীর বক্ষ ভেদ করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। চোখে জ্বালা; কিন্তু বাষ্পের চিহ্ন নেই তাতে। মনের আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপে

সেখান থেকে জলের শেষ বিন্দুটুকু অন্তর্হিত হয়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে মীনাক্ষী আপন মনে উচ্চারণ করল, "শেষ শেষ—সব শেষ।" তার পর উন্মাদের মত প্রমত্ত আক্রোশে হাতের চিঠিটিকে শত খণ্ডে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে গলিয়ে বাইরে ফেলে দিল।

হাত খালি হতেই আবার মীনাক্ষী শান্ত হয়ে গেল। জানালার গরাদ দুই হাতে ধরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মুখে বিদ্রূপের বক্র হাসি ফুটে উঠল। ফুঃ—সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ পার্টি লাইন—সব বাজে কথা। ছলনা। আসল কথা হচ্ছে পোজিশন—বিত্ত কৌলিন্য। এর কাছে আর সব তুচ্ছ, আর সবই গৌণ, ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদাভেদ নব কলেবর ধারণ করেছে মাত্র। অথচ এই সহজ কথাটা স্বীকার করার সৎ সাহস নেই বলে তাকে একটা আদর্শবাদের পোশাকে আবরিত করে জনসমাজে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা! নর্দান টাউনের মত অভিজাত পল্লীতে বার্মা মাইনসের মজুরী করে দিনাতিপাতকারী শ্রমিকের মেয়েকে বউ করা যায় না। সেই নগ্ন সত্যটা বুঝতে মীনাক্ষীর এত দিন লাগল! মীনাক্ষীর মনে হল যে আরও অনেক আগেই তার উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে মুখে কৃষক মজদুরদের জন্য সহানুভূতির বান ডাকলেও নিজেদের জীবনযাত্রায় যারা তাদের ধারে কাছে যাবার সজ্ঞান প্রচেষ্টা করে না, তাদের ঐ মৌখিক ঘোষণার বাস্তব মূল্য কানাকড়িও নয়। ওরা আত্মপ্রতারণার সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও প্রতারিত করছে।

মীনাক্ষীর মনে পড়ে গেল যে ওদের স্টাডি সার্কেলে এক দিন এই নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। আলোচনার সমাপ্তি প্রসঙ্গে স্বাহাদি বলেছিলেন যে কমিউনিস্টরা গান্ধীবাদীদের মত দরিদ্রনারায়ণ দরিদ্রনারায়ণ বলে কান্নাকাটি করে দারিদ্র্যের পূজা করতে চায় না। তারা দারিদ্র্যকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে; কারণ তারা সমৃদ্ধির উপাসক। সুতরাং রিভলিউশনারী ব্যক্তিগত কৃচ্ছ্রতার কথা চিন্তা না করে প্রথমে সমাজবাদ স্থাপনা করার চেষ্টা করে। কারণ সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে সমৃদ্ধি আসবে এবং তখন দারিদ্র্য আপনিই দূর হয়ে যাবে। তাদের মহলে সারল্য ও অনাড়ম্বরতা তাই উপহাসের জিনিস। আজ মীনাক্ষী বুঝতে পারছে যে কি মিথ্যা ভগবানের উপাসনা এত দিন তারা করে এসেছে। কৃষক-শ্রমিকদের রাজত্ব যারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা স্বয়ং যদি প্রথমে তাদের সঙ্গে একাত্ম না হয়, তা হলে কোন দিনই সত্যকার কৃষক মজদুর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না। দই-এর সাজাতেই যদি ভেজাল

থাকে, তা হলে দই ভাল করে জমবে কি ভাবে? যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়ান হবে, তারই মধ্যে ভূত থাকলে ভূত ছাড়ানর তো কোন উপায় থাকে না।

কিন্তু মীনাক্ষীর এখন সুজয়বাবুর উপর কোন আক্রোশ নেই। নেহাত অবস্থার দাস উনি—নিজের পারিপার্শ্বিকতার দুর্ভাগ্যজনক শিকার। আজকের উচ্চ বা নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে আগত সমাজবিপ্লবীরা যদি ভাবে যে বিপ্লব সংগঠিত হবার পর তারা বিপ্লবোত্তর মূল্যবোধ অনুসারে জীবন পরিবর্তন করবে, এখন কেবল সমাজপরিবর্তনই এক মাত্র কর্মসূচী, তা হলে তার মত ভুল বোধ হয় আর নেই। আত্মরক্ষার তাগিদ বিপ্লবের অবসানে তাকে অনভ্যস্ত জীবন গ্রহণ করতে দেবে না এবং তার চেয়েও বড় কথা এই যে এই আত্মরক্ষার তাগিদ তাকে দিয়েই বিপ্লবকে লক্ষ্যচ্যুত করাবে। নিজের জৈব অস্তিত্ব রক্ষার তাড়নায় এই সব পরিবর্তনের আবাহনকারীরা প্রত্যুত সত্যকার পরিবর্তন এড়িয়ে চলবে। সমাজপরিবর্তনকামী প্রথমে নিজের জীবন পরিবর্তন না করলে এই স্ববিরোধ দেখা দিতে বাধ্য এবং সুজয়বাবু এর দুর্ভাগ্যজনক শিকার।

আর অনন্তর বিরুদ্ধেও তার কোন অভিযোগ নেই। সেও নিজের অস্তিত্ব বাঁচানর জন্য পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে। যাক্, মীনাক্ষী নিজেই নিজের কথা চিন্তা করবে। কারণ তার নিজের অস্তিত্বও এখন অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। এখনও যে সে কি করে মাথা ঠিক রেখে চিন্তা করতে পারছে, কি ভাবে যে সে এই কয় দিন চতুর অভিনয় করে মায়ের চোখ এড়িয়ে চলেছে, তা ভাবতে গিয়ে সে আশ্চর্য হল। মানুষ কত সইতে পারে! আর এই কয় দিনে তার বয়সও যেন দশ বছর বেড়ে গেছে, বুদ্ধিও কত পরিপক্ক হয়েছে। প্রত্যক্ষ জীবনসংঘর্ষের সম্মুখীন না হলে, বিপদের মুখে না পড়লে মানুষের বুদ্ধি খোলে না। ক দিন আগেও কি সে এত সব কথা এমন তলিয়ে ভাবতে পারত? পারলে তো আর আজকের সমস্যার সৃষ্টিই হত না।

পথ একটা বার করতে হবে। কিন্তু কি পথ? সুজয়বাবু চলে যাবার পর স্বাহাদিও সেদিন বললেন যে এ ছাড়া আর কোন পথ নেই, অন্ততঃ বর্তমান অবস্থায় তিনি আর কোন বিকল্প দেখতে পাচ্ছেন না। এবং স্বাহাদি আশা দিতে না পারলে আর কার কাছে ভরসা? মাকে বলা? উঃ, সে কথা কল্পনা করতেও মীনাক্ষীর সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগে। কি করে

বলবে মাকে? কি করে দাঁড়াবে মা বাবা এবং ভাই-বোনেদের কাছে এই কালিমালিপ্ত মুখ নিয়ে? তার পর সবাই জানবে—আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী এবং বান্ধবীরা। সকলের ভর্ৎসনা মাখা ঘৃণাদৃষ্টি মীনাক্ষী তার কল্পনা নেত্রে স্পষ্ট দেখতে পায়। সকলের শাসানির তর্জনী তারই দিকে হেলে রয়েছে। না-না-না, কিছুতেই ঐ অবস্থার সম্মুখীন হওয়া যাবে না। আর তা ছাড়া তাতেও তো সমস্যার সমাধান হবে না। প্রতি মুহূর্তে তার দেহের ভিতর যে নবীন ভ্রূণটি তিলে তিলে অঙ্কুরিত হচ্ছে, তার কি হবে? পরিচিত সমাজ তো তাকে স্থান দেবে না। তবে? তবে কি শেষ পর্যন্ত সুজয়বাবুরই শরণাপন্ন হতে হবে? কিন্তু ভীষণ একটা সর্বগ্রাসী ভয় জড়িয়ে রয়েছে যে ঐ প্রস্তাবের সর্বাঙ্গে। বড় কুৎসিত বড় ঘৃণ্য···

"মীনা, ও মীনা।" মীনাক্ষীর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। মা ডাকছেন। জানালা থেকে কয়েক পা সরে রান্না-ঘরের দিকে একটু এগিয়ে মীনাক্ষী মৃদু কণ্ঠে সাড়া দিল, "কি মা?" মা বললেন, "আর কত দেরি করবি মা? যা না তাড়াতাড়ি স্নান করে আয়। গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নে। ক দিন হল কি যে তোর খাওয়ার ছিরি হয়েছে!"

মীনাক্ষী চমকে উঠল। মায়ের চোখে ধুলো দেওয়া কী কঠিন ব্যাপার। আরও কিছু বুঝতে পারেন নি তো মা? সর্বনাশ তা হলে। মাকে বেশী ঘাঁটান উচিত হবে না ভেবে মীনাক্ষী আর বাক্যব্যয় না করে শাড়ি ব্লাউজ কাঁধে ফেলে স্নানের ঘরে ঢুকল।

বালতিতে ঝর ঝর ধারায় জল পড়ছে। কিন্তু উপচে ওঠা বালতির দিকে মীনাক্ষীর নজর নেই। গায়ে জল ঢালার কথাও সে ভুলে গেছে। মীনাক্ষী আবার চিন্তার জাল বুনে চলেছে। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য মা ডাকাডাকি করবেন না, এই অবসর। অনন্তর চিঠির শেষের দিকের কথাগুলি আবার তার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। প্রাণ বা জীবন জড় পদার্থেরই এক বিশিষ্ট অবস্থার বিশেষ প্রকারের অভিব্যক্তি। চৈতন্যের ভিতর জড়বস্তু থেকে ভিন্নতর, উচ্চতর কোন সত্তা বা সত্য নেই। কথাটা কি ঠিক? তা হলে তার প্রতি মায়ের এত স্নেহ এল কোথা থেকে? আর এই স্নেহের স্পর্শ পেয়ে তার এবং তার মত আর সকল সন্তানের মন তৃপ্তিতে ভরে ওঠে কেন? একি অভ্যাস, শুধু সংস্কার? কনডিশানড রিফ্লেক্স দিয়ে কি এর ব্যাখ্যা করা যায়? আচ্ছা আমিও যদি জড়বস্তু ছাড়া আর কিছু না হই,

তা হলে শোক দুঃখ আনন্দ ইত্যাদি বিভিন্ন আবেগের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হয় কেন একই শরীরে ?

হঠাৎ মীনাক্ষীর মাথায় এক খেয়াল চাপল। প্রাণ যদি জড়পদার্থ ছাড়া অপর কিছু না-ই হয়, তবে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য এত দুশ্চিন্তা কেন ? বিশেষতঃ তার মত কলঙ্কিনীর—যে সকলের পরিত্যক্ত, সর্বত্র অনাদৃত ও অবাঞ্ছিত। ভালই হবে যদি এখনই এই অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। দুই হাত মীনাক্ষী নিজের গলার উপর রাখল। তার পর দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে দশ আঙ্গুলে নিজের কণ্ঠনালী চেপে ধরল। এক—দুই—তিন—চার। প্রবল নিষ্পেষণে শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম। অস্ফুট আর্তনাদ করে সে বালতির পাশে বসে পড়ল। বাতাস—বাতাস—বুক ভরে খোলা বাতাস চাই। জীবনের তাগিদে গলার উপর থেকে হাত সরে গেছে। প্রাণবায়ুর অভাবে বুকের উপর উভয় করপল্লব চেপে সামনের দিকে ঝুঁকে টেনে টেনে শ্বাস নিতে লাগল মীনাক্ষী। উঃ কী কষ্ট। প্রাণকে দেহের সম্বন্ধচ্যুত করা কী ভীষণ কষ্টজনক ব্যাপার। হেরে গেল মীনাক্ষী, পারল না। প্রাণকে পরাভূত করা সম্ভব হল না তার পক্ষে। জলের কলটি ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল সে।

ব্রাকেটের উপর রাখা আয়নাটায় হঠাৎ চোখ পড়তে ভূত দেখার মত চমকে উঠল মীনাক্ষী। আয়নাতে ও কার ছায়া ? ঐ মেয়েটি মীনাক্ষী নিজে, না তার প্রেতাত্মা ? কয়েক সেকেণ্ড বাতাসের অভাবে মুখের কী বিকৃত অবস্থা ! প্রাণকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে যাবার যৎসামান্য প্রয়াসেই সমগ্র দেহে কী ভীষণ ক্লেশ ও যন্ত্রণার ছাপ পড়েছে। তা হলে—তা হলে প্রাণের যে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গটি তাকে আশ্রয় করে প্রদীপ্ত হতে চাইছে, সুজয়বাবুর শরণ নিলে তাকেও তো ঐ অবর্ণনীয় মৃত্যুযন্ত্রণার মুখে ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে। মৃত্যুর সামান্য প্রচেষ্টাতেই যদি মীনাক্ষীর এত যন্ত্রণা হয়ে থাকে, তা হলে প্রত্যক্ষ মৃত্যু তো আরও কত শত সহস্রগুণ যন্ত্রণাময়। নিজের সত্তার একটা অসহায় মূক অঙ্গকে কি করে মীনাক্ষী ঐ অবস্থার সম্মুখীন হতে দেবে ? ক্ষুদ্র ও ভাষাবিহীন বলে কি তার বেদনাবোধ নেই ? আমাদের বোধগম্য ভাষায় সে নিজের কাতর আর্তি, জীবনের আকুল আকুতি নিবেদন করতে পারে না বলে ঐ দুঃখ কষ্ট হয় না—এ কথা তো বলা যায় না। তবে—তবে কি করে সুজয়বাবুর শরণ নেওয়া যায় ? মীনাক্ষী বুঝতে পেরেছে যে, যে কোন প্রাণই তার নিজের প্রাণের মত মূল্যবান। তার নিজের মতই কষ্ট বেদনা

দুঃখ যন্ত্রণা এবং সুখানুভূতি আছে ক্ষুদ্রাদিক্ষুদ্র প্রাণকণিকার ভিতর এবং সেই জন্য প্রাণ কেবল অহননীয় নয়, সর্ববিধ প্রচেষ্টায় তা সংরক্ষণীয়ও বটে।

কিন্তু নাঃ, আর দেরি নয়। আরও ভাবতে হবে, আরও চিন্তা করতে হবে। কৃতকর্মের দায়িত্ব তাকে নিতেই হবে। ভীরুর মত অন্যায় পথ নিয়ে গা বাঁচাবার প্রয়াস সে করবে না। মাথায় গায়ে জল ঢালতে ঢালতে আপন মনে বিড় বিড় করে কথা বলতে লাগল মীনাক্ষী।

ঘরের সামনের বাগানে ভিজে কাপড় শুকোতে দিতে গিয়ে মীনাক্ষী থমকে দাঁড়াল। প্রতিবেশী জামাল মিঞার বাগানে এক অদ্ভুত দৃশ্যের অভিনয় চলেছে। জীবন-মৃত্যুর এক রোমহর্ষক সংগ্রাম। আর সে সংগ্রাম সমানে সমানে নয়, দুর্বলে ও সবলে। উপর থেকে সাক্ষাৎ শমন চিলকে ছোঁ মারতে দেখেই মা মুর্গীটা প্রাণপণে চীৎকার করে উঠল—কঁক্ কঁক্ কঁক্, কঁক্ কঁক্ কঁকর কোঁ—হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হো! আট-দশটি তুলোর পুঁটলির মত বাচ্চা যে যেখানে ছিল চিঁয়াক্ চিঁয়াক্ করতে করতে ছুটে এসে মায়ের বুকের তলে আশ্রয় নিল।

চিলটা কিন্তু বার বার ছোঁ মারছে—অন্ততঃ একটা বাচ্চাকে না নিয়ে ছাড়বে না। মা মুর্গীটা তার কর্তব্যে অটল। সন্তানকে সে তার প্রাণ যাবার পূর্বে ছেড়ে দেবে না। সমস্ত শরীরকে ফুলিয়ে দুই ডানা মেলে সে তার বাচ্চাদের আশ্রয় দিয়েছে। চিলের নখর ও চঞ্চুর প্রতিটি আঘাত নিজের দেহে বরণ করে নিয়ে সে তার স্নেহপুত্তলীদের অক্ষত রাখছে। মায়ের স্নেহ স্বেচ্ছায় নিজেকে চরম বিপদ, আঘাত ও বেদনার সম্মুখীন করে তার আত্মজদের মৃত্যুর প্রতিরোধ করছে।

কঁক্ কঁক্ কঁক্—ঐ ভাবে ডানা মেলে পালক ফুলিয়ে চিলের আঘাত সহ্য করতে করতে মা মুর্গীটি পায়ে পায়ে সতর্ক ভাবে এগিয়ে ঐ যে ঐ লেবু গাছের তলায় আশ্রয় নিল। কঁক্ কঁক্ কঁকর কোঁ—স্বস্তির ডাক ছাড়ল মুর্গীটি। ঐ তো প্রত্যক্ষ যম চিলটি আশাহত হয়ে উড়ে যাচ্ছে। রৌদ্রদগ্ধ আকাশে ওর হতাশ কণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছে। মুর্গীটি সমান ভাবে গলা ফুলিয়ে চীৎকার করছে—কঁক্ কঁক্ কঁকর কোঁ, কঁক্ কঁক্ ককঁর কোঁ। আর বাচ্চা কটি তখনও মায়ের দেহের মধ্যে সর্বশরীর গোপন করে কেবল ছোট্ট মাথাগুলি বার করে বিস্মিতভাবে এ দিক ও দিকে ঘাড় নাড়তে নাড়তে নবলব্ধ অভিজ্ঞতা পরিপাক করার চেষ্টা করছে।

কোন মতে খাওয়ার পাট চুকিয়ে খাটে শরীর এলিয়ে দিয়ে মীনাক্ষী তার চিন্তাপ্রবাহের মুখ অর্গলমুক্ত করে দিল। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তার জীবনে। এক অভিনব শিক্ষা লাভ করল সে আজ। তার নিজের এবং তার ভাই বোনেদের সঙ্গে মায়ের প্রতিটি আচরণ, তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথাবার্তা আলাপ আলোচনা নবরূপে তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এক নূতন সত্য আবিষ্কারের উত্তেজনা ও আনন্দে মীনাক্ষীর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থর থর করে শিহরিত হতে লাগল।

মায়ের ভিতর সেই দুর্বার শক্তি রয়েছে যা নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সন্তানের মঙ্গলকে পরমারাধ্য মনে করে। আর—আর সে নিজেও তো মা হতে চলেছে। তিলে তিলে মীনাক্ষীর আত্মজ তার দেহের মধ্যে বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে এই মাতৃ-শক্তিও তো বিকশিত হচ্ছে তার মধ্যে। হোক তার মাতৃত্ব অসামাজিক, তবু প্রকৃতি যখন তাকে পুরস্কৃত করতে মনস্থ করেছে, কিছুতেই মীনাক্ষী সে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করবে না। যার সঙ্গে খাদকের সম্পর্ক, তার রোষ-বহ্নির সম্মুখীন হয়ে যদি মা সন্তানকে রক্ষা করতে পারে, তবে সমাজ যতই করুণাবিহীন হক না কেন, মীনাক্ষী সংগ্রাম করবে। শত হোক মানুষে মানুষে তো খাদ্য খাদকের সম্পর্ক নয়। নিজের উপর সকল দুঃখ কষ্ট হৃষ্টচিত্তে বরণ করে নিয়ে সে লোকসমাজের মানস পরিবর্তন করার প্রয়াস করবে। কতটা সফল সে হবে, তা কে জানে; কিন্তু তার সংগ্রাম শেষ অবধি বিফল হলেও সন্তানকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেবার পরাজিত মনোভাবের তুলনায় অনেক বেশী মহীয়ান এবং নিঃসন্দেহে মনুষ্যোচিত।

হয়তো এই পরিচিত পরিবেশে তার প্রাথমিক প্রয়াস অধিকতর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে পারে। আর তা ছাড়া পরিচিত সমাজের মধ্যে থেকে বাবা-মাকেই বা কেন সে নিজের কর্মফলের বোঝায় বিব্রত করবে? এ পর্যন্ত তো তাঁদের কাছ থেকে কেবল পেয়েই এসেছে। প্রতিদানে সে কি আরও ভারগ্রস্ত করবে তাঁদের? তাই সে বাড়ি থেকে চলে যাবে, বিদায় নেবে পরিচিত পরিবেশের কাছ থেকে। নূতন মানুষের পরিবেশ, যেখানে পূর্ব সংস্কার এমন প্রবল বাধা স্বরূপ তার পথ আটকাবে না, তা হয়তো তার অনুকূল হবে। মীনাক্ষীর দেহ সবল ও সক্ষম, মেধা ও বুদ্ধি অসাধারণ না হলেও তুচ্ছ নয়—অন্ততঃ গড়পড়তা তো বটেই। তবে কিসের ভয়? যত যাই হোক না কেন, কৃতকর্মের দায়িত্ব সে নেবার চেষ্টা

করবে। সুজয়বাবুর সর্বনাশা আশ্রয় তার চাই না, স্বাহাদির স্নেহ পরম প্রিয় হলেও তাঁর পরামর্শ সে মানতে পারবে না। মীনাক্ষী নিজের পথ খুঁজে পেয়েছে। আর তার ভয় নেই। এই বিরাট বিশ্বে আপন শক্তিতে নিজের স্থান খুঁজে নেবার জন্য আজ এই মুহূর্তে তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

উত্তেজনায় সে খাট থেকে নেমে পড়ল। মা স্নান করতে গেছেন—এই তো সু-অবসর। জমান আট-দশটা টাকা তার নিজের কাছেই আছে। আর দুই একটা কাপড়-চোপড় নিতে হবে। তার পর মা স্নান সেরে বেরোবার পূর্বেই রওনা হতে হবে। ট্রেনে যাওয়া চলবে না। হয়তো তার পূর্বেই খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হবে। সাকচীর বাস স্ট্যাণ্ড থেকে মফঃস্বলগামী কোন বাসে চড়ে বাইরের কোন স্টেশন থেকে সে নিজের অনির্দিষ্ট যাত্রার আরম্ভ করবে। আর দেরি নয়। সময় নেই মোটেই।

॥ তেত্রিশ ॥

কোথায় যেন একটা তার কেটে গেছে। কৌশিকবাবুর জীবন-বীণার তার। নচেৎ যে সুরের আকর্ষণে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত চট্টগ্রাম থেকে আন্দামান ও কলকাতা হয়ে ধলভূমের এই আরণ্য রাজ্যে উপনীত হলেন, চেতনাকে অভিভূত করা মোহিনী বাঁশরীর সেই সুর আর কেন তেমন করে কৌশিকবাবুর হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণন জাগাতে পারছে না? বার বার সংশয় ও সন্দেহের কাঁটা কেন তাঁর বিশ্বাসকে বিদ্ধ করছে? ঊষার আবছা আলোকে পথ চলতে চলতে কৌশিকবাবুর মনে প্রশ্ন জাগল। অকস্মাৎ বহু দিনের বিস্মৃতি-সাগর পার হয়ে একটি ঘটনার কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। রসিদ আলী দিবসের কয়েক দিন পূর্বেকার ঘটনা।

কৌশিকবাবু তখন পার্টির তরফ থেকে ছাত্র ফ্রণ্টের কাজ দেখাশুনা করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি দাবি নিয়ে যে আন্দোলন চলছে তার নেতৃত্ব নিজেদের হাতে নেবার জন্য তাঁরা তখন প্রাণপণে লড়ছেন। তাই একরকম নিত্যই তাঁকে সন্ধ্যাবেলায় ছাত্র ফেডারেশনের দপ্তরে বসতে হত। একদিন সন্ধ্যায় জনতিনেক ছাত্র উত্তেজিতভাবে তাঁর কাছে হাজির হল। হাতে তাদের কাগজের একটি বাণ্ডিল। কৌশিকবাবু ওদের চেনেন। একজন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের উৎসাহী কর্মী মণীশ। ওকে কেন্দ্র করে তাঁরা ঐ কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের পরবর্তী নির্বাচনযুদ্ধে জয়ী

হওয়া সম্বন্ধে এক রকম নিঃসন্দেহ। অপর দুই জন বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী এবং বলাই বাহুল্য ফেডারেশনের প্রবল সমর্থক।

হাতের কাগজের বাণ্ডিলটা খুলে তাঁর সামনে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে মণীশ প্রশ্ন করল, "এ কথা কি সত্যি কৌশিকদা—আমাদের পার্টি নাকি নেতাজীকে কুইসলিং বলেছিল ক বছর আগে? আর নেতাজীর এই সব ছবি বেরিয়েছিল আমাদের কাগজে? মির্জাপুর স্ট্রীটের ওরা মানে ছাত্র কংগ্রেসের ছেলেরা এই সব পোস্টার লাগিয়েছে চতুর্দিকে। এক্ষুণি এর জবাব না দিলে ছাত্র-মহলে আমরা ভীষণ অপ্রিয় হয়ে যাব।"

কৌশিকবাবু টেবিলের উপর মেলে ধরা পোস্টারগুলির দিকে তাকালেন। তাঁদের পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্রের কয়েকটি পৃষ্ঠার ব্লক করে ছাপা হয়েছে। ১৯শে জুলাই ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের পত্রিকার "দি বোস ওয়ে" হেডিং-এর নীচে একটি গাধার পৃষ্ঠোপরি উপবিষ্ট একজন জাপানী সমরনায়কের ছবি। গাধার মুখটি সুভাষচন্দ্রের। ১৩ই সেপ্টেম্বরের পত্রিকার ছবিতে সুভাষচন্দ্রকে একটি মাইক্রোফনের সম্মুখস্থ বিড়াল রূপে দেখান হয়েছে এবং তাঁর কান ধরে রয়েছে জার্মান প্রচারবিদ গোয়েবলস। হিটলার মুসোলিনী মুচকি হাসি হাসছে। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা আগস্ট, ৮ই আগস্ট, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২১শে নভেম্বর, ১৯শে ডিসেম্বর এবং আরও অনেক দিনের পত্রিকাতে সুভাষচন্দ্রকে ব্যঙ্গ করে, তিনি যে জার্মাণ ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের চর—এই কথা প্রমাণ করে যে সব কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল; তার প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে পার্টি পত্রিকার ঐ সময়কার রচনাবলীর উদ্ধরণ!

উত্তেজিত মণীশের কণ্ঠস্বর তখন বিষণ্ণতায় ভরে এসেছে। সে বলে চলেছে, "এই সব স্ল্যানডারের প্রতিবাদ না করলে এ আন্দোলনে ফেডারেশন কোণঠাসা হয়ে যাবেই কৌশিকদা। নেতাজী আর আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে এই সব কুৎসা পড়তে আমারই যে খারাপ লাগছে। বলুন, এসব মিথ্যা নিশ্চয়!"

কৌশিকবাবু ওর কথা শুনে মনে মনে হেসেছিলেন। রোমান্টিক সেন্টিমেণ্টালিজমের নমুনা! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে ভয়ও হয়েছিল। সেদিনকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কয়েক বৎসর পূর্বে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে পার্টির যে অভিমত ছিল, তার প্রচার নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর। কারণ ছাত্রদের অধিকাংশই তো ভাবপ্রবণ। ঐ পুঁজিটুকু খোয়া গেলে ওদের দলে রাখার অপর কোন উপায় নেই। সুতরাং মণীশকে তিনি অবজেক্টিভ পটভূমিকায়

সব কিছুকে দেখার উপদেশ দিয়েছিলেন। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি আরও বলেছিলেন যে জওহরলালও তো একদা বলেছিলেন যে জাপানীদের সহায়তায় সুভাষচন্দ্র ভারতে এলে তিনি খোলা তলোয়ার নিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করবেন। জওহরলালের উক্তিতে যদি দোষ না থাকে, তা হলে তাঁদের পার্টির পত্রিকার দৃষ্টিকোণ নিন্দিত হবে কেন? প্রায় ঘণ্টাখানেক আলোচনা হয়েছিল সেদিন।

কিন্তু কোন কাজ হল না। অফিস থেকে যাবার সময় সেদিন মণীশ কেবল পাংশু মুখে বলেছিল, "তা হলে এ সব সত্যি!" ওর চোখে মুখে হতাশা ও বিভ্রান্তির ছাপ গোপন ছিল না। কৌশিকবাবু অবশ্য ঐ কথারও একটা জবাব দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "হ্যাঁ, রিলেটিভ সত্যি।" কিন্তু তাতেও কাজ হয় নি। কারণ তার পর থেকে মণীশ ও তার সঙ্গীসাথীদের আর ছাত্র ফেডারেশনের দপ্তরে দেখা যায় নি।

আজ অনেক দিন পর ধলভূমের রাঙা মাটির পথ ধরে নরসিংগড় থেকে ঘাটশীলা স্টেশনের অভিমুখে চলতে চলতে কৌশিকবাবুর মণীশের সেই মূক অভিযোগে ভরা হতাশ মুখের স্মৃতি মনে পড়ে গেল। কৌশিকবাবু ঠিক বুঝতে পারছেন না, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে কোথায় যেন তাঁর নিজেরই সঙ্গে মণীশের একটা সাদৃশ্য রয়েছে।

জেলা পার্টির এক অতীব জরুরী গোপন বৈঠকে যোগদান করার জন্য কৌশিকবাবু জামসেদপুরে চলেছেন। পুলিস এবং গোয়েন্দাদের চক্ষু এড়াবার জন্য ধলভূমগড় স্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠার বদলে তিনি এই কয় মাইল গ্রামের পথে চলে ঘাটশীলাতে গিয়ে গাড়িতে ওঠা মনস্থ করেছেন। সরকারের চোখে ধুলো দেবার জন্য এ জাতীয় বহু উদ্ভাবনী বুদ্ধির পরিচয় দিতে হয়।

মানসিক অবসাদ ঝেড়ে ফেলার জন্য কৌশিকবাবু আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলেন। কলকাতা থেকে আত্মগোপন করে কেন তিনি ধলভূমের এই অখ্যাত পল্লীতে স্কুলের শিক্ষকের অভিনয় করে চলেছেন? জবাবটা সহজ ও সরল। তিনি বা তাঁর দলের আর যাঁরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে আছেন, তাঁদের কাজ মোটেই গাধা পিটিয়ে ঘোড়া তৈরী করা নয়। শিক্ষকতাটা তাঁদের বাইরের পরিচয়, তাঁদের আসল অভিসন্ধি আরও গভীর। অধ্যাপকের আবরণে তাঁদের সমাজ-বিপ্লবের সৈনিক সংগ্রহ করতে হবে। গলা পচা ও দুর্গন্ধ এই পুঁজিবাদী সমাজ ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের খদ্দরের

টুপি মাথায় দিয়ে খাদির পোশাকের অন্তরালে নিজের মৃত্যুপাণ্ডুর বিবর্ণ দেহ গোপন করার প্রচেষ্টা করছে।

কিন্তু বিশ্বের শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হবেই। মহাচীনের মত রূপকথার দেশেও সান-ইয়াৎ-সেনের দোহাই দিয়ে শেষরক্ষা হল না। সে দেশের শত সহস্র বৎসরের নির্জীব পুতুলগুলিকেও যেমন উত্তরের ইয়েনান প্রদেশের গিরিগুহাজাত প্রাণবন্যায় মুখর করে জাতীয়তাবাদের বর্মের অন্তরালে আত্মগোপনকারী প্রতিক্রিয়াশীল চ্যাংকাইশেকের চিহ্ন অবলুপ্ত করার বিপ্লবের পুরোধাতে পরিণত করা হয়েছে, এদেশেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। একদা যে মহাপ্লাবনের বীজ জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করে ইংলণ্ডে লালিত পালিত হয়ে উত্তর মেরু থেকে শুরু করে পামীর মালভূমি এবং বাল্টিক ও আড্রিয়াটিক সাগর থেকে আরম্ভ করে বেয়ারিং প্রণালী পর্যন্ত এক সুবিস্তীর্ণ এলাকার কোটি কোটি নরনারীর ভিতর এক নবীন জীবনকে মূর্ত করেছে, তার উত্তাল তরঙ্গ আজ কাঞ্চনজঙ্ঘা আর গৌরীশঙ্কর গিরিশৃঙ্গের উত্তর তটে পুনঃ পুনঃ আঘাত করছে। সেই সমুদ্রের ভীমবেগ লহরীর আঘাতে পীত মহাদেশ ও অর্ধেক কোরিয়া রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। জটিল কুটিল আবর্ত তুলে ক্রমস্ফীত সেই অসীম জলরাশি দক্ষিণ পূর্ব দিকে ধাবিত। মালয় যায় যায়, ইন্দোচীন আর ফিলিপাইনসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বন্যার গৈরিক বর্ণ ঘোলা জল প্রবেশ করেছে। প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশ প্রবল ঊর্মিমালার প্রচণ্ড প্রহারে টলমল, থাইল্যাণ্ড আর লাওস কি একক আত্মরক্ষা করতে পারবে?

কৌশিকবাবু যেন দিব্যচক্ষে সেই বিপ্লব-গঙ্গার ধরাবতরণ আর্যাবর্ত ভূমিতে দেখতে পান। মুক্তি ফৌজের এক শাখা পামির থেকে হিন্দুকুশ লাডক হয়ে নেমে আসছে, আর এক উপশাখা নেপাল তরাই-এ পৌঁছে গেছে এবং দক্ষিণের মূল শাখা ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব কোণ দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা ধরে এগিয়ে আসছে। ইতিহাসের অবধারিত গতিই এই। সব লাল হো জায়গা—সুমেরু থেকে কুমেরু, অতলান্তিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর কোথাও এক তিল অন্য রঙের মাটি থাকবে না—সব লালে লাল।

কিন্তু ভারতভূমিতে এই নব গঙ্গাবতরণের অন্যতম ভগীরথের মনে আজ এ কিসের সংশয়? পূর্ব আকাশে ভাস্বর নবারুণের কিরণ-স্পর্শে ধরাতলের বহু যামের অন্ধকার কেটে গেছে। কৌশিকবাবুর চলার পথে আর বাধা নেই। কিন্তু মনোজগতেও কি বাধা সংশয়শূন্য? না তো। কোথায় ছিল

রক্তবীজের মত এত সন্দেহ ও সংশয়পুঞ্জ ? মনের এ অন্ধকার কি মাষ্টারদার জ্যোতির্ময় স্পর্শে অপসৃত হয়ে যায় নি। সেই কিশোর বয়সে দুরু দুরু কম্পিত বক্ষে কর্ণফুলির জলধারাধৌত চট্টগ্রামের পার্বত্য ভূমিতে একান্ত সন্তর্পণে পূর্বনির্ধারিত স্থলে মিলিত হয়ে যাঁর কাছে কৌশিকবাবু আজকের এই অনিকেত জীবনের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন !

মাষ্টারদা! তাঁর প্রসঙ্গ মনে পড়ে যাওয়ায় কৌশিকবাবু উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। বর্তমানের গ্লানি ও অবসাদ ভুলে গিয়ে তাঁর মন চলে গেল সুদূর অতীতে। কৌশিকবাবুর মনে হত যে তিনি মানুষ নন, অন্তরীক্ষ থেকে খসে পড়া একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডই বুঝি নরদেহ ধারণ করে উচ্চাবচ চট্টগ্রামের জনপদে অবাধ সঞ্চরণ করছে। অতি মহার্ঘ, পরম প্রিয় সেই বহ্নিস্ফুলিঙ্গের সঙ্গে সাহচর্যের স্মৃতি। তরুণ বয়সে তাঁর সংস্পর্শে এসে তিনি এবং তাঁর মত আরও অনেকে দেশমাতৃকার বন্ধনমোচন করার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, বিশ্ব থেকে সর্ববিধ অন্যায় অবিচার দূর করে দীনতম ব্যক্তিটিকে স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে মহান সঙ্কল্প তাঁরা গীতা স্পর্শ করে গ্রহণ করেছিলেন, তারই পরিপূর্তির জন্য একদা ঘর ছাড়ার বাঁশীর ডাকে তিনি সাড়া দিয়ে পথ চলা আরম্ভ করেছিলেন এবং এ চলার পরিসমাপ্তি আজও ঘটে নি—কৌশিকবাবুর ধলভূম পরিক্রমা সেই পথচলারই অংশ।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের রোমহর্ষক পর্ব সেরে তাঁরা সদলবলে নাসিরবাদ হয়ে পর দিন রাত্রে জালালাবাদ পাহাড়ে পৌঁছান আত্মগোপন করার উদ্দেশ্যে। অন্যান্য সঙ্গী-সাথারা চতুর্দিকের সঙ্গে চট্টগ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

জালালাবাদ পাহাড়ে লুক্কায়িত অবস্থায় দিবারাত্র তাঁরা প্রহর গুণছেন—এই বার, এই বার বুঝি বিদ্রোহ-বহ্নি সর্বব্যাপক হয়ে এ দেশের ইংরেজদের ভস্মীভূত করে দেবে। অকস্মাৎ ২২শে এপ্রিল পাহাড়ের ওদিকে বন্দুকের গর্জন শোনা গেল—গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্। না, স্বাধীন ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার জয়ধ্বনি নয়, বন্দুক চালিয়ে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করল ইংরেজের বেতনভুক ফৌজ।

জালালাবাদ পাহাড়ের সেই অভূতপূর্ব যুদ্ধের পর আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম থেকে তিনি মৈমনসিংহের দিকে রওনা হন। দিনের বেলায় কোথাও না কোথাও লুকিয়ে থেকে রাত্রির অন্ধকারে নদী নালা খাল বিল পার হয়ে পথ চলা, প্রাণকে সর্বদা হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে লোকালয় ও মানুষের সঙ্গ

পরিহার করে পথের দূরত্ব অতিক্রমণ—সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। বার দিন পর যদিও তিনি গ্রেপ্তার হন তবু ঐ বার দিনেরই অভিজ্ঞতা কম নয়। চতুর্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে কৌশিকবাবু মনে মনেই সিদ্ধান্ত করলেন যে পূর্ববঙ্গের নদীমাতৃক শস্যশ্যামল সমৃদ্ধ গ্রামজীবনের সঙ্গে তাঁর এখনকার বিহারস্থল ধলভূমের তুলনা হয় না। যোগাসনারূঢ় ধলভূমের বহিঃপ্রকৃতি রুক্ষ, ধলভূম গৈরিক চীরবস্ত্রধারী।

পথ চলতে চলতে কৌশিকবাবুর মনে একটা প্রশ্ন জাগল—চট্টগ্রাম আর মৈমনসিংহের গ্রামাঞ্চল থেকে কলকাতার দূরত্ব কত? বেশী নয়, বঙ্গোপসাগরের দৈর্ঘ্য এবং এই দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় লাগে আট বছর মাত্র। হ্যাঁ, আট বছরই তো—দীর্ঘ আট বছর কাল তাঁকে আন্দামানে কাটাতে হয়। পদব্রজে ঘুরতে ঘুরতে একদিন অতর্কিতে কৌশিকবাবু ধরা পড়েন এবং বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড হয়। কী প্রচণ্ড নিঃসঙ্গতায় ভরা আন্দামানের সেলুলার জেলের দিনগুলি। কিন্তু তবু কৌশিকবাবু আন্দামানের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় আন্দামান।

"বিশ্বের শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ হও। তোমাদেরকে সমগ্র জগৎ জয় করতে হবে, আর হাত পায়ের শৃঙ্খল-বন্ধন ছাড়া তোমাদের কিছুই হারাতে হবে না।" এই অমর বাণী আন্দামানে পেয়ে তিনি যেন পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন। কৌশিকবাবু নূতন করে জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন, বেঁচে থাকার আনন্দের আস্বাদন করেছিলেন মার্কস এঙ্গেলস ও লেনিন স্ট্যালিনের রচনায়। ইংরেজের কারাগারে কত সন্তর্পণে সেই সব গ্রন্থ আসত! সদাজাগ্রতচক্ষু ব্রিটিশ সরকারের কূটবুদ্ধি গোয়েন্দাদের সাধ্য ছিল না যে তার আগমন রোধ করে। বাড়ি থেকে পাঠান পার্সেলের মোড়কের কাগজ হিসাবে, সরকার অনুমোদিত উপন্যাস বা এমন কি ধর্মপুস্তকের মলাট রূপে—কত কৌশলে সেই সব প্রাণ-সঞ্জীবনী সাহিত্য তাঁদের হাতে পড়ত। এবং তার পর সে সবের আলোচনা। এক একটি শব্দ ও পংক্তি—তার ব্যাখ্যা ভাষ্য ও তার উপর টীকা-টিপ্পনীর ঝড় বয়ে যেত। অনন্তদা, গণেশদা—এ দের কাছ থেকে কৌশিকবাবুরা কি কম শিখেছেন?

সেলুলার জেলের রাজনৈতিক বন্দীর দল আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভরা চঞ্চল বক্ষের দুরু দুরু কম্পনের সঙ্গে বিশ্ব ইতিহাসের নবীনতম ঘটনা—১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ৭ই অক্টোবরের বিপ্লবের কাহিনী সম্বন্ধে আলোচনা করত। যে

বাড়বানল তার শাসনের বহুযুগের কলঙ্কস্তূপ চক্ষের পলকে ভস্মসাৎ করেছিল, তার একটা স্ফুলিঙ্গ এ দেশে পড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য বন্ধনের অবসান করে দেবে, এই ছিল সকলের আন্তরিক কামনা। তাই তার স্বরূপ, তার কর্মসূচী, সোভিয়েৎ দেশের নয়া সভ্যতার বর্ণনা—নূতন মানুষ ও নবীন সমাজের কাহিনী তাঁদের সর্বক্ষণ পাগল করে রাখত।

খবর পাওয়া গেল যে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দেই এক ভারতীয় প্রতিনিধি দল সোভিয়েৎ সরকারের হাতে এক স্মারকলিপি পেশ করে নিপীড়িত ভারতের দিকে বন্ধুত্বপূর্ণ হাত বাড়াতে অনুরোধ করেছে। এক বৎসর পর রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ব দেশে বিপ্লব ছড়িয়ে দেওয়া স্থির করল এবং ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনালও এ দেশের আন্দোলনকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। আর তার পর বৎসর বাকুতে অনুষ্ঠিত পূর্বদেশীয় জনগণের কংগ্রেসে আরও ছত্রিশটি দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভারতের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিল। ঐ বৎসরই কোমিণ্টার্নের তৃতীয় কংগ্রেসে স্বয়ং লেনিন কী গভীর সহানুভূতি সহকারে ভারতবর্ষ ও তার মুক্তি-আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেছিলেন! সত্য সত্যই গণ-মুক্তির আন্দোলন তো বিশেষ কোন দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বন্দী থাকতে পারে না।

কিন্তু দূর থেকে যতই সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হক না কেন, কোন দেশের মাটিতে বা তার আশে-পাশে শিকড় গাড়তে না পারলে কি করে বাঞ্ছিত ফল লাভ হবে? তাই এর পরবর্তী ধাপের বিবরণও কৌশিকবাবুরা রুদ্ধ নিশ্বাসে আন্দামানের জেলে বসে শুনলেন। তিব্বত সিনকিয়াং আফগানিস্তান ও পারস্য প্রমুখ ভারতের সীমান্তবর্তী দেশে বিশ্বে সর্বহারাদের বিপ্লব ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতিষ্ঠান কোমিণ্টার্নের ঘাঁটি স্থাপিত হল। আর সে যুগে ভারতত্যাগী মুহাজির ও পাঞ্জাবের গদর পার্টির বাছা বাছা প্রায় এক শজন বিশ্বাসী সদস্যদের তাসখন্দে সমবেত করে এম. এন. রায়ের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম ভারতবাসীদের একটি দলকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করা হল। কমিউনিস্টদের সত্যকার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে একদা কোমিণ্টার্নের ভারতীয় নীতির পরিচালক রায় লিখেছিলেন, "কোন দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের জাতীয় অঙ্গস্বরূপ হতে হবে। নচেৎ তা আর সাম্যবাদ পদবাচ্য থাকে না, এর বিকৃতি যে কোন রূপ ধারণ করতে পারে···ভারতীয় মার্কা বিশেষ সাম্যবাদ খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক ব্যাপার। নিজেকে কমিউনিস্ট বলে পরিচয় প্রদানকারী

ভারতবাসীকে বিশ্বের অপরাপর দেশের কমিউনিস্টদের মত কেবল এক জন কমিউনিস্ট হতে হবে।”

পরে অবশ্য প্রতিক্রিয়াশীলতার জন্য রায় কোমিণ্টার্ন থেকে বিতাড়িত হলেও আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে তাঁর ঐ অভিমতে কোমিণ্টার্নের সরকারী নীতিই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। কেবল থিওরীর দিক থেকেই নয়, বাস্তবক্ষেত্রেও তাঁদের পার্টি শুরু থেকে সযত্নে ভারতীয়ত্ব বোধ রূপী সঙ্কীর্ণতা বর্জন করে এসেছে। পার্টির এক অন্যতম প্রবীণ নেতা কমরেড মুজফ্‌ফরের কাছে শোনা তাঁদের পার্টি গড়ার প্রথম যুগের একটা কথা কৌশিকবাবুর মনে পড়ে গেল।

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে কানপুরে সম্মেলন হচ্ছে—উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে এবার বিধিবৎ পার্টি গড়া হবে। কমরেড মুজফ্‌ফরের সঙ্গে কমরেড ঘাটে, জোগলেকর এবং এমন কি সম্মেলনের সভাপতি কমরেড সিঙ্গারাভেলু পর্যন্ত বলছেন যে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশানলের প্রথা অনুযায়ী পার্টির নাম হবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বা কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া। কিন্তু কমরেড সত্যভক্ত এ দাবির বিরোধিতা করে বললেন যে এর নাম হবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি। কারণ সত্যভক্ত ঘোষণা করলেন যে তিনি আন্তর্জাতিকতা মানেন না। তাঁর পরিকল্পিত পার্টি ভারতীয় ধাঁচের অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী পার্টি, আর সেই জন্য তার নাম দিতে হবে “ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি।” এ রকম সর্বনাশা ন্যাশনালিস্ট দৃষ্টিকোণের কাছে নতি স্বীকার করলে তো কমিউনিজমের বীজ পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং পার্টির ভেটারেনরা গোড়া বেঁধে কাজ করেছিলেন—সবরমতীর দালাল সত্যভক্তকে কানপুরেই পার্জ করা হয়েছিল। কিন্তু সে কথা থাক।

ভারতবর্ষে বিপ্লব-স্ফুলিঙ্গ প্রেরণ করার প্রথম প্রচেষ্টা খুব একটা সাফল্য অর্জন করে নি। কারণ তাসখন্দের পর মস্কোর প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় মাস ধরে মার্কসবাদের তালিম দেবার পর ভারতবর্ষে যাদের পাঠান হয়েছিল, তাদের অনেকেই ধরা পড়ে ও ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে পেশওয়ার ষড়যন্ত্রের মামলার ছুতো করে তাদের সকলকেই প্রায় জেলে আটক করা হয়। তবে ঐ সব মুহাজিররা একটা কাজ করেছিল। মস্কোতে থাকা কালীন ১৯২১ খ্রীস্টাব্দেই তারা বিদেশে সর্বপ্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির স্থাপনা করে। এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি যে সর্বপ্রথম মস্কোতে স্থাপিত হয়, তা কোন সাধারণ ঘটনা নয়—বিশেষ গূঢ় অর্থব্যঞ্জক।

যাই হক হতোদ্যম শব্দটি বিপ্লবীদের অভিধানে নেই। তাই আবার পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু হল। আফগানিস্তানের ঘাঁটির ক্রিয়াকলাপে চমৎকৃত হয়ে ইউরোপ প্রবাসী জনৈক ভারতীয় কমিউনিস্ট লিখলেন, "বলশেভিক ঘেঁষা আফগানিস্তানের নিছক অস্তিত্বই উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতীয়দের ভিতর সর্বাপেক্ষা উৎসাহজনক প্রেরণা স্বরূপ হবে এবং তারা বলশেভিজমের বাণী ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেবে।" আর সিংকিয়াং-এ যে ভাবে কোমর বেঁধে লেগে পড়া হয়েছিল তাতে উল্লসিত হয়ে রুশ পত্রিকা "ইচো" ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে লিখেছিল, "বলশেভিকেরা এত দিনে ঐ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করার পর তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে এর ফলে বলশেভিকেরা কুলভজা, আকসু কাসগর ও পামিরের মারফত উত্তর ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে। ...বলশেভিকেরা বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে ভারতবর্ষে প্রচুর কমিউনিস্ট সাহিত্য, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য রসদ পাঠাচ্ছে।"

এর পর এল তিব্বত ও চীনের ভিতর দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের পালা। কোমিণ্টার্ন ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে একজন মুখ্য কর্মীকে প্রতিক্রিয়াশীল লামাদের রাজ্যে পার্টি সংগঠন করতে পাঠাল এবং এ কাজের জন্য কোমিণ্টার্ন থেকে প্রচুর অর্থও বরাদ্দ করা হল। সঙ্গে সঙ্গে চীনেও পার্টির কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেল। কারণ ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দেই কমরেড ঝিনোভিয়েভ দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে, "ভারতবর্ষে যাবার জন্য পারস্য ও আফগানিস্তানের অতি পুরাতন পথের পরিবর্তে চীনই আমাদের কাছে ভারতে কাজ শুরু করার প্রথম ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে।" সুতরাং কমরেড লেনিনের সেই অমর উক্তি—আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের প্যারিসে পৌঁছাবার পথ পিকিং ও কলকাতা হয়ে—একে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য কমরেড ঝিনোভিয়েভ এক নূতন আওয়াজ তুললেন, "বিপ্লবী চীন হয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণতন্ত্রে পৌঁছাতে হবে।"

কমরেড ঝিনোভিয়েভের দূরদৃষ্টির কথা চিন্তা করে আর এক বার নূতন করে চমৎকৃত হলেন কৌশিকবাবু। ঐ ঘোষণার চব্বিশ বৎসর পর ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে মহাচীন লালে লাল হয়ে নূতন চীনে পরিণত হয়েছে। আর এই তো সে দিন বন্যার বেগে মুক্তিফৌজ গিয়ে শত শতাব্দীর কুসংস্কার আর অন্ধকারের দুর্গম দুর্গ লাসার প্রাসাদের উপর রক্তপতাকার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদের

ক্রীড়নক জয়প্রকাশ ও তার চেলারা যতই হট্টগোল করুক না কেন, তিব্বতে আর লামাদের আধিপত্য ফিরে আসবে না। ইনফিলটারেশন-এর কলায় দক্ষ কমিউনিস্টরা একবার ছুঁচ হয়ে ঢুকতে পারলে ফাল হয়ে বেরোবার মন্ত্র জানে।

জয়প্রকাশ জাহান্নমে যাক ; জহরলালের জন্য কিন্তু কৌশিকবাবুর দুঃখ হয়। উনিও কি না শেষকালে সে দিন তিব্বতের আধুনিকীকরণের বিরোধিতা করে মন্তব্য করলেন যে মুক্তিফৌজের কাজ গণতন্ত্র-সম্মত হচ্ছে না। ফুঃ, গণতন্ত্র ! কৌশিকবাবু নিজের মনেই তাচ্ছিল্য সহকারে উচ্চারণ করেন কথাটা। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের দোহাই দেওয়ার ফল জওহরলাল হাতে হাতেই পেয়েছেন। কমরেড চৌ-এন-লাই সঙ্গে সঙ্গে কড়া জবাব দিয়ে দিয়েছেন যে সাম্রাজ্যবাদের বকলেসে-বাঁধা কুকুররা যেন চীনের ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলাতে না আসে। কৌশিকবাবু আপন মনে হেসে উঠলেন একবার। যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।

তিব্বতে মুক্তিফৌজ ঘাঁটি গাড়ার পর থেকে কৌশিকবাবু ও তাঁদের দলের কমরেডদের ভিতর অধীরতা বেড়ে গেছে। কবে—কবে আসবে সেই সুদিন যখন ভারতবর্ষেও মুক্তিফৌজের শুভ পদার্পণ হবে। উত্তরের কুনমিঙ আর পূর্বদিগন্তের মঙ্গলনের দিকে তাকিয়ে তাঁরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাদের বরণ করার জন্য। আর কর্ণকুহরে গুঞ্জরিত হচ্ছে কমরেড মাও-সেতুং প্রেরিত অমর বাণী। গত বৎসর তাঁদের পার্টির সাধারণ সম্পাদকের দ্বারা প্রেরিত অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে কমরেড মাও এই আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে, "আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে বাহাদুর কমিউনিস্ট পার্টি ও অপরাপর দেশভক্তদের সম্মিলিত শক্তির ফলে ভারত আর বেশী দিন সাম্রাজ্যবাদী ও তার ধামাধরাদের তাঁবে থাকবে না।" কী বীরত্বব্যঞ্জক আশার বাণী। সাম্রাজ্যবাদীদের লেজুড় ভারতের কেরেনস্কী জওহরলাল ও জয়প্রকাশরা হুঁশিয়ার !

ভবিষ্যতের কথা থাক, সেলুলার জেলে পার্টির অতীত ইতিহাসের যে বিবরণ তাঁরা শুনতেন, তা-ই আবার কৌশিকবাবুর স্মৃতিপথে উদিত হতে লাগল। কৌশিকবাবু জানেন যে স্থল-পথেই কেবল সর্বহারাদের বিপ্লবের পদচিহ্ন ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসে নি। জলপথকেও তাঁদের পার্টি সমানভাবে কাজে লাগিয়েছিল। ব্রিটিশ পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষাকারী সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের জাহাজে ভারতীয়

নাবিক ও মাঝিমাল্লা রূপে কর্মরত ছদ্মবেশী কমরেডরা কত অর্থ, প্রচার-সাহিত্য ও চিঠিপত্র এ দেশে এনেছে। মীরাট ও কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার অনেকেই ছিল এই রকম নাবিকরূপে আত্মগোপনকারী কমরেডের দল।

সে সময়কার ইংলণ্ডও তাঁদের পার্টির নার্সারী হিসাবে কাজ করেছে। কেবল যে কমরেড দত্ত বা পলিট ইত্যাদি চীনের ব্যাপারে রায়কে কোমিণ্টার্ন থেকে বহিষ্কৃত করার পর থেকে কোমিণ্টার্নের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতীয় তরুণ কমরেডদের পরিচালিত করতেন বা সে দেশ থেকে কমরেড ব্রাডলী বা স্প্রাট ইত্যাদিদের কাজ করার জন্য এ দেশে পাঠিয়েছিলেন, তাই নয়। তখনকার লণ্ডন, অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ ইত্যাদি যে সব শিক্ষাকেন্দ্রে ভারতীয় ছাত্ররা পড়ত, কমরেড সকলতওয়ালাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে পাঠচক্র ইত্যাদি চালিয়ে পার্টি তরুণ কমরেড রিক্রুট করত। আজ এ দেশে কর্মরত পার্টির নেতৃস্থানীয় অনেকেই তখনকার বিলাতে রংরুট করা ছাত্র।

কিন্তু না, পুরাতন ইতিহাসের কথা বড় বেশী ভাবছেন তিনি। তাই নিজেদের কথাতেই ফিরে আসেন কৌশিকবাবু। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ বাঙলার রাজনৈতিক বন্দীদের বাঙলাতেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আন্দোলনের জোয়ার বাড়ল। সুতরাং দেউলী বক্‌সা ক্যাম্প ইত্যাদির বন্দীদের মত তাঁদেরও ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল বাঙলাদেশে। তবে তাঁরা মুক্ত হলেন না। বাঙলা দেশের কারাগার সমূহে তাঁদের ছড়িয়ে দেওয়া হল। ইতিমধ্যে বন্দী অবস্থাতেই তাঁরা মনে মনে কমিউনিস্ট হওয়ায় নিজেদের মধ্যে একটা পার্টি সংগঠনের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁরা বাইরের সঙ্গেও গোপন যোগাযোগ স্থাপনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই দেশে এসে বিভিন্ন জেলে থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন হয়ে যায় নি। কৌশিকবাবুর মনে পড়ল যে বাঙলার এই কারাজীবনেই তিনি এম. এ. পাশ করেন। রাজনৈতিক বন্দীদের কাজ-কর্মের বিশেষ বালাই ছিল না বলে লেখাপড়া নিয়ে একটু সময় কাটাতে মন্দ লাগত না। আর সরকারও বোধ হয় চিন্তা করত যে যদি এই ভাবে এদের মনকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। সুতরাং এম. এ. ডিগ্রীটা অধিকন্তু হিসাবেই জুটে গেল।

জেলেই তাঁরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের খবর পেলেন এবং তার পর দুই বৎসর যেতে না যেতেই সমগ্র বিশ্বকে চকিত করে রুশ-জার্মান যুদ্ধের খবর প্রচারিত হল। বন্দী অবস্থাতেই কৌশিকবাবুরা উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠলেন। সাম্যবাদের পীঠভূমি বিশ্বের সর্বহারাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার

স্থল সোভিয়েৎ রাশিয়ার পরাজয়ের অর্থ নূতন সমাজ, নবীন সভ্যতার চির অবসান। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত মেদিনীপুর জেলের "বি" ওয়ার্ডের সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে পদচারণা করতে করতে কৌশিকবাবুর মহান স্ট্যালিনের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি মনে পড়ত—রাশিয়া কেবল বিশ্ববিপ্লবের কেন্দ্র-বিন্দুই নয়, এ হচ্ছে, "ভবিষ্যতে যে একমেবাদ্বিতীয়ং বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থার আওতায় রাষ্ট্রসমূহ সঙ্ঘবদ্ধ হবে, তারই জীবন্ত নিদর্শন।"

ফরাসী বিপ্লবের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একদা রাজা রামমোহন নাকি বলেছিলেন যে প্রতিটি মানুষের দুটি করে মাতৃভূমি আছে—একটি তার স্বদেশ এবং অপরটি ফ্রান্স। কিন্তু কৌশিকবাবুর মনে হত যে কমিউনিস্টদের আদর্শ, কমিউনিস্টদের সোভিয়েৎ রাশিয়ার প্রতি ভক্তি এর চেয়েও অনেক উচ্চস্তরের। তাই ফাদারল্যাণ্ড রাশিয়ার চরম বিপদের দিনে বন্দীদশার সমগ্র বন্ধন চূর্ণ বিচূর্ণ করে তিনি উরাল পর্বত থেকে লেনিনগ্রাদ ব্যাপী যে সুবিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে লালফৌজ প্যান্‌ৎসারদের বাজের থাবার হাত থেকে সমাজবাদকে রক্ষা করছিল, অস্ত্র কাঁধে সেই জনযুদ্ধের সৈনিক হবার জন্য ছুটে যেতে চাইতেন।

কৌশিকবাবুর কর্ণকুহরে শয়নে জাগরণে বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট নেতা জর্জি ডিমিট্রভের কাব্যময় উক্তি ধ্বনিত হত: "ইতিহাসের রথচক্র এগিয়ে চলেছে এবং দুর্নিবার গতিতে এ অগ্রসর হয়েই চলবে, যতদিন না সোভিয়েৎ সোশালিস্ট রিপাবলিকের বিশ্বজোড়া সংগঠন খাড়া হচ্ছে, যত দিন না সমগ্র বিশ্বে সমাজবাদের চূড়ান্ত বিজয়বার্তা ঘোষিত হচ্ছে।" ইতিহাসের এই অনিবার্য পরিণতি ব্যাহত করতে ইউরোপে যে দুরন্ত দানব আগুয়ান হয়েছে, তাকে প্রতিরোধ করার উপায় কি ?

উপায় একটা পাওয়া গেল এবং সে উপায় অপ্রত্যাশিত ও একান্ত অভাবনীয়। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ দিকে এক দিন কৌশিক-বাবু জেলের ফটকের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ভারত সরকার ২৪শে জুলাই প্রায় দশ বৎসর পর কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেবার পর থেকেই দু জন এক জন করে তাঁদের পার্টির কর্মীরা ছাড়া পাচ্ছিলেন। এবার তাঁরা দলে দলে বাইরে আসতে লাগলেন। সুদীর্ঘ কাল কারাপ্রাচীরের অন্তরালে থাকার পর প্রথম মুক্তবায়ুতে শ্বাস নেবার আনন্দ-জনিত চমকের সঙ্গে সঙ্গে কৌশিকবাবু এই অপ্রত্যাশিত মুক্তির কারণ জানতে পারলেন। রায়ের বহিষ্কারের পর এ যাবত ব্রিটেনের পার্টির

মাধ্যমেই তাঁরা কোমিণ্টার্নের নির্দেশ পাচ্ছিলেন। তাই ব্রিটেনের কমরেড হ্যারি পলিটের যে চিঠিটি ভারত সচিব ম্যাক্সওয়েলের সৌজন্যে পার্টির বন্দী নেতৃবৃন্দের হস্তগত হয়, তারই আধারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে নূতন থিসিস স্বীকৃত হয় এবং ভারত সরকারকে এর খবর দেওয়া মাত্র ম্যাক্সওয়েল সাহেব জনযুদ্ধের সহায়কদের দিকে মিতালীর হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কৌশিকবাবুরা পার্টির সমস্ত শক্তি নিয়ে কোমিণ্টার্নের ষষ্ঠ ও সপ্তম কংগ্রেসের ঘোষণা—সোভিয়েৎ ইউনিয়নকে রক্ষা করাই আন্তর্জাতিকতার যথার্থ কষ্টিপাথর—তাকে কার্যান্বিত করার জন্য কর্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

কিন্তু সে সমুদ্র শান্ত নয়, উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল ফেনিল উর্মিমালা যেন মৃত্যুর নিরন্তর হাতছানি। আগস্ট ১৯৪২-এর ভারতবর্ষের কোণে কোণে একটা চাপা উত্তেজনা থম থম করছে। আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী ভারত যেন কোন অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির শীর্ষোপরি আসীন হয়ে অগ্ন্যুৎগারের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। ফেব্রুয়ারীতে সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে, ৯ই মার্চ গেছে রেঙ্গুন। সাম্রাজ্যবাদী নিপ্পন আর তার ভারতীয় এজেণ্ট সুভাষচন্দ্র ঝড়ের বেগে ভারতের সীমান্ত দ্বারে মুহুর্মুহু আঘাত করছে। তাদের প্রতিরোধ করার পরিবর্তে অধিকাংশ ভারতবাসী সোভিয়েৎ সুহৃদ ইংরাজের বিতাড়ন চাইছে। পূর্ব সীমান্তে দৃষ্টি দেবার পরিবর্তে সকলের চক্ষু বোম্বাই-এর দিকে।

তাঁদের পার্টি অবশ্য তাঁদের ইংরাজী পত্রিকা পিপলস ওয়ার ও তার প্রাদেশিক ভাষার বিভিন্ন সংস্করণ এবং সভা সমিতি ও প্রস্তাব দ্বারা কংগ্রেসের ফ্যাসিস্টপন্থী কার্যকলাপের আপ্রাণ প্রতিরোধ করে চলেছে। কিন্তু তবু ৯ই আগস্ট কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের দেশদ্রোহিতা মূলক আচরণের উচিত পরিণাম স্বরূপ তাদের কারারুদ্ধ করা মাত্র সমগ্র দেশ যেন এক মুহূর্তে বিদ্রোহী হয়ে করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে বলে সরকারের টুঁটি লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বোম্বাই এলাহাবাদ সাঁতারা বালিয়া—সর্বত্র অশান্তির আগুন। কলকাতাও কৌশিক-বাবুদের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রক্ষা পেল না, আগুন লাগল মেদিনীপুরেও।

সরকারকে আঘাত করা মানেই যুদ্ধপ্রচেষ্টায় ব্যঘাত সৃষ্টি করা এবং এর অর্থই হচ্ছে সোভিয়েৎ রাশিয়ার শত্রুতা সাধন। সুতরাং কৌশিকবাবুরা কোমর বেঁধে এই যুদ্ধবিরোধী কংগ্রেসীদের তথাকথিত ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে লেগে পড়লেন। ছলে বলে কৌশলে যে কোন প্রকারে আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করা তাঁদের প্রধান কর্মসূচী হল। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দেই

যারা ঘোষণা করেছে যে, "শ্রমিক শ্রেণীর স্বদেশ বলে কোন কিছু নেই" এবং কমিউনিস্টরা "জাতীয়তার বাছবিচার না করে সমগ্র সর্বহারা শ্রেণীর সাধারণ স্বার্থ" রক্ষা করার জন্য কাজ করবে, তারা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের ছেঁদো বুলিতে হাপুস নয়নে কাঁদে না।

সর্বহারা শ্রেণী এবং তাদের বিপ্লবের কর্ণধার সোভিয়েৎ রাশিয়ার কল্যাণার্থ তাই দেশের স্বাধীনতার মত ক্ষুদ্র ব্যাপার তো বটেই, সমগ্র ভারতবর্ষের অস্তিত্বই বিলিয়ে দেওয়া যায়। এই জন্য ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে যখন সবাই "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই"—বলে উচ্ছ্বাসে নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছে, কৌশিকবাবুদের পার্টি তখন শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করার জন্য, ব্রিটেনের মজুরদের প্রতি সহানুভূতি দেখানর উদ্দেশ্যে বয়কট আন্দোলনের বিরোধিতা করে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড় পরা স্থির করেছিল। এরই নাম হচ্ছে আন্তর্জাতিকতা। অতএব স্ট্রাটেজি, বড় কথা হল স্ট্রাটেজি।

এরই জন্য পৃথিবীর একমাত্র সর্বহারা রাষ্ট্র সোভিয়েৎ রাশিয়াকে রক্ষা করাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কাজ। কারণ তাঁরা জানেন ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর ভারতের লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লিতে তাঁদের তরফের যে চিঠি পড়া হয়, তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছিল, "কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বভাবতই কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালদের অঙ্গ হতে হবে। আর প্রত্যুত একে তাই মনেও করা হয়······কোন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিঃসন্দেহে বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট সংগঠনের অংশ স্বরূপ হতে হবে। তা না হলে এ 'কমিউনিস্ট' নামের অযোগ্য। এই যে সংগঠন সারা দুনিয়ায় অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তার সাংগঠনিক কাঠামোতে বৈদেশিক নির্দেশের গন্ধ আছে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের কমিউনিস্ট আখ্যা দেওয়া চলে না।"

অতএব জাপানকে রুখতে হবে! রক্ষী ফৌজ গড়ে তুলতে হবে—গরিলা যুদ্ধের স্ট্রাটেজিকে করতে হবে জনপ্রিয়। পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত, কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের সমর্থক তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সমূহের অপপ্রচারের ফলে জনগণ বিভ্রান্ত। তাই নিজেদের কাগজ চাই, অবজেক্টিভ দৃষ্টিকোণ থেকে যাবতীয় সমস্যাবলীর স্বরূপ বুঝিয়ে পথ নির্দেশ করে দেবার জন্য প্রয়োজন পার্টির নিজস্ব সংবাদপত্র। সাহিত্য-ফ্রণ্টে অবশ্য কাজ ভালই এগিয়ে চলেছে। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ প্রশংসনীয় কাজ করছে। আর এর দেহে একটু নিরপেক্ষতার

চুনকাম করে এর আবেদনকে বিস্তৃততর করার জন্য প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তিত করে প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ রাখার আয়োজনও হচ্ছে।

কিন্তু ও দিকে জাপানের এজেণ্ট সাম্রাজ্যবাদের পুরাতন সুহৃদ মেকী "নেতাজী" সুভাষচন্দ্র তার চর-অনুচরদের নিয়ে কোহিমা ডিমাপুর টিড্ডিম ছাড়িয়ে ইম্ফলের কাছে এসে পড়ল বুঝি। ঐ জাপানী চরের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্য নষ্ট করতে হবে। আর—আর আগস্ট '৪২'-এর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের যে সব নায়ক—ছদ্মবেশী পঞ্চম বাহিনীর সদস্য আত্মগোপন করে বোস-এর ফ্যাসিস্ট সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবার স্বপ্ন দেখছে, তাদের সম্বন্ধে যেটুকু খবর পাওয়া যায়, তা যথোপযুক্ত স্থানে পৌঁছে দিতে হবে। ন্যাশনালিস্ট সেন্টিমেণ্টের প্রশ্রয় দব ার সময় এ নয়—সর্ববিধ উপায়ে সোভিয়েৎকে রক্ষা করতে হবে।

এ. আর. পি. সংগঠন, ফার্স্ট এড পোস্ট পরিচালনা, বিমান আক্রমণে আত্মরক্ষার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া—কত কাজ রয়েছে। শ্রমিকরা যাতে কংগ্রেসী এজেণ্টদের চক্রান্তে পড়ে হরতাল না করে তা দেখতে হবে। কারণ হরতালের অর্থ হচ্ছে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি। তাই তাঁদের আওয়াজ হচ্ছে—যত যাই হোক না কেন, এখন কেবল উৎপাদন বাড়িয়ে চল। তার পর ছাত্ররা যাতে ন্যাশনালিস্টদের ভ্রান্ত প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে যুদ্ধপ্রচেষ্টার সমর্থক হয়, তার জন্য ছাত্র ফেডারেশনকে চাঙ্গা করতে হবে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকেও সুযোগ-সুবিধামত পাদপ্রদীপের আলোকের সম্মুখে নিয়ে যেতে হবে। এ দিকে মেদিনীপুরের ঝড় ও প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার পর মফঃস্বলে খাদ্যাভাবের কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু না—এ সময় মজুতদার বিরোধী আন্দোলন করে যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে ব্যাহত করা চলে না। এখন তাই ইংরেজ সরকারের কাছে সাহায্য নিয়ে লঙ্গরখানা খুলে বুভুক্ষুদের লপ্সি খাইয়ে আরো কটা দিন জিইয়ে রাখতে হবে। কারণ এই ভাবেই তাঁদের পার্টি সব রকমের জনসেবামূলক কাজের মাধ্যমে লোকচক্ষুর সম্মুখে এগিয়ে আসবে।

সময় এগিয়ে চলে দ্রুত লয়ে। তরঙ্গিত কাল-লহরীর চূড়ায় ভেসে চলেন কৌশিকবাবু। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁদের পার্টির পক্ষে বড় দুঃসময়। যুদ্ধ শেষ হয়েছে; কিন্তু মন্বন্তরের বিভীষিকা দেশের বুকে পাষাণভার দুঃস্বপ্নের মত চেপে আছে। রুদ্ধকণ্ঠ জাতীয়তাবাদীরা আবার মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে জুলাই তাঁদের পার্টির

উপর থেকে সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার পূর্বে কলকাতায় পার্টির কর্মী ও সমর্থকরা শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে "কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করু" বলে যে স্লোগান স্টেনসিল করে লিখতেন, সেগুলির বিকৃতি সাধন শুরু হয়ে গেল অকস্মাৎ। বেশী কষ্ট করার প্রয়োজন হত না। "বৈধ" থেকে "ঐ"কার টুকু তুলে দিলেই পার্টির ইজ্জতের যতটুকু ক্ষতি করার, তা হয়ে যেত। কিন্তু কৌশিকবাবুরা নিরুপায়। ক্রোধে ছটফট করা ছাড়া এই স্বতস্ফূর্ত নির্মম রসিকতার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় ছিল না।

এ দিকে কংগ্রেসকর্মীরাও দলে দলে মুক্ত হচ্ছে। সরকার আর এদের আটক রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করে না। সুতরাং এই সব কারামুক্ত কংগ্রেসী এক একটি হিরোর মত ভাব ভঙ্গী করে তাঁদের পার্টির বিরুদ্ধে যত রাজ্যের কুৎসা রটাচ্ছে এবং ব্রণলোভী মক্ষিকার মত জাতীয়তাবাদী আখ্যাত সংবাদপত্রগুলি তাই নিয়ে প্রচণ্ড মাতামাতি জুড়ে দিয়েছে।

অবশ্য কংগ্রেস ও এই সব জাতীয়তাবাদীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তাঁদের পার্টির মনে কোন দিন কোন মোহ ছিল না। কারণ ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দেই কোমিণ্টার্ন ঘোষণা করে, "কমিউনিস্টদের ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় সংস্কারপন্থী কার্যকলাপের মুখোশ খুলে দিতে হবে এবং স্বরাজ্যদল, গান্ধীবাদী ইত্যাদিদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের যাবতীয় চটকদার বাক্যজালের বিরোধিতা করতে হবে।" তা ছাড়া ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে প্রাভদাতে তাঁদের পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করে "প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশান অফ দি সি. পি. অফ ইণ্ডিয়া" নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়, "ভারতীয় বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করার পথে সর্ববৃহৎ বাধা হচ্ছে এই যে এখনও এ দেশের অনেক লোকের মনে জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে অন্ধ মোহ রয়েছে। তারা এখনও বুঝতে পারে নি যে কংগ্রেস এ দেশের মেহনতী মানুষদের মৌলিক স্বার্থের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান।"

তাই পার্টির এ দুঃসময়ে তাঁদের বিশ্রাম নেবার অবকাশ কই? সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর মত তাঁদের বীরবিক্রমে লড়াই করতে হয়েছে। পার্টি সংগঠনকে বাঁচাতে হবে। ছাত্ররা আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যাপার নিয়ে বড় হৈচৈ জুড়ে দিয়েছে। একেবারে স্রোতের প্রতিকূলে যাবার কথা চিন্তা করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। সুতরাং সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে পুরাতন স্ট্রাটেজি আর চলবে না। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তিদাবির পিছনে তাঁদের

পার্টিকেও ইউনাইটেড ফ্রন্টের হিস্সাদার হয়ে জুটতে হবে। তার পর সুবিধামত ধীরে ধীরে আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়াতে হবে।

অবশ্য তাঁরা বেঁচে গেলেন নৌবিদ্রোহের জন্য। ঐ ব্যাপারে তাঁদের বিরুদ্ধে কারও কিছু বলার ছিল না। সুতরাং মিল মালিকদের অকৃত্রিম সুহৃদ বল্লভভাই-এর ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতার মুখোশ খুলে দিতে তাঁদের অসুবিধা হয় নি। আর তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মুখোশ খুলে দিতে লাগলেন ক্ষমতা-হস্তান্তরের ধোঁকা দিয়ে ইঙ্গ-ভারতীয় পুঁজিপতিদের যে আঁতাত গড়ে উঠছিল, তার।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট! ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দেশী এজেন্টরা ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ওড়াবার উল্লাসে মত্ত। শুধু তাই নয় মেহনতী জনসাধারণের সংগ্রামী বৃত্তি নষ্ট করারও একটা অপকৌশল। মস্কো সম্মেলনের ব্যর্থতার পর থেকেই তাঁরা পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে আঁচ করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে কমরেড ঝানভ পুঁজিবাদী দেশগুলির সত্যকার স্বরূপ উদ্ঘাটন করলেন। অতএব ভারতবর্ষে তাঁদের পার্টিও পিছন দুয়ার দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার বণিক স্বার্থকে কায়েম রাখার ষড়যন্ত্রকে ফাঁস করে দিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল—য়হ আজাদী ঝুটী হ্যায়।

অবশ্য কংগ্রেসী নেতাদের শাসন সম্বন্ধে তাঁদের পার্টি বিধিবদ্ধ বিশ্লেষণ করেছিল আরও পরে—পর বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত গোপন সম্মেলনে। ঐবার যে থিসিস পার্টি গ্রহণ করে, তার কয়েকটা প্যারাগ্রাফ, বিশেষ করে কংগ্রেসী শাসকদের স্বরূপ বিশ্লেষণকারী অংশগুলি কৌশিকবাবুর মনে গভীর দাগ কেটে বসে আছে। আজ তিন বৎসরের উপর হতে চলল, তখনকার মন্তব্য পরিবর্তন করার বিন্দুমাত্র কারণ তিনি খুঁজে পান নি, অধিকন্তু পার্টি থিসিসের বক্তব্য তাঁর কাছে উত্তরোত্তর সত্য স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। ভারতে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে থিসিসে বলা হয়:

"বিপ্লবের কণ্ঠরোধ করার মানসে, পুরাতন ব্যবস্থা জিইয়ে রাখার জন্য যে সব নেতা জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন, তাঁদের কিনে নেওয়া হয়। এই ভাবে বিপ্লবী শক্তিকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে, বিপ্লবীদের আঘাত করার জন্য সরকারের সামাজিক আধার সম্প্রসারিত করা হয়।

"...এর লক্ষ্য হচ্ছে কায়েমী স্বার্থওয়ালাদের এক প্রতিক্রিয়াশীল শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করা। এরা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে কায়েম রাখবে; কিন্তু এর স্বরূপ গোপন করবে।...

"পণ্ডিত নেহেরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হওয়ায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কোন সমস্যার সমাধান হয় নি। এর ফলে ভারতবাসী স্বাধীনতা বা মুক্তি কিছুই পায় নি। এর পরিণামে জনসাধারণ স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হবে—এ আশাও দুরাশা।...এ হচ্ছে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি-গোষ্ঠীতে সুবিধাজনক স্থান নেবার জন্য একটি চাল।..."

পার্টিতে বা দেশে তখনও যাদের নেহেরুর গণতান্ত্রিক ভূমিকা সম্বন্ধে কোন রকম ভ্রান্ত ধারণা ছিল, তাদের উদ্দেশ্য করে পার্টি ঘোষণা করেছিল, "নেহেরু সম্বন্ধে এই রকম ধারণা মার্কসবাদ বিরোধী। এর ফলে জনসাধারণকে বুর্জোয়া নেতৃত্বের কবলে সমর্পণ করা হবে। আমাদের স্পষ্ট করে বুঝে নিতে হবে যে নেহেরু প্যাটেলেরই মত বুর্জোয়া প্রতিনিধি। তারা উভয়েই সাম্রাজ্যবাদের ইদানীন্তন দোসর, বুর্জোয়া শ্রেণীর নীতি ও কর্মপদ্ধতির সমর্থক।..."

"শিশু রাষ্ট্র", "পাকিস্তান ও উদ্বাস্তুদের সমস্যা", "জাতি গঠনে এখন সকলের সহযোগিতা করা কর্তব্য" ইত্যাদি ন্যাশনালিস্ট সেন্টিমেণ্ট প্রসূত আবেদন তাঁদের দৃষ্টিকোণকে পরিবর্তিত করতে পারে নি। অথবা "কাল পর্যন্ত যারা আপনাদের শয্যাসঙ্গী ছিল, আজ হঠাৎ তাদের সাম্রাজ্যবাদী কাল সর্প বলে পরিত্যাগ করার বুদ্ধি জাগল!" ইত্যাদি শ্লেষাত্মক মন্তব্য তাঁদের কর্মসূচীতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। সুতরাং কৌশিকবাবুরা সেই যে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট থেকে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকারী ও তাদের খদ্দরধারী তাঁবেদার জাতীয়তাবাদীদের অপকৌশল ও গণস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, আজও তার অবসান হয় নি। পথ চলতে চলতে কৌশিকবাবু নিজের মনের বিশ্বাসকে পুনরায় সশব্দে ঘোষণা করলেন, "লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত এ জেহাদ জারী থাকবে।" আত্মবিশ্বাস বাড়াবার এ টেকনিকের উপকারিতা কৌশিকবাবু জানেন। বিগত দিনের উদ্দীপনার স্মৃতির রোমন্থন করতে করতে এরই মধ্যে উৎসাহে কৌশিকবাবুর পায়ের গতি বর্ধিত হয়েছে।

গত তিন বৎসর নীতিবাগীশদের সঙ্গে বার বার কৌশিকবাবুদের লড়াই করতে হয়েছে। নীতিবাগীশরা কেবল কংগ্রেসের আগস্ট আন্দোলন বা

আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যকলাপের বিরোধিতার জন্যই তাঁদের পার্টির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে নি, অথবা এখন যাঁদের তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী বলছেন, একদা তাদের সঙ্গে মিলে ফ্যাসিস্ট দস্যুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য তাঁদের বিদ্রূপ করেন নি। পাকিস্তান সৃষ্টির জন্যও এই সব পুঁজিবাদের সুহৃদরা তাঁদের অভিযুক্ত করেছে। মুসলমানদের একদা একটি পৃথক নেশন বা জাতিরূপে স্বীকার করে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি। প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারকদের বক্তব্য এই যে এরই ভিতর পাকিস্তানের বীজ লুক্কায়িত ছিল। কৌশিকবাবুর মাঝে মাঝে এই সব সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টদের জন্য করুণা হয়। মজদুর রাজত্ব কায়েম হলে এদের কি গতি হবে—তার চিন্তায় নয়। এদের ভবিতব্য তো নির্ধারিত হয়েই আছে। কৌশিকবাবুর করুণা হয় এদের বুদ্ধিবৃত্তির দেউলিয়া অবস্থা দেখে।

আশ্চর্যের কথা, ওদের ক্যাম্পে অনেক বুদ্ধিজীবীও আছে! ঐ সব নীতিবাগীশদের কাছ থেকে নীতিবাক্যের আফিং খেয়ে খেয়ে দেশের বুদ্ধি এমন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে যে অবজেক্টিভ ভাবে একটা সহজ রিলেটিভ সত্যকে কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। এদেরই জন্য কৌশিকবাবুদের প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। "শাশ্বত সত্যে"র পূজারী হলে তাঁদেরকে আর সমাজবিপ্লবী হতে হবে না। কৌপিন এঁটে "ভজ গোবিন্দম্ মূঢ় মতে" করাই শাশ্বত সত্যের পূজারীদের পক্ষে শ্রেয়। সামাজিক ক্রান্তির অগ্রদূত হওয়া এই সব জীবন্মৃতদের সাধ্য নয়।

আসলে সত্য একটা রিলেটিভ উপলব্ধি। মূল লক্ষ্যের দিকে যে স্ট্র্যাটেজি এগিয়ে নিয়ে যাবে, তা-ই সত্য। মোদ্দা কথা হল লক্ষ্য পরিপূর্তি—যে কোন পন্থায় আদর্শের সমীপবর্তী হওয়া। এর মধ্যে অহেতুক নীতি ইত্যাদির বখেড়া টেনে আনা বিপ্লবকে পিছিয়ে দেবার গান্ধীবাদী পদ্ধতি। স্টেটাসকো-পন্থীরা চিরকালই কায়েমী স্বার্থের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ধর্ম ও নীতির দোহাই দিয়েছে। ভারতের ইতিহাসে গান্ধী এবং ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্টের বিশ্বাসঘাতকতার নায়ক ঐ গান্ধীর সাঙ্গপাঙ্গরা এরই মূর্ত প্রতীক।

কৌশিকবাবু জানেন যে এই জন্যই দীর্ঘ একত্রিশ বৎসর পূর্বে ক্রেমলিনের দূরদ্রষ্টারা কোমিণ্টার্নের প্রথম কংগ্রেসের কর্মসূচীতে ঠিকই বলেছিলেন যে, "ভারতবর্ষে গান্ধীবাদের মত যে সব মানসিকতা ধর্মীয় ধারণায় ওতপ্রোত, তা বস্তুতঃ পূর্ণমাত্রায় অনগ্রসর বিচারধারা। সমাজ-জীবনের দৃষ্টি থেকে

বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে গান্ধীবাদী ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রের দিক থেকে চরম প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ। সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য এরা সর্বহারাদের সমাজবাদে বিশ্বাসী নয়—এরা চায় এই সব অনুন্নত ও অনগ্রসর পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন। এ ছাড়া এরা নিষ্ক্রিয়তার প্রচারক, শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধী। বিপ্লবী শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এরা খোলাখুলি প্রতিক্রিয়াশীলতার স্তম্ভ রূপে দানা বেঁধে উঠছে। গান্ধীবাদ ক্রমশঃ অধিকাধিক মাত্রায় গণবিপ্লবের বিরোধী বিচারধারায় পরিণত হচ্ছে। কমিউনিজমকে এর বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়তে হবে।" রচনা মনোমত হলে ছেলেবেলা থেকেই কৌশিকবাবু মুখস্থ করে রাখতে অভ্যস্ত, তা সে পদ্য বা গদ্য যাই হোক না কেন। তাই কোমিণ্টার্নের বক্তব্যের শেষ পংক্তি তিনি আর একবার মনে মনে আওড়ালেন, "কমিউনিজমকে এর বিরুদ্ধে……।"

মাঝ পথেই থেমে গেলেন কৌশিকবাবু। ও কে? খরস্রোতার ঘাটের পথ থেকে কয়েক হাত দূরে একটি পাথরের উপর বসে অপলক দৃষ্টিতে নদীধারার দিকে চেয়ে আছে। শাড়ি আর ব্লাউজ পরার ধরন দেখে একথা বুঝতে তিল মাত্র দেরি হয় না যে ও গ্রামের কোন মেয়ে নয়। আর স্বাস্থ্যান্বেষী কোন তরুণী তো এভাবে এত সকালে একাকিনী নির্জন নদীর ঘাটে আসবে না। কৌশিকবাবু সর্বসাধারণের চলার পথ পরিহার করে একটু ঘোরা পথে এগোচ্ছিলেন। তাই সন্তর্পণে আর কয়েক পা এগোনর পরই উপবিষ্টা তরুণীকে পাশ থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। ও—ও তো মীনাক্ষী, স্বাহার ছাত্রী, জামসেদপুরের ছাত্রী ফ্রন্টের কর্মী মীনাক্ষী। বিস্মিত কৌশিকবাবু মীনাক্ষীর দিকে এগিয়ে চললেন।

জামসেদপুর গামী সকালের পার্সেল ট্রেনের একটি কামরায় বসে স্তম্ভিত কৌশিকবাবু মীনাক্ষীর কথাই ভাবছিলেন। উচ্ছ্বাসের মাথায় কাজটা করে কি ভাল হল? তিনি যে সচেতন ভাবে ওকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা নয়, তাঁর ভিতর থেকে কে যেন তাঁকে দিয়ে বলিয়ে নিল। অথচ মীনাক্ষীর কাছ থেকে তার কাহিনী শোনার পর কৌশিকবাবু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন যে তিনি এর দ্বারা পার্টির আদর্শ ভঙ্গ করলেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে একটু সহানুভূতি পাবার পর ঐ রুক্ষ বেশবাস বিভ্রান্ত মেয়েটির রক্তবর্ণ চক্ষু কেমন ধীরে ধীরে কোমল হয়ে এল তা তাঁর মনে আছে। পরম নির্ভয়ে কৌশিকবাবুর দুই পা জড়িয়ে ধরে তাঁর পায়ের সঙ্গে মুখ ঘষতে

ঘরতে মীনাক্ষী বোবা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। মনের যে দৃঢ়তা ও নৈর্ব্যক্তিক ঔদাসীন্যের ছদ্মাবরণে সে এতক্ষণ নিজের কাহিনী বর্ণনা করছিল, তা একটু সহানুভূতির স্পর্শে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে মীনাক্ষীর আসল রূপ—সহায়-সাহায্যকামী একটি অপরিণত-বুদ্ধি বিপদগ্রস্তা যুবতী আত্মপ্রকাশ করল। উত্তেজনা ও ঝোঁকের যে সম্মোহনী শক্তি ওকে বাড়ি ছাড়ার প্রেরণা দিয়ে একলা এই এতদূরে নিয়ে এসেছিল, তার প্রভাব কেটে যেতেই মীনাক্ষী নিজের অসহায় অবস্থাটা যেন বেশী করে বুঝতে পেরেছিল। তাই ঐ রকম বিভ্রান্ত অবস্থায় নদীর কূলে বসে থাকার সময়ে কৌশিকবাবুকে দেখতে পাওয়া তার কাছে ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ মনে হল। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে কৌশিকবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে ক্রন্দনজড়িত বিকৃত স্বরে বলল, “আমায় বাঁচান—বাঁচান কৌশিকদা।”

কিন্তু এ অঞ্চলে অপরিচিত কৌশিকবাবু আর কি করতে পারেন? পার্টির যাদের সঙ্গে পরিচয় আছে, তারা কেউ একে আশ্রয় দেবে না। আর তাঁর কাছে সময়ও তো বেশী নেই। এই গাড়িতে জামসেদপুরে যেতেই হবে তাঁকে। তাই তিনি মীনাক্ষীকে রাখামাইনসে নামিয়ে দেওয়াই স্থির করেছেন। ওর সঙ্গে ভোলানাথবাবুর নামে একটি সংক্ষিপ্ত চিঠিতে লিখে দিয়েছেন যে তিনি স্বয়ং শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে দেখা করে মীনাক্ষীর প্রসঙ্গ আলোচনা করবেন। কেবল ততক্ষণ ভোলানাথবাবু যেন ওকে আশ্রয় দেন।

রাখ্-খা-মাইন্স্, রাখ্-খা-মাইন্স্! কখন গালুডি পার হয়ে গেছে। গাড়ি সুবর্ণরেখার পুল পার হয়ে রাখামাইন্স্ স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। কৌশিকবাবু তাঁর পাশে নীরবে উপবিষ্টা মীনাক্ষীর পিঠে সস্নেহে হাত রেখে বললেন, “নেমে পড় তাড়াতাড়ি। পথের হদিস তো তোমাকে বলেছি। কাউকে জিজ্ঞাসা করে নিও নয়তো। আমি শীঘ্রই আসছি।”

“আসবেন তো!” কৌশিকবাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে করতে মীনাক্ষী বলল। ওর চোখে মুখে ভরসার ছটা।

আজ আর প্রণামে তেমন ভাবে বাধা দিতে পারলেন না কৌশিকবাবু। অনেকবিধ দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও তাঁর মনে কীসের যেন একটা পরিতৃপ্তি। সস্নেহ হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে তিনি বললেন, “নিশ্চিন্ত থাক।”

গাড়ি ছেড়ে দিল।

॥ চৌত্রিশ ॥

ছোট্ট কয়েক ছত্রের চিঠি ; কিন্তু তারই কী অসীম শক্তি। স্বাহার বাইরে ভিতরে মীনাক্ষীর হাতে লেখা ঐ ক ছত্র কী প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটিয়ে দিয়েছে! কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই ক ঘণ্টায় শত বার পড়ে পড়ে চিঠির প্রতিটি শব্দ স্বাহার কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। সমস্ত কাজ কর্ম চিন্তা ভাবনা ছেড়ে স্বাহা সর্বক্ষণ কেবল মীনাক্ষী ও তার চিঠির কথাই ভেবে চলেছে। কদিন হল দিল্লীতে ছাত্র ফেডারেশনের যে বৈঠক হয়ে গেল, তার প্রস্তাবের কাগজপত্র ও ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনার খসড়া এসেছে। কিন্তু তা পড়বার অবকাশ নেই। ইংলণ্ড থেকে কমরেড মস্‌কে পাঠান হবে। অথচ তার জন্য কাগজ কলম নিয়ে বসার আগ্রহ নেই। এমন কি আজ আর একটু পরেই জেলা কমিটির জরুরী সভা থাকলেও তার জন্য তৈরী হবার গা নেই। কাল থেকে এক নাম না জানা পোস্ট অফিসের অস্পষ্ট মোহর দেওয়া একটি খামের ভিতরকার কাগজের টুকরাটির অগ্নিগর্ভ কথাগুলি স্বাহার মস্তিষ্কে অবিরাম পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে।

মীনাক্ষী লিখেছে :

শ্রীচরণেষু দিদি,

আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি আমাকে কত ভালবাসেন জানা সত্ত্বেও আপনার পরামর্শ গ্রহণ করে সুজয়বাবুর দ্বারস্থ হতে পারলাম না। ওটা পাপ। কথাটা শুনে আপনি হাসবেন হয়তো। আপনার সঙ্গে তর্কে আমি পেরে উঠব না ; কারণ আমি জানি যে আমার জ্ঞান বুদ্ধির অনেকটাই আপনার কাছ থেকে পাওয়া। আমি তাই কেবল এইটুকুই বলব যে, যে কাজ জীব-প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারী, তাই পাপ।

আমার স্থান আমি নিজে করে নেব। অনির্দেশ যাত্রায় চলেছি। কোথায় গিয়ে এর শেষ, তা জানি না। তবে এইটুকু জানি যে আমার দায়িত্ব আমি এড়াবার চেষ্টা করব না।

আর একটা কথা বলি। কি জানি আর হয়তো কোন দিন আপনাকে বলার সুযোগ পাব না। এত দিন এত ঘনিষ্ঠ ভাবে আপনাদের মত ও পথকে জানার চেষ্টা করার পরও বলছি এ কথা। বলছি যে আপনাদের বিশ্বাস ও কর্ম ভুল—প্রচণ্ড ভুল। কিন্তু না, তর্কে প্রবৃত্ত হবার বুদ্ধি বা ইচ্ছা কোনটাই আমার নেই। এ যা বললাম, এর পিছনে যুক্তি নেই হয়তো ; কিন্তু

আমার ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্রতর অভিজ্ঞতা তো আছে। সুতরাং আমার কাছে এখনকার মত এ-ই সত্য।

আপনার যে ভালবাসা পেয়েছি তার তুলনা নেই। যেখানেই থাকি ভুলতে পারব না তার কথা। আমার অনেক অনেক প্রণাম নেবেন। ইতি—

মীনাক্ষীর হাতের অক্ষরগুলি উত্তেজনায় আঁকা বাঁকা। হয়তো এতদিনের সযত্নলালিত বিশ্বাসের বিরোধী কথা বলতে হয়েছে তাই। হয়তো বা ওসব কিছু নয়, তাড়াতাড়ি লেখা শেষ করার তাগিদেই এমনি হয়েছে। ট্রেন কিংবা বাসের সময় হয়ে যাওয়ায় হয়তো চিঠিটি তাড়াতাড়ি খামে পুরে মুখ এঁটে দৌড়ে গিয়ে সে গাড়ি ধরেছে। মেয়েটা অদ্ভুত স্মার্ট ছিল, আর ছিল বুদ্ধি ও কর্মশক্তিতে প্রদীপ্ত। স্বাহার বিশ্বাস আছে যে ও যেখানেই থাক না কেন, নিজের ক্ষমতায় স্থান করে নেবে। আহা, তাই নিক। ডান হাত শূন্যে নেড়ে ফিসফিস করে স্বাহা নিজের মনেই উচ্চারণ করে, "তাই নিক।" তার পরই সে বড় লজ্জিতা হয়। হাত নাড়ছিল কেন সে? যেন মনে হল মীনাক্ষী ওর কোল ঘেঁষে বসে আছে আর বাঁ হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে ডান হাত ওর গায়ে বুলিয়ে দিতে দিতে স্বাহা বলছে, "আহা, তাই নিক।"

চকিতে স্বাহার অনন্তর কথা মনে পড়ে গেল। ভীতু কাপুরুষ মেরুদণ্ড-বিহীন ছেলে। মেয়ে হয়ে মীনা যে সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিল, তার একাংশও যদি ছেলেটার থাকত। তা হলে—তা হলে মীনাকে এই রকম ভাবে অজানার উদ্দেশে পাড়ি দিতে হত না। অল্প বয়সের বিপদ কম নয়—অনভিজ্ঞতা-জনিত একটি বিপদই তো ওর কচি জীবন-লতিকাটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। এর উপর আবার যদি নূতন কোন বিপদ ঘটে? আর এ অবস্থায় স্বপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই কি সহজ ব্যাপার! অনির্দিষ্ট জীবনের বন্ধুর যাত্রাপথের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে হিংস্র শ্বাপদের মত মাংসলোলুপ অনন্তরা বসে নেই? হ্যাঁ, অনন্ত সম্বন্ধে এর চেয়ে কোমল কোন শব্দ স্বাহার পক্ষে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। আর সুজয়বাবু? উনি—উনি হচ্ছেন প্রচণ্ড স্বার্থপর। উনি যদি একটু উদার হতেন তা হলে মীনা বেচারীকে কি আর এমন বিপজ্জনক ঝুঁকি নিতে হয়? অনন্তর কেরিয়ার দেখছেন উনি—সব কেরিয়ারিস্ট সুবিধাবাদী।

পুরুষ জাতটাই সুবিধাবাদী বোধ হয়। সুবিধাবাদী এবং স্বার্থপর। আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক। মেয়েদের খানিকটা খেলিয়ে,

মৌমাছির মত তাদের চতুর্দিকে গুন্ গুন্ রবে স্তাবকতা করে মূঢ়মতি মেয়েদের মন ভুলিয়ে তাদের মধু লুণ্ঠন করে। কুসুমের লুণ্ঠনপর্ব সমাপ্ত হলে তার দিকে আর ফিরেও চায় না। নূতন কোন পুষ্পের যৌবনীত তনু ঘিরে ঘৃণ্য মধুকর তার ছলা-কলা বিস্তার করতে থাকে। দ্বিরেফ সদৃশ সমস্ত পুরুষ-জাতটার প্রতিই ঘৃণায় স্বাহার মন বিষিয়ে ওঠে।

কিন্তু কৌশিক—কৌশিককেও কি স্বাহা এই শ্রেণীভুক্ত করবে? ও অবশ্য কোন দিন বিশ্বাসের অমর্যাদা করে নি। কিন্তু করতে কতক্ষণ? জাতের স্বভাব যাবে কোথায়? আর···আর তা ছাড়া ও তো কোন দিন মুখ ফুটে কোন কথা প্রকাশও করে নি। তা হলে ওর উপর নির্ভর করার আধারই বা কই? কথাটা মনে আসতেই স্বাহা কিছুক্ষণের জন্য গুম্ হয়ে যায়। এত দিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, এত সাহচর্য ও সান্নিধ্য—সবই কি মিথ্যা মরীচিকা? এ কি কেবল কমরেডশিপ, তার বেশী কিছু নয়? না—না, অসম্ভব। মেয়েদের চোখ এ বিষয়ে ভুল দেখে না। চোখের পলকে মেয়েরা পুরুষের অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নেবার কলা জানে। ও কোন দিন মুখ ফুটে কোন কথা ব্যক্ত না করলে কি হবে? ওর হাবভাব, চালচলন, অঙ্গভঙ্গী,—সবই ওর মনের বিশেষ একটি কথা প্রকাশ করেছে। করুক, কিন্তু কেবল তার উপর ভরসা করে কত দিন বসে থাকা যায়? চিরকাল—যত দিন ও-পক্ষ প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যক্ত না করছে? না, স্বাহার আর এত সাহস নেই। মীনার এই ঘটনা স্বাহাকে এক জায়গায় অত্যন্ত স্পর্শকাতর আর ভীরু করে দিয়েছে। তাই অনিশ্চিত আশা নিয়ে কল্পনার স্বর্গে বিহার করতে স্বাহা আর রাজী নয়।

জেলা কমিটির সভায় কৌশিকও নিশ্চয় আসবে। আজই একবার সুযোগ মত—না, তাই বা কেন, সুযোগ করে নিয়ে স্পষ্ট ভাষায় ওর মনের কথা শুনতে হবে। মীনার মত প্রতারিত হতে স্বাহা প্রস্তুত নয়। সুদীর্ঘ নটি বছরের প্রতিটি দিবস ও রজনী কখনও সজ্ঞানে কখনও বা অবচেতন মনের প্রেরণায় পলে পলে তিলে তিলে স্বাহা নিজের হৃদয়রাজ্যে কৌশিকের জন্য যে রাজাসন রচনা করেছে, তা বিন্দুমাত্র স্থানচ্যুত হলে স্বাহা যে কি করবে তার কথা কল্পনা করার পূর্বেই যেন ওর হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায়, ওর সমগ্র চেতনাকে গ্রাসকারী একটা কৃষ্ণবর্ণ মেঘের যবনিকা নেমে আসে অসীম শূন্য থেকে। না—না—না, পাগলের মত আপন মনে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে নিজের মনে মনে স্বাহা বিড় বিড় করতে

থাকে। এত দিনের সযত্নলালিত আশা, নিদ্রা জাগরণের কামনার অস্তিত্ব আর নেই—এ কথা চিন্তা করাই অসম্ভব।

ঠক্ ঠক্, ঠক্ ঠক্, কয়েক মুহূর্ত থেমে শুধু একবার ঠক্।

স্বাহা চমকে উঠে রুদ্ধশ্বাসে বন্ধ দরজার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

হ্যাঁ, আবার ধীর অথচ নিশ্চিত মাত্রায় বাইরে থেকে দরজার উপর টোকা পড়ছে। ঠক্ ঠক্, ঠক্ ঠক্। কয়েক মুহূর্ত থেমে আবার ঠক্। এ সিগন্যাল ভুল হবার নয়। পার্টিরই কেউ নিশ্চয়। মীনাক্ষীর চিঠিটি চট করে ব্লাউজের ভিতর গুঁজে রেখে স্বাহা মনের বিষণ্ণ আলস্য ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। তার পর এগিয়ে গিয়ে দরজার খিল খুলে দিল।

কিন্তু ধীরে ধীরে দরজার পাল্লা ঠেলে যে ব্যক্তিটি ভিতরে প্রবেশ করল তাকে দর্শনমাত্র স্বাহার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল। আগন্তুকের সস্মিত হৃদ্যতা উপেক্ষা করে কঠোর স্বরে সে বলল, "আবার কি মনে করে বিভাস?"

বিভাস ইতিমধ্যে দরজায় খিল দিয়ে একটি চেয়ারে বসে পড়েছে। স্বাহার পরুষ ভাব গায়ে না মেখে সে বলল, "জেলা কমিটির মিটিং-এ এসেছি। ভাবলাম মিটিং-এর আগে তোমার সঙ্গে এক বার দেখা করে যাই। অনেক দিন তো দেখাশুনা নেই। আর—আর তুমিও নিশ্চয় মিটিং-এ যাবে। এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে না হয়।"

মধুপবৃত্তির আর এক প্রতিনিধি—আর একটি পুরুষ যার ঘনিষ্ঠ হবার আকাঙ্ক্ষা স্বাহা একেবারে ভালবাসে না। বহ্নিশিখার মত জ্বলে উঠে স্বাহা বললে, "কেন তুমি আমাকে বার বার বিরক্ত করছ বিভাস? কত বার বলেছি না তোমাকে যে তোমার এই গায়ে পড়া স্বভাব আমি দুই চক্ষে দেখতে পারি না।"

মুহূর্তে বিভাসের মুখমণ্ডল আঘাতের বেদনায় কাল হয়ে উঠল। কিন্তু অপমানিতের ভাব চেপে রেখে সে ধীরে ধীরে নিজের আসন পরিত্যাগ করে স্বাহার দিকে এগোতে এগোতে প্রেমমণ্ডিত কণ্ঠে বলল, "আচ্ছা, আমাকে এই ভাবে আঘাত দিয়ে তুমি কি আনন্দ পাও বল তো? আমরা মানে কমিউনিস্টরা তো আর আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করার সঙ্কল্পে বিশ্বাসী নই। তবে—তবে কেন তুমি…"

স্বাহা কয়েক লহমা যেন বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। বিভাস কাছে আসতেই সে হুঁশ ফিরে পেল। তীরের মত ছিটকে ঘরের এক কোণে সরে গিয়ে সে দাঁতে দাঁত চেপে গর্জন করে উঠল, "সাবধান, আর এক পা যদি

এগিয়েছ তো ভাল হবে না। যাও, যাও—এক্ষুনি বেরিয়ে যাও এখান থেকে। ফের যদি কখনও এই ভাবে অসভ্যতা করার দুঃসাহস হয় তো তা হলে সেই দিনই শেষ বোঝা-পড়া হয়ে যাবে।"

দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে স্বাহা উত্তেজনায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে। ওর চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত, নাসারন্ধ্র স্ফীত।

এই মূর্তির দিকে চেয়ে বিভাসের আর এগোতে সাহস হয় না। সাপের মাথায় মন্ত্রপড়া শিকড় পড়লে যেমন উদ্যতফণা ভুজঙ্গ নিমেষে ফণা নামিয়ে শান্ত হয়ে যায়, তেমনিই বিভাসের সব উচ্ছ্বাস, সকল আবেগ চোখের নিমেষে শীতল হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্ত সে মাথা নীচু করে প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। তার পর যখন আহত বেদনার্ত দৃষ্টি তুলে তাকায় তখনও দেখতে পায় যে স্বাহা সেই ভাবে দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখে কোন প্রশ্রয় নেই, নেই কোন প্রীতি বা সহানুভূতির চিহ্ন।

বিভাস মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দরজার দিকে চলা শুরু করে। ধীরে ধীরে দরজার কাছে পৌঁছে খিল খুলে আবার পিছনের দিকে ঘুরে তাকায়। স্বাহা ঘরের কোণে সেই তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বিভাসের চোখ দুটি এক নিমেষের জন্য জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ধক্ ধক্ করে জ্বলে ওঠে। ক্রুর কণ্ঠে হিস্ হিস্ করে সে বলে, "এত অহঙ্কার! আচ্ছা, এর প্রতিফল পাবে।" কথা কটি বলে সে বেগে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আর স্বাহা দ্রুতপায়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে খাটের উপর উবুড় হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। অশ্রুজলে মাখা মুখটি বালিশে বার বার ঘষতে ঘষতে অস্ফুট স্বরে সে উচ্চারণ করে, "আর যে পারি না এই ভাবে একা একা। এবার তুমি এস।"

* * *

নিজের মনকে অনেক শাসন করে অবশেষে স্বাহা যখন সরকার বিল্ডিং-এ উপস্থিত হল, কমরেড সিংহ তখন ওয়্যার প্রডাক্টস শ্রমিক ধর্মঘটের সর্বশেষ বিবরণ দিচ্ছিলেন। বিলম্বের জন্য লজ্জিতা স্বাহা নিঃশব্দে কামরার এক কোণে আসন গ্রহণ করল। কিন্তু তারই মধ্যে দ্রুত একবার ঘরের মধ্যে চোখ বুলিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিল যে কৌশিকও এসেছে।

কমরেড সিংহ বলছিলেন, "মালিক পক্ষ থেকে যেন কোন আপস করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। আজ ধর্মঘটের আটানব্বুই দিন শেষ হবে। কিন্তু এখনও মীমাংসার কোন আশা দেখা যাচ্ছে না। গেটের সামনে

সেই কাঁদুনে গ্যাস ছাড়া ও নারী শ্রমিক এবং নিরীহ জনতার উপর কংগ্রেসী পুলিসের গুণ্ডাচিত বর্বর আক্রমণের পর পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষায় তৎপর সরকার সারা ওয়্যার প্রডাক্টস এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করেছে। ঐ ঘটনার পর আরও সাত সপ্তাহ পার হয়ে গেল। বাইরে আমরা স্বীকার না করলেও কার্যতঃ অর্জুন মিস্ত্রীর দল স্ফীত হতে হতে এখন মোট শ্রমিকদের অর্ধেকেরও বেশী কাজে যাচ্ছে। এ অবস্থায় আমাদের কমরেডদের পক্ষে সাধারণ মজুরদের মরাল বজায় রাখার জন্য কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ছে।"

একটু থেমে শ্রোতাদের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কমরেড সিংহ বলতে লাগলেন, "এর পিছনে অবশ্য একাধিক ফোর্স কাজ করছে। কিছু পুরুষ ও নারী শ্রমিক সেদিনকার ঘটনার ফলে গ্রেপ্তার হবার জন্য আশে-পাশের গ্রাম থেকে আগত দিনমজুরী-করা শ্রমিকরাও ঘাবড়ে গেছে। ঐ সব গ্রেপ্তার শ্রমিকদের মামলা আমরা ডিফেণ্ড করলেও তারা খুব ভরসা পাচ্ছে না। সরকারের লেবার ডিপার্টমেণ্ট পূর্ববৎ চুপচাপ। আমাদের চিঠিপত্র তার ইত্যাদি বিশেষ কার্যকরী হয় নি। সব দিক থেকে চিন্তাজনক ব্যাপার হচ্ছে কোয়াটার্সের বাসিন্দা শ্রমিকদের অবস্থা। অফিস বা শিফটের কেরানীবাবুরাও এর মধ্যে পড়েন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই বহিরাগত। চাকরি ছাড়া এঁদের জীবিকার অন্য কোন উপায় নেই। তিন মাস বেতন না পাওয়ায় তাঁদের যে অবস্থা হয়েছে, তা বর্ণনাতীত।"

কণ্ঠে বেশ হতাশার রেশ থাকলেও তাকে জোর করে চাপা দিয়ে কমরেড সিংহ বলে চলেন, "পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস বা অন্যান্য জায়গার কমরেডদের কাছ থেকে আমরা যে আর্থিক সাহায্যের আশা করেছিলাম, তার একাংশও আমরা পাই নি। এখানে যা অল্প স্বল্প ওঠে তার থেকে ইউনিয়নের খরচ চালাবার পর এতগুলি পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার কথা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং গ্রাম থেকে যে সব ডেলি রেটের কমরেড আসত, তাদের অনেকে গ্রামাঞ্চলে বা শহরের অন্যত্র কোন কিছু যোগাড় করে নিলেও বাইরে থেকে আগত কোয়াটার্সের বাসিন্দা কেরানীবাবু ও টেকনিক্যাল হ্যাণ্ডদের কোন উপায় হয় নি। প্রথম মাসটা কোন মতে কেটে গেলেও দ্বিতীয় মাস থেকে তাদের সকলেরই সংসার অচল। মেয়েদের দু-একখানা গয়নাপত্র যা ছিল, গেছে। এবার অনেকে গরু-ছাগল বিক্রি করে দিচ্ছে। যাদের উপায় ছিল, তারা মেয়েদের দেশে পাঠিয়ে দিলেও এখনও অনেক কমরেড সপরিবারে এখানে আছেন এবং বর্তমান অবস্থা দেখে তাঁরা মরীয়া হয়ে উঠছেন। আর

যে বেশী দিন এ ধর্মঘট চালান যাবে এমন ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। অতএব সর্বশেষে আমি এই মন্তব্য করে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই যে ওয়্যার প্রডাক্টসের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর এবং আমাদের সর্ববিধ মনোযোগ পাবার অপেক্ষা রাখে।"

গম্ভীর কণ্ঠে কমরেড সিংহ তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করলেন। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য গোপন সভাগৃহ নীরব রইল। যেন একটি ক্ষুদ্র ছুঁচ পড়ার শব্দও শোনা যাবে এমনি থম্‌থমে ভাব। অবশেষে কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর ওয়্যার প্রডাক্টস শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক ব্রজকিশোর পাণ্ডে মুখ খুললেন। মৃদু স্বরে তিনি বললেন, "আমি অবশ্য জেলা কমিটির সদস্য নই এবং আমাকে তাই এই সভায় উপস্থিত থাকার অনুমতি দিয়ে আপনারা অত্যন্ত বাধিত করেছেন। তাই ভাবছি এখানে একটা কথা বলার অধিকার আমার আছে কি নেই—।" পাণ্ডেজী কুণ্ঠা ভরে আবার মৌন হলেন।

নিদ্রোত্থিতের মত কৌশিকবাবু বললেন, "না—না, বলুন—বলুন না আপনি। আশা করি কারও আপত্তি নেই এতে।" কৌশিকবাবুর কণ্ঠস্বরে বোঝা যায় যে তিনি যেন আত্মসমাহিত ছিলেন এতক্ষণ।

সুজয়বাবু স্বাহা কমরেড সিংহ ইত্যাদি আর সকলের দৃষ্টিতে সমর্থনের আভাস পেয়ে পাণ্ডেজী বলতে লাগলেন, "এখানকার অবস্থা আমাদের যতটা গুরুতর মনে হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বেশী শোচনীয়। আমি নিজে ওখানকার কর্মচারী বলে এই তিন মাস আট দিনের ধর্মঘটের অর্থ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছি। এখানকার কারও দিকে আর যেন মুখ তুলে তাকান যায় না। আমার কথা বিশ্বাস করুন, ওখানে আর কারও লড়ার ক্ষমতা নেই। আমি বিশ্বস্তসূত্র থেকে জানতে পেরেছি যে আজ-কালের মধ্যেই বাকী সকলে কাজে যাবে। আজকের এই বৈঠকে একটা কিছু হবে—এই আশা দিয়ে আমরা ওদের কোন মতে আটকে রেখেছি। না হলে অনেক আগেই কাজে যেত ওরা। সর্দার ইন্দ্র সিং-এর হাতে পায়ে ধরে আজব সিং-এর কাছে এই মর্মে বণ্ড সই করার ব্যবস্থা হচ্ছে যে আর কোন দিন কেউ ওখানে ইউনিয়নের নাম নেবে না এবং তা হলে তারা কাজ পাবে। আমার ধারণা এই বণ্ডে সই করে ওরা কাজে যাবে। গত পঞ্চান্ন দিনের মত রোজ দুই দশ জন করে নয়, বাকী হাজার খানেক মজুর এক দিনে কাজে যাবে এবং ওদের বাধা দেবার জন্য সেইদিনকার মত রেজারাও আর এগিয়ে আসবে না। এখনও একটা রফা হলে মজদুরদের রুজি আর

ইজ্জত দুই-ই বাঁচে। ভগবান—মানে আপনাদের দোহাই ওয়্যার প্রডাক্টসের মজদুরদের একটা ব্যবস্থা আপনারা করুন।"

কিন্তু কৌশিকবাবুর কানে পাণ্ডেজীর কথা যেন ঠিক ভাবে যাচ্ছিল না। কোন্ এক সুদূর জগতে বসে তিনি কোন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনছিলেন বটে; কিন্তু সে শব্দ খুব ভাসা ভাসা। বাক্য তার পরিপূর্ণ অর্থ নিয়ে কৌশিকবাবুর মানসলোকে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল না। থেকে থেকে তাঁর চোখের সামনে রুক্ষবেশবাস একটি অশ্রুসজল তরুণী মূর্তি ভেসে উঠছিল। সমস্ত পার্টির ইচ্ছার বিরোধিতা করে, কি করে তিনি ওকে বাঁচাবেন? অথচ যে নির্ভরতা ওর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল, তা দেখার পর ও সব মাইনর ব্যাপার বলে ওকে তো ঠিক ঝেড়ে ফেলে দিতেও পারছেন না। এক দিকে এই আর অপর দিকে মোহনপুরের খাদানের মজুরদেরও তো ঐ অবস্থা। কি করে দিন কাটছে ওদের? তা ছাড়া আর একটা কথা। কথাটা বিপজ্জনক হলেও ঘুরে ফিরে মনে আসছে—তা হলে কি ভোলানাথবাবুর কথাই ঠিক? নচেৎ কেন আর তেমন করে মার্কসের সেই দৃপ্ত ঘোষণার উপর ভরসা রাখা যাচ্ছে না? সেই যে তিনি বলেছিলেন যে সর্বহারাদের হাতে পায়ের শিকল ছাড়া হারাবার মত আর কিছুই নেই বলে তারা মরীয়া হয়ে নিজেদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম করবে। কথাটা কি সত্যি? এই রক্ত-মাংসের দেহ, তার ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং বেদনা সহ্য করার শক্তি—এ সবেরই একটা সীমা আছে নিশ্চয়। কিন্তু কোথায় সে সীমানা—কতদূরে? দু মুখো আক্রমণে কৌশিকবাবুর চিন্তাশক্তি বুঝি অসাড় হয়ে যাবে।

"ইনক্লাব জিন্দাবাদ কমরেডস।" পাণ্ডেজীর কথা শেষ হবার পূর্বে নাটকীয় ভঙ্গীতে ঘরে প্রবেশ করলেন এক জন আগন্তুক। তাঁর পিছনে রয়েছে কমরেড সুকুমার।

"আসুন, আসুন কমরেড আহমদ।" ঘরের মধ্যে সবাই হর্ষিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে নবাগন্তুককে অভ্যর্থনা জানালেন। কমরেড সিংহ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তাঁর সম্মুখে সম্ভ্রম সহকারে ঈষৎ আনত হয়ে বললেন, "আপনি আসছেন খবর পেয়ে আমাদের যে কী আনন্দ হল, তা বোঝাতে পারব না। আসুন, বসুন এখানে। কোন অসুবিধা হয় নি তো পথে?"

সকলের মাঝখানে উপবিষ্ট হয়ে কমরেড আহমদ আদ্দির পাঞ্জাবীর পকেট থেকে গোল্ডফ্লেক সিগারেটের একটি টিন বার করলেন। টিন খুলে তার ভিতর থেকে একটি সিগারেট বার করে দুই ঠোঁটের মাঝখানে চেপে ধরে

ষ্ট তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন। অতঃপর আরামসূচক অস্ফুট সঙ্গে মুখ থেকে এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "না, তেমন কিছু নয়।" কমরেড সুকুমারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রসন্ন বদনে তিনি মন্তব্য করলেন, "দিস ইয়ং কমরেড, মানে আমাদের তরুণ সাথীটির ব্যবস্থাপনায় ক্যানভাসার হিসাবে যে হোটেলটিতে উঠেছিলাম, সেখান থেকে আপনাদের এখানে আসতে বেগ পাবার কথাই উঠতে পারে না।"

পার্টির একজন এত বড় নেতার কাছ থেকে এই ভাবে সর্বসমক্ষে প্রশংসা পাওয়ায় কমরেড সুকুমার একেবারে কৃতার্থতার হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

কমরেড আহমদ এ দিকে বলে চলেছেন, "আর যাত্রাপথে এক ওষুধ কোম্পানির অতীব নিরীহ এজেণ্টকে কেনই বা লোকে বিরক্ত করবে? সঙ্গের বাক্সটিতে আবার বড় বড় করে কোম্পানির নাম লেখা। অতএব—" কমরেড আহমদ চোখ থেকে গগলস খুলে নিয়ে ব্যাক ব্রাশ করা কাঁচাপাকা চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে রহস্যভরা দৃষ্টিতে হাসলেন।

বাকী সকলের মুখেও হাসি ফুটে উঠল। পুলিসকে খুব বোকা বানান গেছে যা হোক।

কমরেড আহমদ এবার নড়ে চড়ে বসলেন। তার পর গম্ভীর স্বরে বললেন, "নাউ লেট আস কাম টু আওয়ার বিজ্‌নেস। খবর কি বলুন।" তাঁর কণ্ঠে পদমর্যাদাচিত গাম্ভীর্য।

ঈষৎ খিন্ন স্বরে কমরেড সিংহ বললেন, "ওয়্যার প্রডাক্টস কারখানার ধর্মঘটটা নিয়েই আমরা এখন বিশেষ চিন্তিত কমরেড। ওখানকার অবস্থা—"

তাঁর কথার মাঝখানেই কমরেড আহমদ ঘোষণা করলেন, "ওখানকার ব্যাপার তো ঠিক হয়ে গেছে।"

সাগ্রহে পাণ্ডেজী প্রশ্ন করলেন, "কোম্পানীর সঙ্গে ফয়শালা করার রাস্তা পাওয়া গেছে? কি হবে—এডজুডিকেশন না ট্রাইবুন্যাল?"

নিরুত্তাপ কণ্ঠে কমরেড আহমদ যেন ঘরের কড়িকাঠকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, "পার্টি লাইন বদলে গেছে। জুন মাসে পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটির মিটিংএর পর নূতন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন—এ খবর তো আপনারা জানেন। সুতরাং কমরেড রাও-এর ওসব নিছক এসিড বাল্ব ট্যাক্‌টিক্স আর স্ট্রীট ফাইটের কর্মসূচী লেফট ডিভিয়েশনিস্টদের আউট অফ ডেট রোমাণ্টিক কল্পনা প্রসূত ব্যাপার। সোসালিস্ট রিয়েলিজমের নামগন্ধ

ঐ কর্মসূচীর মধ্যে নেই বলে নূতন থিসিস অনুসারে ও সব বর্জনীয়। আগামী অক্টোবর মাসে কলকাতায় পার্টির যে কনফারেন্স হবে তাতে আপনাদের মধ্যে থেকে যে সব কমরেড যোগদান করবেন, তাঁরা এ সম্বন্ধে আরও ভাল ভাবে জানতে পারবেন। যাই হক, এই জন্য পার্টির পূর্ববর্তী সম্পাদককে প্রলিটারিয়েট ও পার্টির প্রতি শত্রুতার জন্য তাঁর দলবল সহ পার্টির সর্ব প্রকার গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে পার্জ করে দেওয়া হয়েছে। কমরেডবৃন্দ, আমাদের সম্মুখে এখন গুরুতর কর্তব্য। পার্টি সংগঠনের প্রাথমিক স্তরে পূর্ববর্তী সাধারণ সম্পাদকের যে সব স্টূজ আত্মগোপন করে আছে, তাদের খুঁজে বার করে এবার পার্জ করতে হবে।” শেষের দিকে কমরেড আহমদের কণ্ঠ বিচারকের দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণার মতই থম্‌থমে হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল। তার পর স্বাহা ধীরে ধীরে বলল, “কমরেড, আপনি আমাদের নূতন থিসিসের কথা বলুন। পার্টির এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানতে আমরা সবাই আগ্রহান্বিত।” আর সকলে স্বাহার সমর্থনে মাথা নেড়ে বললেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলুন।”

কমরেড আহমদ আর একবার ভাল করে নড়েচড়ে বসে পূর্ববৎ নৈর্ব্যক্তিক সুরে বলতে লাগলেন, “আপনারা সবাই জানেন বোধ হয় যে গত বছরের শেষের দিকে বর্তমান সাধারণ সম্পাদকসহ পার্টির আরও তিনজন অলইণ্ডিয়া লেভেলের নেতা আণ্ডার গ্রাউণ্ডে যান। আসলে ওঁরা অবশ্য মস্কো গিয়েছিলেন ক্রেমলিনের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য। এ বছর জানুয়ারী মাসে তাঁরা একটি অতীব গোপনীয় ও জরুরী ডকুমেণ্ট নিয়ে ফিরে আসেন। এর নাম হচ্ছে ‘ট্যাকটিক্যাল লাইন।’ এরই আধারে গত মে মাসে আমাদের ‘পলিসি স্টেটমেণ্ট’ রচিত হয়। কিন্তু ‘পলিসি স্টেটমেণ্টে’ সব কথা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। কারণটা সহজ—ওটা প্রকাশ্য ডকুমেণ্ট। এটা অর্থাৎ ‘ট্যাকটিক্যাল লাইন’-এর কথা পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটির সকলেই জানতেন না। এমন কি আমিও মাত্র দিন দশেক পূর্বে কমরেড ঘোষের কাছ থেকে জেনেছি।” কমরেড আহমদ এক মিনিট চুপ করে থেকে সকলের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

সকলে রুদ্ধ নিশ্বাসে তাঁর বক্তব্য শুনছেন—এ বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হবার পর তিনি আবার পূর্বতন উক্তির খেই ধরে বলতে লাগলেন, “যাই হক, নূতন থিসিসের মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে আমাদের আরও ইনফিলটারেট করতে হবে। ‘ট্যাকটিক্যাল লাইনে’র ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পার্লামেণ্টারী

কাজ আর বর্জনীয় নয়। ইলেকশানের সময় আমরাও তাতে ভাগ নেব। এর ফলে পার্টি আজ যেখানে যেখানে নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সেখানে আবার বৈধ হবে। নির্বাচনের সময় বিরোধীদের বিরুদ্ধ প্রচার ও নিজেদের প্রোগ্রামের প্রোপাগ্যাণ্ডা করে আমরা আমাদের অনুকূল জনমত তৈরী করব। তার পর পার্লামেণ্ট ও অ্যাসেমব্লিতে যাঁরা যাবেন, তাঁরা ঐ ফোরামকে কাজে লাগিয়ে রোজ কংগ্রেসী সরকারের অ্যাংলো-মার্কিন ঘেঁষা পুঁজিবাদী স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করতে থাকবেন। প্রত্যহ সংবাদপত্রে আমাদের কথা প্রকাশিত হবে। আর জনসাধারণকেও এইভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হবে যে আমরাই শোষিত নিপীড়িত শ্রেণীর একমাত্র দরদী নেতা—তাদের সত্যকারের চ্যাম্পিয়ান। প্রত্যক্ষভাবে কিছু করে দেখাবার দায়িত্ব না থাকায় আমরা ওদেরই রসদে পুষ্ট হয়ে ঐখানে ওদের গোর তৈরী করতে থাকব।"

"আর পার্লামেণ্টারী কার্যকলাপের বাইরে পিপলস লেভেলে আমাদের কোন কার্যসূচী থাকবে না?" কৌশিকবাবুর কণ্ঠস্বর যেন আর্তনাদের মত শোনাল।

তাঁকে অভয়দানের ভঙ্গীতে কমরেড আহমদ বললেন, "থাকবে না মানে? নিশ্চয় থাকবে। ওয়্যার প্রডাক্টস ধর্মঘট শেষ হলেও আপনি মোহনপুরের ধর্মঘট তো চালিয়ে যাচ্ছেন। মুর সাহেবরা তো আমাদের ইলেকশান ফাণ্ডে চাঁদা দেবে না। আর তাছাড়া বিদেশী পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন না থাকলে টেম্পো বজায় থাকবে কি করে? এই ভাবে ট্রেড ইউনিয়ন, কিষানসভা, মহিলা সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন, বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন, গণনাট্য, সাহিত্যিক গোষ্ঠী, তার পর—তার পর আমাদের নূতন ফ্রণ্ট শান্তি কমিটি—এই সবের মাধ্যমে আমরা পূর্ববৎ পিপল্‌স্ লেভেলে কাজ করব। আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার এই পিপল্‌স্ প্রোগ্রাম কি কখনও ছাড়া যায় নাকি? কথা হচ্ছে এই যে, এই সব পিপল্‌স্ অর্গানিজেশন মারফত আমরা সংঘর্ষকে ত্বরান্বিত করব এবং এই সব সংঘর্ষকে অ্যাসেম্বলি ও পার্লামেণ্টে সরকারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার কাজে লাগাব। তবেই না সব দিক থেকে জনসাধারণের মনকে বর্তমান শাসক শ্রেণীর উপর বিষিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।"

মুচকি হেসে কমরেড আহমদ বলে চললেন, "মার্কসের মূল সিদ্ধান্ত তো আমরা ছাড়ি নি। কেবল পরিবর্তিত ওয়ার্লড কনটেক্সট এবং এদেশের বিশেষ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে ইনডিভিজুয়েল টেররিজম মূলক নিছক

স্ট্রীট ফাইট বর্জন করে পার্লামেণ্টারী কার্যক্রমকে পিপল্‌স্ প্রোগ্রামের পূরক হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। এই দেখুন—।"

কথা বলতে বলতে কমরেড আহমদ পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বার করে চোখের সামনে মেলে ধরলেন। তার পর পূর্ব বক্তব্যের জের টেনে বলতে লাগলেন, "এই দেখুন 'ট্যাকটিক্যাল লাইনে'র প্রথম অনুচ্ছেদের শুরুতেই বলা হচ্ছে যে 'নট পিসফুল বাট রিভলিউশনারী পাথ'—অর্থাৎ শান্তির পথে নয়, বিপ্লবের পথে। আর মূল থিসিসের প্রথম থেকে আরম্ভ করে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত—অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশী ধরে এই বিপ্লবী পন্থা অর্থাৎ কৃষক মজুরদের সশস্ত্র সংঘর্ষ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।"

কমরেড আহমদ চুপ করলেন। কিন্তু কৌশিকবাবুর সংশয় মেটে না। তিনি দ্বিধাগ্রস্তের মত আবার বললেন, "ঠিক বুঝতে পারছি না কমরেড, পরস্পর বিপরীত এই দুই কর্মসূচী নিয়ে এগোন কতটা যুক্তিযুক্ত হবে।"

কমরেড আহমদের মুখমণ্ডল থম্‌থমে হয়ে উঠল। শূন্যপানে চেয়ে তিনি গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "আপনারা জেনে রাখবেন কমরেডস্ যে, যে প্রোগ্রাম মহান স্ট্যালিন ও কমরেড মলোটভের আশীর্বাদ লাভ করেছে, তাতে ভুল-ত্রুটির কোন অবকাশ থাকতে পারে না।"

ঘরের ভিতর সূচিভেদ্য নিস্তব্ধতা। অনেকক্ষণ বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর কমরেড সুকুমার কেবল ফিস ফিস করে উচ্চারণ করল, "মহান স্ট্যালিনের আশীর্বাদ পেয়েছে—!" ওর চোখ মুখ থেকে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা ক্ষরিত হচ্ছে।

কমরেড আহমদ কোন কথা উচ্চারণ না করে হাতের সিগারেটে একটি টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। তাঁর মুখে মৃদু হাসি, সে হাসি অনুকম্পার।

পাণ্ডেজী এ সব তাত্ত্বিক আলোচনায় রস পাচ্ছিলেন না। ওয়্যার প্রডাক্টস কারখানার শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থার কথা তাঁর মনের সবটুকু জুড়ে ছিল। তিনি তাই আবার অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু আমাদের—মানে কোম্পানির মজুরদের কি হবে?"

রুষ্ট কমরেড আহমদ যেন ফেটে পড়লেন এবার। পরুষ কণ্ঠে পাণ্ডেজীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, "বলছি ওখানকার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। সোজা কথাটা বুঝতে পারছেন না কেন? কাল থেকে ওরা কাজে যাবে।"

ঘরের ভিতর যেন বজ্রপাত হয়েছে এমনি ভাবে পাণ্ডেজী চমকে উঠলেন। তিন মাসেরও উপর এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালাবার পর কোন আপস নিষ্পত্তি ছাড়াই একেবারে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ! এর পর মালিক পক্ষ কি আর শ্রমিকদের জীবিত থাকতে দেবে? ইউনিয়ন সংগঠিত করে দাবি-দাওয়া পেশ করা তো দূরের কথা, যারা মালিকের পায়ে লুটিয়ে পড়তে পারবে না, তাদের জন্য কারখানায় কোন স্থানই থাকবে না। এবং কয় জনই বা সেই সুযোগ পাবে?

পাণ্ডেজীর মনের চিন্তা কমরেড আহমদ ছাড়া আর সকলের মনেই অল্প-বিস্তর ঢেউ তুলছিল; কিন্তু সাহস করে কেউ মুখ খুলছিলেন না। অবশেষে কৌশিকবাবু ধীরে ধীরে বললেন, "এই শর্তহীন আত্মসমর্পণের পরিণতি কি হবে, তা পার্টির নেতৃবৃন্দ চিন্তা করে দেখেছেন নিশ্চয়?"

কমরেড আহমদ কয়েক সেকেণ্ড জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কৌশিকবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "কমরেড কি মনে করেন যে পার্টি লীডারশিপ ভাল ভাবে চিন্তা না করেই কাজ করে?"

নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে কৌশিকবাবু বললেন, "না, না। সে কথা বলছি না। কিন্তু এর ফলে ওখানকার শ্রমিক আন্দোলন এবং এমন কি মজুরদের অস্তিত্ব পর্যন্ত কী ভীষণ ভাবে বিপন্ন হতে পারে—আমি তার কথাই বলছিলাম।"

"হয় হক। কি যায় আসে ওতে?" কমরেড আহমদের সুর মোটেই নরম হয় নি। পূর্ববৎ উষ্মা সহকারে তিনি বলতে থাকেন, "বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, কমরেড, পার্টির সঙ্গে আপনার এত দিনের সম্পর্ক হওয়া সত্ত্বেও আপনি এই কথাটা বুঝতে পারেন নি যে পার্টিকে ওয়ার্লড রিভলিউশান—সারা বিশ্বে কিষাণ মজদুর রাজ কায়েম করার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা ও কাজ করতে হয়। বিশ্বের শ্রমিকদের মুক্তির জন্য হাজার দেড় হাজার মজুর যদি নিশ্চিহ্নই হয়ে যায়, তাতেই বা ক্ষতি কি?"

শেষের দিকের কথাগুলি যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে শাণিত ছুরিকার মত পাণ্ডেজীর চোখের সামনে ঝলসে উঠল। তাঁর পায়ের অঙ্গুষ্ঠ থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত যেন এক বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল।

বিপ্লবের রথচক্রের নীচে যদি দু-দশ হাজার মীনাক্ষী পিষেই যায় তা হলে ক্ষতি কি তাতে? কৌশিকবাবুর মাথায় যেন সংশয়ের ভূত ভর করেছে। বিন্দুমাত্র নিরস্ত না হয়ে তিনি আবার বললেন, "আপনার কথা ঠিক মন্দে

হলেও একটা জিনিস বুঝতে পারছি না কমরেড। একেবারে অবজেক্টিভ ভাবেই জিজ্ঞাসা করছি যে, যে সব মজুরদের ভাগ্য এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত, তাদের মতামত না নিয়েই এ রকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কি গণতান্ত্রিক নীতি ?"

গণতন্ত্র ! বারুদের স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়ল যেন। উপবিষ্ট অবস্থাতেই সম্মুখের দিকে ঝুঁকে কৌশিকবাবুর দিকে তর্জনী নির্দেশ করে কমরেড আহমদ হুংকার ছাড়লেন, "এত দিন পার্টিতে কাজ করার পরও আপনাকে নূতন করে গণতন্ত্রের অর্থ বোঝাতে হবে নাকি ? পার্টি ক্যাডারের এ রকম অজ্ঞতা সত্য সত্যই লজ্জাজনক ব্যাপার।" তাঁর কণ্ঠ থেকে ক্রোধ এবং শ্লেষ ঝরে পড়তে লাগল।

কৌশিকবাবু নিজেকে আহত বোধ করলেন এবং কমরেড আহমদের অপ্রত্যাশিত উষ্মা দেখে যেন একটু বিভ্রান্তও হয়ে পড়লেন।

কমরেড আহমদ কিন্তু সমান ভাবে গর্জন করে চলেছেন, "এ কি বুর্জোয়া গণতন্ত্র পেয়েছেন যে পুঁজিপতিদের ইঙ্গিতে মাথা গুণতিতে শোষণকার্য সুচারু ভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে ? আমরা বিপ্লবী গণতন্ত্রের উপাসক এবং মেহনতী মজুরদের কাছে এইটাই এক মাত্র সত্যকার গণতন্ত্র। বলুন কমরেড, সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে আদর্শ গণতন্ত্র বা সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে কি না ?"

"নিশ্চয়। সে কথা বলতে।" কৌশিকবাবু এ কথার সমর্থন করেন।

"কে আনবে এই বিপ্লব ?"

"কেন, সর্বহারাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান কমিউনিস্ট পার্টি।" কৌশিকবাবু নিশ্চিন্ত ভাবে বহু দিনের অভ্যাসসঞ্জাত বিশ্বাস ঘোষণা করেন।

"সুতরাং সত্যকার গণতন্ত্রপ্রেমী, কৃষক-মজদুরদের সুহৃদ বিপ্লবীর কর্তব্য কি ?"

কিছুমাত্র দ্বিধা না করে কৌশিকবাবু উত্তর দেন, "কমিউনিস্ট পার্টিকে শক্তিশালী করা।"

এতক্ষণে কমরেড আহমদের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। সস্মিত বদনে তিনি বলেন, "তবে, তবে কেন প্রশ্ন করছিলেন যে ওয়্যার প্রডাক্টসের ধর্মঘট শেষ করা গণতন্ত্র সম্মত কিনা ? পার্টির প্রয়োজনে পার্টির নির্দেশে যে ধর্মঘটের সমাপ্তি হচ্ছে, তা বিশ্বে শ্রমিক রাষ্ট্র গঠনের সহায়ক বলে এই পদ্ধতি পূর্ণ মাত্রায় গণতান্ত্রিক। এরই নাম হচ্ছে পিপল্‌স্ ডেমক্রেসি—দু-চার জন

শোষণকারীর গণতন্ত্র বা কোন গোষ্ঠী বিশেষের গণতন্ত্র নয়। সমগ্র বিশ্বের কৃষক-মজদুরদের গণতন্ত্রের জন্য সর্বহারাদের প্রতিনিধিরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—তা-ই যথার্থ গণতন্ত্রসঙ্গত।”

শেষের কথাগুলি ঠিক মত কৌশিকবাবুর কানে ঢুকছিল না। তাঁর মন বলছিল যে কমরেড আহমদের কথা মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞান সম্মত হলেও এর কোথাও যেন একটা ফাঁক রয়েছে। কিন্তু কোথায়? এত দিন যাবত এই এই যুক্তিবিদ্যাতে বিশ্বাস করে, আর সকলকে বিশ্বাস করতে বলে শেষ কালে এর বাইরে দাঁড়িয়ে একে বিচার করা তো সহজ ব্যাপার নয়। ওয়্যার প্রডাক্টস কারখানার শ্রমিকদের এই ভাবে আত্মসমর্পণ করতে বলার মধ্যে যতই ডায়লেকটিক বিচার থাকুক না কেন, তবু যেন মন বিনা প্রতিবাদে এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে পারছে না। কিন্তু কেন—কেন— কেন?

কমরেড আহমদ তাঁর বক্তব্য বলে চলেছেন, “কথা হচ্ছে এই যে সমগ্র ভারতবর্ষে আমাদের ইলেকশন লড়তে হবে। এই ফ্রন্টে আমাদের তাই শক্তিশালী হওয়া দরকার। তার জন্য যেখানে যত কংগ্রেস বিরোধী দল আছে, তার সঙ্গে ইউনাইটেড ফ্রন্ট বা সংযুক্ত মোর্চা খাড়া করতে হবে। পাঞ্জাবে আমরা মাস্টার তারা সিং-এর আকালী পার্টির সঙ্গে আঁতাত করেছি। ওদের সঙ্গে এখন সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। আকালীদের মস্ত বড় নেতা হচ্ছে ওয়্যার প্রডাক্টস কারখানার মালিক সর্দার ইন্দ্র সিং-এর ছেলে সর্দার বলদেব সিং। সুতরাং পার্টির স্বার্থে বিপ্লবের বৃহত্তর প্রয়োজনীয়তার খাতিরে আর তো এখানে ধর্মঘট চালান যায় না।” কমরেড আহমদ একটু হেসে তাঁর নূতন স্ট্রাটেজি বর্ণনার প্রসঙ্গ সমাপ্ত করলেন।

তাঁর প্রসন্ন মুদ্রা কমরেড সিংহকে একটু ভরসা দিয়েছিল। তিনি তাই একটুক্ষণ ইতস্তত করার পর সাহস করে বললেন, “কিন্তু ঐ সব সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাত মেলালে আমাদের ক্ষতি হবে না তো? মানে পার্টির মঙ্গলের কথা চিন্তা করেই কথাটা বলছি।”

সুজয়বাবুও তাঁকে সমর্থন করে বললেন, “অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক সার্কলে আমরা প্রগতিবিরোধী বলে প্রচারিত হব না তো? মানে অনেকে তো এ সব প্রশ্ন তুলতে পারে, তাই জিজ্ঞাসা করে রাখছি। নয় তো পার্টির সিদ্ধান্তের উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে।”

“কমরেডস, পার্টির পক্ষে এটা কোন নূতন কথা নয়। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আমরা কি বলি নি যে পাকিস্তানের দাবি মুসলমানদের জাতীয়

দাবি? আমরা তো ইতিপূর্বে কোন দিন ভারতবাসীদের এক জাতি বলে স্বীকার করি নি, চিরকালই বলে এসেছি যে ভারতবর্ষে বহু নেশনের বাস। তা ছাড়া বরাবরই আমাদের এই স্ট্যাণ্ড যে মুসলীম লীগ মুসলমানদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং তাই আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুযায়ী ভারত ভাগ করা দরকার। কিন্তু—"

কমরেড আহমদ চোখের ইশারায় মৃদু হেসে বললেন, "কিন্তু এখন কে আর সে কথা মনে রেখেছে? জানেনই তো জনসাধারণের স্মৃতি-শক্তি বড়ই ক্ষীণ। তাই না আজ আমরা কংগ্রেস-ই পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে বলে প্রয়োজন মত জনমত ওদের বিরোধী করে তুলতে পারছি।" একটু দম নিয়ে কমরেড আহমদ আবার বললেন, "কমরেডস্, পার্টি লীডারশিপ এ সব কথা যে চিন্তা করেন নি, তা নয়। চিন্তা করে একেবারে ফুল প্রুফ পরিকল্পনা তৈরী করেছেন। আপনাদের ও প্রশ্নের জবাব অতীব সরল। বলতে হবে গণতন্ত্রের জন্য এর প্রয়োজন। কারণ সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য চাই বিরোধী দল এবং বিরোধী শক্তি আজ বহু বিভক্ত বলে প্রতিক্রিয়াশীল ও জনসমর্থনচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস ভোটে বিজয়ী হবে। সুতরাং গণতন্ত্রের কল্যাণের জন্য সব বিরোধী পার্টিদের ইউনাইটেড ফ্রণ্ট দরকার। একেবারে সহজ সরল যুক্তি।" কমরেড আহমদ দুই কাঁধ উঁচু করে একবার "শ্রাগ" করলেন। তাঁর মুখে রহস্যের হাসি।

একটু থেমে তিনি আবার বলতে লাগলেন, "দেখুন সর্বহারাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে সর্বক্ষেত্রে বিজয়ী হতে হবে—এইটা হচ্ছে মূল কথা। এর সঙ্গে ডায়লেকটিক চিন্তাধারা যোগ করুন। তা হলে অতি সহজে বুঝতে পারবেন যে পার্টিকে ফোরফ্রণ্টে আসার জন্য যে কোন কার্যক্রম, যে কোন পন্থাই ন্যায়সঙ্গত। এই দেখুন না, ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের স্ট্রাটেজি কি! বর্তমান সরকার ওখানকার রাজবংশকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। কাশ্মীর বা অন্যত্র আমরা সামন্তবাদের বিরোধী স্লোগান দিলেও ত্রিপুরাতে আমাদের মেন ইলেকশান ক্রাই বা প্রধান দাবি হচ্ছে রাজাকে পুনরায় ক্ষমতায় অধিরূঢ় করা। ত্রিপুরার সাধারণ জনতার মনে এখনও রাজভক্তির সেন্টিমেণ্ট প্রবল। সুতরাং অবজেক্টিভ কনডিশান এই কথা বলছে যে ওখানে রাজার পক্ষ নিয়ে আমরা ভোট-যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। কমরেডস্, আসল কথা হচ্ছে এই যে কমিউনিস্ট পার্টিকে ফোর ফ্রণ্টে আনতে

হবে—সকলের মুখে মুখে যেন কেবল একটি কথাই ধ্বনিত হয় যে লাল ঝাণ্ডাই এক মাত্র মুক্তিদাতা।"

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

সভা শেষ হয়ে গেলেও সদস্যদের অনেকেই এখনও কয়েক জায়গায় জটলা করছিলেন। দুই চার বা পাঁচ জনের বেসরকারী মিটিং চলছিল। কিন্তু কৌশিকবাবু চতুর্দিকে দৃষ্টি ফেলে দেখলেন যে তিনি একা—সম্পূর্ণ একাকী। কয়েক লহমা শূন্য দৃষ্টিতে সেই জনগোষ্ঠীর দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চমক ভাঙ্গার মত দ্রুত পদে সভা-গৃহ থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর কুঞ্চিত ললাটে আরও কয়েকটা বলিরেখা পড়েছে। চিন্তিত ভাবে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তিনি মাথার চুলের গোছা বার কয়েক মুঠো করে ধরে ঝাঁকানি দিলেন।

আত্মগত চিন্তায় বিভোর হয়েই তিনি সাকচীর পাঁচ মাথার মোড়টা পার হচ্ছিলেন। বেলা বোধ হয় সাড়ে চারটে হবে। সন্ধ্যার একটু আগে থেকে এখানে যে দৈনন্দিন মেলা লাগে, এখন তার পূর্ব প্রস্তুতি চলেছে। ও দিকে রেস্তরাঁগুলির সামনে সাজান চেয়ারের সারি এখনও ভরে ওঠে নি। কেবল দু-একটি দোকান থেকে অ্যামপ্লিফায়ার সহযোগে চটুল সিনেমা সঙ্গীত প্রচারিত হওয়া আরম্ভ করেছে। কৌশিকবাবু দক্ষিণে বামে না তাকিয়ে আত্মসমাহিত ভাবে পথ অতিক্রম করে চলেন।

অকস্মাৎ কার করস্পর্শ তাঁকে চমকে দিল। চকিত দৃষ্টি ফিরিয়ে তাঁর অনুসরণকারীকে দেখে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। অনুসরণকারী নয়, অনুবর্তিনী। স্বাহা পিছন থেকে তাঁর কনুই-এ হাত দিয়েছে।

মৃদু কণ্ঠে স্বাহা বলল, "বাব্বা, কতক্ষণ থেকে পিছনে পিছনে আসছি; কিন্তু তোমার খেয়ালই নেই।"

"না, মানে এই কতকগুলো কথা ভাবছিলাম কিনা।"

"সে তো চাল চলন দেখেই বুঝতে পারছি। যে উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা!" স্বাহার কণ্ঠে কৌতুক।

কৌশিকবাবু কিন্তু রহস্যের ধার কাছ দিয়েও গেলেন না। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তিনি ফিস ফিস করে বললেন, "তোমার কিন্তু এ ভাবে দিনের বেলায় পথ চলা ঠিক নয়। এখানকার ওয়ারেণ্ট আছে না! কার কখন চোখে পড়বে।"

স্বাহা একটু খুশী হল। তা হলে ওর দিকে কৌশিকের দৃষ্টি আছে, ওর জন্য চিন্তাও করে সে। মুখে কিন্তু সে জবাব দিল, "এত দিন এত কাছে থেকেও যখন তোমার চোখে পড়ি নি, তখন আর কি কারও চোখে পড়ব নাকি?" কিন্তু কথাটা বলেই স্বাহা একটু লজ্জিত হল। একথার যে অন্য রকম অর্থ হয়! পরক্ষণেই সে আবার জোর করে লজ্জার ভাবটা ঝেড়ে ফেলল। আজ তো সে বোঝাপড়া করবে স্থির করেছে। সুতরাং এত সহজে লজ্জা পেলে তো চলবে না। যাই হক, কথাটাকে ঘুরিয়ে নেবার জন্য সে আবার বলল, "মানে জনসমুদ্রই আত্মগোপন করবার সবচেয়ে ভাল জায়গা কিনা। এই যে আমরা সবার সঙ্গে মিশে পথ চলছি, এতে ধরা পডবার সম্ভাবনা কম।"

একটু আশ্বস্ত হলেও কৌশিকবাবু বললেন, "তবুও যথাসম্ভব সাবধান হওয়াই ভাল।" স্বাহা লক্ষ্য করল যে কৌশিকবাবু তার প্রথমের কথার নিহিতার্থ বোঝার চেষ্টাও করেন নি।

পথ চলতে চলতেই স্বাহা প্রশ্ন করল, "এত ব্যস্তভাবে চলেছ কোথায়?"

একটু থমকে দাঁড়ালেন কৌশিকবাবু। তার পর অবিচলিত ভাবে বললেন, "কেন, ধলভূমগড!"

দু-এক মুহূর্ত কি চিন্তা করে নিল স্বাহা। তার পর সঙ্কোচটা ঝেড়ে ফেলে বলল, "কেন, আজ থেকে যাও না। কাল যেও। তোমার শরীরটা খুব একটা ভাল ঠেকছে না তো। কেমন যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। আর তা ছাড়া সেই সেবার কোয়ার্টারে যে কদিন ছিলে, তার পর তো আর জামসেদপুরে এলেও না। এখন যদিও নিজের কোয়ার্টারের মত সুবিধে নেই, তবু একটা বেলা তোমার কষ্ট হতে দেব না। আণ্ডার গ্রাউণ্ডে কেমন রাজভোগ উপভোগ করছি দেখবে না একবার?" শেষের বাক্যটি স্বাহা বেশ লঘু ভাবেই উচ্চারণ করবার চেষ্টা করল।

কৌশিকবাবু চমকে উঠলেন। কি বলতে চায় স্বাহা? অলক্ষ্যে আর একবার তিনি পার্শ্ববর্তিনীকে দেখে নিলেন। দেখলেন সে দৃষ্টিতে বেদনা এবং সংবেদন ক্ষরিত হচ্ছে। আবার পথ চলা শুরু করে দিয়ে কৌশিকবাবু ধীরে ধীরে বললেন, "এবার উপায় নেই স্বাহা, মোহনপুরের ধর্মঘটের জন্য বড উৎকণ্ঠায় আছি। পার্টির নির্দেশ তো শুনলে। এখন কি করে কি করা যায় তাই ভাবছি। এবার কাজ আছে।"

"কাজ কাজ আর কাজ।" স্বাহার কণ্ঠে রোষ আর বেদনা যুগপৎ

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "আমার—আমার কথা শোনার জন্য সময় থাকবে কেন?" অভিমানে রুদ্ধকণ্ঠ স্বাহার মুখ দিয়ে আর কিছু বেরোল না। দাবি অনেক হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুদ্র চাহিদা পূর্ণ না হলে এমনিই হয়।

পথ চলতে চলতে কৌশিকবাবু স্থির দৃষ্টিতে স্বাহার দিকে চাইলেন। সেই অন্তর্ভেদী প্রশান্ত দৃষ্টির সম্মুখে স্বাহা যেন কেমন হয়ে গেল। দেখতে দেখতে কৌশিকবাবুর মুখে নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠল। সরল নির্দোষ হাসি অভয় ও নিশ্চিন্ততার দ্যোতক। হাসি মুখেই তিনি মৃদু স্বরে বললেন, "ছেলেমানুষি করো না—ছি!"

ওরা ততক্ষণে বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছে গেছে। স্টেশনগামী একটি বাসে উঠে বসে কৌশিকবাবু বললেন, "আচ্ছা, আসি তা হলে, আবার দেখা হবে।"

নীরব স্বাহা অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইল।

বাস ছেড়ে দিল। আর তার পরমুহূর্তেই সকালের সেই ভয়টা আবার যেন স্বাহাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। স্বাহার ইচ্ছা করল যে আফসোসে সে নিজের হাত কামড়ে চীৎকার করে ওঠে। কেন, কেন সে এত সহজে থেমে গেল। আজ একটা বোঝাপড়া করে নিল না কেন সে? অপস্রিয়মাণ বাসটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্ষোভে বেদনায় স্বাহার যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসার উপক্রম হল।

"কমরেড স্বাহাকে খুব বিচলিত মনে হচ্ছে।"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত স্বাহা পিছন দিকে ফিরে তাকাল। কে—কে তার কানের কাছে ফিস ফিস করে কথা বলছে?

স্বাহার প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিভাস হাসছিল। কিন্তু সে হাসিতে কোন প্রীতিস্নিগ্ধ দ্যুতি নেই। ক্রূর খল মনের এক কুটিল হাস্যে বিভাসের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। মনের সমস্ত বিষ কণ্ঠ দিয়ে উদ্গীরণ করে চাপা স্বরে সে বলল, "কমরেড স্বাহার বিশেষ কারও সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ স্থাপনে বাধা নেই। আর আমার মত যে হতভাগ্য তাঁর জন্য জীবন যৌবন, ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন—সব বিসর্জন দিতে পারে তার কপালে লেখা সদর দরজার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ।" উত্তেজনা ক্রোধ ও ঘৃণায় বিভাসের মুখমণ্ডল থেকে হাসির শেষ চিহ্নটুকু বিলুপ্ত হয়ে ফুটে উঠেছে এক বিকট জিঘাংসার ভাব।

বিভ্রান্ত স্বাহাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বিভাস উচ্চারণ করে, "এত অহঙ্কার! আচ্ছা, দেখা যাবে।" কথা কটি বিমূঢ়

নির্বাক স্বাহার মুখে ছুঁড়ে মেরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে একটি ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠে বসে। তার পর চালককে হুকুম করে, "স্টেশন—জলদি চালাও।"

পার্সেল ট্রেন সেদিন অস্বাভাবিক ভাবে ঠিক সময়ে এসেছিল। সুতরাং কৌশিকবাবু টিকিট কেটে ঐকটি যাত্রীবিরল কামরায় বসার অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

রেলের লোকো শেড ছাড়িয়ে গাড়ি চলেছে। চলন্ত ট্রেনের গতির সঙ্গে তাল রেখে দুলতে দুলতে কৌশিকবাবু চিন্তা-সমুদ্রে ডুবে গেলেন। শূন্য দৃষ্টি উদাসভাবে বহির্মুখী হলেও এই বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে তিনি যেন অচেতন। বহুমুখী চিন্তার পরস্পর-বিরোধী জটিলকুটিল আবর্ত তাঁর সত্তাকে যেন সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছে। অনেক দিনের সযত্নলালিত অনেকবিধ বিশ্বাস এবং অ্যাক্সিউমের সুদৃঢ় ভিত্তি এই প্রচণ্ড সংশয়-তরঙ্গের ঘূর্ণাবর্তে থর থর কম্পিত হচ্ছে।

ওয়্যার প্রডাক্টস শ্রমিকদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। মোহনপুরের ভবিষ্যৎও অনুমান করা যায়। কিন্তু কেন, কেন, কেন? কৌশিকবাবু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না যে কে দিয়েছে তাঁদের এই অধিকার? কিসের কারণে এতগুলি মানুষের শুভাশুভ সম্বন্ধে তাঁরাই হর্তাকর্তাবিধাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন? শুধু তাই নয়, মীনাক্ষীর মত সরল নিষ্পাপ মেয়ের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কর্তৃত্বই বা পার্টি কোথা থেকে পেল?

কিন্তু ইতিপূর্বে এ রকম ঘটনা কি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে আসে নি? এসেছে—বহুবার এসেছে। অথচ তখন তো আজকের মত এমন মানসিক সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হন নি কৌশিকবাবু। পার্টির নির্দেশে আগামী বিপ্লবের প্রস্তুতি স্বরূপ সে ব্যাপারে নিজ দায়িত্ব পালন করে অনুগত সৈনিকের মানসিক তৃপ্তি বোধ করেছেন তিনি তখন। আজ কেন এই সংশয় আর সন্দেহের দোলা লেগেছে তাঁর মনে?

কৌশিকবাবু আত্মবিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। তখন বোধ হয় মানুষের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না তাঁর। মানুষকে হয় বুর্জোয়া পুঁজিপতি অথবা সর্বহারা শ্রমিক বলে জানতেন। মোহনপুরের বিপিন মাহাত, কিনু সর্দার, ডমনা ভকত ইত্যাদিদের মত এত ঘনিষ্ঠ ভাবে এত নিকটে

থেকে ওদের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা বাসনার সঙ্গে ওতপ্রোত ও সমরস হয়ে আর কোন দিন মানুষকে দেখার অবকাশ আসে নি। পূর্বে যাকে তাই কেবল "ম্যাস" বা জনতা বলে মনে হত, আজ তার প্রতিটি ক্ষুদ্রতম অংশ সম্পূর্ণ স্বরাট এক-একটি সত্তা বলে বোধ হচ্ছে এবং তাই যতই তিনি অবজেক্টিভ হবার চেষ্টা করুন না কেন, ওয়্যার প্রডাক্টস বা মোহনপুরের ধর্মঘটী শ্রমিকদের হৃদয়যুক্ত সংবেদনশীল ব্যক্তি-মানবের সমবায় ছাড়া অন্য কিছু—কালেকটিভ মানুষরূপে কল্পনা করা যাচ্ছে না।

বিপিনের পর্ণ কুটীর, লাছুর জীর্ণ বাস, বাস্কের দারিদ্র্য, ডমনার বিশ্বাস, আশার মোহিনী কজ্জল শোভিত কিনুর উজ্জ্বল দৃষ্টি—সব যেন এক-একটি স্বতন্ত্র বিশ্ব। মীনাক্ষীর একক জীবনও এমনি এক স্বরাট দুনিয়া।

কৌশিকবাবুর ভিতর থেকে কে যেন হেঁকে উঠল—কমরেড এ সব সাবজেক্টিভ সেন্টিমেণ্ট প্রোলিটারিয়েট রিভলিউশনারীর পক্ষে শোভনীয় নয়। মনের ভিতর কার যেন বিদ্রূপ-হাস্য শুনতে পেলেন তিনি। কৌশিকবাবু আহত হলেন—বিপ্লবী বিবেকের চাবুকের আঘাত তাঁর মর্মমূলে পৌঁছাল। কিন্তু কই, তবু এই সাবজেক্টিভ চিন্তা তাঁকে রেহাই দিচ্ছে কই?

আর তা ছাড়া সাবজেক্টিভিটি একেবারে বর্জন করা যায় কি? নিজেকে যে অবজেক্টিভ বলে মনে করছে, সে-ই তো স্বয়ং একটি সাবজেক্ট। সুতরাং তাবৎ অবজেক্টিভিটি যে কোন না কোন রকমের সাবজেক্টিভিটি দ্বারা প্রভাবিত নয়, এ কথা জোর করে বলার উপায় কোথায়? এর পরীক্ষা যে করবে, তার পরীক্ষা বা বিশ্লেষণকারী বুদ্ধিও তো অবজার্ভারের মত একই ভাবে সাবজেক্টিভিটি দ্বারা আচ্ছন্ন। কিন্তু—। দূর হক এ সব তাত্ত্বিক আলোচনা। বুর্জোয়া মেটাফিজিক্স আজ গ্রাস করল নাকি তাঁকে?

ভোলানাথবাবুর সাহায্যে মীনাক্ষীর একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় হয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ধর্মঘটী শ্রমিকগুলির কি হবে? ওদের পরিবার সন্তান সন্ততি—সবাইকে এই ভাবে বিপ্লবের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া কি একেবারে অপরিহার্য? আর এ রকম কত শত ঘটনা ঘটার পর, কত লক্ষ কোটী নর-নারীর অশ্রু-সাগর ও রক্ত-সমুদ্র সৃষ্টি করার পর তাঁরা তাঁদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হবেন? এর চেয়ে সরলতর কোন পন্থা কি মানুষের উদ্ভাবনী প্রতিভা আবিষ্কার করতে পারে না? যাতে সালখু ডোমনা ইত্যাদিদের আগামী কাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাবার আশায় আজকে প্রচণ্ড নিগ্রহ

বরণ করতে না হয়। ভবিষ্যৎ তো অনিশ্চয়তার গর্ভে; কিন্তু তাদের নিশ্চিত বর্তমান দুঃখ ও ক্লেশের অনন্ত শরশয্যা।

আর একটা কথা। সকল ধর্মের পাণ্ডারাই তো এই রকম স্বর্গের প্রলোভন দেখান। বলেন মানুষের এ জন্ম কৃচ্ছ্রসাধনা করার জন্য এবং এর পরিণামে স্বর্গে বা পরজন্মে অসীম সুখ। কৌশিকবাবুর মনে হল তাঁদের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে ধর্মগুরুদের কথার কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম মিল রয়েছে। অন্ততঃ ওয়্যার প্রডাক্টস এবং মোহনপুরের মজুরদের বেলায় তো রয়েইছে। কোন এক নৈর্ব্যক্তিক সর্বহারাদের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য ওদের জীবন্ত নরককুণ্ডে আত্মবিসর্জন দিতে বলা হচ্ছে। কৌশিকবাবু শিহরিত হয়ে চিন্তা করেন যে সমস্ত পৃথিবীতে এই ভাবে সর্বহারাতন্ত্র স্থাপন করতে হলে নরকের এই এলাকাটাকে কতদূর বিস্তীর্ণ করতে হবে? আর কত কাল ধরে চলবে এই নরকবাসের পালা?

আর কি কোন উপায় নেই? অন্ততঃ কৌশিকবাবু তো এখনও দেখতে পাচ্ছেন না। ইতিহাস সমাজবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের গতি-প্রকৃতি বিচার এবং বিশ্লেষণ করে মার্কস ও এঙ্গেলস যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, কৌশিকবাবুর দৃষ্টিতে তদতিরিক্ত অপর কিছু তো চোখে পড়ছে না। নবজন্ম গ্রহণ করার পূর্বে শিশুর পক্ষে যেমন গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করা অনিবার্য, নবীন সমাজকে মূর্তকরণের পূর্বে এই নরকবাসও বোধ হয় তেমনি "নেসসারি ইভল" বা প্রয়োজনীয় পাপ। কিন্তু তাই কি? তা হলে মানুষের বিচার-বুদ্ধির মূল্য কি? প্রচলিত পন্থার ত্রুটি সংশোধনে যদি তার সদুপযোগ না হল, তা হলে জ্ঞান বুদ্ধি ইত্যাদি থাকা না থাকা তো একই কথা। আর তা ছাড়া এ কি চরম নিয়তিবাদ নয়? কপালে যা আছে তাই হবে, সুতরাং কেন বৃথা চেষ্টা করা—এর সঙ্গে এই মনোবৃত্তির তফাত কোথায়? মার্কস বলেছেন এই পদ্ধতিতে ইতিহাসের গতিপথে পুঁজিবাদের পর সমাজবাদ আসবেই। কমিউনিস্ট পারে কেবল ঐ গতি-প্রবাহের সঙ্গে নিজের সামর্থ্যকে জুড়ে দিয়ে ইতিহাসের পরিণতিকে ত্বরান্বিত করতে। কিন্তু মার্কসের এ কথা আজ মনঃপূত হল না কৌশিকবাবুর। মানুষের জন্য যদি ঐতিহাসিক পরিণতির গতি শ্লথ বা ত্বরান্বিত হতে পারে, তবে তার দিশা পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয় কেন? সালখু ডোমনাদের জীবনের উপর দিয়ে এই নিগ্রহের ঝটিকা-প্রবাহ বয়ে যাওয়া অনিবার্য হবে কেন?

কৌশিকবাবুর মনের ভিতর আজ ভীষণ এক ঝঞ্ঝা বয়ে চলেছে। এর

ভীম প্রবাহের সম্মুখে বহু দিনের সযত্নলালিত প্রত্যয়পুঞ্জ ছিন্নভিন্ন হয়ে মত্ত প্রভঞ্জনের করুণা নির্ভর শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মত নিঃসহায় বোধ করছে। থর থর করে কাঁপছে তাঁর সমগ্র সত্তার ভিত্তিমূল। কোথায় লুকিয়ে ছিল এত দিন এই যুক্তিজাল? হৃদয়ের কোন্ গহন কন্দরে আত্মগোপন করেছিল সংশয়ের এই শত সহস্র কালনাগিনীরা, যাদের মুহুর্মুহু বিষাক্ত দংশনের ফলে আজ তাঁর দেহ মন ও চৈতন্যের অণুপরমাণুতে এই অসহ্য দহন? অধীর ভাবে মাথা নেড়ে দুই চক্ষু মুদ্রিত করেন কৌশিকবাবু এবং তার পর কামরার দেওয়ালে শরীর এলিয়ে দেন। কিন্তু কই, তবু এ প্রদাহের উপশম হয় কই? তবু কেন এই সংশয়-শরের নিষ্ঠুর আক্রমণের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না?

কৌশিকবাবুর মনে হয় আজ তাঁর স্কেল অফ অবজারভেশন বা দৃষ্টিমান বদলে গেছে এবং তাই এত দিন যে বস্তুটাকে বিশাল পর্বত মনে হয়েছিল, আজ দেখা যাচ্ছে যে তা বল্মীক স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ উদাহরণের শব্দার্থ নিয়েই যদি বিচার করা যায়, তা হলে বলতে হয় যে ক্ষুদ্র পিপীলিকার কাছে বল্মীক স্তূপ সত্য সত্যই বিশাল পর্বত; কিন্তু তার সত্য স্বরূপ কি তাই? এ তো দৃষ্টিমানের পার্থক্যের ফল। একটি মানুষের চক্ষে দেখা, অপরটি পিপীলিকার। একই বস্তুকে দুটি পৃথক জাতির প্রাণীর দৃষ্টিমানে বিচার করলে যদি তাদের মধ্যে আকাশ-পাতালের ব্যবধান দৃষ্ট হয়, তা হলে ক্ষেত্রবিশেষে সমজাতীয় প্রাণীর মধ্যেও এই দৃষ্টিমানের পার্থক্য থাকা বিচিত্র নয়। না, আছেই। কারণ একই জিনিস কেউ খালি চোখে দেখে, কেউবা আবার চশমার সাহায্য না পেলে দেখতেই পায় না। পার্থক্য থাকা বিচিত্র নয়। আর এইটা খুব স্বাভাবিক। তা হলে সমাজবিজ্ঞানের যে "ল" বা বিধানের দোহাই দিয়ে বিশ্বজোড়া ডোমনা আর সালখুদের সমাজবিপ্লবের বেদীমূলে উৎসর্গ করার কথা হচ্ছে, তার স্বরূপ যে শাশ্বত সত্য আধারিত—এর প্রমাণ কি? এই অশ্রু- ও রক্ত-সাগরকে নেসসারি ইভল বলে স্বীকার করে নেবার পিছনে যৌক্তিকতা কই?

আর পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্রের মত কনক্রিট ভৌতিক বিজ্ঞানের "ল" বা বিধান যদি পরিবর্তনশীল হয়, নিউটনের সত্যকে আইনস্টাইন যদি ভ্রান্তি বলে প্রতিপন্ন করে থাকেন, তা হলে সমাজবিজ্ঞানের বিধান যে অক্ষয় অব্যয়—এ কথা বলা কি অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ সঞ্জাত মনোবৃত্তি নয়? এবং বিজ্ঞানের রাজ্যে শেষ কথা বলে কিছু আছে কি? তা হলে মার্কস ও

এঙ্গেলসের আবিষ্কারকে শাশ্বত সত্য বা "ল"—এর অভিধা দেবার তাৎপর্য কোথায়? প্রত্যুত কৌশিকবাবুর তো আজ মনে হচ্ছে যে সমাজবিজ্ঞান বা অর্থশাস্ত্রের আদৌ কোন "ল" হওয়া সম্ভব কি? লেবরেটারিতে "ল" আবিষ্কার প্রচেষ্টার গোড়ার কথা হচ্ছে "আদার থিংস বিইং ইকোয়াল"—অর্থাৎ বিচার্য প্রতিটি নমুনাকে একই রকম পরিবেশে বিশ্লেষণ করতে হবে। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের ক্ষেত্রে লেবরেটারিতে এই সুযোগ পাওয়া সম্ভব হতে পারে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান কি অর্থশাস্ত্রের বেলাতেও কি এ কথা খাটে? এতদুভয়ের কারবার জীবন্ত মানুষ নিয়ে এবং মানুষ বহু বিচিত্র ও সময় সময় পরস্পরবিরুদ্ধ কামনা বাসনার আকর। সুতরাং এখানে "আদার থিংস বিইং ইকোয়াল" হবার নিশ্চয়তা কি?

এর জবাবে হয়তো বলা হবে যে অতীত ইতিহাসের উপর আধার করে বিশ্লেষণ করা চলে। কিন্তু ইতিহাস বহুমুখী মানব-জীবন ও তার বহু বিচিত্র ক্রিয়াকর্মের কতটুকুকে লিপিবদ্ধ করে রাখতে পেরেছে? মানবজাতির জীবন ও কর্মের অধিকাংশই তো লিখিত ইতিহাসের বাইরে রয়ে গেছে। বিজ্ঞানীকে গবেষণার সময় অনেক "ড্যাটা" বা উপাত্ত বর্জন করতে হয়। সুতরাং এই বর্জন ক্রিয়ার শেষে যা জানা গেল তা তো "হেস্টি জেনারেলাইজেশন" অর্থাৎ ত্বরিত সাধারণীকরণও হতে পারে। আর তা ছাড়া জীবন-সত্য ও লেবরেটারির সত্য কি সদা সর্বদা অভিন্ন?

কৌশিকবাবু অধীর ভাবে মাথা নেড়ে ওঠেন—না না, কি করে তা হবে?

"কি বললেন বাবু?"

কৌশিকবাবুর চমক ভাঙে। লজ্জিত ভাবে তিনি চিন্তার রাজ্য থেকে বাস্তব জগতে ফিরে আসেন। ছি ছি, কি মনে করছে পাশের লোকটি তাঁর সম্বন্ধে? পাগল ভাবাও বিচিত্র নয়। মুখে—'কই, কিছু না তো' বললেও মনে মনে অপ্রস্তুত হন তিনি।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ধলভূমের উচ্চাবচ ধূসর প্রান্তর ভেদ করে ছুটে চলেছে লৌহশকট। আসন্ন রাত্রির আগমনবার্তা ঘোষিত হচ্ছে দিগ্‌দিগন্তে। দ্বিপ্রহরের পর থেকে নিজ প্রাধান্য বজায় রাখার ব্যর্থ সংগ্রামে পরাজিত হতে হতে অবশেষে অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষীণ আশাটুকুও বিসর্জন দিয়ে লজ্জারুণ বদনে বিদায় গ্রহণ করেছে সপ্তাশ্ববাহিত রথের হৃতগৌরব আরোহী দেব বিবস্বান। তাঁর পরাজয়ের গ্লানি, পরাভবের বেদনা ছড়িয়ে রয়েছে নীলাভ নভোমণ্ডলের সুবিন্দু থেকে সুদূর দিগন্ত অবধি। প্রচণ্ড মার্তণ্ডের এই

অনিবার্য পরাজয়ে তার আত্মজা ধরিত্রীও বেদনাভিভূতা। বিরল হলেও কৃষ্ণচূড়ার অলক্তক-বর্ণ পুষ্পদলে ধরণীর ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের ঘনীভূত শোণিতের নিদর্শন। শাল ও মহুয়ার নব মুঞ্জরিত গলিত হিরণ্ময়াভ কিশলয়-শিখরের থর থর শিহরণে এক ধূলিশয্যাশায়ী মহাবলীর অন্তিম নিশ্বাসের সর্বশেষ স্বাক্ষর।

কৌশিকবাবুর বক্ষ ভেদ করে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তার পর চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে অনেকক্ষণ ধরে তিনি তার কাঁচ মুছতে লাগলেন। সোজা হয়ে বসে থাকার উৎসাহ তিনি পাচ্ছিলেন না। তাই আবার কামরার দেওয়ালে হেলান দিয়ে চক্ষু নিমীলিত করে দিয়ে সমস্ত শরীরকে শিথিল করে দিলেন তিনি।

এই মানসিক দ্বন্দ্ব, এই বিচার সংঘাত বড়ই পীড়িত করেছে তাঁকে। কেমন একটা প্রচণ্ড শূন্যতা বোধ করছেন কৌশিকবাবু। মনে হচ্ছে যে সুদৃঢ় প্রস্তর স্তূপের উপর এতদিন পরম নির্ভরতায় তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, কি যেন কিসের প্রভাবে তা চকিতে অপসারিত হয়ে গেছে এবং এখন চোখের সম্মুখে এক বিশাল গহ্বরের অন্ধকার গর্ভদেশ তার করাল আস্য ব্যাদান করে প্রকট হয়ে উঠেছে। অথচ পতন থেকে রক্ষা পাবার কোন আশ্রয়, কোন অবলম্বন চোখে পড়ছে না তাঁর। বড় ভয়াবহ এই মানসিক শূন্যতা। মরুভূমির তৃষ্ণার্ত ক্লান্ত পথিক বহু আয়াসে পথ পরিক্রমা করে যখন মরুদ্যানের দ্বারদেশে উপনীত হল তখন দেখা গেল যা তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল, তা তার শুষ্ক কণ্ঠ সিক্তকরণক্ষম ওয়েসিস নয়—নিষ্ঠুর মরীচিকা। কে জানে তাঁর তৃষ্ণার শান্তি সুন্দরকান্তি বারিধারাপূর্ণ খর্জুর-বীথিকা শোভিত তড়াগ আরও কত দূরে?

"রাখ্‌খা মাইনস্‌—রাখ্‌খা মাইনস্‌।" সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে বাইরে থেকে কে হেঁকে উঠল। কৌশিকবাবু চমকে উঠে আত্মস্থ হলেন। উঃ, কখন আসানবনী পার হয়ে গেছে। চিন্তা-সমুদ্রে ডুবে থাকার জন্য খেয়ালই হয় নি তাঁর। একটি ছোট স্টেশনে এসে গাড়ি থেমেছে।

"রাখ্‌খা মাইনস্‌—রাখ্‌খা মাইনস্‌।" আবার সেই অদৃশ্য মনুষ্যকণ্ঠ চীৎকার করে উঠল। বিস্মৃত-স্মৃতি অতিথিদের আমন্ত্রণ জানাবার উদ্দেশ্যে এই তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর যেন প্রতিটি যাত্রীর কর্ণপটাহে তীব্র ভাবে আঘাত করে মস্তিষ্কের কোষে কোষে বিদ্যুৎ শিহরণ জাগিয়ে দিল। এই তো রাখা মাইনস্‌।

"রাখ্‌খা মাইন্‌স্‌—রাখ্‌খা মাইন্‌স্‌।" এবার দূর থেকে ঐ আহ্বান ভেসে আসছে। দূরাগত সেই স্বর কেন যেন কৌশিকবাবুর বেদনা বিজড়িত মনে হল। ভোলানাথবাবুর সহৃদয় মিনতি, না মীনাক্ষীর আর্ত আহ্বান? কেমন যেন নিশি পাবার মত ঝোলাটা কাঁধে ফেলে পায়ে পায়ে কামরা থেকে নীচে নেমে দাঁড়ালেন কৌশিকবাবু। আর তার পরই তীক্ষ্ণ ধ্বনি তুলে প্রায়ান্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে দণ্ডায়মান দীর্ঘদেহ সরীসৃপটা গতিশীল হল—ঝকু ঝকু ঝক্‌ ঝক্‌, ঝকু ঝকু ঝক্‌ ঝক্‌। কৌশিকবাবুর সম্মোহিত দৃষ্টির সম্মুখে কেবল কয়েক মুহূর্তের জন্য ট্রেনের পিছনের লাল বাতিটা কোন্‌ এক রহস্য-সঙ্কেতের মত জেগে রইল। গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌, গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌—গাড়ি সুবর্ণরেখার পুল পেরিয়ে গালুডির দিকে ছুটে চলেছে।

ছোট্ট স্টেশনটি অন্ধকারে এক রকম ডুবে গেছে বলা চলে। এক প্রান্তে কেবল একটি ক্ষুদ্র আলোক-শিখা দেখা যাচ্ছে—কেরোসিনের বাতি একটি। তবে তার থেকে আলোর তুলনায় ধোঁয়াই বেরোচ্ছে বেশী। এক-আধ জন যাত্রী যারা নেমেছিল তারা ঐ অন্ধকারের ভিতরই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। জনবিহীন প্ল্যাটফর্মের বুকে পদধ্বনি তুলে কৌশিকবাবু ঐ ধূম্র উদ্গীরণকারী আলোক-শিখা লক্ষ্য করে পদচারণা শুরু করলেন। ঐ তো ওর আড়ালে স্টেশন মাস্টার মশাই-এর অফিস ঘরটি এবার চোখে পড়ছে।

* * *

ক্ষুদ্র স্টেশনের স্টেশন মাস্টার মহাশয়ের এক মাত্র সহায়ক স্টেশনের নাম হাঁকার দায়িত্ব প্রাপ্ত লোকটির পাশাপাশি খোয়ার রাস্তা দিয়ে ভোলানাথবাবুদের আশ্রমে যেতে যেতে আবার চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন কৌশিকবাবু। ব্যাপারটা অতি সামান্য, অন্য সময় হলে খেয়াল করার মত ঘটনা বলে মনে হত না। কিন্তু আজ কূটচিন্তার যে ভূতটি তাঁর কাঁধে চেপেছে, তার প্রকোপে ছোটখাটো সাধারণ ঘটনাও অসাধারণ ঠেকছে। স্টেশন মাস্টার মহাশয়কে আশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কেবল পথের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হন নি—সঙ্গের লোকটিকেও সাথী করে দিয়েছেন। কৌশিকবাবুর সসঙ্কোচ আপত্তি অগ্রাহ্য করে তিনি বলেছিলেন, "বলেন কি মশাই? বিদেশে আপনি একজন ভদ্রলোক এই রাত্রিবেলায় পৌঁছেছেন, আর আপনাকে একলা ছেড়ে দেব! এটা কি মানুষের কাজ হবে নাকি? শিবচরণবাবু আর ভোলানাথবাবু শুনলেই বা কি ভাববেন।" সুতরাং লোকটি তাঁর পথপ্রদর্শক হয়ে চলেছে।

"এটা কি মানুষের কাজ হবে নাকি?"—আশ্চর্য ব্যাপার। এর মধ্যে স্বার্থ সংঘাত কই? প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করলেও তো স্টেশন মাস্টার মহাশয়ের এই বদান্যতার পিছনে কোন স্বার্থগন্ধ আবিষ্কার করা অসম্ভব। ভদ্রলোকের সঙ্গে জীবনে আর কোন দিন হয়তো দেখা হবে না। তবে কিসের জন্য তিনি তাঁর এইটুকু উপকার করলেন? গুরুতর চিন্তার বিষয়। তবে আইডিয়ালিস্টদের মত কি স্বীকার করে নিতে হবে যে মানুষে মানুষে আর্থিক সম্বন্ধ—স্বার্থ সম্পর্কই একমেবাদ্বিতীয়ম্ নয়? সহানুভূতি প্রেম করুণা ইত্যাদি বৃত্তিরও মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ধারণে হাত আছে। কিন্তু কতটা? যতটুকুই হক না কেন, একবার আছে বলে যদি মেনে নেওয়া যায়, তবে তার অভিবৃদ্ধির সম্ভাবনাও স্বীকার করতে হয় এবং মানবসমাজের কল্যাণার্থ এই সব বৃত্তির সযত্ন পরিপোষণও অবশ্য কর্তব্য বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু তা হলে শ্রেণী-সংগ্রাম কোথায় থাকে? বড় ভীষণ প্রশ্ন এ। আর শ্রেণী-সংগ্রাম পরিহার করে পূর্বোক্ত হৃদয়বৃত্তি সমূহের অনুশীলন দ্বারা কি বাঞ্ছিত লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায় না? আরও বিকট প্রশ্ন। না—না—কৌশিকবাবু এ সব কূট প্রশ্নকে মনে ঠাঁই দেবেন না। সব সন্দেহ তাঁর মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝরে পড়ে গেল, এই রকম একটা ভাব করে কৌশিকবাবু সামনের দিকে তাকালেন।

সম্মুখদেশে তখন কিন্তু ভানুমতীর খেলা শুরু হয়ে গেছে। কোন্ অদৃশ্য জাদুকরের জাদুযষ্টি হেলনে ধলভূমের রুক্ষ বন্য প্রকৃতি মোহিনী মূর্তি ধারণ করেছে। আকাশের অগণিত তারকা নক্ষত্র খচিত চন্দ্রাতপের এক কোণে কিশোরী চন্দ্রমা আলোকসজ্জায় সজ্জিতা হয়ে আবির্ভূতা। ঊর্ধ্ব গগনে গুরুগম্ভীর চালে সঞ্চরমাণ দুই এক খণ্ড মেঘের গায়ে সেই আলিম্পন পড়েছে। সম্মুখে দৃষ্টির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অবরোধ করে রয়েছে সমুন্নত-শীর্ষ দীর্ঘকায় রাঙ্গামাটি পর্বত। সেই অসীম মৌনতা-স্তূপের সাক্ষাতে কলকণ্ঠ বিহঙ্গমের কূজনও বুঝি প্রগল্‌ভতা করতে সাহস পায় না। কচিৎ এক-আধটি খেচরের সতর্ক কণ্ঠধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। এ দিকে কটি তাল গাছ বিজ্ঞের মত মৃদু মৃদু মস্তক আন্দোলিত করছে। তালের সুদীর্ঘ কাণ্ডে জ্যোৎস্নালোক পড়ে ওগুলি স্বর্গের হিরণ্ময় সোপানের রূপ ধারণ করেছে। এ দিকে শাল আর মহুয়ার পত্রগুচ্ছের ভিতর দিয়ে গলিত রজতবর্ণ কৌমুদী-কণা ক্ষরিত হচ্ছে। বৃক্ষগুলি যেন আলো-আঁধারের এক অনুপম বর্ণের তৈলচিত্র—মুঠো মুঠো আলোক ও অন্ধকারের রঙ কোন্

শিল্পীসম্রাট তাঁর চিত্রে এক স্থূলাগ্র তুলিকা দ্বারা অঙ্কিত করে দিয়েছেন। কিট্ কিট্ কিট্—ঝিল্লীর একটানা ঐকতান। সমগ্র নিসর্গব্যাপী এই অসীম শব্দহীনতার মাঝে মানুষের পদধ্বনিও আপনা থেকেই সতর্ক হয়ে যায়। এই আরণ্যভূমিতে তপস্যামগ্ন মহাযোগীর ধ্যান ভাঙ্গাবার সাহস কার আছে? অকস্মাৎ দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করে শিবারব ঘোষিত হয়—হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া। ঐ দুর্বিনীত জীবগুলি বুঝি কোন নিয়ন্ত্রণের ধার ধারে না।

"এই যে আসে গেলি বাবু। এই ফাটক ধরি আগাইঁ যান। টুকু গেলেই আশ্রমের বাবুদেরকে পাই যাবেন। হামি যখন এতটা আলি, তখনকে দুটি ভাত খাঁয়ে যাই ঘরেরলে। এই কাছেই ঘর হামার। খাঁইয়ে আবার টেশনকে যাতে হবেক। মাস্টরবাবু আর হামি—হামরা দু লোক রাতে টিশানে থাকি।" কৌশিকবাবুর সঙ্গী তার হাতে ধরা রেলের বাতিটি দুলোতে দুলোতে একটা সুড়ি পথ ধরল। জঙ্গলের ঝাঁটির বেড়ার মাঝখানে লাগান বাঁশের দরজাটির সামনে কৌশিকবাবু কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পর দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেলেন।

।। ছত্রিশ ।।

সমবেত কণ্ঠের সুরেলা ধ্বনি ভেসে আসছে। মিলিত কণ্ঠে কারা কি আবৃত্তি করছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে কৌশিকবাবু ছোট একটি গাছে হেলান দিয়ে থমকে দাঁড়ান। আর অগ্রসর হবার উপায় নেই। খড়ে ছাওয়া কয়েকটি মাটির কুঁড়ের সামনে একটি নাতিপ্রশস্ত অঙ্গন। সম্মুখস্থ অঙ্গনের ঠিক মাঝখানে একটি ঝাঁকড়া-মাথা মহুয়া গাছের চতুর্দিকে গোলাকার মাটির বেদী। তারই উপর বেশী নয়, বার চোদ্দ জন মানুষ মেরুদণ্ড ঋজু করে উপবিষ্ট। বৃক্ষতলের অন্ধকারে তাদের আকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দৃষ্টিগোচর নয়। কেবল ছায়াছবির প্রতিকৃতির মত তারা সমুন্নত মস্তকে বসে আছে—এইটুকু বোঝা যায়। বৃক্ষপত্রের ফাঁক দিয়ে ইতস্তত ঈষৎ জ্যোৎস্না চুঁইয়ে না পড়লে মূর্তিগুলিকে বিশিষ্ট আয়তনযুক্ত প্রস্তরস্তূপ বলে মনে না করার কোন কারণ ছিল না। স্থির অচঞ্চল ভাবে তারা মিলিত স্বরে এক স্তোত্র উচ্চারণ করছে। কণ্ঠস্বরে বোঝা যায় যে ওদের ভিতর নর নারী শিশু সকলেরই সমাবেশ হয়েছে।

কৌশিকবাবু সংস্কৃত ভাল বোঝেন না। সেই কবে ছাত্রজীবনের প্রথম পর্যায়ে সংস্কৃত পড়েছিলেন। তার পর এত দিন চর্চা নেই। তবু সুরের জন্য স্তোত্র তাঁর মনকে আকর্ষিত করল। বিচিত্র উদাত্ত এক সুর-তরঙ্গ—এর স্পর্শে মনের সব গ্লানি জড়তা ও অবসাদ কেটে গিয়ে নব জীবনের সূত্রপাত হয়। কৌশিকবাবু অভিভূতের মত ছোট গাছটির তলায় মৃত্তিকার আসনেই বসে পড়লেন।

ওরা তখন গাইছিলেন :

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধাঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

বড় জানা জানা মনে হয় শ্লোক দুটি। কোথায় শুনেছেন? আর বাঙলার সঙ্গে খুব একটা পার্থক্য নেই। তিনি তাই তাঁর যৎসামান্য সংস্কৃতের জ্ঞানের উপর ভরসা করে শ্লোক দুটির অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করতে লাগলেন। বিষয়ান্—নিশ্চয় বিষয়চিন্তার কুফল চিন্তা করা হয়েছে এতে। এর কথা ভাবতে ভাবতে আসক্তি জন্মে আর তা পূর্ণ না হলে হয় ক্রোধ। তার পর ক্রোধ থেকে মোহ, মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ অর্থাৎ শাস্ত্রের উপদেশ বিস্মৃতি ও বুদ্ধি বা জ্ঞানের নাশ তার পরবর্তী ধাপ। আর জ্ঞান লুপ্ত হলে সর্বনাশ আর কত দূর? এত দিনের অনুশীলনবিহীন পাঠ্যাবস্থার সংস্কৃত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে শ্লোক দুটির এর চেয়ে গভীরতর অর্থ আবিষ্কার করা কৌশিকবাবুর পক্ষে সম্ভব হল না। যাক্, পরে দরকার পড়লে ভোলানাথবাবুর কাছ থেকে বিশদ অর্থ জেনে নেওয়া যাবে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে হল যে শ্লোক দুটির বক্তব্য কি তাঁর ওপরও প্রযোজ্য নাকি? তাঁর জীবনের ধ্যান-ধারণাও তো এক ধরনের বিষয়চিন্তা।

কিন্তু আর বেশিক্ষণ ভাববার অবকাশ তিনি পেলেন না। স্তোত্রপাঠ থেমে গেল। একজন একটি গান শুরু করল—একক কণ্ঠে এবার, আর সকলে মূক। অদ্ভুত ব্যাপার! রবীন্দ্রনাথের এ গানটি আরও একাধিকবার কানে এলেও এমন ভাবে মর্মস্পর্শ করে নি তো কখনও। কী আশ্চর্য! এ যেন কেউ তাঁরই মনের অবস্থা ছন্দোবদ্ধ করে সুর সহযোগে গাইছে :

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীতসুধারসে এসো॥

কর্ম যখন প্রবল-আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারি ধার
হৃদয়প্রান্তে হে নীরব নাথ, শান্তচরণে এসো।

কিন্তু—কিন্তু এ প্রার্থনা কাকে জানাবেন কৌশিকবাবু? কাকে জীবন-নাথের মর্যাদা দিয়ে তিনি হৃদয় প্রান্তে শান্ত চরণে আসার জন্য অনুরোধ করবেন? তিনি তো এথিস্ট—ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। মানুষ নিজের সুবিধার জন্য নিজের প্রতিরূপ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে। অক্ষম নির্বোধ মানুষের জড়তা ও যুগযুগান্তব্যাপী শোষণের প্রতীক হচ্ছে ঈশ্বর। তবে?

গায়কের কণ্ঠ খুব উচ্চদরের নয়। হয়তো অনেক সূক্ষ্ম সুর তাঁর কণ্ঠে খেলছে না। কিন্তু একটা প্রাণ জুড়োন দরদ, মনের প্রচণ্ড আকুতি তাঁর সব ত্রুটি পূর্ণ করেছে এবং তাই কৌশিকবাবুর মনকে স্পর্শ করেছে এই সঙ্গীত। দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন কিসের আবেশে ঝিম্ ঝিম্ করছে। বুঝি মস্তিষ্কের প্রতিটি স্নায়ু এবং কোষে এই অপূর্ব সঙ্গীতের অনবদ্য ভাব ভাষা ও সুর-তরঙ্গ সম্মিলিত ভাবে আনন্দ-নৃত্য জুড়ে দিয়েছে। রিমি ঝিমি, রিমি ঝিম্—সেই অনির্বচনীয় আনন্দ প্রবাহের উৎস—বিচিত্র নৃত্যের কিঙ্কিণী শিঞ্জন অনুরণিত হচ্ছে তাঁর উভয় কর্ণমূলে। গায়ক গানটির শেষাংশ গেয়ে চলেছেন:

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন
দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ, রাজসমারোহে এসো।
বাসনা যখন বিপুল ধুলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো॥

কৌশিকবাবু দুই হাতে মাথার দুই দিক চেপে ধরে অতল চিন্তা-সমুদ্রে ডুবে গেলেন। তাঁর বাসনা কি তাঁকে এইভাবে অন্ধ করে ভুলিয়ে রেখেছে, আর এর জন্যই কি তাঁর মনে এত সংশয় দ্বন্দ্ব ও দুঃসহ বেদনার দারুণ অস্বস্তিকর অভিব্যক্তি? কে বলে দেবে তাঁকে যে সত্য কি? নিজে তো সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না এর। তবে কি ঐ পবিত্র আর অনিদ্র, যাকে রুদ্র আলোকে আসার জন্য আবেদন জানান হচ্ছে—তিনি? অসম্ভব—অসম্ভব। উটের পক্ষে যদিও বা সূচের ছিদ্র দিয়ে গলে যাওয়া সম্ভব হয়, তথাপি তাঁর মত একজন মার্কসিস্ট, একজন কমিউনিস্টের পক্ষে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এই ভাবে প্রার্থনা জানান অসম্ভব। প্রার্থনা স্তোত্র—এ সবই বুজরুকি। এর নাম ম্যাজিক ট্যাকটিক্স—ম্যাস হিপনটিজমের অতি পুরাতন নিদর্শন এ।

এদিকে প্রার্থনার এখন অন্তিম পর্যায় চলেছে। ধুন শেষ হয়ে গেছে। প্রার্থনাকারীরা এখন সমস্বরে উচ্চারণ করছেন, "অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য অসংগ্রহ, শরীরশ্রম অস্বাদ সর্বত্র ভয়বর্জন, সর্বধর্মে সমানত্ব স্বদেশী স্পর্শভাবনা, হি একাদশ সেবাবে নম্রতে ব্রত নিশ্চয়। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।" সকলে নীরব হলেন। একজন কেবল তার পর ঘোষণা করলেন —প্রার্থনা সমাপ্ত। সেই নির্দেশ শ্রবণের পরই প্রার্থনারত লোকেরা তাঁদের পাশে রাখা কম করা লণ্ঠনগুলির পলতে উস্কে দিয়ে এদিকে ওদিকে চলা শুরু করলেন। বিশ হাত দূরে ক্ষুদ্র বৃক্ষটির তলে নিঃসঙ্গ কৌশিকবাবু তখনও তেমনি আচ্ছন্নের মত বসে আছেন। উঠে গিয়ে কাউকে ভোলানাথবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করবেন—এই ইচ্ছাটুকুও যেন তাঁর মধ্যে থেকে লোপ পেয়ে গেছে।

* * *

"কে ও, এখানে কে বসে?" কখন যে একটি মনুষ্য মূর্তি তাঁর সামনে অদূরে এসে দাঁড়িয়েছে, কৌশিকবাবু তা টের পান নি। তিনি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন। "আমি, মানে—", জড়িত স্বরে উচ্চারণ করে দুই পা এগোতে না এগোতে তিনি এক জোড়া আবেগোচ্ছল বলিষ্ঠ বাহুর বন্ধনে বন্দী হলেন। হাতের লণ্ঠনটি মাটিতে নামিয়ে রেখে ভোলানাথবাবু এক লাফে তাঁর সামনে এসেই তাঁকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন। "উঃ, এ যে একেবারে আশাতীত ব্যাপার! আপনি—স্বয়ং আপনি এখানে আসবেন, এ কথা এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।" আনন্দের আতিশয্যে স্বভাবতই উচ্ছ্বাসপ্রবণ ভোলানাথবাবু মুখর হয়ে ওঠেন। তার পরমুহূর্তে সুর পাল্টে অনুযোগ ভরা কণ্ঠে তিনি বলেন, "আমার টানে তো এত দিনেও একবার আসার সময় হয় নি, এবার আমাদের মীনু বোন—মীনাক্ষীর দৌলতে আপনাকে আমাদের মধ্যে পেলাম। কিন্তু আচ্ছা লোক আপনি। এ ভাবে বসে থাকে? গরমের দিন—সাপ-বিছেতে কামড়াতে পারত তো? একবারে আপনার বুঝি শিক্ষা হয় নি। রাঙী বাছুরটাকে খুঁজতে হঠাৎ এ দিকে এসে না পড়লে তো দেখতেই পেতাম না। কতক্ষণ ঐ ভাবে বসে থাকতেন কে জানে।···না-না-না, এ বড় অন্যায় হয়েছে আপনার।"

যাক্, মীনাক্ষী তা হলে ভালভাবে এখানে পৌঁছে গেছে। একটা উদ্বেগের বোঝা কৌশিকবাবুর বুক থেকে নেমে গেল। কিন্তু ভোলানাথবাবুর কথার কি জবাব দেবেন? তাঁর জন্য এই উদ্বেগ, তাঁর

প্রতি এই প্রীতি-নিসক্ত অভিযোগ এ সবই এখন কোন্ সুদূর রত্নপুরীর বিস্মৃতপ্রায় মধুর সুরলহরীর মত মনে হয় তাঁর। হঠাৎ ছেলেবেলার কথা তাঁর মনে পড়ে যায়। মা বাবা এবং ভাইবোনের কলরবে মুখর তাঁর শৈশব ও কৈশোর কাল। তার পর, তার পর প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে কে কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে?

"চলুন চলুন, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? ঘরের দিকে চলুন। মীনুবোনও সকাল থেকে আপনার পথ চেয়ে আছে। জিনিসপত্র—ও কেবল এই ব্যাগটি বুঝি? ঠিক আছে আমার হাতে দিন। হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে দেয়ে তার পর কথাবার্তা হবে। রান্না এতক্ষণ হয়ে গেছে নিশ্চয়।" ভোলানাথবাবু কৌশিকবাবুর হাত ধরে একরকম টেনে নিয়ে চলেন।

খড়ে ছাওয়া ছোট একটি মাটির ঘরের দাওয়ায় উঠতে উঠতে ভোলানাথবাবু বললেন, "আসুন, আপনাদের মত গণ্যমান্য অতিথিদের জন্য এই আমাদের রাজপ্রাসাদ। সুতরাং আমাদের অবস্থা সহজেই বুঝতে পারছেন।" ভোলানাথবাবু লণ্ঠনটা তুলে ধরলেন। কৌশিকবাবু দেখলেন যে বক্তার মুখে সহজ সরল হাসির ছাপ। লণ্ঠনের দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ছায়াটাও ঘরের দেওয়ালে দোল খাচ্ছে।

ভিতর থেকে আলোর আভাস আসছিল। ভোলানাথবাবুর পিছন পিছন কৌশিকবাবুও ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। তাঁদের সাড়া পেয়ে ভিতরের বাসিন্দা প্রশ্ন করলেন, "কি খবর হে ভোলানাথ—নতুন অতিথি বুঝি?" কৌশিকবাবু দেখতে পেলেন প্রশ্নকারী ভদ্রলোক একটি খাটিয়ার উপর লম্বা হয়ে শায়িত। তাঁদের দেখে খাটিয়ার উপর উঠে বসলেন এবং স্মিত বদনে কৌশিকবাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোক সত্ত্বেও ভদ্রলোকের বয়স আন্দাজ করা কঠিন নয়, প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করার মুখে। শুভ্র মস্তকের সঙ্গে শ্বেতবর্ণ পোশাক সুন্দর মানিয়েছিল। নিকেল ফ্রেমের চশমাটির আড়ালে এক জোড়া সধ্যতা-মণ্ডিত চক্ষুর দৃষ্টি তাঁকে নিরীক্ষণ করছিল।

ভোলানাথবাবু ততক্ষণে দেওয়ালের পাশ ঘেঁষে দাঁড় করান একটি খাটিয়া টেনে এনে পেতে ফেলেছিলেন। খাটিয়ার উপর কৌশিকবাবুকে হাত ধরে বসিয়ে দিতে দিতে বললেন, "বিছানা পরে নিয়ে আসছি। বসুন এখন।" তার পর ঘরের অপর বাসিন্দাটিকে উদ্দেশ করে বললেন, "ইনি আমার বন্ধু সুরেনকাকা। নরসিংগড় স্কুলে এক সঙ্গে কাজ করতাম।

কথার শেষে কৌশিকবাবুর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে যোগ করলেন, "এঁর সঙ্গে আমার যত ভাব, ততই আবার ঝগড়া।"

হো হো করে ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। প্রশান্ত দিল্‌খোলা হাসি। হাসির ফাঁকে ফাঁকে তিনি বললেন, "বেশ, বেশ—ভালই তো। একেবারে দ্বন্দ্ব সমাস, কি বল ?" ভদ্রলোকের উচ্চ হাস্যের উষ্ণতা মনের অনেক জমাট বরফ গলিয়ে দেয়। কৌশিকবাবু আবার নড়ে চড়ে গুছিয়ে বসলেন।

ভোলানাথবাবু এবার কৌশিকবাবুকে উদ্দেশ করে বললেন, "আমার জেঠার বিশিষ্ট সহকর্মী ও বন্ধু সুরেনকাকা। এ অঞ্চলের এম. এল. এ····· " আরও যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন ভোলানাথবাবু। কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে সুরেনবাবু বললেন, "নাও হয়েছে। ঐ ল্যাজটুকুর কথা না বললে যেন নয়। আর ওসব সাহেবী কেতায় তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। তুমি তোমার বন্ধুর আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা কর। ফিরে এসে দেখবে আমাদের কেমন গলায় গলায় ভাব হয়ে গেছে।"

"ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন।" বলতে বলতে ভোলানাথবাবু ব্যস্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হলেন। তার পর হঠাৎ দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে অপ্রস্তুত কণ্ঠে বললেন, "এই দেখুন কৌশিকবাবু, মীনুবোনকে এখনও আপনার আসার খবর দেওয়া হয় নি। দাঁড়ান এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে।" ভোলানাথবাবু ত্বরান্বিত পদে চোখের আড়ালে চলে গেলেন।

মীনাক্ষী বেশীক্ষণ থাকে নি। বৌদি অর্থাৎ ভোলানাথবাবুর স্ত্রীকে রান্নাঘরে সাহায্য করছিল বলে কৌশিকবাবুর সঙ্গে দেখা করার পরই আবার রান্নাঘরে ফিরে গেছে। ওকে কর্মরত দেখে কৌশিকবাবু খুশীই হয়েছেন। তা ছাড়া এখন ওর চোখে-মুখে সকাল বেলার সেই অর্ধোন্মত্ত বিহ্বল ভাবটাও আর নেই। মীনাক্ষীর দৃষ্টি এবং কথাবার্তা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

মীনাক্ষী বলে গেল যে পরে এসে বিস্তারিত আলোচনা করবে। তবে এই ক ঘণ্টার মধ্যেই যে ভোলানাথবাবু এবং বিশেষ করে ওঁর স্ত্রী তাকে আপনার করে নিয়েছেন, প্রসন্ন মুখে একথা তাঁকে জানিয়ে যেতেও সে ভোলে নি। সুতরাং কৌশিকবাবু এবার কতকটা নিশ্চিন্তভাবে ঘরের অপর অধিবাসীটির প্রতি মনোযোগ দেন।

পরিচয় আদান-প্রদানের প্রারম্ভিক আলাপ লঘু পরিবেশের সৃষ্টি করে। অল্প সময়ের মধ্যেই এই হাস্যমুখর প্রৌঢ় বেশ আসর জমিয়ে নিয়েছেন। কৌশিকবাবুর মনে হল যে সত্য সত্যই এঁর কাছে

লৌকিকতা করার বিশেষ কোন কারণ নেই। তাই আলোচনাটা প্রারম্ভিকতার স্তর থেকে আরও একটু গভীর হলে তাঁর মন খুশী ছাড়া অখুশী হবে না এটা তিনি অনুমান করতে পারছিলেন। বিশেষত ঘরের মধ্যে মাত্র দুই জন লোক এবং তারাও বিনা কাজে চুপচাপ বসে থাকবে—এ এক অস্বস্তিকর পরিবেশ। সুতরাং সুরেনবাবুর প্রশ্নের জবাবে তাঁর এখানে আসার কারণ সংক্ষেপে ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা পাল্টা প্রশ্ন করেন, "আপনি তো এখানে থাকেন না, তবে হঠাৎ কোন কাজে নাকি?"

প্রশ্নটি শুনে সুরেনবাবু স্বভাবসিদ্ধ হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। তবে এ হাসি মুখর নয়, স্মিত। সহাস্য বদনেই তিনি উত্তর দিলেন, "একটু আলোর খোঁজে।" উত্তর দেবার পর হাস্যভরা দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

কৌশিকবাবু একটু বিভ্রান্ত ভাবে জবাব দিলেন. "মাপ করবেন। এর মানে তো বুঝতে পারলাম না। যদি আপত্তি না থাকে তা হলে আরও একটু স্পষ্ট করে বলুন।"

"বলছি। প্রায় বিশ বছর বয়স থেকে আলো খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম পলাশীর আমবাগানে যে প্রদীপ নিভে গিয়েছিল, ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট আবার বুঝি তা জ্বলে উঠেছে। কিন্তু আজ পাঁচ বছর পর বুঝতে পারছি যে দিল্লী, পাটনা আর কলকাতার কয়েকটা সুউচ্চ গৃহশীর্ষে আকাশ-প্রদীপ জ্বললেও সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামে তেমনি জমাট অন্ধকার।" সুরেনবাবুর কণ্ঠস্বর আবেগে থম্ থম্ করছে। লণ্ঠনের মৃদু আলোক সত্ত্বেও কৌশিকবাবু লক্ষ্য করলেন যে তাঁর চোখে মুখে কোথাও কৌতুকচিহ্ন নেই—একটা সূক্ষ্ম বিষাদের পর্দা তাঁর সমস্ত চেহারাকে যেন আবরণ করে বিরাজিত।

কৌশিকবাবু মৃদুস্বরে বললেন, "কিন্তু আপনি তো এম. এল. এ। শাসনের ভারপ্রাপ্ত দলের একজন স্থানীয় বিশিষ্ট······"

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুরেনবাবু বললেন, "কিছু না। আমি এক জন পরাজিত সৈনিক মাত্র। দীর্ঘ দিন মন প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করার পর যুদ্ধে বিজয় ঘোষিত হওয়ার পর মুহূর্তেই দেখছি, সে জয় আমার নয়। যে লক্ষ্য পূর্তির জন্য যুদ্ধে নেমেছিলাম, তার ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারি নি।"

অকৃত্রিম বিস্ময়ে কৌশিকবাবু আবার প্রশ্ন করলেন, "এ কি রকম কথা বলছেন আপনি? আপনাদের দলের হাতে শাসনক্ষমতা এল, আপনি

স্বয়ং তার একজন পরিচালক—ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য। আর তবুও বলছেন যে আপনি পরাজিত সৈনিক? সত্যি সত্যি এর অর্থ বুঝতে পারছি না!"

"হ্যাঁ, তবু বলছি আমি পরাজিত সৈনিক। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমাদের মত সাধারণ সিপাহীর লক্ষ্য ছিল এই যে স্বাধীনতার পর দীনতম দেশবাসীর পুনরুত্থান সম্ভব হবে। বুঝতেই পারছেন যে আমি 'য়হ আজাদী ঝুটী হ্যায়'— ঘোষণা করার দলে নই। রাজনৈতিক স্বাধীনতার ফলে মানুষ হিসারে আমাদের যে অভ্যুদয় হয়েছে, তার মূল্য আমি উপলব্ধি করি। কিন্তু কেবল এখানে এসে থমকে দাঁড়ালে শীঘ্র আবার এটুকুও চলে যাবে। ক্ষুধার তাডনায় মানুষ স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। আর চতুর্দিকে এমন বহু লোক রয়েছে যারা ক্ষুধার অন্ন দেবার প্রলোভন দেখিয়ে হাতকড়া পরাবার জন্য উন্মুখ। কিন্তু আমি এদের মারাত্মক সম্মোহনী শক্তির কবল থেকে দেশকে মুক্ত দেখতে চাই বলেই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য উদ্বিগ্ন। এ কথা আমি স্বীকার করি যে তাডাতাড়ি এ সব হয় না— এর জন্য সময় চাই। কিন্তু পথ যদি যথার্থ হয়, তা হলে যত সময়ই লাগুক না কেন, কোন না কোন দিন পথের শেষে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু পন্থা যদি ভ্রান্ত হয়? তা হলে তো আর কোন আশাই নেই। আর এ ক্ষেত্রে কেবল পথই ভুলি নি আমরা। সেটা যে ভুল সে কথা বোঝার বুদ্ধিও দ্রুতবেগে অদৃশ্য হচ্ছে। কী— বড নিরাশাবাদীর মত কথা বললাম আমি, তাই না? কিন্তু কি করব? আমার কাছে এ বডই বেদনালব্ধ সত্য।" সুরেনবাবু বোধ হয় দম নেবার জন্য একটু থামলেন।

কৌশিকবাবু তাঁর বক্তব্য ঠিক মত বুঝতে পারছিলেন না। যে দল শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়েছে, তাদের একজন প্রমুখ কর্মী এবং শাসনকার্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ব্যক্তি এমন অসহায়ের ভাব ব্যক্ত করছেন কেন? দীনতম ব্যক্তিটির কল্যাণসাধনই যদি ওঁর উদ্দেশ্য হয়, তা হলে তাঁদের দলের সরকারকে দিয়ে এ সব করাতে বাধা কোথায়? বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করে কংগ্রেসের পুঁজিবাদী চারিত্র-ধর্ম গোপন করার প্রয়াস নয় তো এ? মনের মত বিষয়ের অবতারণা হওয়ায় কৌশিকবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। তাই তিনি সুরেনবাবুকে বললেন, "দেশের পরিচালনার ভার পেয়েও যদি আপনারা এ না করে থাকতে পারেন, তবে দোষ তো আপনাদেরই।"

সুরেনবাবুর মুখে ম্লান বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "ঠিক বলেছেন, দোষ আমাদেরই। তা ছাড়া অপর কাউকে দায়ী করে লাভই

বা কি? কিন্তু একটা কথা বলব? দেশের পরিচালনার ভার আমাদের উপর—এইটাই সব চেয়ে মারাত্মক ভুল। একেই আমি বলছিলাম যে ভুল পথ ধরেও তা ভুল বলে বুঝতে না পারা।"

"তবে কারা আজ দেশ শাসন করছে?"

"আই. সি. এস আর আই. পি. এস থেকে শুরু করে দূরতম পল্লী পর্যন্ত আমলাতন্ত্রের যে বিরাট অক্টোপাশ তার পঁয়তাল্লিশ লক্ষ বাহু বিস্তার করে রয়েছে, তারাই হচ্ছে সত্যকার ভারতভাগ্যবিধাতা। আর আমরা? আমরা কেবল কাঠের পুতুল। সুতোর টানে নাচি ছুটি; কিন্তু স্বতন্ত্র ভাবে কিছু করার ক্ষমতা নেই।"

"আশ্চর্য ব্যাপার! তাঁরা তো মন্ত্রীদের অধীনস্থ মাত্র। মন্ত্রীদের হুকুমেই তো তাঁদের কাজ করতে হয়।"

"রঙ্গমঞ্চের বাইরে থেকে এমনি মনে হয় বটে; কিন্তু সাজঘরে থাকলে সত্যকার অবস্থা চোখে পড়বে। আর সত্যি কথা বলতে কি এ ছাড়া উপায়ও নেই। বানানো গল্প নয়—সত্য ঘটনা বলছি একটা। এ প্রদেশের জনৈক মন্ত্রী আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি দ্বারভাঙ্গা জেলার অধিবাসী হলেও ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে গ্রেপ্তার হয়ে হাজারিবাগ ও ফুলওয়ারী শরিফের জেলে একই কামরায় আমরা সুদীর্ঘকাল কাটিয়েছি। এবার তিনি মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হবার দিন আবেগ ভরে আমার দুই হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, ভাই দেশসেবার এই বিরাট সুযোগ যখন পেয়েছি, তোমরা প্রার্থনা কর যাতে এর সদুপযোগ করতে পারি। দুই জনে বসে আমরা সুদূর পল্লীর দীনতম ব্যক্তিটির সুখ-সুবিধা বিধানের জন্য কত জল্পনা-কল্পনা করলাম। সমস্ত সরকারী যন্ত্রটিকে কি ভাবে জনতা-অভিমুখী করা যায়, তা নিয়ে কত আলোচনা হল। এর মাস তিনেক পর এক দিন অ্যাসেম্‌ব্লি ফেরত তাঁর বাড়ি গেলাম। কথায় কথায় প্রশ্ন করলাম যে তাঁর বিভাগ মারফত জনসেবার আমাদের সেই পরিকল্পনার কি হল? তিনি কি বললেন জানেন?"

জ্বলজ্বলে দৃষ্টি নিয়ে সুরেনবাবু কয়েক মুহূর্ত কৌশিকবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তিনি ঘোষণা করলেন যে তাঁর ও আকাশকুসুম স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। আমি চমকে উঠলাম। কারণ দীর্ঘকালের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের জন্য তাঁর আদর্শবাদী সত্তার উপর আমার গভীর আস্থা ছিল। আমি তাই ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, কেন— কি হল আবার? বন্ধুটি হতাশ ভাবে বললেন— ভাই আমার সেক্রেটারীকে আমি

চালাব কি, সে-ই আমাকে চালাচ্ছে। খুব তো অহঙ্কার নিয়ে সেক্রেটারিয়েটে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম কত কি করব। কিন্তু সেক্রেটারীদের সঙ্গে পরিচয় হওয়া মাত্র বুঝলাম যে তাঁদের কাছে আমি নেহাত পিগমি বা শিশু। ওঁরা এক এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র। দশ বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় ওঁরা প্রত্যেকে সেক্রেটারিয়েট থেকে শুরু করে জেলার কালেক্টরেট পর্যন্ত প্রতিটি দপ্তরের অন্ধিসন্ধি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। সেখানে স্বাধীন ভাবে কোন মন্ত্রী কিছু করতে গেলে এঁরা এমন ভাবে রুল আর প্রিসিডেন্সের কলকাঠি টিপে দেবেন যে স্বাধীনচেতা মন্ত্রীর তার পর প্রাণ-বাঁচান দায়। সুতরাং আমাদের মত নূতন লোকের ওখানে হালে পানি পাওয়া অসম্ভব। অতএব মন্ত্রিত্ব বজায় রাখতে হলে সেক্রেটারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

সুরেনবাবুর ক্ষুব্ধ কণ্ঠ নীরব হল। কয়েক মুহূর্ত তিনি হাঁটুর উপর দক্ষিণ কনুই রেখে হাতের উপর নিজের থুতনি ন্যস্ত করে শূন্য দৃষ্টিতে বসে রইলেন। তার পর আবার ধীরে ধীরে কতকটা যেন স্বগতোক্তির মত বলতে লাগলেন, "ইংরেজ আমলে আমরা ভাঙ্গার আন্দোলন করেছি। এর পাশাপাশি নূতন সমাজগঠনের কথা মহাত্মাজী বললেও সে কথা তো শুনি নি। সুতরাং আজ অন্ততঃ এই সরকারী যন্ত্রকে গঠনমূলক কাজে লাগাবার ক্ষমতা আমাদের নেই। এক এক জন মন্ত্রীকে নির্বাচনে জেতার জন্য, জনপ্রিয়তা বজায় রাখার খাতিরে প্রাইমারী স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভা থেকে মুদিখানার উদ্‌ঘাটন ইত্যাদি কী না করতে হয়? তার পর বাইরের টুর আছে, আছে প্রতিষ্ঠানগত নির্বাচন ও দল রাখার হাঙ্গামা। এ সবের পর প্রত্যক্ষ প্রশাসন কার্যে কতটুকু সময়ই বা তাঁরা দিতে পারেন? এই অবস্থায় অধিকতর কর্মকুশল সেক্রেটারীদের তৈরী নোটে চোখ বুজে সই না করলে ফাইলের জঙ্গল পরিষ্কার হয় না এবং তাঁদের লিখে দেওয়া জবাব অ্যাসেম্ব্লিতে না পড়লে গায়ের চামড়া বাঁচে না। সুতরাং বুঝতেই পারছেন।" সুরেনবাবু শ্লেষভরা কণ্ঠে হেসে ওঠেন।

কৌশিকবাবু আগ্রহ ভরে সুরেনবাবুর বক্তব্য শুনে যাচ্ছিলেন। তিনি এবার বললেন, "আপনার বিশ্লেষণ অনেকাংশে সত্য হলেও পুরোপুরি মেনে নিতে পারছি না। কারণ পৃথিবীতে এমন নিদর্শনের অভাব নেই যেখানে কেবল শাসক দলের ভিতর জনসাধারণের মঙ্গলেচ্ছা পরিপূর্ণ ভাবে থাকায় প্রচলিত শাসনযন্ত্রের বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করে তার দ্বারা তাঁরা

জনকল্যাণ করছেন। আসলে প্রয়োজন মেহনতী জনতার একটি পার্টির এবং সেই পার্টি ক্ষমতা হাতে পেলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করলে অনেক সময় লেগে যাবে। সুতরাং প্রথমে আপনি কি সমাধানের কথা ভাবছেন, তাই শোনা যাক।” কৌশিকবাবু আত্মপরিচয় প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা এড়াবার জন্য কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।

বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে সুরেনবাবু বললেন, “আমার কাছে এখনও কোন সমাধান নেই। আর নেই বলেই তো বললাম যে এখানে আলো খুঁজতে এসেছি। একটা মৌলিক প্রশ্ন আমার মনে উঠেছে—জনসাধারণকে কি চিরকালই কোন না কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিগোষ্ঠী বা দলের উপসর্গ হয়েই কাটাতে হবে? পথচারী সাধারণ ব্যক্তিটি কি কোন দিনই নিজের ইচ্ছা মত স্বীয় ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারবে না? আজকের বিপ্লবীদল কাল ক্ষমতা পেলে বাস্তব অবস্থার দোহাই দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলতার সমর্থক হয়ে উঠবে না—এর নিশ্চয়তা কোথায়? এই সব প্রশ্ন মনকে পীড়িত করছে বলেই এখানে শিবচরণদার কাছে এসেছি। জানেন বোধ হয় উনি কাল সকালে পদযাত্রায় বেরোবেন। আমিও ঘুরব কিছু দিন ওঁর সঙ্গে। দেখি আমার অন্ধকার বিনোবাজীর আলোয় দূর হয় কি না?”

“বিনোবাজী—ও, তা তিনি আবার কি করছেন?”

“শোনেন নি বুঝি সে খবর? কমিউনিস্টদের সহিংস কৃষক আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সরকারী দমননীতি—এই দুয়ের মাঝে পড়ে অন্ধ্রের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের জনসাধারণের যখন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল, গান্ধীশিষ্য এই বিনোবাই তখন গত বছর সেখানে গিয়ে শান্তি প্রচার করেন। আর সেই শান্তি মিশন থেকেই সৃষ্ট হয় তাঁর ভূদান যজ্ঞ অর্থাৎ ভূমিহীনদের খেটে খাবার পথ করে দেবার জন্য এক আন্দোলন। তিনি পায়ে হেঁটে—ঐ ভূদান যজ্ঞের কথা প্রচার করতে করতে মধ্যপ্রদেশ দিল্লী ছাড়িয়ে উত্তর প্রদেশে এসে পৌঁছেছেন। শিবচরণদা আমাদের জেলার অতি পুরাতন গান্ধীপন্থী গঠনমূলক কর্মী বলে বিনোবাজীর ঐ কর্মসূচি গ্রহণ করে কাল থেকে ধলভূমের গ্রামে গ্রামে ঘুরবেন স্থির করেছেন।”

কৌশিকবাবু মনে মনে হেসে ওঠেন। এবার তাঁর মনে পড়েছে বটে। সংবাদপত্রে এ খবর তেমন চোখে না পড়লেও পার্টির এক গোপন সার্কুলারে শোষণকারীদের আরও কিছু দিন বাঁচিয়ে রাখার এই নবীন প্রচেষ্টার

বিষয়ণের উল্লেখ ছিল। শ্রেণী সংগ্রাম যাতে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে কৃষক-মজদুরদের ক্ষমতা হস্তগত করার পথ প্রশস্ত করতে না পারে, কংগ্রেস এবং তার পৃষ্ঠপোষক জমিদারবর্গ তাই এই ভূদান যজ্ঞের স্পিরিচুয়াল ধাপ্পাবাজী লোকচক্ষুর সম্মুখে খাড়া করার প্রয়াস করছে। আচ্ছা, কৌশিকবাবু মনে মনে বিস্মিত হলেন, এর ঢেউ তা হলে এখানেও এসে পৌঁছেছে। ওঁর ওষ্ঠে ব্যঙ্গের মৃদু হাসি ফুটে উঠল। পুঁজিবাদের যখন নাভিশ্বাস ওঠে, তখন কত ছলাকলাই না বিস্তার করে এর ধ্বজাধারীরা!

"উঃ, বড্ড দেরি করে ফেলেছি আমি—না?" ভোলানাথবাবুর ব্যগ্র কণ্ঠস্বর বাইরে থেকে ভেসে এল। "নিন, চলুন এবার। মুখ হাত ধুয়ে ছুটি খাওয়া-দাওয়া করা যাক।" কথা বলতে বলতে এক হাতে লণ্ঠন এবং অপর হাতে এক গাদা বিছানাপত্র বগলদাবা করে ভোলা৲াথবাবু ভিতরে ঢুকলেন। লণ্ঠনটি মেঝেতে রেখে কৌশিকবাবুর জন্য নির্দিষ্ট খাটিয়াটিতে বিছানাগুলি ধপ্ করে ফেলে দিয়ে তার পাশে তিনি আর একটি খাটিয়া পাততে পাততে বললেন, "জেঠা কাল পদযাত্রায় বেরোচ্ছেন কিনা, তাই আমার উপরই আশ্রমের সব ঝামেলা পড়েছে। সব কাজ বুঝে গুছিয়ে নিতে নিতে কয়েক দিন যাবে।" কিন্তু কথার মাঝখানে হঠাৎ কি মনে পড়ায় প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ব্যগ্র কণ্ঠে তিনি বললেন, "ভাল কথা, আপনাকে বলতেই ভুলে গেছি যে খাওয়া-দাওয়ার পর আপনাকে জেঠার কাছে নিয়ে যাব। কাল ভোরে প্রার্থনার পরই ওঁরা বেরিয়ে পড়বেন বলে এখন ছাড়া তো আর সময় হবে না। কোন অসুবিধা হবে তো না আপনার? আর তার পর দুজনে এখানে পাশাপাশি শোওয়া যাবে। এ পর্যন্ত তো আপনার সঙ্গে ভাল করে কথাই হল না। শুয়ে শুয়ে খুব গল্প-গুজব হবে। অনেক কথা জমে আছে কিন্তু।"

* * *

শ্যামবর্ণ ছোট-খাটো মানুষটির মুখ জুড়ে যেন বরাভয়ের আভাস ছিল। শুভ্র খদ্দরের সঙ্গে মাথার ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলের কেমন একটা মিল খুঁজে পেলেন কৌশিকবাবু। প্রায় আসবাবহীন ছোট মাটির ঘরটিতে খেজুর পাতার চাটাই-এর উপর কম্বল পেতে বসে ম্লান লণ্ঠনের আলোকে চরখা চালাচ্ছিলেন ভোলানাথবাবুর জেঠা শিবচরণবাবু। পিছনের নিরাভরণ দেওয়ালে তাঁর ছায়াটা বিরাটাকার ধারণ করে বই-এর শেল্‌ফ্‌টিকে আবরিত করে ইতস্তত নড়ছিল।

কৌশিকবাবুকে উদ্দেশ করে শিবচরণবাবু বললেন, "ভুলুর কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনি আসায় খুবই আনন্দ হয়েছে; কিন্তু কাল সকালেই আমাকে বেরোতে হচ্ছে বলে আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করার জন্য এখন ছাড়া আর সময় পেলাম না। থাকলে বেশ মন খুলে গল্প-গুজব করা যেত—কি বলেন?" কথার শেষে স্নিগ্ধ হাসি।

কৌশিকবাবুর মন বলল এখানে হৃদয় খুলতে খুব একটা বাধা হবার কারণ নেই। তাই অনেকক্ষণ থেকে মনে যে প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছিল, তিনি প্রথম বারেই তা ব্যক্ত করে ফেললেন। শিবচরণবাবুর দিকে ঋজু দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বললেন, "কিছু মনে করবেন না, আপনাদের এই পদযাত্রা পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখার একটা প্রচেষ্টা নয় কি? এই ভাবে ভিক্ষা চেয়ে কখনও কিছু হয়েছে।"

শিবচরণবাবু কয়েক মুহূর্তের জন্য হাতের কাজ বন্ধ করে চরখা থেকে মুখ তুলে কৌশিকবাবুর দিকে তাকালেন। তার পর মৃদু হেসে বললেন, "বেশ ভাল প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু বিনোবাজী বা আমরা তো ভিক্ষা চাইতে যাচ্ছি না, আমরা বেরোচ্ছি দীক্ষা দিতে। ঈশ্বরের সৃষ্ট ভূমি যে জল-হাওয়া ও সূর্যকিরণের মত সর্বজনের সম্পত্তি হওয়া উচিত, যাতে সকলের সমান ভাবে পরিশ্রম করে ফলপ্রাপ্তির কথা, তাকে ব্যক্তিগত অধিকারের বেড়াজালে বেঁধে ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ সৃষ্টি করে সমাজ এ যাবত যে ভুল করে এসেছে. তার থেকে মুক্ত করার জন্য এই দীক্ষা দেওয়ার অভিযান। আমরা দয়ার দান চাই না, ভূমিহীনদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দাবি করি। বিনোবাজী বলছেন যে তিনি ভূমিহীনদের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রতি ঘরে গিয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে তার ভূমির ষষ্ঠাংশ চাইছেন। দান শব্দ আমরা শঙ্করাচার্যের সম বিভাগ অর্থে ব্যবহার করছি। একি ভিক্ষা হল?" কথা বলতে বলতে শিবচরণবাবুর হাতের গতি দ্রুততর হল, তাঁর কৃষ্ণবর্ণ মূর্তি ঘরের মৃদু আলোকে ইস্পাতের মত ঝলসে উঠল।

কৌশিকবাবুর মনে হল শিবচরণবাবু তো তাঁদের কথাই বলছেন। বক্তব্য এক; অথচ ভাষা ভিন্ন—প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে সত্য সত্যই কি এই সব গান্ধীবাদীরা মুখে যা বলছেন, কার্যতঃ তাই চান? চাইলে এই লক্ষ্যপূর্তির বিজ্ঞানসম্মত পথ—শ্রেণী সংগ্রামের ধার কাছ দিয়েও না গিয়ে যজ্ঞ ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল পৌরাণিক শব্দের শরণ নেওয়া কেন? কৌশিকবাবু তাঁর আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করলেন।

বললেন, "আচ্ছা আপনি কি সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন যে এই ভাবে ভূস্বামীদের হৃদয় পরিবর্তিত হবে এবং তারা স্বেচ্ছায় শোষিতদের জন্য নিজেদের বিশেষ সুবিধা সমূহ বর্জন করবে?"

প্রশ্ন শুনে শিবচরণবাবু আবার হাসলেন। প্রশান্ত হাস্যে উদ্ভাসিত আননে তিনি বললেন, "কেন করব না? সকলের হৃদয়েই তো ভগবান রয়েছেন। স্বার্থের মোহজাল করুণাস্পর্শে অপসারিত হলে তিনি সত্যস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করবেন।"

শিবচরণবাবু কিছুক্ষণের জন্য থামলেন। তার পর পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে কৌশিকবাবুর অবিশ্বাস মাখা মুখচ্ছবি দেখে নিয়ে বললেন, "কিন্তু না, আপনার কাছে ভগবানের কথা না হয় না-ই বললাম। কিন্তু আপনিই তো স্বয়ং হৃদয়পরিবর্তনের নিদর্শন। আপনি কমিউনিস্ট মতবাদে আস্থাশীল হলেন কি করে? না-না, এর জন্য সঙ্কোচ বোধ করার কারণ নেই, সাম্যবাদী হওয়া দোষের কিছু নয়। আমি স্বয়ং ও পন্থায় বিশ্বাসী না হলেও আপনাদের আদর্শবাদী বৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু সে কথা থাক। আমি বলছিলাম যে মার্কস্ বা অপর কেউ কি আপনার বুকের উপর বন্দুক উঁচিয়ে বলেছিলেন যে কমিউনিস্ট না হলে আপনাকে হত্যা করা হবে? দরিদ্রদের দুঃখ আপনার হৃদয়ে অনুরণন সৃষ্টি করেছিল এবং এর প্রতিকার সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে আপনি মার্কস্‌বাদে বিশ্বাসী হয়েছেন। মার্কস্ অ্যাঙ্গেল্‌স্ ও লেনিন বা স্ট্যালিন ইত্যাদি প্রতিটি কমিউনিস্টেরও এই ভাবে প্রথমে হৃদয় পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং আপনাদের ক্ষেত্রে যদি এ রকম সম্ভব হয়ে থাকে, তা হলে আর সকলের বেলায় হবে না কেন?" শিবচরণবাবুর চক্ষে একটা স্নিগ্ধ কৌতুক ফুটে বেরোচ্ছে।

কৌশিকবাবু একেবারে গুম্ হয়ে গেলেন। এ রকম অদ্ভুত যুক্তি তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নি। সুতরাং কিছুক্ষণের জন্য তাঁর মুখে কথা সরল না।

সুরেনবাবু এবার বললেন, "কিন্তু এভাবে এক-একজন করে কতদিনে সারা দেশের লোকের হৃদয় পরিবর্তন করবেন? এর চেয়ে তোমাদের মত লোকেরা যদি অ্যাসেমব্লি পার্লামেণ্টে যেতে, তা হলে সহজেই এরকম আইন তৈরী করে এসব কাজ করা যেত।"

সুরেনবাবুকে লক্ষ্য করে শিবচরণবাবু বললেন, "এতদিনেও তোমার মোহমুক্তি হল না? আজকের পরিষদ আর পার্লামেণ্টের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখ। এর সদস্য কারা? তোমার আমার মত অনুৎপাদক বাবু

শ্রেণী। কেবল কংগ্রেস বলে নয়, সব দলেরই ঐ একই অবস্থা। যারা খেটে খায় তাদের এই সংসদীয় রাজনীতির বিলাস করার মত সময় বা অর্থসঙ্গতি কোনটাই নেই। তাই তুমি কি বিশ্বাস কর যে হৃদয় পরিবর্তন বিনা এই সব বাবু শ্রেণীর লোকেরা এমন ব্যবস্থা করবেন, যাতে তাঁদের অস্তিত্বের আধারই নষ্ট হয়ে যায়? সুতরাং প্রথমে জনমত তৈরী না হলে এ জাতীয় আইন কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ হলেও কোথাও না কোথাও এমন সব ফাঁক থেকে যাবে যে তার ফলে আইন রচনা করার উদ্দেশ্যই বানচাল হয়ে যাবে। সর্দা আইন পাশ হলেও এদেশে বাল্যবিবাহ বন্ধ হয় নি। আর চোরকে শাস্তি দেবার জন্য শতবিধ আইন ও জেল আদালত থাকা সত্ত্বেও চুরি বন্ধ হয় নি। মানুষের স্বভাব ও পরিবেশের পরিবর্তন না হলে কেবল আইন দ্বারা কোন দিনই এ বন্ধ হবে না। তা ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকরা জনমতবিরুদ্ধ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে সাহসই পান না। সমাজবিপ্লবীদের কাজ হচ্ছে তাই জনমত তৈরী করা এবং শাসকরা তার পর তার উপর আইনের সীল মোহর দিতে পারেন। এই জন্যই আমরা জনমত সৃষ্টির কাজ হাতে নিয়েছি।”

ভোলানাথবাবু এতক্ষণ পর্যন্ত নীরব শ্রোতা ছিলেন। তিনি এবার মৌনতা ভঙ্গ করে বললেন, “কিন্তু জেঠা, গান্ধীজীর যে সব শিষ্যের হাতে দেশশাসনের ভার, তাঁরা কেন এই কার্যসূচিকে সরকারের মাধ্যমে কার্যান্বিত করবেন না? আপনাদের কেন আবার নূতন করে সব শুরু করতে হবে?”

শিবচরণবাবুর চরখার সুতা ছিঁড়ে গিয়েছিল। তাই তখনই কথার জবাব না দিয়ে প্রথমে নীরবে সুতার দুটি মুখ জুড়ে নিলেন। তার পর বিষণ্ণ হাসি হেসে তিনি বললেন, “একটা ভুল করছ তুমি ভোলু। কংগ্রেস বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাবার আন্দোলনে জনমানসের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তদানীন্তন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেও তাঁর সামাজিক বা আর্থিক কর্মসূচিকে কোন দিনই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে নি। দেশের কর্ণধারদের মধ্যে দু-এক জন ব্যক্তিগত ভাবে গান্ধীজীর অহিংসা আধারিত কার্যক্রমে বিশ্বাসী হলেও শাসনযন্ত্রের ঘোর-প্যাঁচের মধ্যে পড়ার পর তাঁদের আর পূর্বের সে বিশ্বাস আছে কি না সন্দেহ। থাকলেও অন্ততঃ কার্যক্ষেত্রে তার কোন বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং আমাদের আবার অ আ ক খ থেকেই আরম্ভ করতে হবে।” শিবচরণবাবুর কণ্ঠস্বর আবেগে গাঢ় হয়ে এল।

সুরেনবাবু তাঁর সমর্থন করে বললেন, "তুমি একেবারে সত্যি কথা বলেছ দাদা। স্বাধীনতার পরে আমরা আমাদের পরলোকগত নেতার পথ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছি। দেশে অনেক কলকারখানা, খাল আর বাঁধ তৈরীর কাজ শুরু করলেও ভারতবর্ষের আত্মার চেহারা যেন তার মধ্যে ফুটে উঠছে না। গান্ধীজীর অবর্তমানে দেশকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে বাঁচিয়ে স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে নেতৃত্ব করার কৃতিত্ব নিশ্চয় জওহরলালজীকে দিতে হবে। সব দিক থেকে বিচার করলে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও নানা রকম ভেদবিভেদের বিষে জর্জর এই প্রাচীন দেশকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে এখানে নবজীবন আনার প্রচেষ্টায় আত্মমগ্ন কর্মযোগী হিসাবে জওহরলালজীর অবদান স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষে অদ্বিতীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয় যে স্বাধীনতার পর সত্যকার ভারতের লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার দায়িত্বও তাঁর উপর বর্তাবে। আমি চিরকালই কংগ্রেসকর্মী এবং জওহরলালজীর ভক্ত। তবু সত্যের খাতিরে আমাকে একথা বলতেই হবে যে উনি 'ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া' লিখুন আর যা-ই করুন না কেন, এখনও উনি আসল ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করতে পারেন নি।"

"কেন একথা বলছেন সুরেনকাকা ?" ভোলানাথবাবু প্রশ্ন করলেন।

"বড় দুঃখ ও ক্ষোভে একথা মনে এসেছে। জওহরলালজীর মত সর্বজনপ্রিয় আদর্শবাদী ও নিঃস্বার্থ জননায়ক সম্বন্ধে এরকম কথা উচ্চারণ করা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। তবু সত্য যা তা অস্বীকার করি কেমন করে ? সম্প্রতি ভারতের গণপরিষদে ভারতের রাষ্ট্রপতির বেতনের হার নিয়ে সদস্যদের মধ্যে যে আলোচনা হয়ে গেল, তা ভাল করে লক্ষ্য করেছ তুমি ? কয়েকজন সদস্য রাষ্ট্রপতির এত উচ্চ বেতন হওয়া অনুচিত বলে বেতন হ্রাস করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু জওহরলালজী এই বলে তাঁদের প্রতিবাদ করেন যে রাষ্ট্রের মর্যাদার জন্য রাষ্ট্রপতিকে ঐরকম উচ্চ বেতন দেওয়া প্রয়োজন। বুঝে দেখ ব্যাপারটা। মর্যাদা হচ্ছে অর্থনির্ভর ! তা হলে বলতে হয় যে গান্ধী অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির কোন মর্যাদাই ছিল না। এটা ভারতবাসীর কথা নয়। এদেশ কোন দিনই কাঞ্চন-কৌলিন্যকে স্বীকৃতি দেয় নি। ভারতবর্ষে চিরকালই কপর্দকহীন সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠীর চেয়ে অধিকতর মর্যাদা লাভ করেছে। জওহরলালজীর ঐ ঘোষণা ওঁর বিশিষ্ট মানসিকতার লক্ষণ এবং সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা এই ভোগবাদী দর্শনের

আওতায় পড়ে আজ ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ছে। স্বাধীনতার ঠিক পরেই এক ধাক্কায় ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র ও সমাজসংগঠনকে ভারতমুখী করা যেত; কিন্তু মর্যাদার এই বস্তুনির্ভর মানদণ্ডের ফলে তা আর সম্ভব হল না। এখন শাসনযন্ত্র ও শাসকদল— উভয়েরই রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই বিত্তকৌলিন্যের বৃত্তি প্রচণ্ড গতিতে পল্লবিত হয়ে চলেছে আর তার প্রভাব পড়ছে সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এর ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করতেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।" সুরেনবাবু ক্ষোভে ও বিষাদে মৌন হলেন।

শিবচরণবাবু ধীরে ধীরে বললেন, "তোমার কথা ঠিক। তবে এর জন্য ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করে লাভ নেই। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যে সম্প্রদায় আজ দেশের আর্থিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইত্যাদি সকল বিভাগের নেতৃত্ব করছেন, এ তাঁদেরই মনের কথা। সুতরাং এর জন্য কেবল জওহরলালজীকে দায়ী করে কি হবে? কোন উচ্চতর পদ পেলে আমরা উচ্চতর বেতন আশা করি না? কই, আমরা এই বলে সন্তুষ্ট থাকি না যে উচ্চতর দায়িত্ব দিয়ে সমাজ আমার যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছে, অতএব এই যথেষ্ট। দায়িত্ববোধ যোগ্যতা সেবা-ভাবনা চরিত্র সবই তো অর্থের হাটে বেচাকেনার পণ্য হয়ে গেছে। তাই প্রয়োজন বৃদ্ধি পাক বা নাই পাক, পদোন্নতির অর্থ বেতনবৃদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং ঘুরে ফিরে এই একই সমাধানে পৌঁছাতে হয় যে জনমানস পরিবর্তন করতে হবে সবার আগে। যে ভারতে দশরথের চেয়ে বশিষ্ঠের মর্যাদা বেশী ছিল, যেখানে কেবল তেঁতুল পাতার তরকারি খেয়ে বুনো রামনাথ বলতে পারতেন যে তাঁর মনে কোন বৈষয়িক অনুপপত্তি নেই, সেখানে আবার একদল ঐ রকম জনশিক্ষক চাই নূতন সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কারণ নিন্দা সমালোচনা করে একাজ নিষ্পন্ন হবার নয়, নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাপন করে কর্ম ও বচনে নবীন মূল্যবোধ প্রচার করতে হবে।"

কৌশিকবাবুর কাছে এই চিন্তাধারা এই দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে অচেনা ঠেকছিল। তাঁর মন একে ঠিক স্বীকার করে নিতে পারছিল না, অথচ এর প্রতিবাদের উপযুক্ত ভাষা তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। নিজের মনের মধ্যে এর পক্ষ প্রতিপক্ষ খাড়া করে তাদের তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাচ্ছিলেন তিনি। বিচিত্র এক অস্বস্তি, অদ্ভুত এক দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়া চলছিল তাঁর মনোরাজ্যে। কিছু একটা বলা দরকার, এই জন্যই তিনি যেন তাই বললেন, "সব ভাল লোক যদি এই ভাবে শাসনযন্ত্রের বাইরে থাকেন, তা হলে খারাপ লোকেদের দ্বারা

পরিপূর্ণ হবার ফলে আপনাদের লক্ষ্যপূর্তি কি অধিকতর বিলম্বিত হবে না? এর চেয়ে যতটা পারা যায় ভাল লোকদের এগিয়ে এসে শাসনযন্ত্রের যথা-সম্ভব অধিকাধিক অংশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করা উচিত নয় কি?"

শিবচরণবাবু উত্তর দিলেন, "এর আংশিক উত্তর একটু পূর্বেই সুরেনের প্রশ্নের জবাবে দিয়েছি। আর একটা কথা কি জানেন, আবেদন যদি করতেই হয় তবে দেশের সত্যকার মালিক জনসাধারণের দরবারে করব। তারা কোন কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশ্বাসী হলে তাদের সেবাকারী এই সব পরিষদ প্রতিনিধি বা আমলাদের দিয়ে সে কাজ করিয়ে নেবে। মালিকদের ছেড়ে চাকরদের কাছে দরবার করলে জনসাধারণের পরিবর্তে তাদের কর্মচারীদের মর্যাদা-বৃদ্ধির সহায়ক হব না আমরা? আমরা এটা চাই না; কারণ শেষ অবধি সকল রকমের শাসন বা বাহ্য নিয়ন্ত্রণ দূর করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এরই নাম গান্ধীজীর পূর্ণ স্বরাজ।"

কৌশিকবাবু মাঝ পথে বলে উঠলেন, "শাসন ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলোপন তো আমরাও চাই। আর সেই জন্যই প্রথমে সর্বহারারা রাষ্ট্রযন্ত্রের মারফত শোষক শ্রেণীর অবসান ঘটালে শোষণের যন্ত্র স্বরূপ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা আর থাকবে না।" মনের মত আলোচনার বিষয় পেয়ে কৌশিকবাবু সোজা হয়ে বসলেন।

মৃদু হেসে শিবচরণবাবু বললেন, "দুইজনের অন্তিম লক্ষ্য অভিন্ন হলেও পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। কিছু মনে করবেন না কৌশিকবাবু, কমিউনিস্টদের রাষ্ট্রবিলোপনের কর্মসূচি কতকটা আজ নগদ কাল ধার এই প্রতিশ্রুতির মত। কোন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের আত্মাবলুপ্তি হবে এই আশায় আজ এক প্রচণ্ড সংগঠিত রাষ্ট্রের চাপ জনসাধারণকে সইতে হবে। এ আশার ভিতর বৈজ্ঞানিক সত্যতা আছে কি না জানি না, তবে ব্যবহারিকতার অভাব রয়েছে এ কথা বলতেই হবে। ধরুন হিমালয়ের শিখরে আরোহণেচ্ছুক কেউ যদি দক্ষিণদিকে চলতে আরম্ভ করেন, তা হলে যুক্তির দিক থেকে তিনি কোন অন্যায় কাজ করছেন না এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কারণ পৃথিবী গোলাকার বলে কোন না কোন দিন তিনি ঐ ভাবে উত্তর মেরু ঘুরে হিমালয়ের শীর্ষদেশে উপনীত হতে পারেন। কিন্তু বাস্তববাদী হিমালয়-যাত্রী দক্ষিণদিকে না গিয়ে এখনই উত্তরমুখো হাঁটা শুরু করবেন। তেমনি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলোপকারীকেও এখনই ঐ লক্ষ্যাভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করতে হবে এবং যে সব ক্ষেত্র থেকে এর প্রভাব বিলোপ করা সম্ভব হবে, রাষ্ট্রশক্তির

ততটুকু বিলুপ্ত হল বলা চলবে। অতএব ভূমিসমস্যার মত এমন এক জটিল ও জরুরী সমস্যার নিরাকরণ যদি রাষ্ট্রশক্তি-নিরপেক্ষ হয়ে জনসাধারণ দ্বারা করা যায়, তা হলে তা কি রাষ্ট্রবিলোপনের পথে একটা মস্ত বড় পদক্ষেপ হবে না ?"

কৌশিকবাবু কথাটা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, তখনই এর কোন উত্তর দেবার আগ্রহ বোধ করলেন না।

সুরেনবাবু বললেন, "দেখুন কৌশিকবাবু, আপনি বোধ হয় নির্বাচন ও সংসদীয় রাজনীতির সঙ্গে আমার মত ওতপ্রোতভাবে জড়িত নন। তাই আমার একটা কথা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি। একেবারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্য এ।"

কৌশিকবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুরেনবাবুর দিকে তাকালেন। সুরেনবাবু বললেন, "নির্বাচনে হয় কি জানেন ? নেহাত খুবই জনপ্রিয় দুই-একজন ছাড়া অধিকাংশেরই এত বড নির্বাচন-ক্ষেত্রে বিনা প্রচার ও সংগঠনে জয়লাভ করা অসম্ভব ব্যাপার। আর নিবাচনের সময প্রচার মানেই আত্মস্তুতি পরনিন্দা ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। এ ছাডা কারও পক্ষে ভোট সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এর উপর ভোটের দিনের শতবিধ জাল কারসাজি তো আছেই। এর চক্রে পড়লে ভাল লোককেও প্রত্যক্ষ বা অন্ততঃ পরোক্ষ ভাবে দুর্নীতির শরণ নিতে হয়। একে মানসিক ব্যাধির এক বিচিত্র দুষ্টচক্র—মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় আখ্যা দিতে পারেন। প্রত্যেকেরই মনে হয যে আমি প্রতিদ্বন্দ্বী অপরাপর প্রার্থীর তুলনায় যোগ্যতর ও জনকল্যাণের শ্রেষ্ঠতম বাহন। সুতরাং অযোগ্য লোক নির্বাচনে দুর্নীতি বা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বিজযী হলে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হবে। অতএব জনস্বার্থ রক্ষাকল্পে আমাকেই জিততে হবে ও প্রতিদ্বন্দ্বীরা যেহেতু অন্যায় পদ্ধতির শরণ নিচ্ছে এবং নিছক ন্যায় পথে জেতবার কোন সম্ভাবনা নেই তাই জনকল্যাণের জন্য আমার মত জনদরদীকে যেন তেন প্রকারেণ নির্বাচন বৈতরণী পার হতেই হবে।"

ঈষৎ ম্লান হাসি হেসে তিনি উপসংহার করলেন, "ব্যাপারটা কতকটা জুয়া খেলার মত। দান চডাতে চড়াতে সত্য, ন্যায়বিচার, ধর্মাধর্মবোধ—সবই বাজী রাখা হয়। অতএব ভোটযুদ্ধে জয়ী হবার প্রক্রিয়ায় সৎ লোকও অসত্যের দীক্ষা লাভ করেন ও এই ভাবে যাঁরা বিজয়ী হলেন তাঁরা এর পর পাঁচটি বছর কি ভাবে চলবেন, তা সহজেই কল্পনা করতে পারেন।"

জানালার ভিতর দিয়ে এক ফালি চন্দ্রালোক ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে। একটি নিশাচর পক্ষী তীক্ষ্ণ চীৎকারে চতুর্দিক মুখরিত করে উড়ে গেল। কি যেন এক বন্যকুসুমের সুরভি মৃদু মন্দ সমীরণে ভেসে আসছে। কৌশিকবাবু বুক ভরা শ্বাস নিলেন।

ঘরের অপর দুজন অধিবাসী গভীর নিদ্রায় মগ্ন। কৌশিকবাবুর হাসি পেল। কত আগ্রহ করে ভোলানাথবাবু বলেছিলেন যে তাঁর বহু কথা বলার আছে। পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে কৌশিকবাবু পার্টির সঙ্গে সম্বন্ধের কথা বাদ দিয়ে মীনাক্ষীর ইতিহাস যতটা বলা যায় সংক্ষেপে বলেছিলেন। আর তার পর ভোলানাথবাবুকে প্রশ্ন করেছিলেন যে অসহায় নির্বান্ধব মেয়েটির অপরিণত বুদ্ধি জনিত এই বিপদের সময় ওকে তিনি একটু আশ্রয় দিতে পারেন কিনা।

কৌশিকবাবুর কথা শেষ হবার পূর্বেই ভোলানাথবাবু বলেছিলেন, "আশ্রয়ের কথা বলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন? দাদার কাছে বোন থাকবে—এতে এত লৌকিকতার কি আছে? আপনি নির্ভাবনায় থাকুন, আমরা যতক্ষণ দুমুঠো খেতে পাব, মীনু বোনেরও অভাব হবে না।" একটু থেমে ঈষৎ হেসে ভোলানাথবাবু আবার বলেছিলেন, "বুঝলেন, সব ভগবানের দয়া। না হলে জেঠার সঙ্গে কাল বিদ্যালয়েরও গুটিকয়েক কর্মী পদযাত্রায় চলে যাচ্ছে বলে পড়ানর ব্যবস্থা কি হবে তাই ভাবছি, আর এ দিকে ভগবান মীনু বোনকে পাঠিয়ে দিলেন। নীচের ক্লাসগুলি মীনুবোন সুন্দর চালিয়ে নেবে দেখবেন। আসলে শিক্ষার ক্ষেত্রটা— বিশেষ করে প্রথমের দিকে, আমাদের মা-বোনেদেরই কাজ। শিক্ষা সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে অনেক আলোচনা আছে..... "

কিন্তু অনেক আলোচনা করার ইচ্ছা থাকলেও তা আর পূর্ণ হয় নি। কারণ দেখতে দেখতে নিদ্রার আক্রমণে তাঁর কণ্ঠ নীরব হয়ে গেল। খুব স্বাভাবিকও এ। সারা দিনের পরিশ্রমের পর রাত জাগা সম্ভব নয়।

কৌশিকবাবু সকৃতজ্ঞ ভাবে ওঁর দিকে তাকালেন। স্তিমিত লণ্ঠনের শিখা ও জ্যোৎস্না—এই উভয় রশ্মির আলোয় আবছা ভাবে ভোলানাথবাবুর নিদ্রিত মূর্তি তাঁর চোখে পড়ছিল। কেমন শান্ত নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন! অথচ তাঁর নিজের চোখে ঘুম আসছে না। সমস্ত দিনে তাঁর পরিশ্রমও তো কম হয় নি—বিশেষতঃ মানসিক শ্রম তো অত্যধিক হয়েছে। কিন্তু তিনি এমনি নিশ্চিন্ত ভাবে সুপ্তির ক্রোড়ে ঢলে পড়তে পারছেন

কই? কৌশিকবাবুর হঠাৎ মনে হল যে কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ওঁর এই নিরুদ্বিগ্নতার কারণ ঈশ্বরনির্ভরতা নয় তো? বড় বিচিত্র এই ভদ্রলোক! সব কিছুতেই ভগবানের দয়া দেখেন। এ ক্ষেত্রে অবশ্য কৌশিকবাবু নিরুপায়। কিন্তু না, আর ও সব তত্ত্ববিষয় নিয়ে চিন্তা করবেন না তিনি। সমস্ত দিনের ঘটনাবলী দ্রুত সঞ্চরমাণ চলচ্চিত্রের ছবির মত মনের পটে প্রতিফলিত হচ্ছে। এক দিনে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল তাঁর। বিশেষতঃ শিবচরণবাবুর সঙ্গে আলোচনার পর তাঁর মনের সংশয় ঝড়ের আকার ধারণ করেছে। বহু দিনের অনেক সযত্নলালিত ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসের মূল ধরে প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দিয়েছেন ঐ খর্বাকৃতি শ্যামবর্ণ কৃশতনু প্রৌঢ়টি। ওঁর কথাগুলি মনের ভিতর ভীমবেগে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। মনে মনে ওঁর সঙ্গে কত তর্ক-বিতর্ক করছেন তিনি। কতক্ষণে এই উত্তাল তরঙ্গ শান্ত হয়ে তাঁকে শান্তির পরশ দেবে কে জানে?

পরের দিন সকালে কৌশিকবাবু বিদায় নিলেন। হাওড়াগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেন রাখা মাইন্‌সে বেশীক্ষণের জন্য থামে না। মীনাক্ষীর প্রণাম করা শেষ হতেই কৌশিকবাবু তাকে সস্নেহে ক্ষণকালের জন্য বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তার পর তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠে প্লাটফর্মের দিকে একটি বেঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন। প্লাটফর্মের উপর মীনাক্ষীর পাশে দণ্ডায়মান ভোলানাথবাবু গাড়ির জানালার ভিতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে আবেগ ভরে কৌশিকবাবুর কনুই স্পর্শ করে গাঢ় স্বরে বললেন, "অনেক তর্কাতর্কি হল এবার কি বলেন? আর বেদান্তের পরও যখন বেদের নূতন নূতন টীকা ভাষ্য খণ্ডন সমর্থন বেরোচ্ছে, তখন আমাদের মত সাধারণ মানুষের ভেতর দ্বিমত থাকবে এতে আর আশ্চর্যের কি! কিন্তু মতান্তর হলেও মনান্তর যেন না হয়। কারণ একই লক্ষ্যের সাধক আমরা। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে দুই পক্ষই সমান পটু। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে সমাজের বুদ্ধিমান মানুষেরা যাকে মোষ তাড়াবার বৃত্তি বলেন আর আমাদের মতে যা আদর্শবাদের আরাধনা, তার চিহ্ন সমাজের বেশীর ভাগ লোকের ভেতরই থাকে না। এইখানে আমাদের প্রচণ্ড ঐক্য।"

ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ বাঁশির শব্দে ভোলানাথবাবুর শেষের দিকের কথাগুলি শোনা গেল না। ট্রেন দুলে উঠে মন্থর গতিতে এগোতে লাগল। কৌশিকবাবু জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছিলেন। হঠাৎ দেখলেন মীনাক্ষী কেন যেন চমকে

উঠে ব্যস্ত পদে তাঁর দিকে দৌড়ে আসছে। বুঝি কি বলবে। কিন্তু ট্রেন তখন দ্রুতবেগে চলা শুরু করেছে। মীনাক্ষীর উৎকণ্ঠিত মুখ পিছনে পড়ে রইল। ভোলানাথবাবু ততক্ষণে মীনাক্ষীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ট্রেন বাঁক ফিরে ওদের মূর্তি চোখের আড়াল করে দেবার পূর্বে কৌশিকবাবু লক্ষ্য করলেন যে ভোলানাথবাবুর চোখের কোণ বোধ হয় চিক্ চিক্ করছে—কিংবা হয়তো কৌশিকবাবুরই দেখার ভুল। গাড়ি বাঁক ফেরায় ভোলানাথবাবুর মুখের বিষণ্ণ হাসিটুকুও হঠাৎ তাঁর নয়নপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

শেষ—শেষ—সব শেষ হয়ে যাবে। কৌশিকবাবুর বক্ষ ভেদ করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। এক দিকে নোনা জল এবং অপর দিকে পাহাড়ের মাঝে বন্দী চট্টগ্রামের নরম মাটি এবং তার পর ঊর্মিবলয় বেষ্টিত তাল নারিকেল কুঞ্জ শোভিত আন্দামান। সেখান থেকে আর এক সমুদ্র—কলকাতার জনসমুদ্র। তার পর ধলভূমের এই রুক্ষ অরণ্য প্রকৃতির কোলে এসে উপস্থিত হয়েছেন কৌশিকবাবু। এখানকার এই দিগন্ত বিস্তৃত শাল মহুয়া আর পলাশ কেঁদের জঙ্গল, এই লাল মাটি আর ছোট ছোট ডুংরী কৌশিকবাবুর মনে কী মোহিনী মায়ার কজ্জল পরিয়ে দিয়েছিল। ধলভূমের আকাশ বাতাস মাটি, এই ঊষর ভূমির কৃষ্ণ প্রস্তরে খোদিত বলিষ্ঠদেহ সন্তানগুলি সবই যেন তাঁকে কী এক ভালবাসার বন্ধনে আঁকড়ে ধরেছিল। সরল অজ্ঞ মানুষগুলির বিস্ফারিত চক্ষে তাঁর প্রতি কী অসীম বিশ্বাস, কী অগাধ নির্ভরতা জেগে উঠত। কিন্তু এবার সব শেষ হয়ে যাবে।

মোহনপুরের ধর্মঘটী মজুরদের সামনে কি করে তিনি দাঁড়াবেন, বিপিন, কিষু সর্দার, ডমনা ভকত, লাছু মাঝি আর বাস্কে সরেনদের কাছে কোন্ আশার বাণী নিয়ে যাবেন? কৌশিকবাবু কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছিলেন না। ট্রেন থেকে নামার পর হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে গিয়ে হাজরী খাতায় সই করে তিনি শরীর ভাল নয় বলে ছুটি নিয়ে এসেছিলেন। গরমের ছুটির পর সবে স্কুল খুলেছে বলে পড়াশুনোরও চাপ নেই। সুতরাং ঘরে এসে সেই দুপুর থেকে বেলা গড়িয়ে অপরাহ্ণ হয়ে গেল, নিজের ঘরে তক্তপোশের উপর শায়িত অবস্থায় তিনি সামনের জানালাটি দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন। চোখ খুলে চোখ বুজে—কত রকমের চিন্তা করছেন:

কিন্তু কিছুতেই কোন কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না। কি করে ওদের সম্মুখীন হবেন? পার্টির জেলা কমিটী ওদের জন্য কোন নূতন পথের সন্ধান দিতে পারে নি। বাইরে থেকে টাকা-কড়ি আসারও বিশেষ কোন সম্ভাবনা নেই। পার্টির ফাণ্ড ও মনোযোগ—সব ইলেকশানের দিকে। অতএব মোহনপুরের মজুরদের ভাগ্য তাদের নিজেদের হাতে। কি করে এই কথাগুলি প্রায় দু মাস ধর্মঘটের ফলে উপবাসী ও হতাশায় পীড়িত মানুষগুলির সামনে উচ্চারণ করবেন? সেন্টিমেণ্ট—হ্যাঁ, হয়তো বড় বেশী সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়ছেন তিনি। কিন্তু চেষ্টা করলেও এই সেন্টিমেণ্ট প্রবাহকে প্রতিরোধ করতে পারছেন কই?

ঢং ঢং ঢং ঢং—ছুটির ঘণ্টা পড়ল। কলরব করতে করতে ছেলের দল বাইরে বেরোচ্ছে। হোস্টেলের বাসিন্দা ছেলেগুলির পদশব্দ দ্রুত এগিয়ে আসছে এদিকে। কি জানি হয়তো কোন মাস্টার মশাই কিংবা হয়তো স্বয়ং হেডমাস্টার মশাই-ই তাঁকে দেখতে আসবেন। ওঁদের স্নেহ ও প্রীতি পরম কাম্য হলেও আজ কিন্তু তাঁর কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ভাল লাগছে না। মন চাইছে জনসমাজ থেকে অনেক দূরে পালিয়ে যেতে। জীবনের বিগত অনেকগুলি বৎসর বাড়ি থেকে বাইরে আত্মীয়স্বজনের স্নেহচ্ছায়া থেকে দূরে থাকায় কৌশিকবাবু কেমন যেন অস্বাভাবিক প্রকৃতির হয়ে গেছেন। মানুষের স্নেহপ্রীতির সঙ্গ, তাদের ঘনিষ্ঠতায় স্বাভাবিক প্রসন্নতা বোধ করার পরিবর্তে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করেন তিনি। তাড়াতাড়ি আলনা থেকে জামাটি টেনে নিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। গুমট গরম। খোলা-মেলায় একটু বেড়ালে যদি ভাল লাগে।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে কখন তিনি জাহাতুর পথ ধরেছেন, তা তাঁর খেয়াল নেই। যখন বুঝলেন তখন দেখলেন যে তিনি কাঁকড়াঝোর যাবার জঙ্গলের মাঝে এসে পড়েছেন। কয়েক মুহূর্ত তাঁর মনের ভিতর সংঘর্ষ চলল, যাব কি যাব না এই দ্বন্দ্ব। গত দশ দিন যাবত এই দ্বন্দ্ব তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। অবশেষে আজ তিনি মন স্থির করে ফেললেন। এখান থেকে আর ফেরার চেষ্টা করে লাভ নেই বলে তিনি এগিয়ে যাওয়াই স্থির করলেন। আজ না হয় কাল তো ওদের সামনে দাঁড়াতেই হবে।

সমস্ত দিন কঠিন রৌদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত ধরিত্রী এখন যেন শ্রান্ত নিঃশ্বাস ফেলছে। চতুর্দিকে গাছপালা থাকলেও কোথাও বাতাসের চিহ্ন মাত্র নেই। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন অবসাদে ঝিমোচ্ছে। কৌশিকবাবুরও

দেহ মন ক্লান্ত—সর্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেন অবসাদের প্রবল প্রবাহ নেমেছে। তবু অনিচ্ছুক পা দুটিকে তিনি টেনে নিয়ে চললেন। আজ না হয় কাল ওদের সামনে তো তাঁকে দাঁড়াতেই হবে। এক দিন না একদিন মোহনপুরের ধর্মঘটী শ্রমিকদের কাছে জবাবদিহি করতেই হবে কৌশিকবাবুকে। এর হাত থেকে কোন ক্রমেই নিস্তার নেই তাঁর।

ডুম্ ডুম্ ডুম্, ডুডুম্ ডুম্ ডুম্। কৌশিকবাবু কান খাড়া করে শুনতে লাগলেন। কাঁকডাঝোর জঙ্গলে এই অপরাহ্ন বেলাতেই সন্ধ্যার ঘোর লেগেছে। সুউচ্চ বৃক্ষচূডার পত্রপল্লব ও লতা-গুল্ম ভেদ করে অস্তাচলগামী সূর্যের ম্লান রশ্মি খুব বেশী মাত্রায় অনুপ্রবেশ করতে পারছে না। নির্জন প্রায়ান্ধকার বনভূমিতে একাকী অনভ্যস্ত পথিক শরীরে ভীতিশিহরণ না জাগিয়ে চলতে পারে না। তার উপর এই গুরুগম্ভীর নির্ঘোষ একটানা ধ্বনিত হয়েই চলেছে—ডুম্ ডুম্ ডুম্, ডুডুম্ ডুম্ ডুম্। ধমসা বাজছে। আওয়াজ শুনে বোঝা যাচ্ছে যে শব্দ বেশী দূর থেকে আসছে না। ক্ষীণ হলেও মানুষের মিলিত কণ্ঠরবও শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

কৌশিকবাবুর মনে পড়ে গেল জাহাতু যাবার এই রাস্তার ঈষৎ পূর্বদিকে প্রায় সিকি মাইল দূরে জঙ্গলের শেষ প্রান্ত এদিকের সাঁওতালদের দেবস্থান—জাহিরা। এক শ গজ জায়গা জুড়ে অতি পুরাতন স্ফীতকায় শালগাছের সারি। এই পবিত্র গাছ কেউ কাটতে পারে না; কারণ চান্দা বোঙা, সিং বোঙা, মারাং বোঙা সবাই বাস করেন এখানে। গাছগুলির মাঝে মাঝে ছোট বড় কাল গ্রানাইট পাথরের টিলা। আদিবাসীরা এখানে পূজা পার্বনে এসে বোঙার উদ্দেশে ঐ সব পাথরে সিঁদুর লেপে ফুল-পাতা ছড়িয়ে কুঁকড়া বলি দেয়। গাছগুলির আরও পূর্বে একটা খোলা ময়দান। ওখানে উৎসবের দিনে সাঁওতাল নরনারীরা দলে দলে নৃত্যও করে। কিন্তু এখন কোন্ পর্ব? কিসের জন্য তা হলে ধমসা বাজছে এখন? কৌতূহলের টানে কৌশিকবাবু জাহিরার দিকে এগিয়ে চলেন।

গাছপালার ফাঁক থেকেই মাঠের দৃশ্য কৌশিকবাবুর নজরে পড়ল। প্রায় দু-তিন শ লোকের সমাবেশ। সামনে জাহিরা থাকায় জনসমাবেশ তাঁর থেকে একশ গজ দূরে রয়েছে। এতে অবশ্য তাঁর সুবিধাই হয়েছে। তিনি সকলকে দেখতে পেলেও তাঁকে হঠাৎ কেউ দেখতে পাবে না। ডুম্ ডুম্ ডুডুম্ ডুম্, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুডুম্ ডুম্। ধমসা-বাজিয়েরা উচ্চগ্রামে বাজিয়ে চলেছে। ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্, ডুডুম্ ডুডুম্ ডুম্। দ্রুত লয়ে শেষ

বারের মত বেজে উঠে ধমসাগুলি নীরব হল। এবার মধুচক্রের গুঞ্জনের মত মানুষগুলির কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। কাল কাল ঘর্মাক্ত দেহগুলির উপর শেষ সূর্যের রশ্মি পড়ে প্রতিফলিত হচ্ছে।

সবেন ভাইকো বহিনীকো—কলগুঞ্জন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সাঁওতালীতে বক্তৃতা হচ্ছে। কৌশিকবাবু এ ভাষা অল্পবিস্তর বোঝেন। তা ছাড়া বক্তার কণ্ঠস্বরও তাঁর চেনা চেনা লাগছে। কে বক্তৃতা দিচ্ছে, কার গলা এ? ঠিক ঠিক, এ তো লাদু মাঝি। লাদু এত বড় বক্তা হল কবে থেকে?

উত্তেজিত কণ্ঠে লাদু মোহনপুরের ধর্মঘটের কথাই বলছে। কৌশিকবাবুর বুকের ভিতর ধক্ ধক্ করে উঠল। কত পরিশ্রমে তিনি ধলভূমের এই রাজনৈতিক চেতনাবিহীন মানুষগুলিকে সংগঠিত করে শ্রমিক সঙ্ঘ গড়ার মত সাহস ওদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন। কত কাঠ খড় পুড়িয়ে এদের ধর্মঘটে নামান হয়েছিল এবং কত পরিশ্রম করে এতদিন এই ধর্মঘট চালিয়ে গেছেন তাঁরা। এই সব চিরকালের মূকদের মুখর করে তোলা কি কম তপস্যার ফল! কি বলছে লাদু? ধর্মঘটের কি হবে?

লাদু বলছে, মাস্টার পালিয়েছে। আর আসবে না। আমাদের ধোঁকা দিয়ে এ দেশ ছাড়া হয়েছে মাস্টার, আমাদের সর্বনাশ করে চলে গেছে। তা না হলে এত দিন তার আর দেখা নেই কেন? এত দিন আমরা মূর সাহেবের দয়ায় যাই হোক করে খাচ্ছিলাম। কিন্তু ঐ পলাতক দিকু, ঐ মাস্টারটা যত কুবুদ্ধি দিয়ে আমাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছিল। ওর ঐ কমরেড ফমরেড আর মানা হবে না, এবার ওকে দেখতে পেলে বিষকাঁড়ে একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় করে বিঁধে দিব এ কথা জাহিরার সামনে কিরা খেয়ে বলছি আমি লাদু মাঝি। আর—আর পরশু থেকে সবাই কাজে যাবে। আবার আমরা আমাদের পুরাতন মনিব মূর সাহেবের খাদানে পাথর তুলব। ইউনিয়ন ফিউনিয়ন আমাদের চাই না। মালিক আমাদের বরাবর দেখে আসছে, ভবিষ্যতেও দেখবে। এই তো জাহিরায় পূজা দেবার জন্য মূর সাহেব পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে। আজ তাঁর টাকাতেই সবাই হাঁড়িয়া খাচ্ছে দোনা দোনা। আর সাহেব বলেছে কাজে গেলেই সবাই মজুরী ছাড়া বকশিশ পাবে পাঁচ পাঁচ টাকা। এত ভাল সাহেবের সঙ্গে কিসের ঝগড়া? পারবে ইউনিয়ন এ সব দিতে, পেরেছিল ঐ পালিয়ে যাওয়া দিকু মাস্টার আমাদের এত দিন হাঁড়িয়া খাওয়াতে? তা হলে কার কথা মানা হবে? বল্—বল্ সবাই বোঙার থানে দাঁড়িয়ে।

মুর সাহেবের, মুর সাহেবের—মোহনপুরের আদিবাসী শ্রমিকেরা সমস্বরে চীৎকার করে উঠল। এর মধ্যে যাদের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, তারা পাশে রাখা মাটির ঘড়া থেকে শালপাতার দোনায় ভরে হাঁড়িয়া পান করে কণ্ঠ সিক্ত করে নিল।

লাছু আবার গর্জন করে উঠল, ভাইকো বহিনীকো, পরদেশীদের সঙ আর নয়। দিকুদের আমরা খুব চিনেছি। ঐ পালিয়ে যাওয়া মাস্টারই তার নমুনা। এবার আমরা আমাদের সমাজের নিয়মে চলব। যারা এ কথা মানবে না, তারা সমাজের বাইরে। এই জাহিরায় দাঁড়িয়ে এ কথা বলা হল খেয়াল থাকে যেন। এই ঝাড়খণ্ড থেকে আমরা ঐ মাস্টারের মত সব দিকুদের তাড়াব। ঝাড়খণ্ড আবুয়া, ঝাড়খণ্ড আবুয়া।

ঝাড়খণ্ড আবুয়া, ঝাড়খণ্ড আবুযা! সবাই লাছুর কথার প্রতিধ্বনি তুলল।

কৌশিকবাবু হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের পাতা দুটি ঘষে নিলেন একবার। কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা দেখছেন তিনি। আর মাথার ভিতরও যেন শত শত কামান গর্জন করছে। একটা কেঁদ গাছের মোটা ডাল ধরে কয়েক মিনিট হাঁপাতে থাকেন তিনি। হাঁপাতে হাঁপাতে টেনে টেনে দীর্ঘ শ্বাস নেন। তার পর টলতে টলতে আবার জাহাতুর পথ ধরেন। শেষ—শেষ—সব শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর সেই পংক্তিটি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল—"হাতে পায়ে শিকল ছাড়া হারাবার মত তাদের আর কিছুই নেই। বিশ্বের শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ হও।" এত দিন এত শ্রদ্ধায় উচ্চারিত কথাগুলিকে অকস্মাৎ তাঁর এক প্রচণ্ড ব্যঙ্গ বলে মনে হল।

* * *

জাহাতু গ্রামে পৌঁছাতে অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যেই কৌশিকবাবু বিপিনের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু বিপিনের নাম ধরে ডাকার পূর্বেই ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের একটা চীৎকার ভেসে এল। নারীটি কাকে বকছে—মর্ মর্ মর্ তুই। তুকে নদীয়ে রাখেঁ আসি। চট্ চট্ করে কয়েকটা চড়ের শব্দ হল। একটি বালক-কণ্ঠ বেদনায় ককিয়ে উঠল। তার পর একটা কুকুর আর্তনাদ করতে করতে ঘরের ভিতর থেকে দৌড়ে বাইরে বেরোল। চেঁচাতে চেঁচাতে কুকুরটি গ্রামের পথ ধরে দৌড়ে পালাতে লাগল। ভিতর থেকে আবার ক্রুদ্ধ নারীকণ্ঠের গর্জন শোনা গেল,

"ঐ কুকুরটাই ইটার মাথা খায়েঁছে গ। আজ উটাকেও মারব, আর কুকুর ছানার মুড়টও ধমসাই দিব।"

কৌশিকবাবু বিপিনের দরজার সামনে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছেন আর রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে কুশীলবরা যেন নিজ নিজ ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে। তিনি যে সাড়া দিয়ে কাউকে ডাকবেন, তারও কোন উপায় নেই। বালকটির ক্রন্দনমাখা স্বর বাইরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ফোঁপানর মাঝে জড়িত স্বরে কি বলতে বলতে সে এগিয়ে আসছে। দরজার বাইরে দাওয়ার কাছে এসেই সে কৌশিকবাবুকে দেখতে পেল। তার পর ভীতি-মিশ্রিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "কে—কে বঠে উখানকে? ও বাবা দেখ কে আসেঁছে।"

"কে রে, কে আলেক?" বলতে বলতে মহুয়া তেলের কুপি হাতে বিপিন ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। ধূম উদ্গীরণকারী কুপিটা মাথার সঙ্গে সমান্তরাল করে ধরে সে দাওয়া থেকেই পথের উপর দণ্ডায়মান কৌশিকবাবুকে দেখতে লাগল।

এতক্ষণে কৌশিকবাবুও কথা বললেন, "আমি—আমি মাস্টারবাবু বিপিন।"

"ও! এত দিন পর? তা আসেন আসেন," বিপিন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। তবে তার উচ্চারণভঙ্গীতে পূর্বের প্রাণপ্রাচুর্য আর নেই। কৌশিকবাবু লক্ষ্য করলেন যে বিপিনের মুখে পূর্বাভ্যাসজনিত হাসি ফুটে উঠলেও সে হাসি অত্যন্ত ক্লিষ্ট, বড়ই পাণ্ডুর। কুপিটি নীচে রেখে বিপিন দাওয়ার উপর খাড়া করে রাখা খাটিয়াটি 'কুলি'র পাশে পেতে দিয়ে আপ্যায়ন জানাল, "বসুন মাস্টরবাবু।"

কৌশিকবাবু আসন গ্রহণ করলেন। ছেলেটি কান্না ভুলে বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। তবে তার শীর্ণ বক্ষপঞ্জরের দ্রুত ওঠা-নামায় বিগত বিষাদের নিদর্শন রয়ে গেছে। কাল ধোঁয়া উদ্গীরণকারী কুপিটির পাশে নীচু চালার নিম্নে বিপিনের কাল দেহটি যেন আলো-আঁধারিতে আঁকা একটি স্থিরচিত্র। পরিবেশকে লঘু করার উদ্দেশ্যে কৌশিকবাবু প্রশ্ন করলেন। "কি ব্যাপার, ছেলের কি হয়েছে?"

বিপিন আবার ম্লান হাসি হাসল। কৌশিকবাবু লক্ষ্য করলেন যে কেবল বিপিনের হাসিই ক্লিষ্ট নয়, ওর দেহেও স্বাস্থ্যের সে দ্যুতি নেই। হঠাৎ বড় কটুভাবে তাঁর মনে পড়ে গেল যে এরা আজ দুমাস হল ধর্মঘট চালিয়ে

যাচ্ছে। এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা বিদ্যুৎঝলকের মত তাঁর মনের পটে উদিত হল। তাঁর মত ওজস্বিনী ভাষার বক্তৃতায় শ্রমিকদের ক্ষুধার্ত থেকে ধর্মঘটে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন যে সব শ্রমিক-নেতা, তাঁরা কদিন শ্রমিকদের সঙ্গে উপবাস করেন? কেবল ভারত বলে নয়, সারা পৃথিবীতেই তো এই অবস্থা।

শুষ্ক কণ্ঠে বিপিন উত্তর দিল, "কি আর বলব মাস্টারবাবু—গরীবের অনেক জ্বালা। আজ তিন দিন বাড়ি শুদ্ধ সবাই এক রকম না খেয়ে থাকার মত। কাল জন খাটতে গিয়েছিলাম ভিন্ গাঁয়ে। মজুরী পেয়েছিলাম তিন পৈলা কোদো দানা। ওর মা তাই ফুটিয়ে নুন দিয়ে খেতে দিয়েছিল গোপলাকে। তা ওর মা যেই আমাকে তার খানিকটা খেতে দিতে গেছে, অমনি গোপলা ওর কুকুরটাকে নিজের কোদোর অর্ধেকটা দিয়ে দিয়েছে। বলুন তো মাস্টারবাবু, তিন দিন উপোসে থাকার পর এত কষ্টে যোগাড় করে আনা এই কোদো কি কুকুরকে দেওয়া সহ্য হয়? তাই মনের দুঃখে গোপলার মা গোপলাকে মেরেছে আর কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। খিদেতে ওরও তো মাথার ঠিক নেই।"

শুনতে শুনতে কৌশিকবাবু যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। বিপিন থামতে না থামতে ওর ছেলে অভিমান মাখা স্বরে বলল, "বারে হামরা খাব আর ভুলুয়াটা খাবেক নাই? উহোও তো কত্তদিন খায় নাই। হামাদের ভাত ভুখায় আর উয়ার ভুখায় নাই?" অর্থাৎ আমাদের খিদে পায় আর কুকুরটার খিদে পায় না?

বড় কঠিন প্রশ্ন। বিপিন কেন, কৌশিকবাবুও এর জবাব দিতে পারলেন না। তিনটি মানুষই অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। দাওয়ার উপর রাখা মহুয়া তেলের কুপিটার যতটুকু আলোকশিখা ধোঁয়ার হাত থেকে আত্মরক্ষা করে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছিল, তা-ই কেবল থেকে থেকে মৃদু বাতাসে কাঁপতে লাগল আর পিছনের দেওয়ালে সকলের বিরাটাকার ছায়া দুলতে লাগল তার সঙ্গে।

"গোপলা—হাই গোপলা।" মৃদু নারীকণ্ঠ ঘরের দরজার কাছ থেকে ভেসে আসছে। অন্ধকারে কারও চেহারা দেখা যায় না, কেবল অনুতপ্ত মায়ের ব্যাকুল আহ্বান কানে ভেসে আসে। "না—খাব নাই", গোপাল অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে। বিপিন তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, "যা বাবা, অমন কি করতে আছে?" কৌশিকবাবুও এক

স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করেন। গলা ঝেড়ে নিয়ে তিনিও বলেন, "যাও গোপাল, মা ডাকলে যেতে হয়।" কথা কটি বলেই তাঁর কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। এতটা ঘনিষ্ঠ হওয়া ঠিক হল কি? খুব বেশী সেন্টিমেণ্টালিজমের প্রশ্রয় দেওয়া হল না তো?

গোপাল দরজার ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কি করে কাজের কথা তুলবেন কৌশিকবাবু তা ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। আর ক্ষুধার্ত লোকটিকে বেশীক্ষণ আটকে রাখা ঠিক নয়। বিশেষতঃ এখনই ঐ ঘটনা ঘটে যাবার পর। অনেকক্ষণ ইতস্তত করার পর অবশেষে তিনি উচ্চারণ করলেন, "খবর কি বিপিন?" কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বরই নিজের কানে—কেমন অদ্ভুত শোনাল। কৌশিকবাবু বুঝতে পারছিলেন যে মনের তার কোথায় যেন ছিঁড়ে গেছে।

॥ আটত্রিশ ॥

রাত্রির অন্ধকারে জাহাতু থেকে ধলভূমগড় ফেরার পথে একটা কথা কৌশিকবাবুর মনকে প্রচণ্ডভাবে তোলপাড় করছিল। না, মোহনপুরের ধর্মঘটের কথা নয়। কারণ তার পরিণতির ইঙ্গিত তিনি কয়েক ঘণ্টা পূর্বে জাহিরার মাঠে পেয়েছিলেন। আর আটচল্লিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে অত দিনের ধর্মঘট ভেঙ্গে যাবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়বে কতদিনের কত পরিশ্রমে গড়া মোহনপুর খাদানের শ্রমিক সংগঠন। যাক্, সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাক্। অনিবার্যকে কে প্রতিরোধ করতে পারে? মোহনপুর সম্বন্ধে কৌশিকবাবুর মনে আর কোন উদ্বেগ নেই।

চলে আসার পূর্বে বিপিন তাঁকে চাপা স্বরে যে কথা বলে সতর্ক করে দিয়েছিল, তার কথা কি তাঁর মনে ঘোরা-ফেরা করছে? মৃত্যুর আশঙ্কায় তিনি কি ভীত? বিপিন চাপা বিষণ্ণ কণ্ঠে তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিল যে তিনি যেন আর এই ভাবে একা একা গ্রামাঞ্চলে ঘুরে শ্রমিক সংগঠনের চেষ্টা না করেন। কারণ ঝাড়খণ্ড দলের কথা এখন স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে বেদবাক্যস্বরূপ এবং এমন কি বিপিনদের মত চিরকাল গ্রামের সুখ-দুঃখের সাথী মাহাত বা গৌড় সম্প্রদায়ের লোকেদেরও আদিবাসীরা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে। কারণ বিপিনরা তো আদিবাসী নয়। যাই হক, ওরা পরশু থেকে মোহনপুরের আদিবাসী শ্রমিকদের বিনা শর্তে কাজে ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়েছে ও ঘোষণা করেছে যে এর বিরুদ্ধে যারা কিছু

বলবে তাঁরা দিকু এবং তাই হোড়ের শত্রু। ঐ জাতীয় লোকেদের বিষকাঁড় দিয়ে বিঁধে দেওয়া অতীব সৎকর্ম। এ অবস্থায় বিপিনদের মত মুষ্টিমেয় মাহাত বা গৌড়দের পক্ষে আর ধর্মঘট চালানর মানে হয় না এবং সত্যি কথা বলতে কি তাদের সে শক্তিও নেই আর। সুতরাং……

সুতরাং যা হবার তাই হবে।

বিপিন অবশ্য কৌশিকবাবুকে এ কথাও জানাতে ভোলে নি যে লাহুরা তাঁকেই বিষকাঁড়ের প্রথম শিকার বানাতে পারে। কি করে যেন ওদের ধারণা হয়ে গেছে যে তিনি এই ভাবে জেনেশুনে ওদের সর্বনাশ করে পালিয়ে গেছেন। কিন্তু না, মৃত্যুভয় কৌশিকবাবুকে চিন্তিত করে নি। অতীত জীবনে একাধিকবার তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন পার্টির অনুগত সেবক হিসাবে এবং প্রত্যেক বারই তিনি সেই সব বিপদ বরণ করে নিয়েছিলেন স্বেচ্ছায় ও সানন্দে। সুতরাং এত দিন পর ধলভূমের এই আরণ্য ভূমিতে আরণ্য অধিবাসীদের মারফত তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হয়ে থাকলে তিনি বিচলিত হবেন না। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অবশ্য মনের ভাব কি হবে, তা কৌশিকবাবু এখনই বলতে পারেন না। কিন্তু এখন এত পূর্বে তার আশঙ্কায় তিনি নিজেকে পীড়িত করবেন না।

কৌশিকবাবুর মনে যে প্রশ্নটি প্রচণ্ড তরঙ্গ তুলছিল, তা একেবারে অভিনব। এত প্রবল তাগিদ সেই প্রশ্নের যে তার উত্তাল বিস্তারের মধ্যে পড়ে তিনি সাময়িক ভাবে মোহনপুরের ধর্মঘট ইত্যাদি এত গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক সমস্যাবলীর কথাও বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গহন অন্ধকার ভেদ করে পায়ে চলা পথের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে চলতে চলতে একটি প্রশ্নই বার বার তাঁর সমগ্র সত্তামূলে প্রবল আঘাত করছিল— মানুষ তার এই জড় বা ভৌতিক সত্তারও অতীত কোন কিছু কিনা? কারণ তা যদি না হত তা হলে কি করে তিন দিনের উপবাসী ক্ষুধার্ত ঐ শিশু নিজের ক্ষুধার অন্নের ভাগ অবলীলাক্রমে কুকুরের মুখে তুলে দিত? মায়ের উপবাসী থেকে সন্তানকে খাওয়ানর না হয় একটা জড়বাদী ব্যাখ্যা দেওয়া চলতে পারে। কিন্তু নিজে না খেয়ে পোষা কুকুরকে খাওয়ানর পিছনে মানুষের কি স্বার্থ থাকতে পারে? কুকুরের উপর দরদ কতটা প্রবল হলে মানুষ নিজের ভৌতিক দেহের ক্ষুধার জ্বালা জনিত প্রতিক্রিয়াকে জয় করতে পারে? তা হলে দরদ বা ভালবাসা কি মানুষের জৈব সত্তার চেয়েও শক্তিশালী কোন অন্তঃপ্রেরণা? এর উৎস তো জড় দেহ

হতে পারে না। কিন্তু কোথায় তা'হলে এর উদ্গম? অশিক্ষিত বিপিনের নিরক্ষর বালকপুত্র গোপাল কৌশিকবাবুর মনে একি সমস্যার অন্তবিহীন তরঙ্গ সৃষ্টি করল? ডায়লেকটিকাল মেটিরিয়লিজম দিয়ে এর কোন কূলকিনারা করা যাচ্ছে না তো?

গুড় গুড় গুড়— কড়াৎ কড়। আকাশের কৃষ্ণবর্ণ পর্দাটা চক্ষের পলকে বিদীর্ণ করে দিয়ে কোন্ অদৃশ্য ড্রাগনের সুদীর্ঘ জিহ্বা মুহূর্তের জন্য লক্ লক্ করে উঠে আবার আত্মগোপন করল। কড় কড় কড়াৎ কড়— অনতিদূরেই কোথায় বজ্রপাত হল। সোঁ সোঁ সোঁ— শাল মহুয়া আর পলাশবৃক্ষ জুড়ে প্রচণ্ড মাতন জাগিয়ে মত্ত প্রভঞ্জন দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছে। প্রথম আষাঢ়ের সন্ধ্যার গুমট দূর হয়ে শীতল বাতাসে শরীর উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু এ উল্লাস স্থায়ী হবার নয়। ঝম্ ঝম্ ঝম্, ঝম্ ঝম্ ঝম্— লক্ষ লক্ষ বৃষ্টির সিপাহী তালে তালে তাদের অযুত সংখ্যক পা ফেলে বায়ুর গতিতে এগিয়ে আসছে পৃথিবী জয় করার জন্য। ক্ষুদ্র বিরাট নির্বিশেষে প্রতিটি বিটপীর পর্ণে পর্ণে জেগেছে তাদের পদধ্বনি। আর নিস্তার নেই। বিষ কাঁড় না হলেও তীরের ফলার মত তীক্ষ্ণ ঐ বৃষ্টিবিন্দুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য কৌশিকবাবু এক রকম দৌড়ে এগোতে লাগলেন। কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় কোথায়?

হুম্ হুম্ হুম্, হা-হা-হা— প্রতিটি বৃক্ষ যেন তাঁর দুরবস্থা দেখে অট্টহাস্য করছে। নিষ্ঠুর উল্লাসে সর্ব অবয়ব দুলিয়ে ঐ অন্ধকারের মধ্যে তারা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। মড় মড় মড়াৎ— একটু দূরে কোথাও একটি বিশাল বৃক্ষের মূল পর্যন্ত বুঝি উৎপাটিত হল। ছোট বড় নানা আকারের ডাল ভেঙ্গে পড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কী ভাগ্যি একটি এসে তাঁর মাথার উপর পড়ে নি। বৃষ্টিস্নাত অবস্থায় দৌড়োতে দৌড়োতে কৌশিকবাবু হাঁপিয়ে উঠলেন। ধলভূমগড় তো এখনও অনেক দূর। কিন্তু একটা আশ্রয় চাই তো! বৃক্ষতল মোটেই নিরাপদ নয়। চড়াৎ— গুম্ গুম্ গুম্। কোটি কোটি ভোল্টের বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল কাল আকাশের গায়ে। আর তারই আলোকে কৌশিকবাবু দেখলেন যে তিনি এবার চাকুলিয়া যাবার রাস্তা থেকে আর খুব বেশী দূরে নেই আর জঙ্গলও শেষ হয়ে আসছে। কারণ যুদ্ধের সময় এখানে উড়োজাহাজের যে আড্ডা তৈরী হয়েছিল, এবার তিনি তারই প্রান্তদেশে উপস্থিত হয়েছেন। ঐ ভাঙ্গা বাড়িটি বর্তমানে পরিত্যক্ত এরোড্রোমেরই একটি ঘর। এই প্রবল ঝড় ও

বর্ষণের মধ্যে আর এগোন অসম্ভব বলে তিনি ঐ আশ্রয়ের অভিমুখে অগ্রসর হলেন।

* * *

একটা প্রচণ্ড দমকা হাওয়ায় এলসির তন্ময়তা ভেঙ্গে গেল। স্টিয়ারিং দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে সে সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করল। মোটরের হেড লাইটের আলোকে রাস্তার দুই পাশে যতটুকু দেখা যায়, তাতে সে বুঝতে পারল যে আশেপাশের শাল মহুয়া আর পলাশের সারি যেন ক্ষেপা নাচনে মেতে উঠেছে। মুহুর্মুহু প্রলয় দোলায় দুলছে বৃক্ষগুলির শাখা-প্রশাখা এবং এমন কি ভূমির সঙ্গে দৃঢ়সংবদ্ধ কাণ্ডটিও। বুরুহাতু থেকে এত দূর পর্যন্ত এমন আনমনা ভাবে সে এসেছে যে চতুর্দিকে জলদজালের এই বিপুল সমাবেশ এতক্ষণ পর্যন্ত তার নজরে পড়ে নি। কি নিয়ে সে এত চিন্তামগ্ন ছিল? মোহনপুরের ধর্মঘট? বাবার হস্তক্ষেপের ফলে পরশু থেকে তো তা মিটে যাবার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। ধর্মঘট শেষ হবার পর নূতন করে কাজ শুরু করার সমস্যা? সে যা হোক হবে। আর তা ছাড়া এতদিন পর বাবা যখন আবার কাজকর্মে মেতেছেন তখন এলসির আর বিশেষ চিন্তা কিসের? তা হলে কি নিয়ে এতক্ষণ আত্মবিস্মৃতের মত চিন্তা করতে করতে এতটা পথ গাড়ি চালিয়ে এল এলসি? অদ্ভুত ব্যাপার! এতক্ষণ যেন শূন্য নিয়ে আত্মসমাহিত হয়ে ছিল এলসি।

শোঁ-ওঁ-ওঁ। করুণ আর্তনাদ উঠেছে বৃক্ষলতার রাজত্বে। প্রলয়ঙ্কর ঝটিকাপ্রবাহ বয়ে চলেছে ধলভূমের আরণ্য অঞ্চলে। দেখতে দেখতে বৃষ্টি নামল। চড় চড় চড় চড়— বড় বড় ফোঁটায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। মড় মড় শব্দে গাছের ডাল-পালা ভেঙ্গে পড়ছে। এলসি একটু উদ্বিগ্ন হল। ধলভূমগড় স্টেশন এখনও পাঁচ মাইল দূরে। এই তো সবে পুরাতন এরোড্রোমের এলাকা শুরু হয়েছে। মোহনপুর এখনও আটমাইলের বেশী রাস্তা। গাড়িটার অবস্থা খুব ভাল নয়। অনেক দিন যাবতই সে একে সার্ভিসের জন্য জামসেদপুরে নিয়ে যাবার কথা ভেবেছে; কিন্তু এতদিন ধর্মঘটের হাঙ্গামায় কোন কিছু করার মন ছিল না। এই ঝড়-জলের মধ্যে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তা হলেই বিপদ।

চড় চড় চড় চড়। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা এসে জিপের ক্যানভাসের চাল আর দুই পাশের আবরণের উপর পড়ছে। সামনের সার্সিটার গা বেয়ে জলস্রোত নেমেছে। ওয়াইপারের দীর্ঘ রবারের হাত দুটি প্রাণপণে

সার্সিটিকে মুছেও পরিষ্কার রাখতে পারছে না। থেকে থেকে পাশের আবরণের ফাঁক দিয়ে দমকা হাওয়ার সঙ্গে জলের ছিটে এসে এলসির পোশাক ভিজিয়ে দিচ্ছিল। আজ বর্ষাতি নিয়ে বেরোবার কথা এলসির খেয়াল হয় নি। কিন্তু এখন অন্যমনস্ক হবার সময় নয়। বৃষ্টির জলে পিছল রাস্তা কামড়ে ধরতে টায়ার একটু ত্রুটি করলে গাড়ি উল্টে যাওয়া অসম্ভব নয়। এলসি এক্সিলারেটরের উপর থেকে চাপ কমিয়ে দিয়ে দৃঢ় মুষ্টিতে স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরে প্রয়োজন মত ডাইনে বামে ঘোরাতে লাগল।

কড় কড় কড়াৎ, গুম্ গুম্ গুম্। আকাশ পাতাল মন্দ্রিত করে জার্মান বোমা বিস্ফোরণের মত কোথায় বাজ পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে এলসির হাত কেঁপে স্টিয়ারিংটা অকস্মাৎ ডান দিকে অনেকখানি ঘুরে গেল। কি হল বুঝে সামলাবার চেষ্টা করার পূর্বেই এলসির জিপ রাস্তা ছেড়ে পাশের ক্ষেতের আলের সঙ্গে ধাক্কা খেল। বৃষ্টিতে ভেজা আলের মধ্যে সামনের বাম্পার ঢুকে গিয়ে কোন মতে টাল সামলে গাড়ি উল্টে যাবার হাত থেকে বাঁচল। কিন্তু ঐ প্রচণ্ড ধাক্কায় মোটরের প্রতিটি যন্ত্রপাতি যেন নেচে উঠে এলোমেলো হয়ে গেল এবং গাড়ির হেড লাইট দুটি নিভে গিয়ে কেবল এঞ্জিনটি ক্রুদ্ধ গর্জন করতে লাগল।

আর এলসি? "ও গড", বলে ভয়ার্ত আর্তনাদ করে নিজের আসনের উপর লাফিয়ে উঠলেও তার হাত তখনও স্টিয়ারিং হুইলের উপর আছে। কয়েক মুহূর্ত সে স্টিয়ারিং এর উপর মাথা রেখে আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল। তার পর ডিউকের চিৎকারে তার সম্বিৎ ফিরে এল। অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে ডিউক ঘেউ ঘেউ করছে। এলসি চটপট গাড়ির স্টার্ট থামিয়ে দেবার জন্য সুইচ অফ করে দিল; কিন্তু তবুও সে হঠাৎ নিজের আসন ছেড়ে নড়তে পারল না। কারণ সে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল যে ব্রেক ও ক্লাচের উপর রাখা তার পা দুখানি থর থর করে কাঁপছে।

বাইরে ঝড়-বৃষ্টির দাপাদাপি সমান তালে চলেছে। এলসির গতিশূন্য জিপের পাশে একটা বিশাল মহুয়া গাছ তার অজস্র বাহু নিয়ে আকুলি বিকুলি করছে। পৃথিবীতে বুঝি ওলট-পালট ঘটে যাবে একটা এবং তারই সূচনা পেয়ে গাছটির এই হাহাকার। কোন্ নোয়ার জাহাজ, তার পর জল-প্লাবিত ধরণীবক্ষে নূতন বিশ্ব গড়ে তোলার প্রতীক্ষায় ঘুরে বেড়াবে তা কে জানে?

এলসি সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে ফেলে আবার মোটরের সুইচ অন্ করল।

এই প্রলয়ঙ্করী রাত্রে নির্জন জঙ্গলের ভিতর নিজের পুরুষকার ছাড়া পরিত্রাণ পাবার দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। আর তার মত চিরকালের নিঃসঙ্গ মেয়ের এত সহজে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। ক্লাচ-গীয়ার-এক্সিলারেটর······কিন্তু কই, গাড়ি এগোচ্ছে কই? সামনের চাকা দুটি কেবল কয়েকবার প্রবল বেগে আবর্তিত হয়ে হঠাৎ আবার থেমে গেল। গাড়ি সেই নীচু জায়গা ছেড়ে এক চুলও এগোল না। আবার ক্লাচ-ব্যাক গীয়ার-এক্সিলারেটর। কেবল একটা জোরালো ঝাঁকুনি দিয়ে গর্জন করা ছাড়া এলসির জিপে গতির কোন নিদর্শন দেখা গেল না। এলসির বুকের ভিতর পর্যন্ত শিহরিত হয়ে উঠল, উপায়— তা হলে উপায় কি? এই প্রবল বর্ষণের মধ্যে চার মাইল হেঁটে ধলভূমগড় যাবার কথাও তো কল্পনা করা যায় না। উন্মাদিনীর মত সে ঐ অন্ধকারের মধ্যে বার বার এক্সিলারেটরে পদাঘাত করতে লাগল।

অবশেষে হতাশ হয়ে সে যখন গাড়ির আশা ছেড়ে দিল তখন তার সমস্ত শরীর যেন শিথিল ও অবশ হয়ে গেছে। এই ঠাণ্ডা হাওয়া সত্ত্বেও কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদকণিকা দেখা দিয়েছে, কণ্ঠনালীও যেন শুষ্ক। গাড়ির দুই পাশ দিয়ে সমান ভাবে জলের ঝাপটা আসছে। পোশাকপরিচ্ছদ পুরোপুরি ভিজে যেতে আর দেরি নেই বললেও চলে। এলসি বাঁ হাতে ডিউকের গলাটা জড়িয়ে ধরে চালকের আসনের উপর নিজের দেহ এলিয়ে দিল।

কড় কড় কড়াৎ— গুম্ গুম্ গুম্। আকাশ জুড়ে বিদ্যুল্লেখা হিল্লোলিত হয়ে উঠল। সেই ক্ষণপ্রভার আলোকে এলসি দেখতে পেল যে গজ পঞ্চাশেক দূরেই গাছপালার ফাঁকে একটি পুরাতন বাড়ি। ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত এই অনড় গাড়ির মধ্যে বসে ভিজলে আর কি লাভ? তা ছাড়া পাশের মহুয়া গাছটির অবস্থাও সুবিধার নয়। একটি ডাল ভেঙ্গে পড়লে আর রক্ষা নেই। তার চেয়ে এরোড্রোমের ঐ পরিত্যক্ত বাড়িটিতে আশ্রয় নেওয়াই ভাল।

ভয়? ডিউক সঙ্গে থাকতে ভয় কিসের? আর এখন যে অবস্থা, তার চেয়ে বেশী বিপদ আর কি হতে পারে? তা ছাড়া আর কিছুক্ষণ পরে তো হেঁটে রওনা হতেই হবে। অন্ততঃ ধলভূমগড়ে ইন্দুবাবুর কাছে হাজির হলে মোহনপুরে পৌঁছানর ব্যবস্থা তো হবেই এবং সঙ্গে সঙ্গে কালকে গাড়িটি উদ্ধারেরও বন্দোবস্ত হতে পারে। এ অঞ্চলে এক ইন্দুবাবুই তাঁর ট্রাকগুলির জন্য একটি ছোট-খাটো গ্যারেজ রাখেন। সুতরাং তাঁর লোক জনের সাহায্য ছাড়া গাড়িটির মুক্তির উপায় নেই। এলসি গাড়ির বডি

লাইট জ্বালিয়ে স্পিডোমিটারের বাঁ দিকের খোপ থেকে একটি টর্চ বার করল এবং তার পর সাহসে ভর করে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

একটা দমকা হাওয়ার সঙ্গে জলের ছাট এসে এলসির স্কার্টের যেটুকু শুকনো ছিল তাও সিক্ত করে দিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের প্রতিটি রোমকূপ যেন শীতের ছোঁয়ায় খাড়া হয়ে উঠল। মৃদু হেসে এলসি টর্চের আলো নীচের দিকে ফেলল এবং তার পর ভিজে মাটির উপর নেমে পড়ল। ঝপাৎ—যন্ত্রচালিতের মত ডিউকও গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে ওর অনুবর্তী হল। ছপ্ ছপ্ ছপ্—শীর্ণ একটি আলোকরেখার পিছনে দুটি প্রাণী এগিয়ে চলল।

॥ উনচল্লিশ ॥

পরিত্যক্ত মিলিটারী ব্যারাকটির সামনে এসে এলসি একবার থমকে দাঁড়াল। এত দিনের পোড়ো বাড়ির ভিতর ঢুকবে কি ঢুকবে না? না, ভূত প্রেত দৈত্য দানোর ভয় এলসির নেই। এ বয়সে ওটা হাস্যকর ব্যাপার। আর উদরান্নের সংস্থানের জন্য যাকে মাতৃভূমি থেকে বহু সহস্র মাইল দূরে এক অচেনা পরিবেশে কেবল একটি জিপ এবং ডিউকের উপর ভরসা করে রাত্রি-দিনের কথা খেয়াল না করে বন-বাদাড়, পাহাড়-জঙ্গল চষে বেড়াতে হয়, তার মনে ও সব অসম্ভব কল্পনা ঠাঁই পায় না।

কিন্তু তবু হিংস্র কোন পশু অথবা সাপ-বিছের মত বিষাক্ত প্রাণী থাকাও তো বিচিত্র নয়। সাবধানের মার নেই। তাই নীচে দাঁড়িয়েই সে টর্চের বোতাম টিপে তার আলোতে ছোট্ট অপ্রশস্ত বারান্দাটি দেখে নিল। না, যতটা ঝোপ জঙ্গল হবে আশঙ্কা করেছিল, তা নেই। কিন্তু ঘরটির অবস্থা সত্য সত্যই জরাজীর্ণ। দরজা জানালার পাল্লা এবং এমন কি চৌকাঠেরও বালাই নেই। খুঁড়ে খুঁড়ে কারা নিয়ে গেছে। এক ইঁটের দেওয়ালের জায়গায় জায়গায় ফাটল। তার উপর দিয়ে চালের জল চুঁইয়ে অজস্র ধারায় নামছে। কারণ চালের খড়েরও শেষ অবস্থা উপস্থিত। ছ-সাত বছর নূতন খড় না পড়লে চাল সুরক্ষিত থাকার কথা নয়।

এবার দেখা যাক ভিতরের কি অবস্থা। এলসি টর্চের বোতাম টিপে সিঁড়ি ভেঙ্গে বারান্দার উপর উঠে পড়ল। বলা বাহুল্য ডিউকও তার সঙ্গে। তার পর কয়েক পা এগিয়ে দরজার ভিতর টর্চের আলো ফেলে বাইরে থেকে

পায়ের আওয়াজ করল। এলসি শুনেছে ধারে কাছে সাপ থাকলে এতে চলে যায়।

"কে, কে—কে ওখানে ?"

আচম্বিতে এলসি দুই পা পিছিয়ে এল। এখানে এখন মানুষের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। তার হাত কেঁপে উঠে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ টর্চের বোতামের উপর থেকে সরে গেল। চতুর্দিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার। বাইরে কেবল একটানা বর্ষণের আওয়াজ—ঝুপ ঝুপ ঝুপ, ঝর্ ঝর্ ঝর্।

"কে, কে, কি চাই এখানে ?" পদশব্দ দ্রুত এগিয়ে আসছে।

ডিউক প্রচণ্ড স্বরে গর্জন করে উঠল, ঘেউ ঘেউ ঘেউ—ঘেউ-উ-উ। এখনি কোন বিপদ ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। এলসি তাড়াতাড়ি টর্চ জেলে নিল আবার। দেখল ডিউক তার সমস্ত শরীর টান টান করে উপরের দিকে মুখ তুলে গর্জন করছে। তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, সম্মুখের পা দুটি দিয়ে সে পর্যায়ক্রমে বারান্দার মাটি আঁচড়াচ্ছে। শিকারের উপর ভীমবেগে লাফিয়ে পড়ার জন্য ওর প্রতিটি পেশী এবং স্নায়ু প্রস্তুত।

ভিতরের পদধ্বনি মন্থর হয়ে গিয়েছিল। টর্চের আলো আবার জ্বলে উঠতে দরজার একটু ও পাশ থেকে ভিতরের লোকটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "কে আপনি, কি চাই এখানে ?"

কণ্ঠস্বর পুরুষের ; কিন্তু অভাবনীয় পরিস্থিতির জন্য তা যেন ঈষৎ বিকৃত, একটু কম্পিত। এলসি বাঁ হাতে টর্চটি ধরে ডান হাতে ডিউকের গায়ে আদরের চাপড় দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, "ছাটস ও-কে, ডিউক। নাউ স্টপ ইট।" ডিউক এলসির মুখের দিকে তাকাল। সেখানে নির্ভরতার ছবি। ধীরে ধীরে ওর উগ্র সংগ্রামী মূর্তি স্বাভাবিক হয়ে এল। বার দুই আদর সূচক কুঁই কুঁই করে ডিউক এলসির গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

জলন্ত টর্চ হাতে নিয়ে এলসি দুই পা এগিয়ে গিয়ে আবার চৌকাঠের নীচে দাঁড়াল। তার পর বলল, "আমি মিস মুর। মোটর খারাপ হয়ে গেছে বলে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য এখানে এসেছি। আপনি···"

টর্চের আলোকরশ্মি ঋজু ভাবে ওদিকের দেওয়ালে পড়েছিল। ধীরে ধীরে সেই আলোকিত দেওয়ালের উপর একটা ছায়া পড়ল। ছায়াটা কিছুটা এগিয়ে এল এবং তার পরই একটি মনুষ্যমূর্তি দৃষ্টিগোচর হল। টর্চের শিখাকে একটু নিম্নমুখী করে এলসি জিজ্ঞাসা করল, "আপনি···আপনি কে ?"

চড়াৎ চিড় চিড় চিড়। আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল এবং তার পরই

কার আগমন ঘোষণা করার জন্য মেঘের দুন্দুভি বাজতে লাগল—গুম্ গুম্ গুম্, গুড় গুড় গুড়। সেই চোখ ঝলসান বিদ্যুতের আলোকে এলসি দেখল আগন্তুক কৌশিকবাবু। হঠাৎ নভোমণ্ডলের ঐ দুন্দুভি-ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠল এলসির বুকের ভিতর।

*   *   *   *

কাছে থেকেও কত দূর! ঘরের ভিতর দুই জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলেও এ যাবৎ প্রারম্ভিক কুশল সমাচার বিনিময় ছাড়া আলাপচারি আর বেশী দূর এগোয় নি। এর সঠিক কারণ যে কি, তা কেউ-ই বোধ হয় জানে না। কিন্তু তবু ইচ্ছা থাকলেও পাশাপাশি দণ্ডায়মান মানুষ দুটি মন খুলে কথা বলতে পারছে না।

বাইরে তখনও অজস্রধারায় বর্ষণ চলছে; কিন্তু বাতাসের বেগ অপেক্ষাকৃত শান্ত। থেকে থেকে হা-হা করে একটা দমকা হাওয়া ছাড়া ঝঞ্ঝার আর প্রকোপ নেই বললেও চলে। পরিত্যক্ত মিলিটারী ব্যারাকটির ভিতরে তার ফাটা দেওয়াল গড়িয়ে এবং মাথার উপর পাতলা খড়ের আস্তরণ চুঁইয়ে বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকারে সঠিক বোঝা না গেলেও এ কথা স্পষ্ট যে জলধারার হাত থেকে সুরক্ষিত জায়গা বিশেষ নেই। ডিউক কৌশিকবাবুকে বার কয়েক মনোযোগ সহকারে শুঁকে অবশেষে ওদিকে এমনি একটু শুকনা জায়গায় আশ্রয় নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। অন্ধকারে ওর জ্বলন্ত চোখ দুটি কেবল ধক্ ধক্ করছে। আর এদিকে এক অপ্রশস্ত অপরিসর জায়গায় পাশাপাশি এলসি ও কৌশিকবাবু। দুজনেই মৌন। দুজনেই ওরা যেন কোন অতল চিন্তা-পারাবারে ডুব দিয়েছে।

এই অস্বস্তিকর পরিবেশ এলসির মোটেই ভাল লাগছিল না। হাত ঘড়িটা একবার সে চোখের সামনে তুলে ধরল। অন্ধকারে কাঁটা দুটি জ্বলছে। রাত নটারও উপর হল সময়। এলসি নিজের মণিবন্ধ কানের কাছে নিয়ে গেল। না, চলছে। টিক্ টিক্ টিক্ টিক্—ক্ষীণ কিন্তু সুনিশ্চিত কণ্ঠে মহাকালের নকীব সময়ের হিসাব হেঁকে চলেছে।

"কটা বাজল?" কৌশিকবাবুর কণ্ঠ।

"নটা পাঁচ," উত্তরের চেষ্টাকৃত নিরুত্তাপ ভঙ্গীতে ভিতরের চাঞ্চল্য ধরা পড়ে না।

টিক্ টিক্ টিক্ টিক্। আবার নীরবতা। ঘড়িটা কেবল নিয়মিত ভাবে এই অস্বাভাবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে।

কেন জানি এলসির বড় খারাপ লাগে। নিরর্থক মনের ভিতর একটা হাহাকার, একটা বেদনার স্রোত পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। তার বঞ্চিত নিঃসঙ্গ জীবনের সব কটি প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কারণ সেই মুহূর্তে তার মনে ঠেলাঠেলি করে ভিড় জমায়। যুদ্ধ, বোমায় ক্ষতবিক্ষত মায়ের দেহ, নিরুদ্দেশ স্টুয়ার্ট, খামখেয়ালী পিতা—সবাই মিলে তাকে দলে পিষে চূর্ণ করে দিচ্ছে। এলসির ইচ্ছা করে সে উচ্চকণ্ঠে কেঁদে ওঠে। কিন্তু ছিঃ, এ সে কি চিন্তা করছে? একজন ইংরেজ মহিলার উপযুক্ত কাজ নাকি এ? এ কোন্ দুর্বলতা মাঝে মাঝে এলসির উপর ভর করে? ছি-ছি-ছি। এলসি আবার নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে। জীবনে যতই দুঃখ-বিপত্তি আসুক না কেন, নিজের মর্যাদা বজায় রেখে পৃথিবীতে চলাই তো তার ইংরেজ সংস্কৃতির লক্ষ্য।

কৌশিকবাবুর মনেও সংগ্রাম চলেছে। পরিবেশটা বিসদৃশ এ কথা সত্য; কিন্তু একজন ক্যাপিটালিস্টের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ? বিশেষতঃ যার খাদানে তিনি মজুরদের হরতাল করতে প্ররোচিত করেছেন এবং কমিউনিস্ট হিসাবে যার সঙ্গে তাঁর খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক। খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক? কথাটা নিজের কানেই আজ কেন যেন তাঁর বেসুরো বাজল। বহুদিন ধরে বহু রকমে যে বিশ্বাস তাঁর সত্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেঁধে এক রকম তাঁর স্বকীয় অঙ্গই হয়ে গেছে, তা আজকে এমন বিচিত্র মনে হচ্ছে কেন? কৌশিকবাবু যেন তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান আর এক কৌশিকবাবুকে চুল-চেরা বিশ্লেষণ করা শুরু করলেন।

খাদ্য-খাদক সম্পর্কে সামাজিক সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু মানুষে মানুষে সম্পর্কের বেলাতেও কি এ কথা সত্য? মানুষের কথা থাক—মানুষে পশুতে? তা হলে গোপালের এ আচরণের অর্থ কি? নিজের ক্ষুধার অন্ন কুকুরকে দিয়ে দেবার মানে? কুকুরের কাছ থেকে তো ওর কোন প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই! কিন্তু আর্থিক কারণে অর্থাৎ উৎপাদন কার্যে ভাগ নেবার জন্য যে সব মানুষ কাছাকাছি এসেছে, সমাজবদ্ধ হয়েছে, তাদের মধ্যে কয়েকজন পুঁজিপতি এবং অনেকে মজুর হলেই কি তারা পরস্পর সম্পর্কবিহীন খাদ্য খাদকে পরিণত হবে? আর্থিক সম্বন্ধ নিরপেক্ষ কোন মানবীয় সম্পর্ক কি মানব প্রজাতির ভিতর নেই? না-ই যদি থাকবে তবে গোপালের আচরণের কি ব্যাখ্যা? ভালবাসা কি সঙ্কীর্ণ আর্থিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না? যদি পারে তা হলে তো ভালবাসাকে অন্য-নিরপেক্ষ স্বয়ম্ভু সত্তা বলতে হয়।

কিন্তু তা হলে ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার কি হবে?—মেটিরিয়ালিস্ট ইন্‌টারপ্রিটেশন অফ হিস্ট্রি!······মানুষ বড় না অর্থশাস্ত্র, মানুষ আগে না অর্থশাস্ত্র আগে? কৌশিকবাবুর কানে যেন অকস্মাৎ ভোলানাথবাবুর প্রীতিস্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর অনুরণন করে উঠল— মতান্তর হলেও মনান্তর হবে কেন?

দূর হক ছাই এই সব অন্তহীন নৈয়ায়িকের তর্ক। কৌশিকবাবু মনে মনে ভাবলেন এই দুর্যোগে দুজনে এক জায়গায় পাশাপাশি আশ্রয় নেবার পরও এ ভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা একেবারে অস্বাভাবিক ব্যাপার। বন্যার দিনে মানুষ আর কেউটে সাপ একই গাছের ডালে দিনের পর দিন কাটিয়েছে। সাপ মানুষকে কামড়াবার প্রয়াস করে নি এবং মানুষও সাপকে মারার কথা ভাবে নি—এও তো শোনা গেছে। সুতরাং আপাততঃ তাঁর উপকারী বা একরকম জীবনদাত্রী একজন মহিলার সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ না করার কোন কারণ নেই। তিনি তো মিস মূরের পুঁজিবাদী কার্যকলাপের ভাগীদার হচ্ছেন না। এ নিছক ভদ্রতা, নেহাত-ই সৌজন্য।

মনে মনে কিছুক্ষণ প্রস্তুতি করে নিয়ে অবশেষে তিনি বললেন, "এত রাত্রে এই রকম ঝড়-বাদলের মধ্যে না বেরোলে আপনার চলত না?"

এলসি চমকিত। কৌশিকবাবুর কণ্ঠে আত্মীয়তার সুর! কতদিন—ওঃ, কতদিন এমনি আত্মীয়তার সুর কানে আসে নি। ওর মুখে প্রসন্নতার চিহ্ন ফুটে উঠল। বুক থেকে কিসের একটা বোঝা নেমে গেল যেন।

লঘু কণ্ঠে সে উত্তর দিল, "অন্নের সংস্থান করতে হলে সময়ের বাছ বিচার করলে চলে? আমরা জরুরী কিছু অর্ডার পেয়েছি জাপান থেকে। ভাইজাগ বন্দরে জাহাজে মাল বোঝাই হবে। কাল থেকে চাকুলিয়ায় ওয়াগন দেওয়া শুরু হচ্ছে। জানেন বোধ হয় আমাদের মোহনপুরের খাদানে দু মাস ধরে ধর্মঘট। তাই দিন রাত লেগে থেকে আমাদের বুরুহাতুর খাদানে মাল তৈরী হচ্ছে। এর পর কাইনাইট পাথর চাকুলিয়ায় আসবে।" একটুখানি থেমে দম নিল এলসি। তার পর প্রশ্ন করল, "কিন্তু আপনি কেন এত রাত্রে বেড়াতে বেরিয়েছেন, আর নরসিংগড় থেকে এত দূরে এই বনে জঙ্গলে? সেই সাপে কামড়ানর কথা ভুলে গেছেন বুঝি?" এলসির কণ্ঠে যুগপৎ কৌতুক এবং মৃদু অনুযোগ।

তাই তো, কেন বেরিয়েছেন কৌশিকবাবু এমনি দুর্যোগের মধ্যে? কি উত্তর দেওয়া যায় এর? কৌশিকবাবু বিলক্ষণ বিব্রত বোধ করলেন।

"আমি—আমি···মানে···" বলতে বলতে তাঁর বিহ্বল দৃষ্টি এলসির মুখ ছাড়িয়ে ঘরের চাল এবং চাল থেকে দেওয়ালের উপর পড়ল। ওকি, অন্ধকার ওখানে জমাট বেঁধে দুলছে নাকি? অকস্মাৎ ক্ষিপ্র ভাবে তিনি এলসির উভয় হস্ত ধরে নিজের দিকে সবলে আকর্ষণ করে দুই লাফে পিছনের দিকে সরে গেলেন। হুড়মুড় করে উপর থেকে ফাটা দেওয়ালের একাংশ ধ্বসে এলসি যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানে পড়ল। তার পরও অল্পক্ষণ ধরে ঝুর ঝুর করে মাটি পড়তে লাগল।

"দেখছিলেন, এক্ষুনি কি হচ্ছিল!" উদ্বেগমাখা স্বরে কৌশিকবাবু বললেন। এবং পরক্ষণেই তাঁর খেয়াল হল সেই যে অতর্কিতে আকর্ষিত হবার পরমুহূর্তে বিভ্রান্ত এলসি অস্ফুট আর্তনাদ করে তাঁর বক্ষে এলিয়ে পড়েছিল, তার পর থেকে অমনি ভাবেই রয়েছে সে এবং তিনি নিজেও তেমনি দৃঢ়ভাবে তার দুই হাত ধরে আছেন। কতটুকু সময়ই বা হবে? তবু কৌশিকবাবুর সর্বাবয়ব শিহরিত হয়ে উঠল। তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন এলসির কমনীয় দেহবল্লরীর নমনীয় স্পর্শে থর থর করে কেঁপে উঠল। সেই মৃদু সুরভির মিষ্টি গন্ধটুকুকে একেবারে বুকের কাছে তিনি পাচ্ছেন।

ভৌ-ভৌ-ভৌ—ডিউক এক লাফে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। হুংকার ছেড়ে উপরের দিক থেকে পতিত ইঁট এবং মৃত্তিকা স্তূপের কাছে দাঁড়িয়ে সে আকাশের দিকে মুখ তুলে চীৎকার করতে লাগল।

ডিউকের ডাকে এলসির যেন সম্বিৎ ফিরে এল। ধড়মড় করে কৌশিকবাবুর কাঁধ থেকে মাথা তুলে নিয়ে সে দেয়ালে ভর দিয়ে হাঁপাতে লাগল। কৌশিকবাবুও ওর হাত ছেড়ে দিয়েছেন। হাঁপাতে হাঁপাতে ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলল, "এক্সকিউজ মি প্লীজ। বড় নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম এই আকস্মিক ঘটনায়। এক্সকিউজ মি কৌশিকবাবু।"

কৌশিকবাবু নিজের কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিকতাকে যথাসম্ভব চাপা দিয়ে বললেন, "না-না তাতে কি হয়েছে? এ রকম আকস্মিক ঘটনায়······"

* * *

রহস্যাবগুণ্ঠনে ঢাকা মোহময়ী শর্বরী। আকাশ মেঘশূন্য, নক্ষত্র-তারকা খচিত ঊর্ধ্ব গগনের চন্দ্রাতপের প্রায় কেন্দ্রস্থল থেকে শীর্ণ শীতাংশু বারিস্নাত ধরিত্রীর দিকে অবিশ্রান্ত ধারায় কৌমুদীবাণ হেনে চলেছে। পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশাখায় যেন নীল নভের শোভা তারকারাজিরই পুঞ্জ পুঞ্জ চূর্ণিত অবশেষ ঝিকিমিকি করছে। খদ্যোৎবাহিনী কখনও স্থাণু আবার কখনও

বা পথচারী পথিক যুগলের আলোক-প্রদর্শনকারী বর্তিকা স্বরূপ উড়ে উড়ে বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে সঞ্চরণশীল। উৎফুল্ল ভেকের দাছুরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে ঝিল্লির একটানা ঐকতান, অরণ্য-ত্রিযামা আর মৌনতায় ভয়াবহ নয়, সমগ্র বিশ্বচরাচর মুখর। যার যা বক্তব্য আছে সবই বুঝি এই মোহিনী নিশীথে বলা হয়ে যাবে।

কিন্তু এলসি বা কৌশিকবাবু কারও কণ্ঠে ভাষা নেই। পৃথিবীব্যাপী এই কলরবের মধ্যে ওরা দুজনে আত্মসমাহিত ভাবে পাশাপাশি পথ চলেছে। উভয়ের পদশব্দ বহুগুণ হয়ে উভয়ের কানে বাজছে। হয়তো বা এ শব্দ ওদের সমাধিস্থ সত্তায় কোন বাহ্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে অক্ষম। সহযাত্রী দুটি নর-নারীর নীরবতার কিছুটা প্রভাব বুঝি ডিউকের উপরও পড়েছে। ওর চীৎকারও স্বল্পক্ষণস্থায়ী ও বিলম্বিত। ছায়াছবির পাত্র-পাত্রীর মত আলো-আঁধারের পটভূমিকায় ওরা নীরবে পথ চলেছে।

অবশেষে দুজনের চলার পথ ভিন্ন হবার সময় উপস্থিত হল। রাত্রি একটু বেশী হলেও এখনই একবার এলসির ইন্দুবাবুর বাড়ি না গিয়ে উপায় নেই। কাল সকালে ওঁর গ্যারেজের লোকজনের সাহায্য না পেলে তার গাড়ি উদ্ধার করা অসম্ভব। আর সম্ভব হলে গাড়িটা পাহারা দেবার জন্য ওঁর এক জন লোককে পাঠানর কথা বলতে হবে। এই সময়ে গাড়ি অচল হয়ে পড়ে থাকার অর্থই হচ্ছে প্রচণ্ড লোকসান। মোহনপুরের এই দুমাসের ধর্মঘটে তাদের তো কম ক্ষতি হল না। সুতরাং আর লোকসান যাতে না বাড়ে তাই এখনই বাড়ি যাবার পথে ইন্দুবাবুকে বলে কাল ওখান থেকে গাড়ি তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। কে জানে রাস্তার পাশ থেকে টেনে তুললেই গাড়ি ঠিক মত চলবে কি না? যদি শুনতে হয় যে গাড়িকে এখনি মেরামতের জন্য জামসেদপুর পাঠাতে হবে, তা হলে তো সর্বনাশ! আর কটা দিন না গেলে কিছুতেই তার ফুরসুত হবে না।

মোড়ের কাছে এসে এলসি থমকে দাঁড়াল। সোজা রাস্তাটা নরসিংগড় হয়ে ঘাটশীলায় চলে গেছে। বাঁ হাতি রাস্তাটা শ দুই গজ দূরে ধলভূমগড় স্টেশনে গিয়ে শেষ হয়েছে। ঐ পথে মোড় থেকে কয়েকটা বাড়ির পর ইন্দুবাবুর বাড়ি।

ঘণ্টা দেড়েকের নীরবতা ভঙ্গ করে এলসি এবার বলে, "গুড নাইট কৌশিকবাবু। আমাকে এবার অসময়ে গিয়ে ইন্দুবাবুকে বিরক্ত করতে হবে। তা না হলে আমার গাড়িকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করার আশা

নেই।” একটু থেমে সে আবার আন্তরিকতা মাখা কণ্ঠে যোগ করে, “আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। আজ আপনার জন্যই প্রাণ ফিরে পেয়েছি।”

স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কৌশিকবাবুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, “আপনিও আমাকে একবার প্রাণ দিয়েছেন। এখন আমার প্রাণ আপনার এবং আপনার প্রাণ আমার। বলতে গেলে আমাদের উভয়ের প্রাণই উভয়ের মিলিত সম্পত্তি।” লঘু কণ্ঠে কথাটা আরম্ভ করলেও মাঝপথেই কৌশিকবাবু কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। অকস্মাৎ এতটা প্রগল্‌ভতা করা তো তাঁর স্বভাব নয়।

এলসি ভীষণ ভাবে চমকে উঠল। ও কী বলছেন কৌশিকবাবু? এ কথাটার গূঢ় অর্থ কি উনি বোঝেন না? হৃৎপিণ্ডের উদ্দাম স্পন্দনকে কোন মতে বশে এনে ধীরে ধীরে লজ্জারুণ দৃষ্টি কৌশিকবাবুর মুখের উপর নিবদ্ধ করিল এলসি। চাঁদের ঈষৎ পাণ্ডুর আলোকে ঐ সরল নিষ্পাপ মুখে বাক্‌চাপল্য-জনিত লজ্জা ছাড়া অপর কোন কিছুর ছাপ আছে কি না বোঝা গেল না। ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি আনত হয়ে এল। তার পর যন্ত্রচালিতের মত কৌশিকবাবুর দিকে দক্ষিণ করপল্লব এগিয়ে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে সে উচ্চারণ করল, “গুড নাইট।”

কৌশিকবাবুও এলসির কোমল করপল্লব নিজ হস্তে ধারণ করে গাঢ় স্বরে প্রত্যুত্তর দিলেন, “গুড নাইট।”

এলসি তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিয়ে পিছন ফিরে চলা শুরু করল। আর বিলম্ব হলে তার বক্ষের শিহরণ করাঙ্গুলিতে সংক্রামিত হত। তাই আর দেরি করার সাহস ওর হল না। ডিউকও কৌশিকবাবুর চারপাশে দুই পাক ঘুরে মুখ তুলে তাঁকে শুঁকে নিয়ে দীর্ঘ লম্ফনে এলসির অনুগামী হল। কৌশিকবাবু কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে এলসির গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

খড় মড় খস্ খস্—ও কি? এলসির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে কৌশিকবাবু চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। কই, রাস্তায় তো কিছুই নেই। তবে কি রাস্তার ডানদিকের শাল জঙ্গল থেকে ঐ আওয়াজ এল? কয়েক মুহূর্ত নিশ্বাস রুদ্ধ করে তিনি উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। না, আর কোন শব্দ নেই তো! কোন জীবজন্তু হবে বোধ হয় বলে তিনি নিজেকে প্রবোধ দিলেও কি যেন কিসের একটা খোঁচা মনে লেগে রইল। চিন্তান্বিত ভাবে তিনি পথ চলা শুরু করলেন।

॥ চল্লিশ ॥

ঘড়ির কাঁটা সাতটার দিকে এগিয়ে গেলেও এলসির আজ বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। ঘুম অবশ্য বেশ কিছুক্ষণ হল ভেঙ্গে গেছে। তবু সে কখনও চোখ বুজে কখনও তাকিয়ে বিছানাময় এপাশ ওপাশ করছে।

শরীর ক্লান্ত থাকারই কথা। কারণ কাল ঘরে ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় বারটা বেজে গিয়েছিল। ধলভূমগড় থেকে হেঁটে এলে আরও কত দেরি হত কে জানে? ইন্দুবাবু যে কেবল ওর গাড়ি উদ্ধার করে পাঠিয়ে দেবার দায়িত্ব নিলেন তা-ই নয়, ওকে নিজের গাড়িতে করে ঘরে পৌঁছে দেবারও ব্যবস্থা করলেন। ঐ অত রাত্রে ঘুম থেকে উঠিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে ভদ্রলোক নিজেই এলসিকে ড্রাইভ করে পৌঁছে দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু কারও উপর অতটা অত্যাচার করা কি সম্ভব? তাই সে ভীষণ ভাবে আপত্তি করেছিল এবং অবশেষে ইন্দুবাবু বাধ্য হয়ে ড্রাইভারকে গাড়ি বার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বীণা দেবীও মৃদু হেসে বলেছিলেন, "ক্ষতি কি—দুজনে আমরা তোমার দৌলতে খানিকটা নৈশ শোভা দর্শন করে আসব।"

ইন্দুবাবু আর কথা বাড়াতে না দিয়ে ওকে গাড়িতে তুলে দিয়েছিলেন। দিয়ে বলেছিলেন, "রাত না হয়ে গেলে আপনাকে আটকে রাখতাম। মিস্টার মূর আপনাকে ফিরতে না দেখে নিশ্চয় ভীষণ চিন্তা করছেন, তাই আর দেরি করাব না আপনাকে।"

বীণা দেবী স্নেহভরে ওর করমর্দন করে বলেছিলেন, "আজ অমিতা আর দীপের সঙ্গে দেখা হল না। ওরা শুয়ে আছে। কাল বিকেলে নিশ্চয় আসবে। অমিতা পরশুও তোমার কথা বলছিল। আসছে সপ্তাহে ও চলে যাবে কিনা। ওদের ছুটি শেষ হয়ে এল তো।" গাড়ি স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে যাবার পরও এলসি বীণা দেবীর মিষ্টি আমন্ত্রণ শুনতে পেয়েছিল, "এস কিন্তু। আমরা সবাই অপেক্ষা করে থাকব।"

ফেরার পথে এলসির ব্যগ্র দৃষ্টি পথের উভয় পার্শ্বে কাকে সন্ধান করেছে। কিন্তু তাকে ব্যর্থ হতে হয়েছে। কারণ ইন্দুবাবুকে তাঁর দরোয়ান দিয়ে ডাকিয়ে উঠিয়ে সব কথা বলে গাড়ি নিয়ে বেরোতে নেই নেই করেও কি আধ ঘণ্টা সময় লাগে নি। ধলভূমগড় থেকে নরসিংগড় পৌঁছানর পক্ষে ও সময় যথেষ্ট। বিশেষতঃ ঐ ভদ্রলোকের মত, যিনি নিত্যকার পদাতিক।

টক্ টক্ টক—এলসির শয়ন কক্ষের দরজায় টোকা মারার শব্দ। এলসি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। এবং তার পর ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে শোবার ঘরের খিল খুলে দিল।

"সেলাম মিসিবাবা।" এলসির আয়া ফুলমণি ঘরে ঢুকল।

"সেলাম সেলাম। কি খবর?"

"সাহেব খাবার ঘরে টেবিলে বসে আছেন। আপনাকে খবর দিতে বললেন যে আপনার সঙ্গে চা খাবেন।"

"তাই নাকি? তা হলে গিয়ে বল আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।"

ফুলমণি বিদায় নিল। এলসি আর দেরী না করে বাথরুমের দিকে অগ্রসর হল।

* * * *

খাবার ঘরে ঢুকতে মুর সাহেব স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন, "গুড মর্নিং মাই গার্ল। রাত্রের ঐ পরিশ্রান্তির পর সুনিদ্রা হয়েছিল আশা করি।"

বাবাকে চায়ের টেবিলে বসিয়ে রাখার জন্য এলসির নিজেকে একটু অপরাধী বোধ হচ্ছিল। টোস্টে মাখন লাগিয়ে তাড়াতাড়ি বাবার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, "হ্যাঁ ড্যাডি। থ্যাংক ইউ।"

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মুখে একটা তৃপ্তিসূচক মৃদু শব্দ করে মুর সাহেব একটু নড়ে চড়ে বসলেন। তার পর এলসিকে লক্ষ্য করে বললেন, "শুনে সুখী হবে কাল থেকে মোহনপুরের খাদানে কাজ শুরু হবার ব্যবস্থা এক রকম সম্পূর্ণ বলা যায়। এক-আধ জন ছাড়া হরতালের অধিকাংশ রিং-লিডার নিজেদের কুলিকামিন নিয়ে কাল সকালে কাজে লাগবে। আর একবার কাজ শুরু হয়ে গেলে বাকী কয় জনের আসতে কতটুকু দেরি লাগবে? পয়সা তো কম খরচ করি নি। এই সব ইমপার্টিনেণ্টদের শিক্ষা দেবার জন্য আমি নরকে যেতেও প্রস্তুত আছি, হ্যাঁ নরকে।"

উত্তেজনায় মুর সাহেবের চোখ মুখ আরক্তিম হয়ে ওঠে।

কাল থেকে আবার কাজ শুরু হবে এবং এত দিনের হরতালের ঝঞ্ঝাট মিটে যাবে—এ কথায় এলসির মনে আনন্দ হচ্ছিল বৈ কি। আজ কত বছর তার জীবনের সঙ্গে মোহনপুর আর বুরুহাতুর খাদান একাত্ম হয়ে গেছে। আবার সে গাড়ি নিয়ে কোয়ারীতে কাজ দেখতে যাবে—ঠং ঠং, গাঁইতায় পাথরের বুকে চোট পড়ছে, ও দিকে ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্ শব্দে কামিনরা পাথর ভেঙ্গে সাইজ করছে এবং মাঝে মাঝে লাল ঝাণ্ডা টাঙান

দূরের একটা খাদানের গর্ত থেকে এক জন মজুর দৌড়ে বেরিয়ে আসার কয়েক মুহূর্ত পরই আকাশ বাতাস মুখরিত করে ব্লাস্টিং-এর গুড়ুম গুড়ুম শব্দ। চতুর্দিকে কাজ, কত কাজ। তার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে দুনিয়ার অপর সব কিছু ভুলে থাকা এলসির পক্ষে কত নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

কিন্তু সে সম্ভাবনার পুনরাবির্ভাবের চেয়েও আজ তার আনন্দ হচ্ছে বাবার পরিবর্তন দেখে। দিন রাত মদের বোতল নিয়ে যিনি কয় বৎসর জীবন্মৃত হয়েছিলেন, কাজের আকর্ষণে তাঁর ভিতরও নবজীবনের জোয়ার এসেছে। আজকাল অন্ততঃ দিনের বেলায় তিনি বেশী বাড়াবাড়ি করছেন না। নানা রকম লোকজন আসছে তাঁর কাছে। তাদের সঙ্গে সলা পরামর্শ করতে হচ্ছে। মোহনপুরের ধর্মঘট তার বাবার কাছে একটা মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে—এ কেবল লাভ-লোকসানের ব্যাপার নয়, জীবন-মরণ সমস্যা যেন। সুতরাং বুদ্ধি ও কর্মশক্তির বিন্দুমাত্র শিথিলতার সুযোগ দেবেন না মূর সাহেব। ইদানিং এলসির অনেকবার মনে হয়েছে যে এই ধর্মঘট তার পক্ষে বুঝি শাপে বর হয়েছে।

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে মূর সাহেব তর্জন করে উঠলেন, "বুঝলে মাই গার্ল, ব্রিটন্‌স উইল নেভার বি স্লেভ্‌স্—ইংরেজ কারও গোলামি করে না। আজ এত বছর ধরে এই দেশে কাইনাইটের খাদানে কাজ করে এলাম, কত ডেপুটি কমিশনার, পুলিস সুপার এবং এমন কি কমিশনার পর্যন্ত দেখে নিলাম আর আমাকে হুডউইংক করবে কি না একটা স্কুল-টীচার? এসব ব্ল্যাক মেলিং…"

বাবার পেয়ালায় টিপট থেকে আর এক কাপ চা ঢালতে ঢালতে এলসি বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "স্কুল-টীচার কে বাবা?…"

রহস্যভরা হাসি হেসে মূর সাহেব বললেন, "আছে আছে, এর পিছনে অনেক লোক আছে। খবর পেয়েছি আমাদের খাদানে ধর্মঘট চালাবার পিছনে রয়েছে নরসিংগড়ের এক স্কুল টিচারের ইনস্টিগেশন। বলব বলব, সব কথা বলব তোমাকে। একটু পরেই লাহুরা আসছে। ওদের কাছে পাকা খবর পাওয়া যাবে। ভাল কথা, তুমিও থাকতে পার কথাবার্তার সময়। ইউ উইল হ্যাভ এ ফার্স্ট-হ্যাণ্ড নলেজ। কি বলছ, না—আচ্ছা থাক, শরীরটা তো ভাল নেই তোমার। কম স্ট্রেন যায় নি কাল তোমার উপর দিয়ে। ইন-ফ্যাক্ট এই কয় বছর তুমিই তো সব সামলাচ্ছ। দুর্ভাগ্য আমার। আজ তোমার মা থাকলে…"

শেষের কথাগুলি উচ্চারণ করার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। ধরা ধরা গলায় মাঝ পথেই তিনি থেমে কিছুক্ষণের জন্য গুম্ হয়ে যান। এলসির মনেও বাবার মনের বেদনা সংক্রামিত হয়। বাবার বেদনা কেন, এ তো তারও মনোবেদনা। ওর মা, মায়ের সেই পরমনির্ভরতা মাখা মিষ্টি হাসিটুকু—সব এলসির মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভেসে ওঠে।

অমনি নীরবতার মধ্যেই কিছুক্ষণ কেটে যায়। তার পর একবার গলা ঝেড়ে নিয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত ঘোষণার মত গম্ভীর স্বরে বলেন, "ধর্মঘটের এই হাঙ্গামাটা মিটতে দাও। তার পর একটু সামলে নিয়েই আমরা হোমে চলে যাব। হ্যাঁ, বেশ কিছু দিনের জন্য আমরা হোমে চলে যাব। এখানে তোমার মনের মত সমাজ নেই, তোমার বয়সী মেয়েদের থাকার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত—রটন জায়গা এটা। এখন তোমরা হাসবে খেলবে জীবনকে উপভোগ করবে। তা নয়, আমার দুর্ভাগ্য..."

আবার তাঁর গলার স্বর ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। "ওর মা বেঁচে থাকলে এত দিনে আমাদের এলসি সুন্দর একটা ঘরের গৃহিনী হত—নিশ্চয় হত।"

শেষের কথাগুলি বিড় বিড় করে স্বগতোক্তির মত বললেও এলসির কানে যায়। লজ্জায় আরক্ত মুখমণ্ডল সে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেয়। কি জানি কেন সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ দুটিও জলে ভরে আসে।

মুর সাহেবও আর এলসির দিকে তাকান না। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি উঠে দাঁড়ান এবং তার পর চেয়ারটিকে সশব্দে টেবিলের কাছে সরিয়ে রেখে ভারী পদক্ষেপে বাইরে চলে যান।

* * *

নিজের কামরার ভিতরের দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলসি পিছনের বারান্দার উপর দাঁড়াল। বারান্দার নীচে সরু সিঁড়ি নেমে গেছে এবং তার পর সব্জির বাগান। এলসি বারান্দা ধরে কয়েক পা এগিয়ে গেল। একটু দূরে বাগানের এক কোণ ঘেঁষে বাবুর্চিখানার চিমানি দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে। ওর ভিতরে রহমান ঠুন্ ঠান্ শব্দে ভোজ্য তৈরী করার কাজে ব্যস্ত। বাবুর্চিখানার কয়েক পা দূর থেকে আবার নিজেদের কামরার দিকে ফিরে এল এলসি। তার পর একটি ডেক চেয়ার টেনে এনে বারান্দাতে বসল।

উঁচু টিলার মধ্যস্থলে অবস্থিত তাদের বাড়ি ও বাগানের এলাকার শেষে নাতিউচ্চ একটি পাঁচিল রয়েছে। পাঁচিলের ওপারটাও এলসি

উপবিষ্ট অবস্থাতে দেখতে পাচ্ছে। প্রথমে উপলাকীর্ণ বন্ধুর জমি, তার পর ছোট ছোট ধানের ক্ষেত। কালকে প্রচণ্ড বর্ষণ হয়ে যাওয়ায় আজ প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেতেই লাঙ্গল চলছে। এত দূর থেকেও লাঙ্গলের মুঠোধারী কৃষকের ইঙ্গিতে চালিত জোড়া জোড়া বলদ বা কাড়ার বলদৃপ্ত গতি-ভঙ্গিমা এলসি যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারে। ক্ষেতের মাঝে মাঝে আলের উপর উচ্চচূড়া তাল বা খেজুর গাছ। তারও উত্তরে নরসিংহগড়ের ঘর-বাড়ির চাল দেখা যায়। মাঠ ভাঙ্গলে নরসিংহগড় এখান থেকে মাইল দেড়েকের বেশী নয়। কিন্তু এলসি ও নরসিংহগড়ের দূরত্ব কি কেবল অতটুকু? অনেকক্ষণ এলসি অপলক দৃষ্টিতে ঐ দিকে চেয়ে রইল।

হঠাৎ আবার মেঘ করে এল। নরসিংহগড়ের বাড়ি ঘর দুয়ার এবং এমন কি ক্ষেতের তাল ও খেজুর গাছগুলিও বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে শেষে ঢাকা পড়ে গেল। ঝিরি ঝিরি ঝিরি ঝিরি, ঝিনি ঝিনি ঝিনি ঝিনি নূপুরের নিক্কণ তুলে চপলা বালিকার মত বৃষ্টি মোহনপুরের এই টিলার উপর এসে পড়ল। অল্প অল্প জলের ছাঁট এলসির গায়ে লাগছে। কিন্তু এলসির ভিতর ও বাইরে এমন একটা আলস্য, এমন অবসাদ ভর করেছে যে উঠে চেয়ারটি একটু সরিয়ে নিতেও ইচ্ছা করছে না। দুই হাতে চোখ চাপা দিয়ে মাথা নীচু করে কতক্ষণ সে বসে রইল।

"এলি, এলি—এলসি মাই গার্ল।" এলসিকে ডাকতে ডাকতে ব্যস্ত পদে মুর সাহেব তাঁর কামরা পার হয়ে পিছনের বারান্দায় এসে পড়লেন। এলসি চেয়ার ছেড়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

"দ্যাটস অল রাইট" বলে হাতের ইশারায় তাকে বসতে বলে ব্যস্ত ভাবে মুর সাহেব বললেন, "দেখ, এদিকের ব্যবস্থা তো মোটামুটি ঠিক আছে। কিন্তু কারও কারও মনে হচ্ছে কাল কোন হাঙ্গামা হতে পারে। আমি তাই এক্ষুনি জামসেদপুরে যাচ্ছি পুলিস সাহেবের কাছে। তাড়াতাড়ি করলে পার্সেল ট্রেনটা পেয়ে যাব। যাই হক, তাঁকে বলে ঘাটশীলার এস. আইকে খবর পাঠাতে হবে যে কাল কাজ শুরু হবার পূর্বে কিছু পুলিস প্রটেক্‌শানের ব্যবস্থা যেন থাকে। আমি সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরতে পারব আশা করছি। ভাল কথা, তোমার কোন কাজ আছে নাকি জামসেদপুরে?"

"না ড্যাড, মনে পড়ছে না তো? কিন্তু এখনই যাবে? খাওয়া-দাওয়ার……"

মুর সাহেব সস্নেহে এলসির পিঠে মৃদু চাপড় মেরে বললেন, "হবে হবে,

কাল থেকে সব আবার নিয়মিত ভাবে হবে। এই এজিটেটরগুলোকে ভাল করে শিক্ষা দিই আগে। আর তা ছাড়া মানুষের পক্ষে ওয়ার্ক ইজ ওয়ার্শিপ —কাজই হচ্ছে ঈশ্বরের উপাসনা। সুতরাং আগের ব্যাপার আগে।" উদ্দীপনায় মুর সাহেব ছটফট করছেন। হঠাৎ ওঁর বয়স যেন বিশ বছর কমে গেছে। আর একবার তিনি এলসির পিঠ চাপড়িয়ে দিয়ে, "চিয়ারিও—" বলে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন।

* * *

মুর সাহেবের চলমান দীর্ঘ মূর্তি যতক্ষণ না একটি টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সামনের বাগানের গেট থেকে, ততক্ষণ এলসি এক দৃষ্টিতে তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল। তার পর ধীর ক্লান্ত পদক্ষেপে নিজের কামরায় ফিরে এল। ঘরের মধ্যে বিনা প্রয়োজনে বার কয়েক পায়চারি করে অবশেষে ড্রেসিং টেবিলের সামনে একটি চেয়ার নিয়ে সে আবার বসে পড়ল।

কেমন যেন অদ্ভুত একটা বিষাদের ভাব আজ তাকে সকাল থেকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিসের যেন একটা গভীর দুঃখ তার মনে পাষাণ ভারের মত চেপে বসে দেহযন্ত্রকে বিকল করে দিয়েছে। কোন উৎসাহ, কোন উদ্যমের ছিটে-ফোঁটার অবশেষ সে আজ ঘুম ভাঙ্গার পর থেকে নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে না। কেন—কেন এমন হল ? আজ বুরুহাতু যাবার তাগিদ নেই বলে ? গাড়ি উদ্ধার হবার খবর এখনও এসে পৌঁছায় নি। সুতরাং ইচ্ছা থাকলেও বুরুহাতু যাবার উপায় নেই, তা ছাড়া এর খুব একটা প্রয়োজনও নেই। কারণ চাকুলিয়ার রেল ইয়ার্ডে মাল লোড করার কাজ তাদের ওখানকার মেট চিরকাল করে এসেছে। আসল কথা হচ্ছে কোন কাজ করতেই তার আজ ইচ্ছা করছে না। উঃ, বাবার এই নবীন কর্মোদ্যম তাকে মুহুর্মুহু ব্যঙ্গ করছে।

ড্রেসিং টেবিলের উপর থেকে মাথা তুলে এলসি ঋজু ভাবে সামনের দিকে তাকাল। দামী বেলজিয়ান কাঁচের দর্পণে তার কটিদেশ পর্যন্ত নিখুঁত ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ঈষৎ রক্তিমাভ কুঞ্চিত কেশদামের নীচে নাতিপ্রশস্ত ললাট, তার পর টিকালো নাসিকা ও গোলাপী বর্ণের উভয় গণ্ডের মাঝে ছোট্ট টোল দুটি। পাতলা কিন্তু চাপা অধরোষ্ঠের নীচে সুষমা-মণ্ডিত চিবুক দেশ। চিবুকের নীচে মসৃণ গ্রীবা, কণ্ঠ ও স্কন্ধদেশে উভয় বাহুর মিলনস্থল। সুন্দর একটি নীল রঙের চেক দেওয়া পপলিনের স্কার্টে সেই

বরতনু আরও বরণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু ঐ নীল চোখে ও কিসের ঘোর? মনমুকুরের ছবি কি চক্ষুর দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে বেলজিয়ান গ্লাসের সহায়তায় এলসির সামনে ধরা দিয়েছে? নিজের চোখের লেখা অভিনিবেশ সহকারে পড়ার জন্য এলসি যেন আয়নার সঙ্গে মিশে যেতে চাইল।

কিন্তু এমনি ভাবে কতক্ষণ সে অনিবার্যকে ঠেকিয়ে রাখবে? ফ্রি উইলের সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি মেনে নিয়ে কেউ ইচ্ছার স্বাধীনতার কথা বললেও ইচ্ছা মত ইচ্ছা করার স্বাধীনতা তো কারও নেই। মানুষ চাক বা নাই চাক অপ্রিয় এবং অবাঞ্ছিত হলেও কোন ইচ্ছা যখন খুশী নিজের খেয়ালে মানুষের মনে চড়াও হতে পারে। এই অনিবার্যকে ঠেকানর সাধ্য কার আছে?

তাই তো শত চেষ্টা করেও সে কৌশিকবাবুকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। কোথায় তিনি আর কোথায় সে নিজে। দেশ জাতীয়তা ধর্ম পরিবেশ—সব দিক থেকে বিচার করলে দেখ যাবে যে দুই জনে যেন দুই পৃথক গ্রহের বাসিন্দা। আর কয়েকদিনের দেখা এবং দু-চার জনের মুখে ওঁর সম্বন্ধে টুকরো টুকরো কয়েকটা উড়ো খবর শোনা ছাড়া এলসি কতটুকুই বা তাঁকে চেনে? তবু কেন ঘুরে ফিরে ভদ্রলোকের শান্ত উদাস দৃষ্টি বার বার এলসির মনে আলোড়ন তুলছে? কৌশিকবাবুর কোন বৈশিষ্ট্য ওকে আকৃষ্ট করেছে? ওঁর শান্ত সৌজন্যমূলক ব্যবহার, ওঁর বাক্‌কার্পণ্য, এলসিকে এড়িয়ে চলার বৃত্তি, না অল্প শুভ্রতার ছোঁয়া লাগা ওঁর এলোমেলো চুলের প্রশস্ত কিন্তু বহু রেখায় শোভিত গৌরবর্ণ ললাট? আর বাহু ধারণ করে সেই অতর্কিত আকর্ষণ ও তাঁর প্রশস্ত বক্ষ আশ্রয় করে দুর্ঘটনার হাত থেকে পরিত্রাণ? এলসি ঠিক বুঝতে পারে না যে কিসের জন্য কৌশিকবাবুর উপর তার এই আকর্ষণ। অথবা এর কোন কারণ নেই। এ শুধু এমনি—নিছক এমনি, যেমন এক দিন হয়েছিল স্টুয়ার্টের সঙ্গে।

স্টুয়ার্ট! ওঃ কোন্ সুদূরাগত ধ্বনি মনে হয়— এত দূরের যে উৎকর্ণ হয়ে থাকলেও স্পষ্ট শোনা যায় না ঐ শব্দ। কেবল একটা অর্থহীন ব্যঞ্জনাহীন ধ্বনি-সমষ্টি— চেনা মনে হয়; কিন্তু তবু কত অচেনা।

অকস্মাৎ এলসির নিজের বাঁ হাতের দিকে নজর পড়ল। চম্পককলি-সদৃশ অঙ্গুলিগুলি সম্পূর্ণ ভাবে নিরাভরণ। চমকিতা এলসি ভাল করে অঙ্গুলিগুলিকে আরও একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। আংটি—স্টুয়ার্টের দেওয়া আংটিটি কই? কোথায় গেল ওর জীবনের বসন্তাবির্ভাবের অভিজ্ঞান সেই এনগেজমেণ্ট রিং!

পাগলের মত এলসি ড্রেসিং টেবিলের সব কটি ড্রয়ার হাতড়ে নিল। না, নেই তো! কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না তার চির প্রতীক্ষার মূক সাথী সেই শোভন অঙ্গুরীয়টিকে। দ্রুতপদে সে বাথরুমে ঘুরে এল। যদি স্নানের সময় কোন দিন খুলে থাকে। কিন্তু না—সেখানেও নেই। তবে—তবে—তবে—কোথায় গেল স্টুয়ার্টের মধুর স্মৃতিবিজড়িত স্বর্ণপ্রতীক? হাতের কাছে বাক্স তোরঙ্গ যা কিছু ছিল, সব তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফেলল এলসি। কোথাও নেই। একদা যার কণ্ঠস্বর, ঈষৎ স্পর্শ তার মনে পূর্ণিমা নিশির রত্নাকরের মত উচ্ছল উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করত, যার সান্নিধ্যের জন্য সদা সর্বদা তার মন সূর্যাভিলাষী সূর্যমুখীর মত চির উন্মুখ হয়ে থাকত, তার সুগভীর প্রেমের প্রতীক পরম কাম্য সেই অঙ্গুরীয় এলসির অসাবধানতার জন্য কখন হারিয়ে গেছে।

হারিয়ে গেছে। প্রেমাস্পদের অন্তর্ধানের পর এত দিন বুক দিয়ে যে স্মারক এলসি রক্ষা করে এসেছিল, আর তার অস্তিত্ব নেই। প্রণয়ীর মত তার স্মৃতিচিহ্নও চিরকালের মত পৃথিবীর এই বিশাল জনারণ্যে হারিয়ে গেছে। কিন্তু স্মৃতি? স্মারক চলে গেলে স্মৃতিও কি বিলুপ্ত হয়ে যায়? ড্রেসিং টেবিলের সামনে হতাশ হয়ে শরীর এলিয়ে দিয়ে চক্ষু মুদিত করে উন্মত্তের মত অধীর আবেগে মাথা নাড়তে লাগল এলসি। সত্যি কথা স্বীকার করতে ভয় হয়, নিজের গলা নিজেই যেন দুই হাত দিয়ে চেপে ধরতে ইচ্ছা করে। এ সত্য যে উচ্চারণ করা যায় না। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের নিঃসঙ্গ প্রতীক্ষার ভার সহ্য করতে পারে নি এলসির পরম প্রিয় স্মৃতি। একদা মনের মণিমঞ্জুষায় সযত্নে সঞ্চিত অমূল্য সম্পদের অস্তিত্ব আজ আর খুঁজে পাচ্ছে না সে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার সে চোখ খুলল। ডান হাতের কাছে বই-এর শেল্ফ। সাগ্রহে সে শেল্ফের দিকে হাত বাড়িয়ে একটি বই টেনে নিল। স্টুয়ার্টের দেওয়া কবিতা সঙ্কলন। যেন কোন মহার্ঘ্য সম্পদ নাড়া চাড়া করছে এই ভাবে ধীরে ধীরে এলসি বইটি খুলে ধরল।

কত মধুর স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এই কাব্য সঙ্কলনের সঙ্গে। এলসি পরম যত্নে বইটির পাতা ওল্টাতে লাগল। হঠাৎ খোলা পৃষ্ঠার এক জায়গায় এলসির দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। সুইনবার্নের কবিতা "অ্যান ইণ্টারলুড"-এর একাংশ:

And the best and the worst of this is,
That neither is most to blame.
If you've forgotten my kisses,
And I've forgotten your name.

তুমি যদি আমার চুম্বনের কথা ভুলে গিয়ে থাক, আর আমি যদি ভুলে থাকি তোমার নাম, তাতে কারও দোষের কিছু নেই।

এলসির অর্ধোন্মীলিত চক্ষুর্দ্বয়ের উভয় কোণ বেয়ে মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রু-কণা গড়িয়ে পড়তে লাগল। কোমরের কাছ থেকে রুমাল নিয়ে চোখের উপর চাপা দিয়ে সে কতক্ষণ অচেতনের মত পড়ে রইল।

অনেকক্ষণ পর আবার সে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বইটির পাতাগুলি নিয়ে এলোমেলো ভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগল। শেলী ব্রাউনিং ওয়ার্ডসওয়ার্থ ম্যাথু-আরনল্ড টেনিসন হুইটম্যান—কত জনের নাম ফর্‌ফর্‌ করে চোখের সামনে দিয়ে সরে যেতে লাগল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে যেন অর্ধেক চেনা অর্ধেক অচেনা কোন্ এক স্বপ্নলোকের সঙ্গীতের রেশ থেকে থেকে তার হৃদয়তন্ত্রীতে মৃদু অনুরণন সৃষ্টি করতে লাগল।

পাতা ওল্টান শেষ, মলাটের পর প্রথম পৃষ্ঠায় এসে এবার এলসির হাত থেমে গেল। কত দিন—আবার কত দিন পর তার বুকের ভিতর সপ্ত সিন্ধুর উদ্দাম কোলাহল! স্টুয়ার্টের হাতের লেখা—সুদীর্ঘ কালের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিবর্ণ হলেও এখনও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। বইটিকে আরও একটু দৃষ্টির কাছে টেনে নিল এলসি। প্রথমে শেলীর থেকে চারটি পংক্তি উদ্ধৃত করা, তার পরই আছে সেই লেখাটি। স্পষ্ট পড়া যায়—সুন্দর টানা হরফে লেখা "টু লিসি, মাই লাভ।"

কয়েক মুহূর্ত চিত্রার্পিতের মত বইটিকে চোখের সামনে ধরে এলসি স্তব্ধভাবে বসে রইল। তার পর তার অজান্তেই কখন টপ টপ করে কয় ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল লেখাটির উপর। ব্যগ্র হস্তে এলসি রুমাল দিয়ে জলের বিন্দুগুলিকে মুছে দিতে গেল। কিন্তু কী সর্বনাশ! ঘষা লেগে বারিবিন্দুর সঙ্গে স্টুয়ার্টের হাতের লেখাও মুছে গেল যে। রুমালের ঘর্ষণে ভিজে কাগজের সূক্ষ্ম কণিকাগুলি "মাই লাভ" লেখা অংশটুকু থেকে উঠে গিয়ে কাগজের বুকে একটি অগভীর ক্ষতের সৃষ্টি করল। গুড হেভেন্‌স্—বলে অস্ফুট আর্তনাদ করে এলসি লেখার জায়গাটুকু হাল্‌কা আঙুলের ছোঁয়ায় পরিষ্কার করে দিলেও স্টুয়ার্টের প্রেমবাণীটুকুর পুনরাবির্ভাব ঘটান আর তার সাধ্য নয়। তারই বা কেন, কারও ক্ষমতায় কুলোবে না এ অসাধ্য সাধন করা। সে চিহ্ন নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়ে গেছে মানবীয় পৃথিবী থেকে। বইটি হতাশ ভাবে বন্ধ করে বুকের উপর চেপে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল এলসি।

॥ একচল্লিশ ॥

টিফিনের সময় হেডমাস্টার মশাই-এর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে স্কুল থেকে চলে এলেন কৌশিকবাবু। আজ আর কাজে মন বসছে না, আর ছেলেদের সঙ্গে বক্ বক্ করতে ভাল লাগছে না। সমস্ত দেহে মনে প্রচণ্ড একটা অবসাদের বোঝা চেপে বসেছে। হোস্টেলে নিজের কামরাটিতে ঢুকে তিনি গায়ের জামা খুলে আলনায় টাঙিয়ে রাখলেন। তার পর কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেয়ে খাটের উপর দেহ এলিয়ে দিলেন।

কেন জানি আজ তিনি অন্যমনস্ক। বর্তমানকে ভুলে গিয়ে মন অতীতের দিকে ছুটে চলে যেতে চাইছে। পুরাতন স্মৃতি বার বার এসে মনের পটে ভিড় করছে। কিছুতেই তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করা যাচ্ছে না। এক দিকে সমুদ্র ও অপর দিকে পাহাড়ের নিগড়ে বন্দী ছেলেবেলার চট্টগ্রাম। মুলী বাঁশের বেড়ার দেওয়াল আর টিনে ছাওয়া তাঁদের চার চালা বাড়ি। উঁচু দাওয়া থেকে নেমে উঠানটুকু পেরোলেই আম জামরুল আর কাঁঠাল গাছের বাগান। মাঝে মাঝে মাথা উঁচু সুপারি ও নারিকেল। একটু বাতাস দিলেই সুপারির ঝাঁকড়া মাথা কেমন টলমল করে নড়ে। নীরু— ওর দিদি নীরু বলত, শিব ঠাকুর জটা নাড়ছেন। কোথায় হারিয়ে গেল নীরুদি ?

শুধুই কি নীরুদি ? মা বাবা অপরাপর ভাইবোনেরা এবং ছেলেবেলার সঙ্গী-সাথীর দল, ওদের তো কেউ নেই আজ। মা-বাবার মৃত্যুসংবাদ কৌশিকবাবু পেয়েছিলেন। কিন্তু আর সব ? তারা কোথায় গেল ? এই যে বাঙলার উপর দিয়ে অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর দুটো প্রচণ্ড ঘূর্ণি বয়ে গেল মন্বন্তর আর দেশ বিভাগ—এর মধ্যে তারা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে ? পার্টির নির্দেশে কর্মব্যস্ত কৌশিকবাবুর স্বয়ং উদ্যোগ করে খবর নেবার অবকাশ হয় নি। তা যাক্। তার পর সেবা-সমিতির কাজের ভিতর দিয়ে যেদিন কৌশিকবাবু মাস্টারদা অনন্তদা এঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করলেন, সেই দিন থেকে একটা নূতন জগতের দ্বার তাঁর সামনে খুলে গেল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন বিশ্ব— ঘর বাড়ি, আত্মীয় স্বজন সব মরীচিকার মত মনের পট থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার পর নূতন জগতের কত সঙ্গী সাথী পথ চলা ছেড়ে দিল, মাস্টারদার মত কত জন আরব্ধ কর্মের বেদীমূলে নিজেদের উৎসর্গ করে দিলেন। আর

সেই কর্তব্যসমুদ্রের ঊর্মিশিখরে ভাসতে ভাসতে তিনি কত গাঙ ঘুরে অবশেষে ধলভূমের এই আরণ্য অঞ্চলে সাময়িকভাবে নোঙর গেড়েছেন। হ্যাঁ, সাময়িক ভাবেই। কারণ আবার যে কবে হুকুম হবে মাঝি ওঠ, এবার পাল তুলে বৈঠা ধর—তা কে জানে? তবে যেদিনই সে নির্দেশ আসুক না কেন, অনুগত সৈনিকের মত তিনি বদর বদর বলে খেয়া ভাসিয়ে দেবেন। কোথায়, কোন্ বন্দরাভিমুখে? এ প্রশ্ন করার অধিকার তাঁর নেই।

কিন্তু অপর একটি প্রশ্ন হঠাৎ তাঁর মনে উদিত হল। কয়েকদিন আভাসে ইঙ্গিতে যে জিজ্ঞাসা মনে জাগা সত্ত্বেও কোন না কোন প্রকারে যাকে তিনি এড়িয়ে এসেছেন, চাপা দিয়ে এসেছেন সেই প্রশ্ন আবার আজকের এই অলস কর্মচাঞ্চল্যবিহীন দিনে তাঁকে আক্রমণ করল। তাঁর জীবনের এই অনির্দেশ যাত্রার অন্তিম পরিণতি কি, এর সার্থকতা কিসে?

প্রশ্নটা মনে ওঠা মাত্র একরাশ জবাবও একসঙ্গে ভিড় করে মাথা চাড়া দিতে চাইল। সর্বহারার একনায়কত্ব, সত্যকার গণতন্ত্র, যথার্থ সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপায়ণ, ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করে তোলা ইত্যাদি আরও কত এত দিনের শিক্ষা-দীক্ষা ও কর্ম-ভাবনার অনুকুল উত্তর। কিন্তু এত দিন যেসব কথা গভীর আবেগাপ্লুত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে বাহ্য পরিবেশ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনেও একটা মহত্ত্ব, একটা সুস্পষ্ট সার্থকতার ভাব সৃষ্টি করেছে, মোহনপুরের খাদানের শ্রমিকদের এই ব্যর্থতার পর ওসব তেমন ভাবে বিশ্বাস করতে চাইছে না তাঁর মন—ওসব কথার ভিতর আর তিনি পূর্বেকার তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছেন না। বড় ফাঁকা, বড়ই শূন্যগর্ভ ইমোশান মনে হচ্ছে এ সব। এ যেন এক ধরনের ইন্‌টেলেকচুয়াল জিমনাস্টিক। আর যাই হক অন্ততঃ এর ভিতর বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদের ছিঁটেফোঁটাও নেই। সমস্তটাই ভাবালুতার একটা প্রকাণ্ড বড় রঙিন বেলুন।

কৌশিকবাবু আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসলেন। বাইরে একটানা স্বরে একটা কাক থেকে থেকে ডেকে চলেছে। কেমন যেন ক্লান্ত বিষণ্ণ সেই স্বর। কৌশিকবাবু জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। গরাদের বাইরে পেয়ারা গাছটির নরম কচি পাতাগুলিতে মৃদু বাতাসের ঈষৎ হিল্লোল, আর তার উপর অপরাহ্নের পাণ্ডুরাভ রৌদ্র পড়েছে। মনে মনে কৌশিকবাবু একবার নিজেকে শাসন করে নিলেন। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা—কাজ নেই বলে হাজার রকম বাজে চিন্তা মনকে তোলপাড় করছে। ব্যস্তভাবে

বিছানা ছেড়ে উঠে তিনি আবার জামা গায়ে দিয়ে নিলেন এবং তার পর কামরার দরজায় শিকল তুলে দিয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন।

নরসিংগড়ের লোকবসতি পার হবার পর তাঁর মনে হল এরকম অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়ানর অর্থ কি? একবার ভাবলেন ফিরে বিভাসের কাছে যাবেন। কিছু মজুর কাল ইউনিয়নের সম্মতি ছাড়াই লাডুর নেতৃত্বে কাজে যাবে—এ কথাটা বিভাসের কানেও পৌঁছেছে নিশ্চয়। ওর সঙ্গে পরামর্শ করে এর কোন সুরাহা করা যায় কি না দেখলে হত। কিন্তু আজ আর তাঁর কাজের কথা আলোচনা করতে উৎসাহ নেই। তা ছাড়া কি হবে সলা-পরামর্শ করে? কাজে ওরা যাবেই। এই ক্ষুধার্ত মজুরদের কেবল কথা দিয়ে আর ভুলিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ওরা চায় নিশ্ছিদ্র ম্যাটার—ফুড ম্যাটার। কৌশিকবাবু মনে মনে একটু হাসলেন—দর্শনরাজ্যের মেটিরিয়ালিস্টদের চেয়েও আরও এক কাঠি সরেস তাঁদের ভাবশিষ্য এই সব মজুরেরা।

কর্তব্যচ্যুতি হয় হক, আজ আর কোন কাজের কথা বলতে মন রাজী নয়। এত দিন তো কাজের পুলটিস দিয়ে মনের দরজার সবগুলি ছোট বড় ফাঁক ফুটো নীরন্ধ্র করে বন্ধ করে দিয়েছিলেন কৌশিকবাবু। আজকে ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে বিদ্রোহী ইচ্ছা বাইরে বেরিয়ে যদি অবাধ সঞ্চরণ করতে চায়, তবে করুক না তা। একটা দিন বই তো এ স্বাধীনতা পাবার অবকাশ আর আসবে না।

ঐ যে মাথার উপরে ঘন নীল আকাশ আর তার বুকে মধুরালস্যে সঞ্চরণশীল পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের দল, এই যে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ আর জোলো হাওয়ার ঈষৎ সির্‌সিরে অনুভূতি—এই দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের পার্টি জীবনে অন্ততঃ একটি দিন কিছুক্ষণের জন্য ডায়লেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজ্‌ম্‌ ও সর্বহারাদের একনায়কত্বের চেয়ে এ-ই অধিকতর সত্য হক। নরসিংগড় ছাড়িয়ে কৌশিকবাবু ঘাটশীলার সড়ক ধরে পূর্ব দিকে এগিয়ে চললেন।

আজ আর জাহাতুর দিকে যাবেন না তিনি, এখনকার মত বিপিন ডমনা বাস্কে ইত্যাদি কেউ আর তাঁর সামনে নেই। আছে কেবল উন্মুক্ত উদার আকাশ আর ঐ দিক্‌চক্রবালের কাছে তার পা ছোঁয়া ধলভূমের উচ্চাবচ প্রান্তর। বিষ কাঁড়ের ভয় নয়, সে ভয় থাকলে তিনি এতদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে পারতেন না। আজকের এ মনোভাবের খুব একটা সুসঙ্গত কারণ তিনি আবিষ্কার করতে পারছেন না। এ যেন চট্টগ্রামের চায় চালা

টিনের বাড়িটির বাসিন্দা একটি শিশুর অকারণ পুলক, সামান্য জিনিস দেখে অতি সহজে অট্টহাস্যে ফেটে পড়া। ওঃ, কত দিন এই রকম কারণবিহীন নিছক আনন্দের স্বাদ তিনি পান নি।

কিন্তু একি, অন্যমনস্কভাবে পথ চলতে চলতে তিনি যে মোহনপুরের খাদানের দিকে চলে এসেছেন। ঐ তো রাস্তার বাঁ দিকে খাদান ব্লাস্টিং করার জন্য ডিনামাইট ও অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থ রাখার ম্যাগাজিন। আর—আর তার ডান হাতি নাতি-উচ্চ টিলার উপর মুর সাহেবের বাঙলো! অকস্মাৎ ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে কৌশিকবাবু চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। কেউ লক্ষ্য করছে নাকি তাঁকে? কই—না তো! কিন্তু কিসের জন্য এই অপরাধী ভাব তাঁর মনে? বিগত রাত্রির ঘটনার জন্য নাকি? এলসির সঙ্গে এরোড্রামের পরিত্যক্ত বাড়িতে ঐ দুর্যোগের মধ্যে তাঁর আকস্মিক সাক্ষাৎ এবং তার পর—তার পর নাটকীয়ভাবে ওর পেলব হস্ত ধারণ করে নিজের দিকে আকর্ষণ করার পর কৌশিকবাবুর বক্ষে ওর আশ্রয় গ্রহণ। সেই মৃদু সুরভির মন মাতান সুবাস আর রমণীয় কমনীয় তনুর রেশম কোমল স্পর্শ! কৌশিকবাবুর হৃৎপিণ্ডের রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে বক্ষের তটে এসে আঘাত করতে লাগল। সকাল থেকে যে চিন্তাকে তিনি পরিহার করে আসছিলেন, যাকে বহু আয়াসে মনের অচেতন লোকে চাপা দিতে সমর্থ হয়েছেন বলে মিথ্যা আশ্বাসে এতক্ষণ আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলেন, তা এবার নিজ মূর্তিতে তাঁর সত্তাকে আক্রমণ করল।

পথের পাশের একটি মহুয়া গাছের গায়ে হেলান দিয়ে টিলার উপরস্থ বাড়িটির দিকে তিনি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। এখান থেকে উপল-বহুল টিলার বুকে প্রথমে বাড়িটির নাতি উচ্চ প্রাচীর, তার পর বাগান। ছোট্ট লনটুকু এবং সবার পিছনে বিলাতী প্যাটার্নের বাঙলোটি কোন পাশ্চাত্য দেশীয় শিল্পীর হাতে আঁকা ছবির মত মনে হচ্ছে। অপরাহ্ণ আকাশে রৌদ্রের তেজ আর নেই। বর্ষা ঋতুর অগ্রদূত দুগ্ধফেননিভ বলাহকরাশি আপন মনে গগন প্রাঙ্গণে ক্রীড়ারত। এক ঝাঁক শ্বেত বর্ণের বক পক্ষবিধূননে চতুর্দিক মুখরিত করে সেই শুভ্র মেঘের সঙ্গে যেন মিলিয়ে গেল। চতুর্দিকের এই শান্ত পরিবেশ সত্ত্বেও তাঁর মনে শান্তি কই, সেখানে যেন প্রলয়ঙ্কর ভিসুভিয়াসের জ্বলন্ত লাভা উদ্গীরণের পর্ব চলেছে। বুকে হাত চেপে তিনি কিছুক্ষণ হাঁপাতে লাগলেন এবং তার পর দ্রুতপদে ফেরার পথ ধরলেন।

নিজের কাছে নিজের স্বরূপ ধরা পড়ে যাবার মত দুর্ঘটনা বুঝি মানুষের জীবনে আর হয় না। সমস্ত জীবন মানুষ পরম যত্নে নিজের সঙ্গে প্রতারণা করে চলে। যা সে নয়, নিজে তাই—এই কথা মনকে বোঝাবার জন্য কী মর্মান্তিক প্রচেষ্টা তার। কথা, ভাব-ভঙ্গী এবং এমন কি অপরের সঙ্গে আচরণের সময়ও তার মনে থাকে এই প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা। নিজেকে মহৎ ও বরেণ্যরূপে বিশ্বের সম্মুখে উপস্থাপিত করার জন্য নির্জ্ঞান মনে বিবিধ উপচার ও সমারোহের আয়োজন হয়। কিন্তু তার পর অকস্মাৎ এক দিন যখন নির্জ্ঞান ও সজ্ঞানের মাঝখানের বাঁধ ভেঙ্গে দুই-ই একাকার হয়ে যায়, তখন দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে মানুষ নিজের সত্য স্বরূপ চেনে, জানে। আর সকলের মত কৌশিকবাবুর পক্ষেও নিজের এ পরিচয় বড়ই ভয়ঙ্কর, বড়ই করুণ।

আত্মমগ্নভাবে পথ চলছিলেন বলে প্রথমটা কৌশিকবাবু খেয়াল করেন নি। পিপ্ পিপ্ পি-ই-প্—একেবারে পিছনে মোটরের হর্ন। ব্যস্ত ভাবে কৌশিকবাবু রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ান। না, এলসির জীপ নয়, ভারী গাড়ি একখানি—মিলিটারীদের পরিত্যক্ত কমাণ্ড কার। গাড়িটি অপ্রশস্ত গ্রাম্য পথ দিয়ে হেলে দুলে কৌশিকবাবুর পাশ কাটিয়ে এগোতে লাগল।

কৌশিকবাবু দেখলেন ইন্দুবাবু সহাস্যমুখে ড্রাইভ করছেন এবং তাঁর ছেলে বাবার কোলে বসে স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়ে রয়েছে। শিশুটির মুখভঙ্গীতে ভীষণ একটা গম্ভীর ভাব, যেন তার একটুখানি অন্যমনস্কতার অর্থ হচ্ছে এতগুলি প্রাণীর প্রাণসংশয়। গাড়ির পিছনে একটি মহিলা ও অপর একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে। নিশ্চয় ইন্দুবাবুর স্ত্রী এবং কন্যা। কৌশিকবাবু জানেন এই দিক দিয়ে ওঁদের চাষ-বাড়ি বড়াজুড়ী যাবার রাস্তা। সেইখান থেকে ওঁরা ফিরছেন নিশ্চয়। মেয়েটি ভাই-এর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে মায়ের কানে কানে কি বলল এবং তার পর খিল খিল করে হাসির আওয়াজ উঠল। স্ত্রী এবং কন্যার হাসি সংক্রামিত হয়ে ইন্দুবাবুকেও আক্রমণ করেছে। চলন্ত মোটরের গর্জনকে ছাপিয়ে ওঁদের সকলের প্রাণখোলা হাসি আসন্ন সন্ধ্যার প্রান্তর-ভূমিকে মুখর করে তুলল।

উঃ, কত দিন যে কৌশিকবাবু এমনি প্রাণ খুলে হাসেন নি। অল্পায়াসে ওঁদের মত হাসতে পারা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কৌশিকবাবু মুগ্ধ দৃষ্টিতে কম্যাণ্ড কারটির গমনপথের দিকে তাকিয়ে পথ চলতে লাগলেন।

কী সুন্দর হাসি-খুশী পরিবার। স্বামী স্ত্রী একটি মেয়ে ও একটি ছেলে! একেবারে পরিপূর্ণ নিখুঁত দাম্পত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। এর উপর আছে আর্থিক সাচ্ছল্য। সুতরাং পরিতৃপ্তির ষোল কলা পূর্ণ হতে দেরি হয় নি। ঐ রকম একটি পরিবার, ঐ রকম একটি সুখী সংসারের কেন্দ্রবিন্দু তো কৌশিকবাবুও হতে পারতেন। হাসি খুশী অথচ সলজ্জ স্বভাবের একটি মেয়ে, আর প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল ঈষৎ দুষ্টু একটি ছেলে তাঁকে ঘিরে ঘুর ঘুর করছে। কখনও তিনি পুত্র বা কন্যাকে বুকে টেনে নিয়ে তাদের কোমল অঙ্গের কমনীয় স্পর্শের আনন্দ উপভোগ করছেন। কখনও বা ওদের মা ছোটখাটো সাংসারিক সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর সঙ্গে সলা পরামর্শ করছে। ওদের মা—কার মত মুখ তার? কৌশিকবাবু যেন ঈষৎ অবগুণ্ঠনে আবরিত সেই রহস্যময়ী গৃহিণীর মুখাকৃতি স্পষ্ট দেখতে পান। কী সর্বনাশ! এ যে এলসির মুখ। সেই মুখ, সেই নাক, সমুদ্রের গভীরতা মাখা সেই নীল চক্ষু এবং টোল খাওয়া গাল! কৌশিকবাবু উন্মাদের মত বিড় বিড় করে না-না বলতে বলতে মাথার চুল মুঠো করে ধরে ঝাঁকানি দিতে থাকেন।

* * *

উদ্‌ভ্রান্তের মত উদ্দেশ্যহীনভাবে আরও অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে কৌশিকবাবু সন্ধ্যার বেশ কিছুটা পর স্কুলের বোর্ডিং-এ উপস্থিত হন। স্খলিত পদে টলতে টলতে কোন মতে নিজের কামরার দরজার কাছে পৌঁছে লক্ষ্য করেন ঘরের দরজা খোলা এবং ভিতরে লণ্ঠন জ্বলছে। তাঁর ঘরের লণ্ঠন জ্বেলে কে কি করছে? নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তিনি ধীর অথচ দৃঢ় পদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন।

তাঁর খাটের উপর বিভাস বসে ছিল। তাঁকে দেখে প্রশ্ন করল, "এই যে কৌশিকদা, কোথায় গিয়েছিলেন?"

"এই—এই দিকে, মানে একটু বেড়াবার জন্য।" নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই তাঁর কেমন বেমানান লাগল।

বিভাস হাসল। সেই বাঁকা হাসি অবশ্য কৌশিকবাবুর চোখে পড়ল না।

অকস্মাৎ বিভাস কণ্ঠস্বর গুরুগম্ভীর করে বলল, "আপনাকে এখনই একবার আমাদের বাড়িতে যেতে হবে। জেলা পার্টির সবাই সেখানে অপেক্ষা করছেন, আর কমরেড আহমদও আছেন। জরুরী দরকার।"

কী ব্যাপার? মোহনপুরের ধর্মঘট এমন একটা ভীষণ জরুরী ব্যাপার নয়, যার জন্য জেলা পার্টির সকলকে এবং এমন কি কমরেড আহমদকে পর্যন্ত এখানে টেনে আনবে। কৌশিকবাবুর ললাটের কুঞ্চন-রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু দাঁড়িয়ে চিন্তা করার অবকাশ তখন আর নেই। জরুরী ডাকের অবহেলা করা চলে না।

শান্ত কণ্ঠে, "তা হলে চল"—বলে কৌশিকবাবু কমরেড বিভাসের অনুবর্তী হলেন।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে সন্ধ্যা উতরে গেল। বেরোবার ইচ্ছা আজ এলসির মোটেই ছিল না। কিন্তু বীণা দেবীর নিমন্ত্রণ রক্ষা না করাটা অত্যন্ত অভদ্রতা হবে। অত করে বললেন কালকে ওঁরা। তা ছাড়া ইন্দুবাবুদের কাছে এলসি কি কম উপকৃত? এই তো, ইন্দুবাবুর সাহায্য না পেলে কি আজ তার গাড়ির উদ্ধার হত? জামদেসপুরের গ্যারাজ থেকে মেকানিক না আসা পর্যন্ত এরোড্রামের জঙ্গলেই পড়ে থাকত তার গাড়ি। তাই আর কিছু না হক, অন্ততঃ এর জন্য ওঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেও তো তার যাওয়া দরকার।

সারা দিনটা এক রকম শুয়ে শুয়েই কেটে গেল। দুপুরে কোন মতে একবার খাবার টেবিলে বসেই উঠে পড়ার সময়টুকু বাদ দিলে বাকী সময়টুকু সে বিছানায় গড়িয়ে গড়িয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। এমন কি ইন্দুবাবুর লোক এসে ওর গাড়ি পৌঁছে দেবার সময়ও একবার গাড়ি চালিয়ে সব ঠিক আছে কি না দেখে নেবার আগ্রহ তার হয় নি। সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে আবদুল বেয়ারার মারফত লোকটিকে খবর দিয়েছে যে সে যেন তার সাহেবকে এলসির সেলাম দেয়।

কিন্তু মাঝে মাঝে চোখ বুজে থাকলেও ঘুম আসে নি মোটেই। কত এলো-মেলো অসংলগ্ন চিন্তা, কত স্মৃতির রোমন্থন ও দংশন তাকে যেন কুরে কুরে খেয়েছে। বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করে ছটফট করতে করতে সে মাঝে মাঝে কেবল কেঁদেছে। কিন্তু এমন কেউ তার নেই যার কাছে এলসি হৃদয়ের বোঝা নামিয়ে কিছু সান্ত্বনা পেতে পারে। সুখ ও দুঃখ আরও একটি দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। আনন্দের ভাগ অপরকে দিলে তা বৃদ্ধি

পায়, আর বেদনার অংশ নেবার লোক পাওয়া গেলে দুঃখের বোঝা লাঘব হয়। কিন্তু এলসি কাকে তার সমব্যথার ব্যথী করবে? দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরের জীবন যে নিতান্তই ঊষর ও নিষ্ফল।

বেলা গড়িয়ে অপরাহ্ণ এবং অপরাহ্ণের শেষে সন্ধ্যা নামল। আয়া ফুলমণি ঘরে বাতি পৌঁছে দিয়ে গুড ইভনিং মিসি-বাবা বলে তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে গেল। উজ্জ্বল ডিজ বাতির আলো ড্রেসিং টেবিলের আয়নার উপর পড়ে হীরকদ্যুতির মত প্রতিফলিত হচ্ছে। আর শুয়ে থাকা চলে না।

পরম ঔদাসীন্য সহকারে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোন মতে এলসি পোশাক বদলে নিল। আগ্রহ না থাকার জন্য কি পরল, আর কি না পরল কে-ই বা জানে? যন্ত্রচালিতের মত টেবিলের সামনে বসে চুলগুলিকে ফিতে দিয়ে কোন রকমে পিছনের দিকে গোছা করে হর্সটেল করে দিল। তার পর আলগা ভাবে পাউডার পাফ মুখে গলায় ঘাড়ে বুলিয়ে নিল। গালে রুজ দিতে আজ আর ইচ্ছা হল না। হাল্কা হাতে লিপস্টিক ঠোঁটে বুলিয়ে নিয়ে তার প্রিয় সেই মৃদুগন্ধী সুগন্ধীর কয়েক ফোঁটা রুমালে ঢেলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল এলসি। আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল একবার। তার পর, মনে মনেই ভাবল যে, মানুষকে এই পৃথিবীতে সর্বদাই যেন মুখোশ এঁটে ঘুরে বেড়াতে হয়। দর্পণে তার ম্লান বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল।

অন্ধকারের বুক চিরে গাড়ি চালিয়ে ইন্দুবাবুর বাড়ি যাবার সময়ও এলসি লক্ষ্য করল যে সে মোটেই স্বাভাবিক হতে পারছে না। যন্ত্রচালিতের মত গাড়ি চালালেও সে যেন নিষ্প্রাণ কলের পুতুল, তার নিজের কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি বা কর্মোদ্যম নেই। যেতে হয় তাই সে চলেছে।

মোহনপুরের বাঁক ছাড়িয়ে গাড়ি ধলভূমগড় থেকে ঘাটশীলাগামী পাকা রাস্তার উপর পড়ল। দেখতে দেখতে দেখতে গাড়ি নরসিংগড় পৌঁছে গেল। পিপ্ পিপ্, পি-ই-প্—হাটতলার পাশ দিয়ে এলসির জীপ চলেছে। নাথুনী শেঠের দোকান পিছনে রয়ে গেল। সর্পদষ্ট কৌশিকবাবুকে সে দিন রাত্রে দেখার পর ঐখানেই তো সে প্রথম উপস্থিত হয়েছিল। ওঃ, দেখতে দেখতে এক বছরেরও বেশী হয়ে গেল।

এলসির ব্যগ্র চক্ষু পথের দুই পাশে সন্ধানী দৃষ্টিপাত করতে লাগল। কিন্তু কই, চেনাশুনা কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না। সাঁৎ সাঁৎ করে নরসিংগড়ের ঘর বাড়ি সব পার হয়ে শাল জঙ্গলের পথে গাড়ি চলতে

লাগল। চাঁদ আজ দেরিতে উঠবে। পথের পাশে পুঞ্জীভূত ঘন অন্ধকার। একি এলসির মনের অন্ধকারের বাহ্য প্রতিরূপ?

এই পথের উপর সর্বপ্রথম সে সেই দিন নিশার অন্ধকারে কৌশিকবাবুকে দেখেছিল। অপর কয়েক জনের সঙ্গে সেও সেই রাত্রে নিজের দুই বাহু দিয়ে ভূমিশয্যাশায়ী অচেতন পুরুষদেহকে গাড়ির পিছনে তুলে দিয়েছিল এবং তার পর উত্তেজনায় দুরু দুরু কম্পিত চিত্তে ঘাটশীলার দিকে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিল। দেখতে দেখতে শাল জঙ্গলের এলাকাও শেষ হয়ে গেল। ঐ তো সামনে স্টেশনে যাবার পথের মোড়। এলসি স্টিয়ারিং হুইলকে ডান দিকে ঘুরিয়ে দিল।

* * * * *

গাড়ির সুইচ বন্ধ করেই এলসি চমকে উঠল। উৎকর্ণ হয়ে সে চালকের আসনের পাশ দিয়ে নামতে লাগল। ও কি, গানের সুরে সুরে অমিতা কি এলসির কথাই বলছে? কী আশ্চর্য, মানুষের মনের গোপন কথা এত প্রাঞ্জল ভাবে ভাষায় রূপান্তরিত করা যায়? এলসি খুব ভাল বাঙলা না বুঝলেও এ গানের ভাষা ও সুর, এ দুই-এ সম্মিলিত ভাবে তার কাছে গানের ভাব যেন স্পষ্ট ব্যক্ত করছে। অমিতা গাইছিল:

কে যে আমায় কাঁদায়, আমি কী জানি তার না-আ-আ-আ-ম।
যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতা-আ-আ-ম।

এলসিকে যে কাঁদাচ্ছে তার নাম জানলেও তো সে তার কথা কাউকে জানাতে পারছে না। আর এ ব্যথা যে কোথায়, তা-ই কি এলসি স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে আর কাউকে বা বিশেষ কাউকে তা জানাবে?

গানের প্রথম চরণ—যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম—দুবার গেয়ে অমিতা এবার গাইছিল:

কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে, ফিরি আমি কাহার পিছে,
সব যেন মোর বিকিয়েছে, পাই নি তাহার দাম॥

এ তো একেবারে তারই মনের গোপন কথা ভাষা ও সুরে মূর্ত করে তুলেছে অমিতা। বার বার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় হাত বাড়ানর পরাজয়ের গ্লানি ও সব বিকিয়ে যাবার দুঃখ ও বেদনা, একটা সব হারানর ব্যাকুল মনের আর্তি অমিতার গানের সুরে সুরে আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। দুরু দুরু কম্পিত বক্ষে এলসি বাগানের ফটক পেরিয়ে এগোয়। দরোয়ান সেলাম করে গেট খুলে ধরেছিল, এবার গেট বন্ধ করে দিল।

কিন্তু সজোরে পদক্ষেপ করে অবাঞ্ছিত শব্দ সৃষ্টি করতে এলসি ইচ্ছুক নয়। এমন মর্মস্পর্শী সঙ্গীত তা হলে ব্যাহত হতে পারে। অমিতা যদিও ওদের বসার ঘরে বসে গাইছে তবু ও কাঁকর-বিছান লাল পথটির বুকে পদশব্দ তুলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গানভঙ্গের কারণ হতে চায় না।

অমিতা আবার গানের প্রথম দুই কলিতে ফিরে এসেছে এবং ঐ দুই কলি শেষ হবার পর গানের দ্বিতীয় অংশ ধরল :

এই বেদনার ধন সে কোথায় ভাবি জনম ধরে।
ভুবন ভরে আছে যেন পাই নি জীবন ভরে।

এক রকম নিঃশব্দে বারান্দার কাছে উপস্থিত হয়ে একটি পা নীচে ও অপরটি সিঁড়ির গোড়ায় রেখে এলসি ভাবছে যে তার জীবনের এই বেদনার ধন কে? কি ভুবন ভরে থাকলেও এলসির জীবনে তার চরণপাত হয় নি? আকণ্ঠ জলের মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও যে পিপাসা, তা মিটবে কিসে? অমিতা গাইছে :

সুখ যারে কয় সকল জনে বাজাই তারে ক্ষণে ক্ষণে—
গভীর সুরে 'চাই নে, চাই নে' বাজে অবিশ্রাম ॥

অমিতা শেষবারের মত গানটির প্রথম দুই কলি গেয়ে থেমে গেল। এলসি আরও কয়েক মুহূর্ত ঐ রকম ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। তার পর অকস্মাৎ স্বপ্নোত্থিতের মত ঘোর ভেঙ্গে ধীর মৃদু চরণে বারান্দাতে হাই হিলের শব্দ তুলে বসার ঘরের দিকে এগোল।

বারান্দাতে পদশব্দ শুনে অমিতা এক লাফে দরজার পর্দা ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়াল। খুট্ করে সুইচ টেপার আওয়াজ হতেই বারান্দাটা আলোয় ঝল্‌মল্ করে উঠল। অকৃত্রিম আনন্দে উৎফুল্ল অমিতা উল্লাস ভরা কণ্ঠে উচ্চারণ করল, "মা, মাসী এসেছেন—এলসি মাসী।" কথা বলতে বলতে সে এলসির দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল।

এলসি দুই হাতে অমিতাকে জড়িয়ে ধরে তার গাল টিপে দিয়ে বলল, "সুইট অমিতা গুড ইভনিং।"

"গুড ইভনিং মাসী, গুড ইভনিং।"

বীণা দেবী এবং ইন্দুবাবুও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরাও অমিতার কথার প্রতিধ্বনি তুললেন, "গুড ইভনিং মিস মূর।"

"গুড ইভনিং।" স্মিত হাস্যে মাথা নেড়ে এলসি সকলকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করল।

"এস এস, অনেকক্ষণ যাবৎ আমরা তোমার অপেক্ষা করছি।" বীণা দেবী এগিয়ে এসে তার হস্তধারণ করলেন।

কিন্তু ঘরে ঢুকতে গিয়ে সকলে দরজার গোড়াতেই বাধা পেলেন। দীপ মিলিটারী কায়দায় স্যালুট করে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। তার ছোট্ট ডান হাতটি কপালের সঙ্গে তেরছা করে লাগান। ভাবলেশহীন মুখে কণ্ঠে যথাসম্ভব গাম্ভীর্যের ভাব ফুটিয়ে তুলে সে ঐ অবস্থাতেই ঘোষণা করল, "অ্যাতেনছান্।"

দীপের কথা বলার ভঙ্গীতে সবাই হেসে উঠল। এলসিও সে হাসিতে যোগ দিল।

দীপ এবার অনুযোগমাখা সুরে বলল, "বারে, মিলিটারীর কথায় হাসে নাকি? অ্যাতেনছান্ কর সবাই। তার পর ছ্যালুত করে তো ঘরে ঢুকবে।"

অনুনয়ের ভঙ্গীতে বীণা দেবী বললেন, "সন্ধ্যে থেকে অনেকবার তো মিলিটারী হলে বাবা। এখন আর মাসীকে মিলিটারী হতে বলো না।"

দীপ কিন্তু তাঁর অনুরোধে কর্ণপাত করল না। পূর্বের মত গম্ভীর স্বরে সে ঘোষণা করল, "না—আগে অ্যাতেনছান্।"

দীপের আচরণে এলসির মনেও কৌতুকরস সঞ্চারিত হয়েছে। বেশ উপভোগ্য লাগছে তার দীপের এই খেলা। তা ছাড়া ছোট ছেলেকে মনঃক্ষুণ্ণ করে কি লাভ? এলসি তাই বীণা দেবীকে উদ্দেশ করে সহাস্য বদনে বলল, "হই না একটুক্ষণের জন্য সিপাই, যদিও যুদ্ধে আমার ভীষণ আপত্তি।"

বীণা দেবীও মিষ্টি হাসি হেসে বললেন, "কি আর করা যায়—অগত্যা। মিলিটারী ছেলের পাল্লায় যখন পড়েছি সবাই, তখন ওর হুকুম মানতেই হবে। দাঁড়াও এবার আমার সঙ্গে লাইনে।"

হাসতে হাসতে সবাই এক সারিতে দাঁড়াল।

দীপ এবার পূর্বের মত গম্ভীর গলায় বলল, "ছ্যালুৎ।"

সকলকে ডান হাত কপালে ছোঁয়াতে হল।

"হ্যাঁ, হয়েছে," বলে প্রসন্ন মুখে দীপ দৌড়ে এসে মাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে তাঁর আঁচলে মুখ গুজল।

হাসতে হাসতে ওঁরা সবাই বসার ঘরে গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন।

* * *

চা পান করতে করতে গল্প-গুজব হচ্ছিল।

ইন্দুবাবু এলসিকে প্রশ্ন করলেন, "গাড়ি ঠিক চলছে তো?"

এলসি সকৃতজ্ঞ ভাবে জবাব দিল, "অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ আগের মতই চলছে।"

বীণা দেবী এলসির দিকে খাবারের প্লেট এগিয়ে দিতে দিতে মন্তব্য করলেন, "ভাল না বললে রক্ষা ছিল নাকি? কর্তা স্বয়ং আজ যন্ত্রপাতি নিয়ে গাড়ির পিছনে লেগেছিলেন সারা সকাল।"

সলজ্জ ভাবে এলসি আবার বলল, "দেখুন তো কত কষ্ট দিলাম।"

ওকে আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে ইন্দুবাবু বললেন, "না না, কষ্ট কি। আসলে যন্ত্রপাতি আর কলকব্জা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে আমার ভালই লাগে।"

স্মিত হাস্যে স্বামীর বক্তব্যকে সমর্থন করে বীণা দেবী বললেন. "সে কথা আর বলতে? ঐ দেখুন না, ওঁর দেখাদেখি আর একটি নমুনা তৈরী হচ্ছে।"

বীণা দেবীর কথায় এতক্ষণে সবার দৃষ্টি দীপের উপর পড়ল। ঘরের এক কোণে কতকগুলি লোহা লক্কড় নিয়ে সে আপন মনে খেলে চলেছে। কখনও সরবে সে বলছে ঠাঁই ঠুঁই, ঘট্ ঘট্। কখনও বা মুখে মুখে সে হুস্ হাস্ করছে। কখনও আবার নীরবে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ছোট্ট হাত দুটি দিয়ে কোন এক যন্ত্র ধরার ভঙ্গী করে প্যাঁচ কষার মত হাত দুটিকে ঘোরাচ্ছে।

সকলে কথাবার্তা থামিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে দীপ একটু লজ্জা পেল। বা-রে, বলে খেলা ছেড়ে সে ছুটে এসে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বিব্রত কণ্ঠে বীণা দেবী বললেন, "দেখি-দেখি, ছাড়-ছাড় আমায়। এমনি করে মিলিটারীরা মায়ের কোলে ওঠে বুঝি?"

"আমি তো ছোট মিলিটারী।"

ঘরের মধ্যে একটা হাল্কা হাসির প্রবাহ বয়ে গেল।

* * *

কখন যেন এলসির মন বাহ্য পরিবেশ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। গৃহস্থালির কর্মে নিরত বীণা দেবীকে দেখতে দেখতে হঠাৎ বাবার সকাল বেলার অর্ধোচ্চারিত ইঙ্গিতগর্ভ কথাটা ওর মনে পড়ে গেল— আজ তোমার মা থাকলে……। আর তার পর, এখন তোমরা হাসবে খেলবে—জীবনকে উপভোগ করবে। বিচিত্র ব্যাপার! মানুষের মন কিছুতেই আশা ছাড়তে পারে না। এক আশা ছলনা করে, প্রতারণা করে, তার আঘাতে কেঁদে

কেটে মানুষ কিছুদিনের জন্য বিমর্ষ থাকে ; কিন্তু তার পর আবার নূতন করে প্রতারণার ফাঁদে পড়ার জন্য নূতন আশার শরণ নেয়। প্রথমে স্টুয়ার্ট এবং তার পর······

"কি ভাবছেন মিস মুর ? শরীর অসুস্থ নয় তো ?"

ইন্দুবাবুর কণ্ঠস্বর। এলসি চমকে উঠে বাস্তব জগতে ফিরে এল। বীণা দেবী ও অমিতা খাবারের বাসনপত্র নিয়ে কখন গৃহান্তরে চলে গেছেন। দীপও নিশ্চয় ওদের অনুগামী হয়েছে। ঘরে কেবল সে এবং ইন্দুবাবু। নিজের উপর বড় রাগ হল এলসির। বড় অসামাজিক হয়ে পড়ছে সে। ছি ছি—লোকে কি ভাববে ?

অপ্রস্তুত ভাবে হেসে এলসি জবাব দিল, "না— মানে কিছু নয়। ক্ষমা করবেন, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।"

"না না, তাতে কি হয়েছে।" ইন্দুবাবু স্বাভাবিক স্বরেই কথাটা বললেন। "বলছিলাম কি আপনাদের খাদানের ধর্মঘটের কি খবর ? শুনেছিলাম শীঘ্রই একটা মিটমাট হয়ে যাবে।"

কণ্ঠে যথাসম্ভব আগ্রহের ভাব ফুটিয়ে এলসি বলল, "হ্যাঁ, বাবা তো খুব চেষ্টা করছেন। কালকে কাজ আরম্ভ হবার কথা আছে।"

"হলেই ভাল। আমরাও তো সাগ্রহে আপনাদের ধর্মঘটের দিকে তাকিয়ে আছি। আমাদেরও তো মজুর চরিয়ে খেতে হয় কি না। যাক্, এই নিয়ে অনেক উৎকণ্ঠা গেল আপনাদের। আর লোকসানের কথা তো না তোলাই ভাল।

"হ্যাঁ। তাই তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করার ব্যাপারে আমাদেরও আগ্রহ। দু-চার দিনের মধ্যে বিশ ওয়াগন মাল বুক করতে না পারলে জাপানের অর্ডারটা হাত ছাড়া হয়ে যাবে। আর তার অর্থ কেবল এখনকার মত বড় রকম আর্থিক ক্ষতিই নয়, একটা ভাল এবং পুরাতন পার্টিও হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া।"

কথার মাঝখানে অমিতা ও দীপকে নিয়ে বীণা দেবী আবার ঘরে ঢুকলেন। এলসির পাশে বীণা দেবী আসন গ্রহণ করার পর ও বলল, "আচ্ছা, উঠি তা হলে এবার।"

"সে কি, এত তাড়াতাড়ি ?"

ইন্দুবাবুও বললেন, "বসুন না আর একটু। রাত তো বেশী হয় নি— এই পৌনে আটটা মাত্র।"

অমিতা আস্তে আস্তে উঠে এসে এলসির সোফার হাতলে ভর করে দাঁড়াল। তার পর ওর দিকে তাকিয়ে সলজ্জ হাসি হেসে বলল, "একটা কবিতা পড়ুন না, অনেক দিন শুনি নি।"

কবিতা? এলসির মনে হঠাৎ দমকা হাওয়ার ক্ষেপা মাতন জাগল যেন। আর তারই সঙ্গে কানের ভিতর সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাসের মত গর্জন করে উঠল সকালে পড়া সুইনবার্নের সেই কটি পংক্তি:

And the best and the worst of this is,
  That neither is most to blame,
If you've forgotten my kisses,
  And I've forgotten your name.

ব্যগ্র ভাবে এলসি উচ্চারণ করল, "না—না—কবিতা নয়।" বলতে বলতে তার অমিতার মুখের দিকে নজর পড়ল। সরল কচি মুখটিতে আশাহতের বেদনা। প্রত্যাখ্যানের অস্বাভাবিক ব্যগ্রতার অশোভনতা চাপা দেবার জন্য নিজেকে একটু সামলে নিয়ে এলসি ওকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। তার পর ওকেই পাল্টা অনুরোধ করল, "তার চেয়ে তুমি বরং একখানা গান গাও। যেমন গান গাইছিলে তেমনি।"

অপর কেউ কিছু বলার পূর্বে দীপ গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ তুমিই গাও দিদি। মাসী গান করবে না। বাবার সামনে লজ্জা করে যে।"

সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন।

ইন্দুবাবু ওকে কোলে টেনে নিয়ে কৃত্রিম কোপের ভঙ্গীতে বললেন, "পণ্ডিত ব্যাটা আমার!"

এলসি মনে মনে দীপকে শত শত ধন্যবাদ জানিয়ে ভাবল যাক্ খুব বেঁচে গেছে সে।

অমিতা হাসি মুখেই এবার প্রশ্ন করল, "আপনি আগের গানটি শুনেছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ, বারান্দার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম।

বীণা দেবী লজ্জিত ভাবে বললেন, "ও মা—ঘরে চলে এলে না কেন? দেখ তো কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলে!"

এলসি তাড়াতাড়ি তাঁকে বুঝিয়ে বলল, "না-না, তাতে কি হয়েছে। গানের মাঝখানে ঢুকলে অমন সুন্দর গানটি থেমে যেত। তাই দু মিনিট পরে ঢুকলাম।" আবার একটু ইতস্তত করে সে অমিতার দিকে ফিরে বলল,

"ভারি সুন্দর লাগছিল গানটি। যেমন মনকে উদাস করে দেওয়া সুর, তেমনি কথাগুলি। ওর মানে জানতে ইচ্ছা করছে খুব।"

অমিতা বলল, "এর রাগিণী তো ভৈরোঁ।" তার পর আরও যেন কি বলতে গিয়ে উদ্যোগের মুখেই থেমে গেল। থেমে মায়ের দিকে ফিরে সলজ্জ ভঙ্গীতে বলল, "মা তুমিই বলে দাও গানের মানেটা। আমি অত ভাল করে বোঝাতে পারব না।"

বীণা দেবী বললেন, "কেন, তুমি বললেই তো পারতে।" কিন্তু অমিতাকে প্রবল ভাবে মাথা নাড়তে দেখে তিনি অবশেষে এলসির দিকে ফিরে বললেন, "শব্দগুলির মোটামুটি অর্থ তো তুমি বুঝতে পেরেছ। তবে গুরুদেবের অন্য অনেক কবিতা ও গানের মত এর একটা গূঢ় অর্থও আছে। হঠাৎ মনে হবে এ বুঝি প্রেমসঙ্গীত। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে এবং বিশেষ করে শেষের পংক্তি কটির দিকে খেয়াল করলে বোঝা যাবে যে এ প্রেম মানবীয় নয়, ঐশ্বরিক। আমাদের দেশের বৈষ্ণবদের মধ্যে বহুকাল যাবত ভগবানকে প্রেমিক বা প্রেমিকা রূপে কল্পনা করে আরাধনা করার রেওয়াজও আছে। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, 'প্রিয়রে যা দিতে পারি তাই দিই দেবতারে। —আর পাব কোথা। দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা।' কিন্তু অত বিস্তৃত ব্যাখ্যা থাক। সংক্ষেপে বলতে গেলে এইটুকু বলতে হয় যে উচ্চস্তরে উঠে মানবীয় প্রেম ঈশ্বরপ্রেমে রূপায়িত হয়ে যায়। গুরুদেবের এই রচনাটি ঐ ভাবের দ্যোতক।" কথা শেষ করে স্বামীর দিকে ফিরে সলজ্জ হাসি হেসে তিনি বললেন, "কি ঠিক হল তো? এর চেয়ে বেশী বলতে গেলে আমার বিদ্যাবুদ্ধি ফাঁস হয়ে যাবে।"

ইন্দুবাবু হেসে জবাব দিলেন, "আমি পাথরের ব্যাপারী। আমাকে জাহাজের খবর জিজ্ঞাসা করা কেন? গান আর কবিতা সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে তো দীপের মতটাও নিতে হয়।"

মৃদু ঝংকার দিয়ে বীণা দেবী বললেন, "থাক্—আর বিনয় করতে হবে না।"

এলসি এবার বিস্ময়াভিভূত স্বরে ধীরে ধীরে বলল, "বড় অদ্ভুত ব্যাপার তো। মানুষ আর ভগবানকে একাকার করে ফেলা।"

বীণাদেবী বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু এদেশে নতুন নয়। গুরুদেব এই ভাবের আরও গান লিখেছেন। গাও না অমিতা—ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার গানটা। বৃষ্টিবাদলের দিনে ভালই লাগে আমার ঐ গানটা।"

বাইরে তখন সত্য সত্যই আবার বৃষ্টি নেমেছে। ঝির ঝির ঝর ঝর—বৃষ্টি-বিন্দুর ধরণীবক্ষে পতনের একটানা অবিশ্রাম শব্দ কানে আসছে। সিক্ত দমকা হাওয়ার সঙ্গে উচ্চচূড় বৃক্ষের অতৃপ্ত কামনার চাপা গোঙানিও মাঝে মাঝে শ্রুতিগোচর হচ্ছে। আকাশ-বাতাস, বৃক্ষ-লতা—সমগ্র প্রকৃতি যেন একটা শূন্যতার বোঝার চাপে থেকে থেকে হাহাকার করে উঠছে।

অমিতা ততক্ষণে আবার হারমোনিয়ামের কাছে গিয়ে বসেছে। দু-একবার হারমোনিয়ামের চাবিগুলির উপর লঘু হাতে আঙ্গুল ছুঁইয়ে সে কিছুক্ষণ সুর ভেঁজে নিল। তার পর আরম্ভ করল :

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরানসখা বন্ধু হে আমার॥
আকাশ কাঁদে হতাশসম, নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম, চাই যে বারে বার॥

স্তব্ধ এলসি রুদ্ধনিশ্বাসে গান শুনে চলেছে। বীণা দেবী যা-ই বলুন না কেন, এলসির মনে হচ্ছে টেগোর যেন ওর মনের কথাই এই দুটি গানের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন—বিশেষ করে এই গানটির দ্বারা। কাল থেকে এই ঝড়ের প্রকোপ, আকাশে বৃষ্টির এই কান্না, আর সে যে মনের দুয়ার খুলে বার বার দেখছে যে জীবন-দেউলে তার প্রিয়তমের চরণপাত হল কি না—এ তো তারই কথা, তার অন্তরের অন্তস্তল থেকে একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উৎসারিত আকুতির বাঙ্ময় স্বরূপ।

অমিতা তখন গানের শেষার্ধ ধরেছে ঃ

বাহিরে কিছু দেখিতে না পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন্ নদীর পারে গহন কোন্ বনের ধারে
গভীর কোন্ অন্ধকারে হতেছ তুমি পার॥

কবে কোন্ শুভলগ্নে তার জীবনে আবির্ভাব হবে প্রিয়তমের—যে সুদূর নদী, গহন বন আর গভীর অন্ধকার পার হয়ে আসছে? কবে এসে ঐ জীবনের সঙ্গে সংগ্রামশীল, চিরকালের উদাসীন নিজের শক্তিতে অধিষ্ঠিত হবে এলসির যৌবরাজ্যে—হয়ে ওর জীবন যৌবন সব কিছুকে ধন্য করবে! আর তো একক প্রতীক্ষার শূন্যতার ভার সহ্য করা যায় না।

গান শেষ। এলসি অনেকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রবল আকুতিভরা গানের ঐ বিষাদ-মধুর সুর কান থেকে

মস্তিষ্কের কোষে কোষে এবং সেখান থেকে শরীরের অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে সমগ্র দেহের মধ্যে রিম্ ঝিম্, রিম্ ঝিম্ করে বাজতে লাগল। এলসি অনেকক্ষণ ঐ ভাবে তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ স্বপ্নোত্থিতের মত এক সময় দীর্ঘশ্বাস মোচন করে অস্বাভাবিক দ্রুত কণ্ঠে বলল, "আসি তা হলে আজ।"

বীণা দেবী বললেন, "যাবে? কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে যে।"

"তা পড়ুক।" ওর কণ্ঠে দৃঢ়তা। "তা ছাড়া এর চেয়ে যে আরও বাড়বে না, তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই।"

ইন্দুবাবু বললেন, "সে কথা ঠিক-ই!"

বীণা দেবী তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে তিনটি ছাতা নিয়ে এলেন। একটি এলসির হাতে ও একটি ইন্দুবাবুর হাতে দিয়ে তিনি নিজে তৃতীয়টি খুলে নিয়ে বললেন, "চল—তোমাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি আমরা।"

এলসি আর কথা বাড়াল না। ওর আর দেরি করার উপায় নেই। গানের ঘোর কেটে যাবার পর থেকেই কি জানি কেন সকালবেলার সেই কান্নার ভাবটা আবার তার গলা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। চোখের কোণে জ্বালা। এক ছুটে ঘরে গিয়ে সে বিছানায় উবুড় হয়ে নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দিতে চায়। এখন আর একটি মুহূর্তও লোকচক্ষুর সম্মুখে থাকার সাহস নেই তার।

গুড় গুড় গুড় গুড়—গম্ভীর স্বননে মেঘের মাদল স্তনিত হয়ে উঠল। এলসি দ্রুত অমিতা এবং দীপের গাল টিপে আদর করার পাট সমাধা করে হাতের ছাতাটি খুলে বারান্দার বাইরে নেমে পড়ল। ইন্দুবাবু তাড়াতাড়ি টর্চ হাতে অগ্রবর্তী হলেন এবং বীণা দেবীও ওদের সঙ্গ নেবার জন্য দ্রুত পায়ে বৃষ্টির মধ্যে চলা শুরু করলেন। ডিউক ততক্ষণে চার লাফে গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে।

এলসির গাড়ির পিছনের দিকের লাল আলোটা দেউড়ির দরজা দিয়ে অদৃশ্য হবার পর ইন্দুবাবু বীণা দেবীকে বললেন, "নাও, চল এবার।"

বীণা দেবী অন্যমনস্কের মত উচ্চারণ করলেন, "হুঁ।" তার পর স্বামীর সঙ্গে গৃহাভিমুখে পদচারণা করতে করতে বললেন, "এলসির কেমন যেন একটু ভাবান্তর দেখলাম আজ।"

ইন্দুবাবু বললেন, "কই, আমি তো খেয়াল করি নি।"

বীণা দেবী বললেন, "তোমাদের চোখে পড়ার কথা নয় বোধ হয়।"

॥ তেতাল্লিশ ॥

কাটা কাটা তীক্ষ্ণ শব্দগুলি কৌশিকবাবুর কর্ণবিবর দিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তাঁর মর্মমূলে বিদ্ধ হচ্ছিল। ওঃ, কথার কী প্রবল শক্তি! তা না হলে এই এক ঘণ্টার মধ্যে কমরেড আহমদের ঐ সব সূচীমুখ বাক্যবাণ তাঁকে এমন ভাবে বিবশ ও বিহ্বল করে ফেলবে কি করে? প্রথম দিকে প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শরাহত বিহঙ্গের মত চমকে উঠছিলেন। প্রচণ্ড আঘাতজনিত বেদনায় তাঁর সত্তার প্রতিটি অণু-পরমাণু থর থর করে কেঁপে উঠছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি যেন আঘাতে আঘাতে পর্যুদস্ত হতে হতে অবশেষে শিলীভূত হয়ে গেলেন। কেমন একটা অবসন্নতার ভাব, আচ্ছন্নতার ভাব তাঁর দেহের কোষে কোষে ভর করল। মনও আর যেন সক্রিয় রইল না, চেতনার স্পর্শবিরহিত হয়ে গেল তাঁর বোধি। শরীরের সঙ্গে মনের আর কোন সংযোগ নেই, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিও বুঝি পরস্পর যুক্ত নয়। ওগুলি একই অঙ্গের বিভিন্ন অংশ হলেও ভিন্ন ভিন্ন পেশী স্নায়ু ও শিরার সঙ্গে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। এ এক বিচিত্র বায়বীয় অনুভূতি! এই পৃথিবীতে থেকেও না থাকার মত।

কৌশিকবাবু উপবিষ্ট অবস্থাতেই ধীরে ধীরে মাথা তুললেন। প্রচণ্ড মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে তিনি তাঁর ইচ্ছাকে কার্যকরী করলেন। ঘাড়ের উপর যে অদৃশ্য বোঝাটা পাষাণভারের মত তাঁকে ক্রমশঃ চেপে ধরে ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল করার প্রয়াস করছিল, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজসাধ্য নয়। দুই পাশের ভূমিতে হাতের ভর দিয়ে অনেক সংগ্রাম করার পর ভারী মাথাটা তুলে ধরে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন কৌশিকবাবু।

ঐ তো কমরেড আহমদ আসরের মাঝখানে কেন্দ্রমণির মত স্বকীয় মহিমায় উপবিষ্ট। লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোকেও তাঁর দুগ্ধফেননিভ পাজামা ও পাঞ্জাবী চোখ পড়ছে। কামরার বিপরীত দিকের প্রায়ান্ধকার দেওয়ালে হেলান দিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি তাঁর সম্মুখস্থ শিকার কৌশিকবাবুর বিরুদ্ধে পার্টির অভিযোগ বিবৃত করে চলেছেন। অন্ধকারের মধ্যে তাঁর সাদা পোশাক কোন বিকটদর্শন নরমাংস-লোলুপ বিশাল শ্বাপদের ঘনকৃষ্ণ মুখবিবরের মধ্যস্থিত দশন-পংক্তির মত মনে হচ্ছে।

কমরেড আহমদ বলছিলেন, "কমরেড্‌স্, তা হলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সম্মুখে উপবিষ্ট ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি বহুদিন যাবৎ পার্টির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা-মূলক কাজকর্মে জড়িত। কথাটা কঠিন হলেও আমাকে

বলতেই হবে যে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন দিনই আমাদের পার্টি এবং সর্বহারাদের বিপ্লবের প্রতি অনুগত ছিল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শুরু থেকেই উনি সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিপতিদের চর হিসাবে শ্রমিক স্বার্থকে বিক্রি করার জন্য পার্টিতে ঢুকেছিলেন। এই জাতীয় আরও কজন ট্রেটার পার্টিতে আছে কে জানে?" কমরেড আহমদের কণ্ঠস্বর পার্টির জন্য উদ্বেগ-ব্যাকুল হয়ে উঠল।

"অভিযুক্ত ব্যক্তি"—আর কমরেড নন কৌশিকবাবু। "সম্মুখে উপবিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তি"—ঐ কথাটুকুর মধ্যে কৌশিকবাবু যেন পূর্বাপর সব কিছু দেখতে পান। পার্টির দৃষ্টিতে তিনি আর নেই। ইতিপূর্বেই তিনি লিকুইডেটেড হয়ে গেছেন। কমরেড থাকার অধিকারই যদি তাঁর চলে গেল, তা হলে আর রইল কি? এখন তো কেবল লিকুইডেশনের আনুষ্ঠানিক কৃত্যটুকু বাকী। অবশ্য তারও সূত্রপাত হয়ে গেছে এখানে আসার পরমূহূর্তেই, যখন পার্টির সদস্য-কার্ডটি তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়। কী লজ্জা, কী অপমান! সমগ্র জীবন একনিষ্ঠ ভাবে পার্টির সেবা করার পর অবশেষে এই পুরস্কার? এর পূর্বে তাঁর মৃত্যু হল না কেন, তাই কেবল কৌশিকবাবু ভাবেন। যাক্ এতটাই যখন হয়েছে, তখন লিকুইডেশনের শেষটুকুর জন্য তিনি চিন্তা করবেন না।

কমরেড আহমদের বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হচ্ছিল, "কিন্তু পার্টির নেতৃত্বকে ধন্যবাদ যে তাঁরা অনেকদিন যাবৎ এই আত্মপরিচয়-গোপনকারী ও পুঁজিপতিদের দালালের স্বরূপ চিনে ফেলেছিলেন এবং তাই বহু দিন যাবৎ অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর পার্টির খরদৃষ্টি ছিল। কমরেড্‌স্, কথাটা শুনে আপনারা কেউ কেউ আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন। কিন্তু পার্টির অফিসে আমাদের বৈঠকের সময় ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি যে রকম পার্টি-বিরোধী আচরণ করেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আমার বক্তব্যের যৌক্তিকতা আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি বলছিলাম যে পার্টির এই সদাজাগ্রত দৃষ্টির প্রতি আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত এবং পার্টি-নেতৃত্ব অবশ্যই আপনাদের ধন্যবাদ পাবার যোগ্যতা রাখে। এই রকম ট্রেটাররা পার্টি-নেতৃত্বের কাছে ধরা পড়ে যায়, বেশীদিন তাদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ দুরভিসন্ধি চালাবার সুযোগ পায় না। কমরেড্‌স্, এতে পার্টি-নেতৃত্বের যোগ্যতা ও বলিষ্ঠতাই সূচিত হয় না কি?"

কমরেড সিংহ সুজয়বাবু স্বাহা সুকুমার ও বিভাস ইত্যাদি পার্টির আর

যাঁরা চিত্রার্পিতের মত কমরেড আহমদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাঁর কথা শুনছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে ধীরে ধীরে সমর্থন সূচক মাথা নাড়লেন। কৌশিকবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন। স্বাহা—স্বাহাও কি মাথা নাড়ার দলে? কিন্তু ঘরের অস্পষ্ট আলোকে স্বাহার অঙ্গভঙ্গী ঠিকভাবে নজরে পড়ল না। মানুষের ছায়ায় অন্ধকার দেওয়ালের পটভূমিকায় ওর মুখের অর্ধাংশের উপর ঈষৎ মাত্র আলো পড়ায় ওকে আলো-আঁধারি দিয়ে রচিত কোন পটের প্রতিকৃতি মনে হল কেবল।

পার্টি-নেতৃত্বের যোগ্যতা ও বলিষ্ঠতা সম্বন্ধে এই কিছুক্ষণ পূর্বে পর্যন্ত কৌশিকবাবু দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন। পার্টির অভ্রান্ততা সম্বন্ধে কচিৎ কখনও মনে সংশয় জাগলেও নৈষ্ঠিক সৈন্যের মত মুহূর্তে সে অবিশ্বাস ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আত্মধিক্কার দ্বারা তিনি সাময়িক দুর্বলতার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। কিন্তু আজ? আজ তো কমরেড আহমদের বক্তব্যের সমর্থনে মস্তক আন্দোলিত করার সাধ্য তাঁর নেই।

শুরু থেকেই অভিযুক্ত ব্যক্তি সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিপতিদের চর—মাস্টারদার নেতৃত্বে চালিত সিপাহী রূপে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার ও জালালাবাদ পাহাড়ে জীবন পণ করে মৃত্যুদূত ইংরেজের বুলেটের সঙ্গে লড়াই করার পর দীর্ঘদিন ক্ষুধা তৃষ্ণা ও যাবতীয় শারীরিক কষ্ট ভুলে জীবন-মৃত্যুর দোলায় যে দুলেছে, তার উপর এ উপযুক্ত অভিধাই বর্ষিত হচ্ছে বটে! তার পর আন্দামানের সেলুলার জেলের নিঃসঙ্গ সেলের দীর্ঘকালীন নির্বাসন, রাজশক্তির চণ্ডনীতির উৎপীড়ন ও নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছে যাকে, তার সম্বন্ধে অত্যন্ত সমীচীন মন্তব্য এ! আর এতদিন যাবৎ একান্ত অনুগত সৈনিকের মত যে পার্টির নির্দেশ পালন করার জন্য আহার নিদ্রা ভুলে কেবল নূতন সমাজ নূতন দিনের আবাহনের স্বপ্নে মশগুল হয়ে কর্মমগ্ন ছিল—তার সেবার যথোচিত প্রতিদান এ!

অকস্মাৎ তাঁর স্কুল-জীবনে পঠিত ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটি পাত্র—রাজা অষ্টম হেনরীর মন্ত্রী উল্‌জীর জীবনের শেষ দিনের কথা মনে পড়ল। দীর্ঘকাল একান্ত বশম্বদ ভাবে রাজসেবা করার পর জীবন-সায়াহ্নে রাজার একটি বদ খেয়ালে সম্মতি না দেওয়ার অপরাধে উৎপীড়িত সেই বৃদ্ধ অবশেষে আর্তনাদ করে বলেছিলেন, হায়, এত করেও রাজার মন পেলাম না। কিন্তু এর একাংশ পরিশ্রম করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যেত। কৌশিকবাবুর মনে হল তাঁর অবস্থাও উল্‌জীর মত। তফাত কেবল

এইটুকু যে উলজ্ঞীর মত তিনি শেষকালে ভগবানের শরণ নিতে পারছেন না।

"পুরাতন অভিযোগ সমূহের কথা শুনলেন, এবার নরসিংহগড়ে আসার পর ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি পার্টির প্রতি, সর্বহারাদের বিপ্লবের প্রতি কেমন ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তা শুনুন।" কমরেড আহমদের কম্বু কণ্ঠ নিপুণ সরকারী উকিলের মত কথার পর কথার মালা সাজিয়ে নিজের মোকদ্দমা তৈরী করে চলেছে। কোন ছিদ্র দিয়েই আসামী যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে, তার দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি।

কমরেড আহমদ বলে চলেন, "এখানে উনি মোহনপুরের কৃষক সংগঠন মারফত প্রথমে কৃষক ও তার পর তাদের দ্বারা মজুরদের ভিতর ইনফিল্টারেট করে তাদের পুঁজিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জঙ্গী গরিলা সৈনিক রূপে গড়ে তুলবেন, এই ছিল এবস্কণ্ডিং পিরিয়ডে ওঁকে এখানে রাখার পিছনে পার্টির উদ্দেশ্য। এ ছাড়া ছাত্র ও শিক্ষিতদের মারফত মধ্যবিত্তদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তাদের পার্টি লাইনের প্রতি আকৃষ্ট করাও ওঁর গৌণ কর্তব্য ছিল। কিন্তু উনি কি করেছেন এর জন্য?" কমরেড আহমদ কয়েক মুহূর্ত মৌন থেকে চতুর্দিকে আবার সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে মার্ক এণ্টনির মত দেখে নিলেন যে তাঁর বক্তৃতা বাঞ্ছিত ফল প্রসব করছে কিনা।

"কি করেছেন এর জন্য"— আর একবার নিজেরই প্রশ্নের প্রতিধ্বনি তুলে তিনি স্বয়ং তার জবাব দিতে শুরু করেন। "ওঁকে পার্টি এত দিন এত খরচ করে মেন্‌টেন্ করার পর দেখা যাচ্ছে যে ওঁরই জন্য মোহনপুরের সংগ্রামী মজদুর ভাইরা লড়াই করায় ইতি দিয়ে কাল থেকে কাজে যাবার সিদ্ধান্ত করেছে। হ্যাঁ ওঁরই জন্য—" কথাটার উপর জোর দিলেন কমরেড আহমদ। জার্মান কূটনীতিজ্ঞ ও হিটলারের অকৃত্রিম দোসর গোয়েবল্‌সের একটি উক্তির কথা কৌশিকবাবুর মনে পড়ে গেল। প্রচার দ্বারা জনসাধারণকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার কলা সম্বন্ধে গোয়েবল্‌সের অভিমত হচ্ছে এই যে সত্য মিথ্যা বলে আদপে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। সুকৌশলে বার বার প্রচার করতে পারলে মিথ্যাও সত্যের রূপ ধারণ করে।

তার পর কৌশিকবাবুর দিকে তর্জনী নিবদ্ধ রেখেই কমরেড আহমদ বলতে লাগলেন, "নচেৎ পরশু জামসেদপুরে পার্টির মিটিং-এর পর মোহনপুরের ধর্মঘটের দোহাই দিয়ে তাড়াতাড়ি এখানে আসব বলে রওনা হলেও পথে এক জায়গায় উনি নেমে পড়েছিলেন কেন এবং কেনই বা এখানে কাল বেল

বারটার পূর্বে উনি পৌঁছান নি? আর মাঝের এই কয় ঘণ্টা যাদের সঙ্গে উনি পার্টির বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করে কাটিয়েছেন, তাদের পরিচয়ও আমাদের অজানা নয়। টাটা বিড়লার দালাল, ঘৃণ্য কংগ্রেসীদের দোসর, ধর্মের নেশায় বুঁদ, শ্রেণী সংগ্রামের শত্রু গান্ধীবাদীরা হচ্ছে ওঁর সেই গোপন ষড়যন্ত্রের পার্টনার।"

কমরেড আহমদ হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গীতে মাথার উপর মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে বলতে লাগলেন, "শুধু তাই নয়। পার্টির নির্দেশ অমান্যকারী আমাদের ছাত্রী ফ্রন্টের একটি ভূতপূর্ব কমরেডকে পার্টির নির্দেশের বিরুদ্ধে ঐ সব গান্ধীবাদীদের কাছে ইনি পাঠিয়েছেন। মীনাক্ষী ও ইনি এইভাবে সম্মিলিত রূপে প্রতিক্রিয়াশীল গান্ধীবাদীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পার্টি-বিরোধী ষড়যন্ত্র গড়ে তুলেছেন। অস্বীকার করতে পারেন উনি একথা?"

গলার স্বর একটু নামিয়ে কমরেড আহমদ বলে চললেন, "অবশ্য অনেক দিন থেকেই গান্ধীবাদীদের চর এখানকার স্কুলের ভূতপূর্ব শিক্ষক ভোলানাথ ভকতের সঙ্গে ওঁর মাখামাখি। সেই লোকটির সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে সব পত্রবিনিময় হয়েছে, তার নকল পার্টির হস্তগত হয়েছে এবং যাদের ইচ্ছা হবে সেগুলি আমার কাছ থেকে নিয়ে দেখে নিতে পারেন। চিঠিগুলি পড়লেই বুঝতে পারবেন যে গান্ধীবাদীরা কি ভাবে ওঁকে প্রভাবিত করেছে এবং পার্টির মূল সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতি ওঁর বিশ্বাস কত অগভীর। এই রকম ভেসিলেটিং এলিমেণ্ট অর্থাৎ বেতসপত্রের মত কম্পমান কর্মীরাই যে পার্টির শত্রু এ কথা নিশ্চয় আপনাদের বলে দিতে হবে না।"

কমরেড আহমদ দম নেবার জন্য কয়েক মুহূর্ত থামলেন। তার পর আবার দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে শুরু করলেন, "তা ছাড়া গান্ধীবাদীদের সঙ্গে মাখামাখির ব্যাপারটা আপনারা আর একটু তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন। যে গান্ধী সম্বন্ধে সেই ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিনফর্মের প্রথম কংগ্রেসের কর্মসূচীর ষষ্ঠ অধ্যায়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে: 'ভারতবর্ষের গান্ধীবাদ জাতীয় প্রবণতা ধর্মীয় গোঁড়ামিতে ওতপ্রোত এবং সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পশ্চাদ্‌পদ ও আর্থিক দিক থেকে নিতান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা। গান্ধীবাদের মতে সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানের পথ সর্বহারাদের সমাজ-বাদে নেই, আছে ঐ সব অনগ্রসর বিধিব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের মধ্যে। গান্ধীবাদ শান্তির নামে নিষ্ক্রিয়তা প্রচার করে ও শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধিতা করে এবং এই ভাবে বিপ্লবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই গান্ধীবাদ খোলাখুলি

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে পর্যবসিত হয়। গান্ধীবাদ ক্রমশঃ অধিকাধিক মাত্রায় গণবিপ্লবের বিরুদ্ধাচারী আদর্শের রূপ পরিগ্রহ করছে। সাম্যবাদকে এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড জেহাদ চালিয়ে যেতে হবে।' শুধু এই নয়। এর ঠিক দশ বছর পর প্রাভদাতে আমাদের পার্টির উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সম্বন্ধে যে রচনা প্রকাশিত হয়েছিল এবং লণ্ডনের কমরেডদের মুখপত্র ডেলি ওয়ার্কারে পর্যন্ত যা পুনরুদ্ধৃত হয়েছিল, সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রে এদের সম্বন্ধে কি বলা হয়? বলা হয়, 'কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীর আধার গান্ধীবাদ প্রেম ও ভালবাসার ছায়াবরণের অন্তরালে ভীরুতার প্রশ্রয় দেয়। গান্ধীবাদ দারিদ্র্য চিরস্থায়ী করে কঠোর পরিশ্রমমূলক জীবনের জয়গান করে। গান্ধীবাদ কৃষকদের বোঝা হ্রাস করা, জাতীয় ঐক্য সাধন ও হিন্দুস্থানের ঐতিহাসিক দায়িত্ব ইত্যাদির বুলি কপচালেও আসলে এই সব ধূয়োর আড়ালে ভারতীয় পুঁজি-পতিদের স্বার্থ রক্ষা ও প্রচারের চক্রান্ত করছে। সমাজে ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ কায়েম রাখার যৌক্তিকতা ও অনিবার্যতা এবং অসাম্য ও শোষণকে চিরস্থায়ী করার জন্য গান্ধীবাদ ষড়যন্ত্র করে চলেছে।"

উত্তেজিত কমরেড আহমদ কিছুক্ষণের জন্য থেমে ঘন ঘন শ্বাস নিলেন। তার পর পূর্ব বক্তব্যের জের টেনে বলতে লাগলেন, "এতেও যাদের জ্ঞানচক্ষু খুলবে না, তাদের আমি সর্বোপরি আমাদের চিরকালের পথপ্রদর্শক গ্রেট সোভিয়েৎ এনসাইক্লোপেডিয়ার গান্ধী সম্পর্কিত বিবরণের কথা মনে করিয়ে দেব। তাতে স্পষ্টই বলা হয়েছে, 'গান্ধী প্রতিক্রিয়াশীল ও সুদখোর বেনেদের বংশধর······ধর্মীয় কুসংস্কারের নাম ভাঙ্গিয়ে খাওয়াই তার পেশা······প্রাচীন-পন্থীদের কার্যকলাপের অনুকরণ যিনি বানরের মত করে থাকেন।······দক্ষিণ আফ্রিকায় জুলুদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সক্রিয় ভাবে সাহায্যকারী ······।' আপনি—আপনি এ সব জানতেন নিশ্চয়! তা হলে জানার পরও ওদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মোহনপুরের ধর্মঘটের প্রতি এ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন কেন? বলুন, চুপ করে থাকলে চলবে না। বলুন?" কমরেড আহমদ একেবারে মারমুখী হয়ে কৌশিকবাবুকে প্রশ্ন করেন।

এই রকম কুৎসিত ও সর্বৈব মিথ্যা অভিযোগের কি জবাব দেবেন তিনি? তা ছাড়া কমরেড আহমদ এমন অভদ্র ও নাটকীয় ভঙ্গীতে কথাবার্তা বলছেন যে ক্ষোভে ও অপমানে কৌশিকবাবুর ভিতরটা রি রি করতে লাগল। দুই একবার মুখ খোলার চেষ্টা করলেন তিনি; কিন্তু কে যেন কঠিন হস্তে তাঁর

কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে। কয়েকবার ঢোক গেলার জন্য তাঁর কণ্ঠমণি নড়ে উঠলেও কোন শব্দ বেরোল না তাঁর গলা দিয়ে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর বিজয়হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে কমরেড আহমদ ঘোষণা করলেন, "ঢোক গেলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কারণ কী-ই বা আর বলবেন? বৃথা আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা কৌশিকবাবু।"

দুঃখে অপমানে কৌশিকবাবু মনে মনে প্রার্থনা করছিলেন, ধরণী দ্বিধা হও, আর তার মধ্যে আত্মবিসর্জন করে এই হিংস্র কুটিল ব্যক্তিটির সান্নিধ্য পরিহার করার সুযোগ পাই। এত বৎসর এমন অনুগত ভাবে পার্টির সেবা করার পর এই পুরস্কার—এই সর্বাবয়বে অগ্নিপ্রবাহ-বর্ষণকারী বাক্যের জ্বালা! মনে মনে বিড় বিড় করতে করতে কৌশিকবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। কারণ তাঁর মনে হল কমরেড আহমদ তো পার্টির অনুগত কর্মী হিসাবেই তাঁকে এই ভাবে দগ্ধ করে চলেছেন। পার্টির তাঁকে আর প্রয়োজন নেই—এই হচ্ছে লক্ষ্য। অতএব পার্টির যে কোন উপায়ে কার্যসিদ্ধি করার নীতি অনুযায়ী কমরেড আহমদ অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত কাজ করছেন। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস! কৌশিকবাবু এক কালে যে কেবল পার্টির এই নীতিকে বেদবাক্য জ্ঞানে বিশ্বাস করেছেন তা-ই নয়, অপর সকলকেও এর দীক্ষা দিয়েছেন এবং যাঁরা সৎ উপায়ের কথা বলতেন তাঁদের কুলীশ কঠোর বিদ্রূপের বাক্যবাণে ঘূর্ণি হাওয়ার সম্মুখে পতিত চৈত্রশেষের ঝরা পাতার মত উড়িয়ে দিয়েছেন। সকরুণ ক্লান্ত দৃষ্টিতে কৌশিকবাবু আবার সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন।

ঐ তো পাষাণপ্রতিমার মত স্বাহা বসে রয়েছে। ওর ভিতর জীবনের স্পন্দন আছে কি না বোঝার উপায় নেই। ওর সঙ্গে কৌশিকবাবুর কেবল গুরু-ছাত্রীর সম্পর্ক নয়, পার্টিতে আকৃষ্ট করে ওর পথপ্রদর্শকের কাজই তিনি কেবল করেন নি, শুধু কমরেড ইন আর্মস ছাড়া আরও ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক ওর সঙ্গে আছে বলে স্বাহা মনে করে। সময়ে অসময়ে ওঁর উপর স্বাহা যে বিশেষ অধিকার খাটাত, কর্তৃত্ব করত, তা পার্টির নিছক কর্মপরিধির বাইরে। এখানে ঐ অভিযোগকারীদের সারির মধ্যে ও-ই তো কৌশিকবাবুর সর্বাপেক্ষা পুরাতন পরিচিত এবং সবার তুলনায় অধিক শুভাকাঙ্ক্ষীও বটে। ওকি তাঁকে এই বিচারের প্রহসন, এই অপরিসীম অপমান ও গ্লানি থেকে বাঁচাবার কোন প্রয়াস করতে পারে না? কে জানে কি ভাবছে ও ঐ রকম চিত্রার্পিতের মত বসে? ও-ও কি পন্থার চেয়ে লক্ষ্যকে

বস্তু বলে মনে করার দলে? হবে হয়তো। কৌশিকবাবুও তো এত দিন—নিজের উপর বিপদের বোঝা এসে না পড়া পর্যন্ত ঐ ভ্রান্ত দর্শনে বিশ্বাস করতেন। যাক্, কারও কাছেই কৌশিকবাবুর আর কোন আশা নেই। তবু তিনি হঠাৎ স্বাহার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলেন না। ও ডাইনে বামে কোন দিকে নড়ছে না, এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে কি না তাও বোঝার উপায় নেই। স্পন্দনহীন স্থির প্রস্তরমূর্তির মত মেঝের দিকে তির্যক দৃষ্টি মেলে বসে আছে কেবল।

বাকী সকলে? তাঁরাও মৌন, নীরব। আর কৌশিকবাবু এই সব স্বল্প পরিচিত কমরেডদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী কী-ই বা আশা করতে পারেন? এই জাতীয় পার্জিং-এর বৈঠকে অতীতে তিনি দুই চার বার উপস্থিত থেকেছেন। এমন আটঘাট বেঁধে পার্টির তরফ থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করা হয় যে উপস্থিত কমরেডদের সকলকেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হয় যে পার্টির বক্তব্যই ঠিক এবং আসামীর কাঠগড়ায় খাড়া ভূতপূর্ব কমরেডটি চূড়ান্ত শাস্তি পাবার যোগ্য। তাঁর তো প্রত্যেকবারই মনে হয়েছিল, আর ঐ সব ক্ষেত্রে যাঁরা আসামী ছিলেন, তাঁদের মনের অবস্থাও নিশ্চয় তাঁর মত হত। বিচিত্র ব্যাপার, ভাগ্যচক্রের কী নিষ্ঠুর আবর্তন। কাল যে ফরিয়াদী ছিল, আজ সে আসামী এবং আজকের অভিযুক্তকারীর অবস্থা আগামী কাল কি হবে? নিজেদের পার্টির অভিযুক্ত কমরেড ছাড়া আরও কতকগুলি এই রকম অভিযুক্ত ও পার্জিং-এর শিকার ভূতপূর্ব কমরেডদের মুখচ্ছবি তাঁর মনের পটে দ্রুতগতিতে একের পর এক ভেসে উঠল।

সেই মিছিলের পুরোভাগে রয়েছেন ট্রটস্কি এবং তার পর আগস্ট ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের মস্কো বিচারের অন্যান্য আসামী—ঝিনেভিয়েভ, ক্যামেনোভ, স্মীরনভ এবং আরও তের জন। তার পর দ্বিতীয় মস্কো বিচার থেকে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত পার্জিং-এর যে অখণ্ড প্রবাহ প্রবাহিত হয়েছে, তার শিকার হন পিয়াটকভ তুকাচেভস্কী য়াকির, ডিভানী ইত্যাদি কত শত রুশ জননায়ক। সারির শেষে রয়েছে রায়কভ, বুখারিন, কেস্টিনাস্কি এবং আরও কত জন। এইখানেই এ কাহিনীর উপসংহার হয় নি। পূর্ব ইউরোপের "গণতন্ত্র" গুলিতেও এই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়েছে। পোল্যাণ্ডের গোমুলকা, রুমানিয়ার অ্যানা পঁকার, জর্জেস্কু, হাঙ্গেরীর রিয়ক এবং এই সে দিন যাকে সরান হল সেই জোনস কাদার ও তাদের শত শত অনুগামীরাও রয়েছে এই শোভাযাত্রায়। আর কোথাকার ভূতপূর্ব

কমরেডরা নেই ? বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া—সব দেশের ভূতপূর্ব কমরেডদের ঐ মিছিলের পিছনে কৌশিকবাবু নিজের প্রতিমূর্তিও যেন দেখতে পেলেন।

শিহরিত কৌশিকবাবু বাস্তব জগতে ফিরে এলেন। কমরেড আহমদ কয়েক মিনিট থেমে একটু দম নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠকে আরও গুরুগম্ভীর করে শুরু করলেন, "কমরেড্‌স্‌, এবার আমি আমার অভিযোগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা সকলে মনোযোগ সহকারে সব কথা শুনে অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে রায় দেবেন। কারণ সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার ছাড়া পার্টির অপর কোন কাম্য নেই বা থাকতে পারে না।"

সকলে একটু নড়ে-চড়ে বসে কমরেড আহমদের দিকে আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। কিন্তু স্বাহার ভঙ্গিমায় কোন পরিবর্তন দেখা গেল না, সে তেমনি অনড় ভাবে বসে রইল। যেন তার চেতন সত্তা এ পৃথিবীতে নেই।

কমরেড আহমদ বলছিলেন, "ঝুটী আজাদীর ধোঁকা দিয়ে দেশকে বিভ্রান্ত করে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্টের পর ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে সরে গিয়ে নেপথ্যে দাঁড়িয়েছে। তাদের প্রতিনিধি মাউণ্টব্যাটেন এবং তার চর ও অনুচর বহু বিদেশী ব্যবসায়ী এদেশে রয়ে গেছে যারা ভিতর থেকে মেহনতী মজদুরদের লড়াইকে স্যাবোটাজ করে থাকে এবং এ কথা পার্টির সকলেই জানেন। এই সব আন্তর্জাতিক স্যাবোটিয়ারদের একজন হচ্ছে মোহনপুরের খাদানের মুর সাহেব এবং তাঁর কন্যা। যতই ছলা কলা বিস্তার করুন না কেন তিনি, হ্যাঁ সচেতন ভাবেই আমি বলছি যে আমাদের মধ্যে কেউ যতই তাঁর মোহজালের শিকার হন না কেন, তিনিও আসলে ব্রিটিশ ক্যাপিটালিস্টদের ঘৃণ্য এজেণ্ট ছাড়া আর কিছু নন। পার্টি এই সব বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের ভাল ভাবে চেনে বলেই আমরা মোহনপুরের খাদানে ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম এবং আমাদের ভূতপূর্ব কমরেড ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

ভূতপূর্ব—এর মধ্যেই তিনি ভূতপূর্ব হয়ে গেছেন। এই ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যেই! তা হলে কেন মিছামিছি এই বিচারের অনুষ্ঠান ?

কমরেড আহমদের কণ্ঠস্বর গর্জন করে চলেছে, "কিন্তু উনি ইঙ্গ মার্কিন পুঁজিবাদের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিকিয়ে দিয়ে পার্টির কর্মসূচীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। ওঁরই জন্য মোহনপুরের ধর্মঘট আজ

ব্যর্থ হবার পথে এবং একদল মজুর কাল কাজে যাবে বলে স্থির করেছে।"

"মিথ্যা কথা, একেবারে মন গড়া—বানান অভিযোগ।" অবরুদ্ধ উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে কৌশিকবাবু বললেন। আর চুপ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। এত আঘাতে মৃত ব্যক্তিও উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে। কৌশিকবাবু তো এখনও মারা যান নি।

ঘরের ভিতর যেন বজ্রপাত হল। সমস্ত ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য সূচীভেদ্য নীরবতা ভর করল। উপস্থিত সকলের দৃষ্টি একবার তাঁকে ও অপর মুহূর্তে কমরেড আহ্‌মদকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

সেই দুঃসহ নীরবতা ভঙ্গ করে অবশেষে কমরেড আহমদের শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল, "বাঃ—এই তো আমাদের ভূতপূর্ব কমরেড কথা বলছেন। বেশ, ওঁর কথা মেনে নেওয়া যাবে যদি পার্টি যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করেছে, তা নিরাধার বলে উনি প্রমাণ করতে পারেন। আচ্ছা বলুন কৌশিকবাবু, মোহনপুরের ধর্মঘট পরিচালনা করার ভার আপনার উপর ছিল কি না?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ। মালিকের এজেন্ট হলে শ্রমিক স্বার্থে ধর্মঘট পরিচালনা করা যায় কি?"

কোন ইতস্তত না করে কৌশিকবাবু জবাব দিলেন, "না।"

"তা হলে ঘাটশিলার হাসপাতাল থেকে জামসেদপুরে কমরেড স্বাহার ওখানে যাবার সময় আপনি ওঁর গাড়িতে করে গিয়েছিলেন কেন? রেল-গাড়িতে জায়গার অভাব ছিল—এ কথা নিশ্চয় বলবেন না। তাই নয়, জামসেদপুর থেকে ফেরার পর আপনি মিস মুরের সঙ্গে এত মেলা-মেশা করতেন কেন? আবার হেডমাস্টার মশায়ের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাওয়ার দিন ওঁর গাড়ি ছাড়া অন্য কোন বাহন আপনার জুটল না কেন? এবং তার কিছুক্ষণ পূর্বে ওঁর গাড়িতে চড়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন কিসের জন্য? এ ছাড়া বহুদিন গোপনে ওঁর সঙ্গে দেখা করে নানাবিধ ষড়যন্ত্র এবং আরও কত কি করেন নি? আমি সর্বাধুনিক দৃষ্টান্তই দেব। কাল রাত্রে এরোড্রোমের জঙ্গলে ওঁর সঙ্গে গোপনে দেখা করে একটি ঘরের মধ্যে কেবল দুইজনে কি মার্কসবাদের কথা আলোচনা করছিলেন? এ কথা আপনি বললেও কি পৃথিবী বিশ্বাস করবে? পার্টির দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনারই

মারফত মিস মুর শ্রমিকদের একাংশকে প্রভাবিত করে ফের খাদান চালু করার ব্যবস্থা করছেন। নচেৎ ধর্মঘটের এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কট চলছে জানবার পরও শ্রমিকদের সঙ্গে এবং এমন কি কমরেড বিভাসের সঙ্গে দেখা করে ধর্মঘট চালিয়ে যাবার জন্য কোন ব্যবস্থা করার পরিবর্তে আজও বিকেলে আপনি মিস মূরের সঙ্গে দেখা করতে ওঁদের বাড়ির দিকে গিয়েছিলেন।"

ওষ্ঠপ্রান্তে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে তুলে কমরেড আহমদ বললেন, "শেষ পর্যন্ত দেখা করার সাহস হয় নি—একথা সত্যি। কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা তো ছিল। বলুন—চুপ করে আছেন কেন ? এর কোন্ কথাটা মিথ্যা ?"

মিথ্যার চেয়ে অর্ধ সত্য অধিকতর বিপজ্জনক এবং তার খণ্ডন করা আরও কঠিন। কমরেড আহমদের এই সব অভিযোগের কী প্রত্যুত্তর দেবেন তিনি ? কৌশিকবাবু দপ্ করে জ্বলে ওঠার মত আবার চকিতে নিভে গেলেন। পূর্বের মত মাথা নীচু করে মৌন ধারণ করলেন তিনি।

খেলিয়ে খেলিয়ে ইঁদুর ধরার সময় শিকারী বিড়ালের মনের ভাব যেমন হয় তেমনি ভাব করে কমরেড আহমদ চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করলেন, "তা হলে দেখতেই পাচ্ছেন, আপনার জবাব দেবার বিশেষ কিছু নেই। কি করবেন বলুন—চেষ্টা তো অনেক করলেন ; কিন্তু শাক দিয়ে তো মাছ ঢাকা যায় না।" কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আবার তিনি উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বললেন, "কিন্তু এই শেষ নয় কমরেডস। আমাদের আরও একজন কমরেডের এর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে এবং সেটা পেশ করা শেষ হলেই আর আমি আপনাদের ধৈর্যকে পীড়িত করব না। তার পর আপনারা অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে রায় দেবেন।"

কৌশিকবাবু আবার ঘাড় তুলে সকলের দিকে তাকালেন। আরও কোন্ শর রয়েছে কমরেড আহমদের অক্ষয় তূণে ? উত্তেজনায় তাঁর বুকটা ধক্ ধক্ করতে লাগল।

কমরেড আহমদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ঘরের নীরবতা খান্ খান্ করে ভেঙ্গে দিয়ে ঘোষণা করল, "পার্টির তরফ থেকে তোমাকেই চার্জ পেশ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কমরেড বিভাস।"

কমরেড বিভাস—বিভাস ! তাঁর বিরুদ্ধে আজ এখানে চার্জ পেশ করবে তাঁরই এক জন শিষ্যস্থানীয় কমরেড সম্প্রতি তিনি যাকে আবার নূতন করে পার্টির অন্তরঙ্গ মহলে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছেন ! গত কয়েক মাস

যাকে কনিষ্ঠের স্নেহে ও প্রীতিতে তিনি ধীরে ধীরে আবার পার্টির মধ্যে টেনে এনেছেন সেই বিভাস। তড়িৎস্পৃষ্টের মত কৌশিকবাবুর সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়ে একটা দুরন্ত শিহরণ বয়ে গেল। অপ্রত্যাশিতের আঘাতে তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা স্নায়ু সব যেন সংহতি হারিয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। এতদিন ধরে পরম স্নেহে যাকে বক্ষসংলগ্ন করে রেখেছিলেন, সে-ই হঠাৎ কালভুজঙ্গ হয়ে তাঁকে দংশন করবে এ যেন কল্পনাতীত ব্যাপার। মানুষের নৈতিক মান এত নেমে গেছে যে কারও উপরই আর বিশ্বাস রাখা যায় না!

কিন্তু নৈতিক মান, নীতি—এ সব কি ভাবছেন কৌশিকবাবু? তাঁদের শিক্ষাগুরু লেনিনের সেই কথা তাঁরা কতবার আবৃত্তি করেছেন, "আমাদের কাছে নৈতিকতার স্থান সর্বদাই সর্বহারাদের শ্রেণী সংগ্রামের স্বার্থের পদতলে।······আমাদের ছলনা, চাতুরী ও আইন ভাঙ্গার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সত্যকে গোপন করা, বিকৃত করা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।" কৌশিকবাবুরা এ যাবৎ প্রোলিটেরিয়েটদের নৈতিকতার এই শিক্ষা পার্টির কমরেডদের দিয়েছেন, যাতে তারা অনুকম্পার হাসি হেসে শাশ্বত সত্যের কুসংস্কারের পূজারীদের সমাজবাদী যুক্তির খরপ্রবাহে ভাসিয়ে দিতে পারে। বিভাস তো পার্টির শিক্ষা অনুযায়ীই কাজ করতে চলেছে। কমরেড স্ট্যালিনের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি যা কমিউনিস্ট নৈতিকতার মূলমন্ত্র তা যেন কৌশিকবাবুর কর্ণকুহরে গুঞ্জন করতে লাগল, "কূটনীতিজ্ঞের কথার সঙ্গে তার কাজের কোন সামঞ্জস্য থাকবে না। নচেৎ কূটনীতি আর কি হল? কথা এক, কাজ আর এক। কথা হচ্ছে কুকর্ম গোপন করার উপায়। সৎ কূটনীতি শুকনো জল বা লোহার মত কাঠের ন্যায়ই অসম্ভব কথা।" কৌশিকবাবু তো এত দিন মনে প্রাণে নৈতিকতার এই মানদণ্ডে বিশ্বাস করে এতদনুযায়ী আচরণ করে এসেছেন। তবে—তবে কেন বিভাসের এই নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর মনে দুঃখ?

কৌশিকবাবু আর কিছু ভাবতে পারেন না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন আর কিছু নেই, রয়েছে কেবল একটা রুদ্র হুংকার—চার্জ পেশ কর কমরেড বিভাস।

আর স্বাহা? স্বাহার সম্মুখে আচম্বিতে প্রচণ্ড গর্জনে বুঝি অশনিপাত হল। ওর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে পরশু বিকেলে সাকচী বাস স্ট্যাণ্ডের দৃশ্য ভেসে উঠল। বিভাসের সেই জ্বলন্ত আক্রোশমাখা দৃষ্টি—সেই ক্রুর

জিঘাংসার ভাব আর দাঁতে দাঁত ঘষে কথা, "এত অহংকার! আচ্ছা দেখা যাবে।" স্বাহার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড উত্তাল গতিতে টিপ টিপ করে চলেছে। বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি শুধু তাই কেন, বুঝি সমগ্র চৈতন্যই লোপ পাবে। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে বিভাসের দিকে তাকাল।

বিভাস তখন কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নৈর্ব্যক্তিক কণ্ঠে বলে চলেছে, "উনি পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে যার খাদানে ধর্মঘট চালানর দায়িত্ব ওঁর ওপর পড়েছিল, তারই মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে বেড়িয়েছেন। হ্যাঁ এলসি মুরের সঙ্গে ওঁর অন্তরঙ্গতা প্রেম ছাড়া আর কিছু নয়। কালকের রাত্রে সেই দুর্যোগের মধ্যে ধলভূমগড়ের এরোড্রামের জঙ্গলের এক ভাঙ্গা বাড়িতে দীর্ঘ কাল এক সঙ্গে ছিলেন ওঁরা। দুজনে ওর ভিতরে কি করেছিলেন, তা উনিই বলতে পারেন। তার পর স্টেশনের রাস্তার মোড়ে যখন উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে বিদায় নেন তখন উনি মিস মুরকে বলেন, আমার প্রাণ আপনার, আপনার প্রাণ আমার। হ্যাঁ, এই কথা উনি বলেছেন। এ ছাড়া আজ বিকেলেও উনি মিস মুরের সঙ্গে দেখা করার জন্য মোহনপুরে গিয়েছিলেন…"

স্বাহা অস্ফুট আর্তনাদ করে দুই হাত দিয়ে কান চেপে ধরল। উঃ কী ভীষণ! আঘাতের উপর আঘাত! কৌশিক—কৌশিক মিস মুরের সঙ্গে…? স্বাহা বুঝি পাগল হয়ে গেছে। ওর কানের ভিতর বিভাসের কথা যেন গলিত সীসে ঢেলে দিচ্ছে। স্বাহার এত বছরের এত আদরের ধন—ওর সযত্ন লালিত কামনা-বাসনা আকাঙ্ক্ষার সৌধ চুরমার হয়ে যাচ্ছে। আঘাতের বেদনায় স্বাহা হাঁপাতে থাকে। ওর দাঁত কখন যে অধরকে বিদ্ধ ও রক্তাক্ত করেছে তার দিকেও খেয়াল নেই। হাঁপাতে হাঁপাতে স্বাহা উন্মাদের বিভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে ঘটনা-প্রবাহ লক্ষ্য করতে থাকে।

ঘরের মধ্যে আবার কমরেড আহমদের কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠল, "তা হলে বুঝতেই পারছেন কমরেডস, ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট এক পুঁজিপতির কন্যার প্রেমে উন্মত্ত কী ভীষণ কালভুজঙ্গ এত দিন আমাদের পার্টির মধ্যে আত্মগোপন করে ছিল। এখন বলুন এই পার্টিদ্রোহী প্রতিবিপ্লবী ব্ল্যাকশিপকে আপনারা কি শাস্তি দিতে চান? পার্টি চূড়ান্ত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এ আপনারা জানেন এবং তাই আপনারাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। আমি একটি কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সমাজবাদের

ফাদারল্যাণ্ডে এই সব বিশ্বাসঘাতক ও রেনেগেডদের জন্য কি ব্যবস্থাপত্র রচিত হয়, তা নিশ্চয় আপনারা জানেন।" কথার শেষে কমরেড আহমদ তাঁর দুই হাত পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন।

স্বাহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আর একবার শিহরিত হয়ে উঠল। কৌশিকবাবু কিন্তু নির্বিকার।

কমরেড আহমদ এবার পকেট থেকে হাত বের করেছেন। লণ্ঠনের মৃদু আলোকেও বেশ বোঝা গেল তাঁর করমুষ্টিতে একটি খর্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ বস্তু রয়েছে এবং বস্তুটি একটি রিভলভার। খেলাচ্ছলে আগ্নেয়াস্ত্রটি নিয়ে ধীরে ধীরে লোফালুফি করতে করতে তিনি লঘু কৌতুকের ভঙ্গীতে বললেন, "আমি আবার সাইলেন্সার লাগান যন্ত্রই পছন্দ করি। কেবল হিস্ করে একটি চাপা শব্দ—কোন হাঙ্গামা নেই, নীরবে কর্ম সম্পাদন হয়ে যায়।" যেন একটা প্রচণ্ড রসিকতা করে ফেলেছেন এমনি ভাব করে তিনি নিম্ন কণ্ঠে খিক্ খিক্ করে হাসতে লাগলেন।

স্বাহা প্রায় আর্তনাদ করে তাঁর দিকে দুই হাত বাড়িয়ে খানিক এগিয়ে গেল। কিন্তু তার ব্যাকুল কণ্ঠ থেকে মৃদু না-না ছাড়া অপর কোন শব্দ ফুটল না।

আর সকলের উন্মুখ ব্যগ্র দৃষ্টি একবার কৌশিকবাবু এবং তার পরের বার কমরেড আহমদের করমুষ্টিতে ধৃত সেই ক্ষুদ্রকায় অগ্নিনালিকাটির দিকে পড়তে লাগল। ছোট্ট ঘরটির পরিবেশ কোন্ এক নাটকীয় ঘটনার শেষ দৃশ্যের অন্তিম পরিণতির জন্য রুদ্ধ নিশ্বাসে কাল গুনতে লাগল।

কমরেড আহমদ হাসলেন। সেই নিঃশব্দ হাস্যে শ্লেষ ও বিদ্রূপ মূর্ত হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। দুই কাঁধে একবার "শ্রাগ" করে হাত দুটিকে সামনের দিকে চিতিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "কমরেডস, অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে আপনাদের কি রায় তা আমি বুঝতে পারছি। কেবল কমরেড স্বাহা বোধ হয় ওঁর জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা চান। তা আমরা ওঁকে সে সুযোগ দিতে অনিচ্ছুক নই। কারণ পার্টির নেতৃত্ব তার ন্যায়বিচার ও করুণাপরায়ণতার জন্য বিখ্যাত।" দুই এক মুহূর্ত থেমে কমরেড সুকুমারের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "ইয়ং কমরেড, তোমাকে স্বীকারোক্তি পত্রের যে খসড়াটা লিখিয়ে দিয়েছিলাম, তার নকল করা হয়ে গেছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বেশ। কমরেড স্বাহা ওটা নিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দিন। ওতে যদি

উনি সই করে নিজের দোষ স্বীকার করেন, তা হলে পার্টি ওঁর সম্বন্ধে বিবেচনা করে দেখবে।”

তার পর আর সকলকে সম্বোধন করে কমরেড আহমদ বললেন, “কমরেড্‌স্‌, এ ঘরে কমরেড স্বাহাই আপাততঃ একা অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নেবার কাজ করুন। আমরা চলুন পাশের কামরায় যাব। কমরেড বিভাস মোহনপুরের খাদানে ধর্মঘট চালিয়ে যাবার জন্য যে ব্যবস্থা করেছে, তার কথা আপনারা শুনবেন। কমরেড তোমার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ তো, মূর সাহেবের জমাদার— কি যেন নাম বলেছিলে তার, তোমার প্ল্যান মত কাজ করেছে তো ?”

কমরেড বিভাস সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। মুখে বলল, “ও ঘরে চলুন, সব বলছি।”

* * *

বাইরে দমকা হাওয়ার সঙ্গে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। থেকে থেকে আকাশ বাতাস মন্দ্রিত করে একটা চাপা আর্তনাদ উঠছে— গোঁ ওঁ ওঁ, গোঁ ওঁ ওঁ। কাছেই কাদের ঘরের টিনের চালে বৃষ্টিধারার একটানা ঐকতান বাদ্য বেজে চলেছে। ঘরের জানালা থেকে অল্প দূরে একটা ঝাঁকড়া নিম গাছের ডালপালা সর্বাঙ্গ আন্দোলিত করে সর্বশক্তি প্রয়োগে বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। তার হুটোপুটির শব্দ নৈশ পরিবেশে কেমন ক্লান্ত করুণ হাহাকারের মত শোনাচ্ছে।

ঘরের ভিতর একটি পুরুষ ও একটি নারী পরস্পরের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। কৌশিকবাবুর দৃষ্টি মমির মত ভাবলেশহীন, আর স্বাহার দুই চক্ষু দিয়ে ব্যগ্র ব্যাকুলতা ঝরে পড়ছে। ওর বিষণ্ন মুখমণ্ডল, রুক্ষ অবিন্যস্ত কেশদাম এবং আয়ত চক্ষুর্দ্বয়ের করুণ দৃষ্টি— সব মিলিয়ে ওকে মূর্তিমতী বিষাদের মত মনে হয়। স্বাহা যেন একটা অতলস্পর্শী গহ্বরের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে আর ওর পদযুগলে মনের আতঙ্ক-শিহরণের ছোঁয়া লেগে থর থর করে কাঁপছে। আর এক পল মাত্র। তার পরই স্বাহার পদতলের মৃত্তিকা সরে যাবে আর একটা মর্মান্তিক আর্তনাদ তুলে ও চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাবে ঐ মৃত্যুগহ্বরের করাল জঠরে। না-না-না, সব হারানোর সেই সর্বনাশের করাল রূপ, কৌশিকবিহীন জীবনে সর্বগ্রাসী শূন্যতার ভয়াল কল্পনা সে সহ্য করতে পারবে না।

কিন্তু বিপদের সম্মুখে বুদ্ধিভ্রষ্ট হলে চলবে না। চেষ্টা করতে হবে, প্রাণপণ প্রয়াসে চেষ্টা করতে হবে। তাই স্বাহাই অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করল। একটু এগিয়ে এসে কৌশিকবাবুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে মনের উচ্ছ্বাসকে প্রবল প্রয়াসে আয়ত্ত্ব করে আন্তরিকতা ঢালা স্বরে সে বলল, "কি ভাবছ? আর চিন্তা না করে কাগজটায় সই করে দাও। তার পর আমরা সকলে মিলে কমরেড আহমদকে বলে···"

কথা শেষ করার পূর্বে কৌশিকবাবু নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন, "ওতে কি লেখা আছে জান?"

"জানি। তুমি দোষ করেছ, তাই পার্টির কাছে ক্ষমা চাইছ। পড়েই দেখ না কেন কাগজটা।"

পূর্ববৎ নিরাসক্ত ভঙ্গীতে কৌশিকবাবু বললেন, "দরকার নেই, বহুবার পড়া ওটা। পার্টির বাঁধা ধরা স্বীকারোক্তি পত্রের নকল। আমার আগে অনেককে দিয়ে সই করান হয়েছে।"

"তা হোক। তুমি অত কথার মধ্যে না গিয়ে সই করে দাও। তুমি তো রেহাই পাও আগে।" স্বাহার কণ্ঠে শুভার্থীর মিনতি ফুটে উঠল।

কৌশিকবাবু যন্ত্রবৎ বলে চলেন, "আর সই করেও তারা রেহাই পায় নি। দুদিন আগে বা পরে তাদের জাতও গেছে, পেটও ভরে নি। দৈহিক মৃত্যু তো হবেই; কিন্তু ওতে সই করার অর্থ হচ্ছে আমার রাজনৈতিক অপমৃত্যু। —না অপমৃত্যু নয়, আত্মহত্যা।"

"তা হলে?" স্বাহা যেন হতাশায় ভেঙ্গে পড়বে।

"তুমি চাও আমি এই কথা লিখিত ভাবে স্বীকার করি যে শুরু থেকেই সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিপতিদের চক্রান্তের চর হিসাবে আমি পার্টিতে যোগদান করেছিলাম এবং এ যাবৎ পার্টির নির্দেশে যা কিছু করেছি তার সবটুকুই মিথ্যা? পার্টির কোপদৃষ্টিতে পড়ে কেউ কোনদিন বাঁচে নি স্বাহা। কিন্তু তা বলে আমাকে নিজের হাতে নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করতে বলো না। এ মিথ্যা—প্রচণ্ড মিথ্যা।"

বাইরে চোখ-ঝলসান বিদ্যুৎ চমকে উঠল। তার পর গুড় গুড় গুড় গুড় শব্দে মেঘডম্বরুর স্তনন দিগ্বিদিক মন্দ্রিত করে গর্জন করতে লাগল। বাতাসের রুদ্ধ হুংকার আর বৃষ্টির একটানা শব্দ সমান ভাবে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে।

বাহ্য প্রকৃতির উদ্দামতার ছোঁয়া লেগেছে স্বাহার মনেও। বোঝাপড়া

—শেষ বোঝাপড়া করে নিতে হবে আজ। আজকের এই রাত্রি, তাই বা কেন, আর কয়েক মুহূর্ত অতিক্রান্ত হলে আর সময় পাওয়া যাবে না। হয় আজ এই মুহূর্তে, নচেৎ কোন দিনও নয়।

আবার কিছুক্ষণ দুজনে নীরব থাকার পর শুষ্ক কণ্ঠে স্বাহা অবশেষে বলল, "কিন্তু সবটাই কি মিথ্যা? ঐ মিস মূরের সঙ্গে তোমার···?"

কৌশিকবাবু কোন কথা না বলে মাথা নাড়লেন।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে স্বাহা বলল, "তা হলে তুমি বলছ ওঁর সঙ্গে মেলামেশা কর নি? ওঁর গাড়িতে চড়ে ঘোরো নি? ওঁর সঙ্গে বহুক্ষণ একত্র থাক নি এবং ওঁকে একথা বল নি যে আমার জীবন আপনার এবং আপনার জীবন আমার? বল—বল—বল! চুপ করে থেকো না।" অধীর উত্তেজনায় স্বাহার মূর্তি উগ্র হয়ে উঠেছে। দুই হাতে কৌশিকবাবুর হাত দুটি ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল সে। ওর উত্তেজিত মুখমণ্ডলের চতুর্দিকে এক রাশ এলোমেলো কাল চুল দুরন্ত হাওয়ায় উড়ছে।

স্বাহার বিস্ফারিত নাসারন্ধ্রের উষ্ণ শ্বাসপ্রশ্বাস চোখেমুখে পড়ছে। দশটি অঙ্গুলি দিয়ে সজোরে সে কৌশিকবাবুর হাত ধরে আছে। কৌশিকবাবু অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন। সেই সার্চলাইটের মত চোখ দুটি দিয়ে বুঝি ওর মনের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিলেন একবার। তার পর পূর্ববৎ শান্ত স্বরে বললেন, "ঘটনাগুলো সত্য; কিন্তু তার যে ব্যাখ্যা তোমরা করছ, তা ভিত্তিহীন।"

উত্তেজিত স্বাহা তেমনি তীব্র কণ্ঠে বলল, "আচ্ছা তা-ই না হয় হল। কিন্তু তুমি কথা দাও আর কখনও মিস মূরের সঙ্গে মেলামেশা করবে না, আর কখনও ওর সঙ্গে দেখা করবে না। বল—চুপ করে থেকো না, কথা দাও আমাকে।" কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় সম্বিৎশূন্য স্বাহা দুই হাতে কৌশিকের দুই কাঁধ ধরে তাঁকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে লাগল। এর জবাবের উপর স্বাহার জীবন মরণ নির্ভর করছে। উত্তর যদি সন্তোষজনক হয়, তা হলে পার্টির কমরেডদের হাতে পায়ে ধরে স্বাহা কৌশিকবাবুর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে নেবে। স্বাহা এখনও আশা রাখে—পাবে, পাবে, নিশ্চয় পার্টির দয়া পাবে তারা।

কাছাকাছি দুটি মুখ। স্বাহার অন্তরে যে ঝটিকা-প্রবাহ বয়ে চলেছে তার প্রভাব পড়েছে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এবং ওর উন্মত্ত আচরণে। থর থর কম্পিত হস্তে সে কৌশিকবাবুর দুই কাঁধ

ধরে নিজের উত্তাল বক্ষের কাছে আকর্ষণ করে তাঁর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সুদীর্ঘ দিন একান্ত সংগোপনে মনের নিভৃত মণিকোঠায় যে কামনা বাসনা, যে ইচ্ছা ও আকুতি সে এত যত্নে লুকিয়ে রেখেছিল, তিলে তিলে তিলোত্তমা সৃষ্টির মত শয়নে স্বপনে জাগরণে যাকে সে আপনার মনের মাধুরী দিয়ে এত দিন একান্তে বসে একটু একটু করে গড়েছে, আজকের এই প্রচণ্ড প্রভঞ্জনের দুরন্ত আঘাতে তা বুঝি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। ওর মনের সাতমহলা প্রবাল প্রাসাদের ভিত্তিমূল এলোমেলো হয়ে তার প্রতিটি অণু-পরমাণু বুঝি ক্ষেপা হাওয়ার আকর্ষণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়বে। এ ক্ষতি সহ্য করার শক্তি স্বাহার নেই, কারণ স্বাহা বাঁচতে চায়। তাই এ অঙ্গীকার স্বাহাকে আজ পেতেই হবে। এর সঙ্গে ওর জীবন মৃত্যু জড়িয়ে রয়েছে। যাকে অবলম্বন করে তার বিপ্লবী জীবন, যার জন্যে সে পার্টিকে পেয়েছে, তাকে সে কোন মতেই হারাতে পারে না। না—না—না, কিছুতেই না।

আর কৌশিকবাবু কি দেখছিলেন? ঐ বিস্ফারিত দৃষ্টির অন্তরালে, ঐ কজ্জলবর্ণ অক্ষি-তারকা দুটির পিছনে লুকিয়ে রাখা কামনা কি তাঁর চোখে পড়েছে? বেপথুমতী স্বাহার দশ অঙ্গুলির কম্পন কি তাঁর মনে কোন শিহরণ জাগাচ্ছে? ঐ যে উত্তেজনায় অধীর বক্ষ ও ঈষৎ বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র নিঃসারিত উষ্ণ শ্বাস, সে কি তাঁর হৃদয়ে কোন স্পন্দন তুলেছে? না। কৌশিকবাবুর সম্মুখে স্বাহা নেই। আছে একটি চির নিঃসঙ্গ মহিলার আকৃতি যে কারও উপর জোর করে কোন অধিকার খাটাতে পারে না। ওঁর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রয়েছে একটি গৌরবর্ণ মুখারবিন্দ যার নীল চক্ষে অতলান্তিক সাগরের অতলস্পর্শী বিষণ্ণতা। বব্ করা ঈষৎ রক্তিমাভ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ স্কন্ধোপরি বিলম্বিত। টানা টানা অক্ষিপল্লব, তার নীচে টিকলো নাকটি। রক্তবর্ণ গণ্ডের টোল দুটি বিচিত্র দর্শন। হাসলেই মনে হয় যেন এক জোড়া খঞ্জনা নেচে উঠল। কিন্তু সেই বিরল হাস্যও বিষণ্ণতায় বিধুর। আর সেই নাম না জানা মৃদু সুরভি, যার গন্ধে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এক মধুরাবেশে ঝিম্ ঝিম্ করে উঠে। ঐ চিরবঞ্চিতা রিক্তা মহিলার, ঐ সরল নিরপরাধ নিষ্পাপ বিদেশিনীর আকস্মিক সংসর্গও পরিত্যাজ্য হবে কেন?

"বল, কথা দাও আমাকে।" অধীর আগ্রহে স্বাহা তাঁর দুই কাঁধ ধরে আবার ঝাঁকুনি দিল।

কৌশিকবাবু স্বপ্নোত্থিতের মত মৃদু কণ্ঠে বললেন, "কেন ?"

এক নিমেষে স্বাহার মুখমণ্ডলে কে যেন এক পোঁচ কালি লেপে দিল। চেহারায় যে ব্যগ্র ব্যাকুলতার ভাব ছিল, তার স্থান নিল তীব্র ক্রোধ ও ঘৃণা। মনের সমস্ত আক্রোশ যেন ওর আয়ত চক্ষু দুটিতে একত্র হয়ে প্রলয়ঙ্কর রুদ্রের তৃতীয় নেত্রের মত ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল। তীব্র ব্যঙ্গ মিশ্রিত স্বরে সে বলল, "কেন—এত দিন পর কেন ?" বলতে বলতে এক ঝটকায় সে কৌশিকবাবুকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

পদদলিতা ফণিনীর মত বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে হিস্ হিস্ করে সে বলল, "ভুলে গিয়েছিলাম—তুমিও অনন্তের মত পুরুষ যে। তোমাদের জাতটাই বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক।" দাঁতে দাঁত চেপে কথা কটি উচ্চারণ করে সে তীব্র বেগে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

ঝনাৎ ঝন্। ঘরের দরজায় বাইরে থেকে শিকল দেবার শব্দে কৌশিকবাবু সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তা হলে তিনি এখন বন্দী। এবার নাটকের পঞ্চমাঙ্কের শেষ দৃশ্যের অভিনয়ই কেবল বাকী !

কৌশিকবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তার পর কি যেন কি ভেবে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ বোঝা সত্ত্বেও কি জানি কেন ভিতর থেকে দরজায় সজোরে চাপ দিলেন। একবার—দুবার—তিনবার। কৌশিকবাবু বুঝতে পারলেন দরজা ভেঙ্গে বাইরে যাবার শক্তি তাঁর নেই। হতাশার পাণ্ডুর হাস্য ফুটে উঠল তাঁর অধরোষ্ঠে।

আবার তিনি পদচারণা শুরু করলেন। দরজার ঠিক বিপরীত দিকেই একটি জানালা। কৌশিকবাবু তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাইরে তখনও ঝড়-বৃষ্টির দাপাদাপি মাতামাতি সমান তালে চলেছে। সামনের শাখা-প্রশাখা ও পত্রবহুল নিম গাছটা কৌশিকবাবুর মতই যেন তার সর্বস্ব হারিয়েছে। তাই আকুলি-বিকুলি করে ওর কান্না ও বুকফাটা হাহাকার। থেকে থেকে নভোমণ্ডলে ঈশানের গুরুগম্ভীর বিষাণ বেজে উঠছে এবং তারই ইঙ্গিতে ভূতনাথের অযুত সহস্র অনুচরেরা কোটি কোটি করে প্রলয়ঙ্কর তালি দিয়ে হুংকার ছাড়তে ছাড়তে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ছে। ওদের ধ্বংস-পাগল ফেনিল হাস্যের রেশ সুদূর মেঘলোক থেকে ধরাপৃষ্ঠে এসে প্রতিধ্বনিত

হচ্ছে। কল কল, কল কল করে কাছেই কোথাও ঐ যে জলের নালায় বৃষ্টির জলস্রোত বয়ে চলেছে, ওতেই বুঝি মহেশানুচর রক্ষ যক্ষ ভূত প্রেত গন্ধর্ব কিন্নর দলের খল খল হাস্যের স্পর্শ লেগেছে।

কৌশিকবাবু দীর্ঘশ্বাস মোচন করে ঘরের দিকে মুখ ফেরালেন। ধূম উদ্গীরণ করার ফলে ছোট লণ্ঠনটায় এখন আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশী হচ্ছে। আর একবার হাসি পেল কৌশিকবাবুর। তাঁর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কের শরণ নরসিংহগড়ের এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠটিতে বুঝি তাঁর ভবিষ্যতেরই প্রতিচ্ছবি—এর বাইরে ভিতরে মসীকৃষ্ণ অন্ধকার। অন্যমনস্ক ভাবে কৌশিকবাবু ক্ষুদ্র কামরার ভিতর পায়চারি করতে লাগলেন।

লম্বায় দশ কদম এবং চওড়াতে আরও একটু কম হবে। কী ছোট্ট ঘরটি! হাঁটা শুরু করতে না করতেই ফুরিয়ে যায় এবং মুহূর্তেই অপর দিকের দেওয়ালের সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। এ যেন জীবন থেকে মৃত্যুর ঘাটে উত্তরণ। মাঝের এই দশ কদম জায়গা পৃথিবীতে অস্তিত্বের অবধি। এইটুকুর জন্য কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, কত পরিকল্পনা! সব পরিকল্পনার সমাধি চক্ষের নিমেষে হয়ে যায় অপর দিকের দেওয়ালের সামনে উপস্থিত হওয়া মাত্র। কিন্তু না, তিনি বড় বেশী ফিলজফিক্যাল হয়ে যাচ্ছেন। এরই নাম তো শ্মশান বৈরাগ্য। এই মেকী দার্শনিকতা তাঁর পোষাবে না। এত দিনের বিশ্বাস ও কর্মে এর স্থান ছিল না। অতএব ও চিন্তা যাক।

কোমরের উপর এক হাত ফেলে অপর হাত দিয়ে সেই হাতের কব্জি ধরে পদচারণা করতে করতে তিনি আবার চিন্তা-সমুদ্রে ডুবে গেলেন। মাস্টারদার প্রেরণায় চট্টগ্রামের অস্ত্রাগারে ও জালালাবাদ পাহাড়ের জীবন-মরণ সংগ্রামে যে তরুণ প্রাণের স্ফুলিঙ্গটি একদা জ্বলে উঠেছিল, আন্দামানের সেলুলার জেলের প্রস্তর প্রকোষ্ঠে যা বিকশিত হয়ে একটা নিশ্চিত আকার ধারণ করেছিল, ধলভূমের রাঙা মাটির বন্ধুর প্রান্তরে এবার তার শেষ পরিণতি দেখা দেবে। দিক, ক্ষতি নেই তাতে। আজ না হয় কাল এ পরিণাম তো সবারই হবে। তা হলে চিন্তা কিসের? কিসের—হ্যাঁ শেষ দৃশ্যটা এমন বিয়োগান্তক হল কেন? লক্ষ্য তো এ ছিল না। নূতন সমাজ, নবীন পৃথিবী রচনা করার জন্যই তো তিনি জীবনোৎসর্গ করেছিলেন এবং জ্ঞান বিশ্বাস মত আজ পর্যন্ত সেই লক্ষ্যের সাধনাতেই জীবনের প্রতিটি

মুহূর্তকে আহুতি দিয়ে এসেছেন। তবে—তবে কেন এই পরিণাম? কোথায় ভুল হল তাঁর, এমন মারাত্মক ভ্রান্তি?

লক্ষ্য জ্যামিতির বিন্দুর মত, যার সংজ্ঞা থাকলেও বাস্তবে কোন দিন তাকে রূপায়িত করা যায় না। তাই লক্ষ্য শুদ্ধ হলেও যদি তার পরিপূর্তির পন্থা সৎ না হয়, তা হলে বিপত্তি অনিবার্য। কারণ মহৎ লক্ষ্যে উপনীত হবার মাধ্যম যদি অনুচিত হয়, তা হলে লক্ষ্য তো যাবেই, নগদ লাভ হবে অন্যায় পন্থা। —কে, কে বলছে এ কথা? কৌশিকবাবু চমকে উঠলেন। নির্জন ঘরে তিনি বই দ্বিতীয় কোন প্রাণী তো নেই। একটি শ্যামলবর্ণ খর্বকায় মানুষের হাসি হাসি মুখ তাঁর মনের পটে ভেসে উঠল। ওঃ, মনে মনে তিনি নিজেই ভোলানাথবাবুর কথা আওড়াচ্ছিলেন।

ভোলানাথবাবু বলতেন, দেখুন আদর্শ চির দিনই অপ্রাপ্ত থেকে যায়। এ অনেকটা পাহাড়ে ওঠার মত। অনেক কষ্টে একটি শিখরে উঠে ভাবলেন এইবার বুঝি সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠেছেন; কিন্তু সেই শিখর থেকে চতুর্দিকে তাকালে দেখতে পাবেন অপর একটি উচ্চতর চূড়া ধরণীর বক্ষভেদ করে গগনাভিমুখে মস্তক উত্তোলন করে আপনাকে হাতছানি দিচ্ছে। সুতরাং পন্থা সৎ হওয়া চাই। তা না হলে অধ্রুব মরীচিকার লোভে ধ্রুবকে হারাতে হবে—মানবসমাজ কোন দিনই সুখ শান্তি পাবে না। একটু থেমে ভোলানাথবাবু আরও জোর দিয়ে বলতেন, এই আগামী কালের মোহচক্রের মায়ায় ফেলে অর্থাৎ পরলোকের লোভ দেখিয়ে মধ্যযুগে ধর্মধ্বজরা অনেক কুসংস্কার মূলক কাজ করিয়ে নিয়েছেন। আর আধুনিক যুগের নবীনতম কুসংস্কার—প্রগতির মরীচিকা সামনে ঝুলিয়ে রেখে এ কালের রাজনীতি-বাজরা চির অলব্ধ আগামী কালের সুখসমৃদ্ধির লোভে আজকের দিনটি অত্যাচার অবিচার ও সর্ববিধ শোষণের দ্বারা কলঙ্কিত করছেন। আর কত দিন মানুষ এই আধুনিক প্রতারণায় প্রবঞ্চিত হবে? জ্বলজ্বলে চোখের দৃষ্টি দিয়ে কৌশিকবাবুকে যেন অভিভূত করে ফেলতেন ভোলানাথবাবু।

এত দিনে মনে হচ্ছে যে ভোলানাথবাবু যেন ঠিকই বলেছিলেন। এই যে গোপন ষড়যন্ত্র ও হিংসা ইত্যাদির বলে বলীয়ান হয়ে যে সব কমরেড সর্বহারাদের প্রতিনিধি স্বরূপ ক্ষমতা দখল করবে, শাসনদণ্ড হাতে আসা মাত্র কোন্ জাদুমন্ত্র প্রভাবে তারা ন্যায়বিচারের প্রতিমূর্তি হয়ে যাবে? যে অস্ত্রের সহায়তায় তারা ক্ষমতাধিরূঢ় হবে, ক্ষমতা বজায় রাখতে ও তার সঞ্চালন করার জন্য স্বভাবতই তাদের এত দিনের অনুশীলনের ফলে অধিগত সেই ষড়যন্ত্র

ও হিংসার শরণ নিতে হবে। আর তার পরিণাম হচ্ছে চিরকালীন হিংসার রাজত্ব। পার্টি সংগঠনের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে কৌশিকবাবুর নিজের উপর আজ যে আচরণ হল, রাষ্ট্র ও সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তার ব্যাপকতর প্রয়োগ হবে। ভোলানাথবাবু ঠিকই বলতেন যে যুক্তি দিয়ে দুই আর দুই-এ পাঁচ প্রমাণ করা গেলেও বাস্তব পৃথিবীতে নিম গাছের বীজ পুঁতলে সেই গাছে কোন দিনই আম ফলবে না। লক্ষ্য ও পন্থা সত্য সত্যই একেবারে অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার।

কুলাক নিধন, ট্রটস্কি বিতাড়ন ও ঝিনভিয়েভ, ক্যামেনোভ, বুখারিন ইত্যাদির পার্জিং এবার যেন কৌশিকবাবুর কাছে সত্য স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যে পন্থায় জারের রাজত্বের অবসান করা হয়েছিল, ও সবই তার তর্কসঙ্গত পরিণতি। একটিকে অপর ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। আর একটি কথা। আগামী কাল সম্বন্ধে ট্রটস্কি ও ঝিনোভিয়েভরা স্ট্যালিনের মত মোহগ্রস্ত হযে থাকতে অনিচ্ছুক হবার জন্য ওদের বলির পাঁঠা বানান হয়েছে। হিটলার কর্তৃক সব বিষয়ে ইহুদীদের দায়ী করা, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গপ্রেমী সরকারের বর্ণ বিদ্বেষ এবং ঐ সব পার্জিং তো একই মনোভাবপ্রসূত। যারা আমাদের স্বপ্নের নেশায় বুঁদ হয়ে বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিতে অস্বীকার করবে, তাদের এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও। কোন সন্দেহ নেই এতে। নচেৎ বিপ্লবের এই দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর পর দফায় দফায় এত বার এত প্রচণ্ড পার্জিং করা সত্ত্বেও এখনও সেই "স্বাধীন ও সমানাধিকারবিশিষ্ট নাগরিকদের সমাজ"-এর লক্ষ্যে উপনীত হওয়া গেল না কেন? এমন একছত্রাধিপত্য দ্বারা নিজ মনোমত লক্ষ্যের রূপায়নের সুবর্ণ সুযোগ ইতিহাসে আর কে পেয়েছে? এত দিন পরও থেকে থেকে অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবীদের ঘাড়ে সব দোষ চাপানর প্রয়োজন ঘটে কেন?

ওদের স্বীকারোক্তির মূল্য কৌশিকবাবু জানেন। তাঁকেও তো ঐ রকম স্বীকারোক্তিতে সই করতে বলা হয়েছিল। স্বীকারোক্তি! কৌশিকবাবু পায়চারি করতে করতেই হাতের কাগজটিকে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে মুঠিতে দলা পাকিয়ে ঘরের কোণের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সব পূর্ব থেকে তৈরী করা সাজান ব্যাপার। মানুষকে প্রতারিত করার কত ছলই না হতে পারে। নিজের দীর্ঘ পার্টি জীবনে কৌশিকবাবু স্বয়ং একাধিকবার এই স্বীকারোক্তি পর্ব দেখেছেন। সব স্বীকারোক্তির রহস্য আজ তাঁর কাছে ফাঁস হয়ে গেছে। ওতে আর আস্থা নেই তাঁর।

কিন্তু এ সব কথা বুঝতে এত দিন লাগল কেন? পার্টি এবং তার কমরেডদের সঙ্গে দীর্ঘ দিন এমন ওতপ্রোত থাকার পরও এবং এই জাতীয় আরও ঘটনা দেখা সত্ত্বেও আজকের মত জিজ্ঞাসা কেন তাঁর মনে জাগে নি? বড় বিচিত্র প্রশ্ন। অকস্মাৎ কৌশিকবাবুর বহু দিন পূর্বে পড়া বার্নাড শ-এর একটি চরিত্রের উক্তির কথা মনে পড়ে গেল। সেণ্ট জোয়ান নাটকের শেষ দৃশ্যে ফ্রান্সের রাজা সপ্তম চার্লসের স্বপ্নে মৃতাত্মারা সবাই আবার একত্র হয়েছেন। জোয়ানের উপর ডাইনীর অভিযোগ চাপিয়ে তাকে হত্যা করার ব্যাপারে এক জন প্রধান নায়ক উইনচেস্টারের কার্ডিন্যালের চ্যাপলিন দ্য স্টগম্বারের প্রেতাত্মা ঐ ঘটনা সম্বন্ধে আত্মগ্লানি ভরে বলছেন, "দেখুন আমি একবার একটা খুব নিষ্ঠুর কাজ করেছিলাম। কারণ নিষ্ঠুরতা যে ঠিক কি রকম তা আমি তখন জানতাম না। আমি এর পূর্বে নিষ্ঠুরতা দেখি নি কি না, তাই। এ একটা বড় কথা; নিজে না দেখলে সঠিক অভিজ্ঞতা হয় না। আর এই অভিজ্ঞতা বিনা প্রায়শ্চিত্ত বা মুক্তি কিছুই হয় না।" এক জন বলছেন, "আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যে বেদনা ও জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন. তা কি আপনার কাছে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা বলে মনে হয় নি?" দ্য স্টগম্বার উত্তর দিচ্ছেন, "না-না, মোটেই না। ছবিতে যীশুর ঐ সব দৃশ্য দেখে এবং বই-এ পাঠ করে মনে হয়েছিল বটে যে আমার ভিতর খ্রীষ্টের ঐ দুঃখবরণ প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এর কোন মূল্য ছিল না। তাই বলছি প্রভু খ্রীষ্ট আমাকে উদ্ধার করেন নি। আমার মুক্তিদাত্রী হচ্ছে একটি তরুণী যাকে আমি চোখের সামনে জীবন্ত পোড়াতে দেখেছিলাম। সে দৃশ্য ভয়ঙ্কর, উঃ অতীব ভয়ঙ্কর। কিন্তু তার জন্যেই আমি মুক্তি পেয়েছি।..."

পদচারণা করতে করতে কৌশিকবাবু ভাবলেন যে জোয়ানকে দগ্ধ করার দৃশ্য দেখে দ্য স্টগম্বারের মত ভণ্ডেরও মতি পরিবর্তন হয়েছিল; কিন্তু তাঁর অনুভূতি এত স্থূল যে ইতিপূর্বে পার্টির বহু কমরেডকে এই ভাবে পার্জ করতে দেখেও তাঁর জ্ঞানোদয় হয় নি, হল অবশেষে আজ যখন ঐ বিপদ প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁর উপর সওয়ার হয়েছে। ছবিতে দেখা বা বই-এ পড়া তো বহু দূরের কথা, অপরের উপর অনুষ্ঠিত হতে দেখাও যথার্থ অভিজ্ঞতার পক্ষে গৌণ সাধন। এর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সাবজেক্টিভ নলেজ, যার স্বাদ আজ তিনি কটু ভাবে পেলেন।

বড় বেশী অবজেক্টিভিটির শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তাঁদের। তারই

দুষ্পরিণাম এ। আজ স্বয়ং ঐ গোপন ষড়যন্ত্র ও হিংসার শিকার হবার পর অর্থাৎ তাঁর ভিতর সাবজেক্টিভিটি জাগায় তিনি এই সত্য বুঝতে পারছেন। অবজেক্টিভিটি একমাত্র সত্য নয়, আজ তিনি উপলব্ধি করছেন যে ক্ষেত্র-বিশেষে সাবজেক্টিভিটিও সমান সত্য। অপরের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা কখনও তার আচার-ব্যবহার বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করেন নি। নিজেদের আদর্শবাদের বাঁধা ধরা মাপদণ্ডে মেপে যাকেই ন্যূন বলে ভেবেছেন, তারই বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করা হয়েছে। সত্যের একচেটিয়া অধিকার আছে মনে করে তাঁরা অপরের দৃষ্টিকোণের মূল্য বোঝার চেষ্টা করেন নি কোন দিন। আর আজ তিনি স্বয়ং যখন ঐ অন্ধ দলীয় "সত্যের" শিকার হয়েছেন, তখনই পূর্বোক্ত পদ্ধতির ভ্রান্তি ধরা পড়েছে! নিয়তির চমৎকার পরিহাস এ। কিন্তু এর চেয়েও বোধ হয় বড় ব্যঙ্গ এই যে তাঁর জীবনমূল্যে লব্ধ এই সত্য পার্টির কোন কমরেড ভবিষ্যতে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করবে না। পার্টি কমরেডদের বিশিষ্ট মানসিকতার জন্য রেনেগেডদের অপপ্রচার রূপেই তাঁর অভিজ্ঞতা হয়তো ধিকৃত হবে।

কৌশিকবাবু আত্মানুসন্ধানে একেবারে মগ্ন হয়ে অধীর ভাবে দ্রুতপদে প্রকোষ্ঠটি পরিক্রমা করতে থাকেন। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত অবিরাম পদচারণা করতে করতে তিনি চিন্তার জাল বুনে চলেন। জোয়ানকে তাঁর যুগ ডাইনী বলে বিশ্বাস করলেও পরে তাঁর সত্য পরিচয় প্রকট হয় ও এমন কি ইংলণ্ডের গীর্জাও তাঁর সেণ্ট অভিধা স্বীকার করে নেয়। সমসাময়িক কাল ও সমকালীন গোষ্ঠীর বিচারই যদি অভ্রান্ত হত তা হলে সক্রেটিস, যীশু ইত্যাদির প্রতি ন্যায়বিচার করা হয়েছিল বলতে হয়।

কৌশিকবাবু বুঝতে পারছেন যে বর্তমান কালের চেয়েও বড়, অধিকতর সত্য আর একটা কাল আছে এবং আসলে তার মানদণ্ডেই ইতিহাসের রায় ঘোষিত হয়। সব কিছুকে সমসাময়িকতার মানদণ্ডে মেপে ফতোয়া জারী করা উচিত নয়। মার্কস তাঁর সময়কার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন বলে যদি তাঁকে হত্যা করা হত, লেনিন ও স্ট্যালিনকে যদি জারের সরকার পরবর্তী কমিউনিস্ট সরকারের আদর্শে ফাঁসি দিত, তা হলে দুনিয়ার কোন লাভ হত কি? অথচ তাঁদের পার্টির বিচারের মানদণ্ডে ক্ষমতাধিরূঢ় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাঁদের সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ করা তো মৃত্যুদণ্ড আমন্ত্রণ করার সমতুল্য। কৌশিকবাবুর সমগ্র সত্তা মথিত করে কে যেন উচ্চ-কণ্ঠে বলে উঠল— ভুল ভুল, প্রচণ্ড ভুল এ। সমসাময়িক কাল ও সে যুগের

নায়কদের ভুল হতে পারে, যেমন তাঁর নিজের বেলায় আজ পার্টির হয়েছে এবং অতীতে অন্যান্য অনেকের ক্ষেত্রেও যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কিন্তু তা বলে তাদের কণ্ঠ চিরতরে নীরব করে দেবার অধিকার কারও নেই এবং এতে যে আদর্শ সাধন করার জন্য পার্টির জন্ম, তারও পরিপুষ্টি হয় না। সক্রেটিস যীশুরই মত ভবিষ্যতে কোন দিন দেখা যাবে যে তদানীন্তন ক্ষমতাধীশদেরই ভুল হয়েছিল এবং শাস্তিপ্রাপ্ত বিরোধীদের বক্তব্যই ছিল সত্য।

অতএব মতবিরোধের জন্য, ভিন্ন পন্থা গ্রহণের জন্য কাউকে হত্যা করা উচিত নয়। থেকে থেকে কৌশিকবাবুর অন্তরাত্মা যেন কম্বু কণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগল— মা হিংসী, মা হিংসী— পৃথ্বিং মা হিংসী। বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের মুষ্টি দিয়ে আঘাত করতে করতে তার তালে তালে আপন মনে তিনি উচ্চারণ করতে লাগলেন, "মা হিংসী, মা হিংসী।"

কৌশিকবাবুর মনে আজ বহিপ্রর্কৃতির প্রলয়ঙ্করী রূপের ছোঁয়া লেগেছে। আর তারই তাড়নায় তাঁর বহু দিবসের সযত্নলালিত বহু বিশ্বাসের ভিত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। মনের ভিতর থেকে থেকে যেন একটা দুরন্ত আগ্নেয়গিরি প্রবল বেগে অগ্ন্যুৎগার করে চলেছে। পম্পাই নগরীর শেষ দিনের মত তাঁর মনোরাজ্যের অবস্থা।

যন্ত্রচালিতের মত ক্ষিপ্রবেগে ঘরটির মধ্যে পদচারণা করতে করতে আজ তিনি বহু সত্যের সম্মুখীন হচ্ছেন—না, সম্মুখীন হচ্ছেন বলা সমীচীন নয়, বহু সত্য তাঁর ভিতর উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সত্য এই যে সত্য অনন্ত, তার বিস্তার অসীম। তাই সীমাবদ্ধ মানুষের সীমিত জ্ঞান বুদ্ধি অনুভূতি বা চেতনা দিয়ে পূর্ণ সত্য উপলব্ধি করা যায় না। মানুষের সীমাবদ্ধ সত্তা অনন্ত ও সর্বব্যাপী সত্যকে খণ্ড খণ্ড করে গ্রহণ করে এবং তাই মানুষের বোধে যার ছাপ পড়ে তা পরিপূর্ণ সত্য নয়, সত্যের অংশ মাত্র। এই অংশকে পূর্ণ মনে করে চললে, পূর্ণতা প্রাপ্তির অলীক অহঙ্কারে মত্ত হয়ে অন্ধবৎ আচরণ করলে তার ভ্রান্ত পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। এই ভ্রান্তির আধুনিকতম নিদর্শন হচ্ছে তাঁদের ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা আর ডিটারমিনিজ্‌ম্‌। হ্যাঁ, এ কথা স্বীকার করতে আজ তাঁর কোন রকম দুর্বলতা নেই যে তাঁদের নিত্যকার জপমন্ত্র, বিশ্বের তাবৎ কার্যকারণের গতি-প্রকৃতির নিয়ামক ঐ দুই বিদ্যা এক ভ্রমাত্মক বিশ্বাস—এদের আধুনিক কুসংস্কার বলাও অন্যায় হবে না। এই কুসংস্কার ও কুযুক্তিকে নির্বিচারে মেনে নিয়ে এর ভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে

কার্যকরী করার জন্য লেগে পড়া তো এক সঙ্গে দুটো ভুল করা। কৌশিকবাবু সৌভাগ্যবান যে দেখিতে হলেও তাঁর মোহনিদ্রা ভেঙ্গেছে। মুক্তি হয়তো তাঁর কপালে নেই। অজ্ঞ সহকর্মীদের অন্ধ বিচারের পদতলেই হয়তো তাঁর মৃত্যু হবে। তা হক। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই সান্ত্বনা নিয়ে যেতে পারবেন যে কোন কুসংস্কার মনে নিয়ে তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয় নি। জীবনে-মরণে তিনি র‍্যাশনাল ছিলেন।

ওঃ, কত অভিজ্ঞতাই না ভবিষ্যৎ নিজ গর্ভে গোপন করে রেখেছিল। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অনবদ্য অভিজ্ঞতা, তাঁর সত্তামূল পর্যন্ত বিস্রস্ত করে দেবার মত শক্তিশালী অযুত অভিজ্ঞতা। কৌশিকবাবু জানালার কাছে এক লহমার জন্য থমকে দাঁড়ান। বাতাস তেমনি প্রমত্ত হুংকার ছাড়ছে, মসীকৃষ্ণ আকাশ থেকে মুষলধারায় বর্ষণ হচ্ছে। বিশ্বচরাচরে যেন একটা ওলট-পালট হয়ে যাবে আজ এই রাত্রেই। তাঁর জীবন-নাট্যের মত পৃথিবীরও কি আজ অন্তিম দিবস নাকি?

কৌশিকবাবুর মনের ভিতর আবার চিন্তার লহরী উত্তাল হয়ে উঠল। ডিটারমিনিজ্‌ম্ যদি আংশিক সত্য আধারিত হবার জন্য ভ্রান্ত হয় এবং তার এক মৌলিক অঙ্গ শ্রেণীসংগ্রাম যদি অসত্য হয়, তা হলে সত্য কি? কিন্তু— কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামও কি মিথ্যা? নিশ্চয়, এতে সন্দেহ কি? কৌশিকবাবুর বিশ্লেষণী মন অবরোহী পদ্ধতিতে যুক্তির সোপান খাড়া করতে থাকে। বিভিন্ন প্রজাতির ভিতর সংগ্রাম থাকলেও একই প্রজাতি অর্থাৎ মানুষের ইতিহাস কি নিছক শ্রেণীসংগ্রামেরই প্রতিফলন? তা ছাড়া শ্রেণীর স্বরূপ তো অদ্যাবধি স্পষ্ট ভাবে নির্ধারিত হয় নি। আর তর্কের খাতিরে এ কথা যদি স্বীকারও করে নেওয়া যায় তা হলে প্রশ্ন থাকে এই যে ধরণীর বক্ষ থেকে অমিতবলশালী ডাইনোসর টিরানোসারাস ইত্যাদি প্রাগৈতিহাসিক জীবের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যারা সংগ্রামে দুর্ধর্ষ ছিল। কিন্তু সুসংবদ্ধ ভাবে টিকে আছে ক্ষুদ্রকায় মানুষ থেকে শুরু করে উই পিঁপড়ে ও মৌমাছির দল। কেন এমন হল? পারস্পরিক সহযোগিতা কি এর একটা অন্যতম কারণ নয়? তা ছাড়া সভ্যতার মূলাধার যদি সমাজ হয়, তা হলে নিশ্চয় এ কথা বলা চলে যে সমাজেরও আধারশিলা হচ্ছে সহযোগিতা। পারস্পরিক আদান-প্রদানের বদলে কেবল সংগ্রামই যদি একমাত্র প্রেরক-শক্তি হত, তা হলে মানুষ এবং ঐ সব জীব সমাজবদ্ধ প্রাণীরূপে ধরাতলে বিচরণ না করে অতীতের ম্যামথদের মতই আজ গবেষণার বস্তু হত।

আর একটা কথা। এই মানুষও একদা নরমাংসভোজী ছিল। সময়-বিশেষে সন্তান পালন করার পরিবর্তে আত্মজ দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা তার কাছে ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। ঐ মানুষই ধীরে ধীরে পরিবার গড়ে পরিবারের এলাকা থেকে সংগ্রাম হিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বিসর্জন দিল। হিংসাকে বর্জন করার এই এলাকা ক্রমশই বাড়তে লাগল। পরিবার থেকে গোষ্ঠী, তার পর সম্প্রদায়, জাতি রাষ্ট্র এবং আজ তো মানুষ বিশ্বমানবতার পূজারী হয়েছে। আদিম মানবের হিংসাবৃত্তির সঙ্গে সূক্ষ্ম ভাবে বীজাকারে অহিংসা-বৃত্তিও নিশ্চয় তাদের মধ্যে ছিল, যা ক্রমশঃ বিকশিত হচ্ছে। আর ঐ সঙ্গে সঙ্গে হিংসাবৃত্তিও জঙ্গলের বিধান রূপে ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হচ্ছে। অহিংসার একটা সচেতন বিকাশধারা মানবজাতির ইতিহাসের মধ্যে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। তাই আজ যুদ্ধ ও হিংসাকে রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধের এলাকা থেকেও বর্জন করার প্রয়াস চলেছে। এটা কিসের লক্ষণ? আর বৃহৎ বৃহৎ বিশ্বসমস্যার সমাধানের জন্য যদি যুদ্ধ বর্জনীয় হয় তবে রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য শ্রেণী সংগ্রামের ধুয়া ভ্রান্ত না হলেও অন্ততঃ অযৌক্তিক ও অবাঞ্ছনীয় নয় কি? মানুষের প্রগতি ও বিকাশের সঙ্গে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের তো কোন সম্বন্ধ নেই, বরং এরা পরস্পরবিরোধী।

তা হলে সত্য কি? সত্য হচ্ছে—মা হিংসী। হ্যাঁ, নূতন সমাজ গড়ার জন্য, সাম্যের রাজত্ব আনয়নের জন্যও হিংসার শরণ নেওয়া চলবে না। সত্যি কথা বলতে কি হিংসার পথে নববিধান কোন দিনই স্থাপিত হয় না, পুরাতনই কেবল বেশ পরিবর্তন করে উপস্থিত হয়। তাই মা হিংসী, যার অপর নাম প্রেম বা ভালবাসা। ভালবাস—সবাইকে ভালবাস। এই বিশ্বচরাচরের মানব মানবেতর, জড় চেতন—সকল বস্তু ও প্রাণীকে হৃদয়ের প্রেম-প্রবাহে পরিপ্লুত করে দাও। প্রেমের পরিধিকে বাড়িয়ে চল, আর হিংসার পরিধিকে কর খর্ব। এই হচ্ছে সত্য, এই হচ্ছে সভ্যতা, এরই নাম সংস্কৃতি এবং কৌশিকবাবু সকল দ্বিধা ও সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মনে মনে উচ্চারণ করলেন—এরই নাম বৈজ্ঞানিকতা। বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতির বাইরের অমূর্ত কোন কিছু নয়।

এই আবিষ্কারের পর কৌশিকবাবুর মন এক শুচিস্নিগ্ধ মধুরাবেশে ভরে উঠল। আর তাঁর মনে কোন ক্ষোভ নেই, কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ অনুযোগ কিছুই নেই। জীবনের একটা নূতন অর্থ তিনি আজ খুঁজে

পেয়েছেন, বেঁচে থাকার একটা চিরপুরাতন কারণ নূতন করে আবিষ্কার করেছেন কৌশিকবাবু।

আশ্চর্য, এমন একটা জাজ্বল্যমান সত্য এতদিন তাঁর উপলব্ধিতে ধরা পড়ে নি। নিজের মনেই ঈষৎ হাসির ছোঁয়া লাগে তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে। দীর্ঘ দিন ধরে কত বড় ভ্রম নিয়ে মানুষ ঘর করতে পারে! যে সত্য জীবনবায়ুর মত সর্বদা চতুর্দিক থেকে জীবনীশক্তি সঞ্চার করছে, যে সত্য পৃথিবীর সৌর পরিক্রমার মত বা সূর্যের আকর্ষণ বিকর্ষণের মত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সতত ক্রিয়াশীল, তার জ্ঞানলাভ করতে এত দিন লাগল! পার্টি আজ তাঁকে পার্জ করার জন্য এই ভাবে বিচারসভার আয়োজন না করলে আরও কত দিন কলুর বলদের মত চোখে ঠুলি বেঁধে ঘুরে বেড়াতে হত, কে জানে? নিজের প্রতি প্রেমের অভাব দেখেই বোধ হয় আজ তিনি প্রেমশক্তি সম্বন্ধে এমন সচেতন হতে পেরেছেন। সর্বদা শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি বলে আমরা বায়ুর অস্তিত্ব ও গুরুত্ব অনুভব করতে পারি না; কিন্তু এক মুহূর্ত বায়ু বন্ধ হলেই শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিদ্রোহী হয়ে প্রাণবায়ুর মহার্ঘতা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তোলে।

গভীর মানসিক প্রশান্তির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ভিতর অদ্ভুত একটা চাঞ্চল্য ও ক্ষিপ্রতা অনুভব করলেন কৌশিকবাবু। তাঁর মন যেন চীৎকার করে উঠল, লিভ অ্যাণ্ড লেট লিভ—বাঁচ এবং বাঁচতে দাও। না—শুধু বাঁচতে দাও নয়, বাঁচাও। অপরের শুভাশুভের ব্যাপারে কেবল নিরপেক্ষ নিষ্ক্রিয় দর্শক নয়, সক্রিয় সহযোগীর ভূমিকা নেবার মহত্তর ইঙ্গিত রয়েছে এতে। এলসি পুঁজিপতি, তাই সর্বহারার প্রতিনিধির সঙ্গে শত্রুতার সম্বন্ধ—এত দিনের এই শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করে এই জন্যই তো কাল তাঁর ইনস্টিংক্ট বা সহজ বৃত্তি ওকে রক্ষা করার প্রয়াস করেছিল। তাঁর চেতন মন যাকে বৈরী জ্ঞান করেছে, অচেতন মন অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রকৃতি তাকেই রক্ষা করার জন্য তৎপর হয়েছে। এলসিকে রক্ষা করতে আগুয়ান হওয়ার জন্য যুক্তির প্রয়োজন হয় নি, কনডিশানড রিফ্লেক্স তাঁকে দিয়ে তাঁর স্বাভাবিক কার্য পালন করিয়ে নিয়েছে।

অকস্মাৎ এলসির মুখচ্ছবি তাঁর মনের পটে ভেসে উঠল। সেই বিষণ্ণ বিধুর অনুপম মুখারবিন্দের ঈষৎ হাসি, টানা টানা ভ্রুর নীচে নীল চোখের অতল গভীর রহস্য। টিকালো নাকটির নীচে পদ্মদলের মত গোলাপী বর্ণের অধরোষ্ঠ কী এক অব্যক্ত দুঃখে সর্বদা মুহ্যমান। রক্তিম গণ্ড, নিখুঁত চিবুক ও

তার নীচে সেই মরাল গ্রীবা। কী যেন চায় অথচ মুখ ফুটে তা ব্যক্ত করতে পারে না, অনেক ইচ্ছা নিয়ে কাছে এগিয়ে আসে অথচ তা প্রকাশ করতে না পারার অক্ষমতার লজ্জায় নিমেষে আবার দূরে সরে যায়। ঈষৎ চেনা আর অধিকাংশই অজানা ঐ বিপুল বিস্তার রহস্য পাথার।

কিন্তু বেশীক্ষণ এলসির কল্পনায় কাটাতে পারেন না কৌশিকবাবু। আচম্বিতে বিভাসকে সম্বোধন করে উচ্চারিত কমরেড আহমদের শেষের দিকের কথাগুলি একটা নূতন অর্থ নিয়ে তাঁর কর্ণপটাহে আঘাত করে—কমরেড তোমার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ তো, মুর সাহেবের জমাদার—কি যেন নাম বলেছিলে তার, তোমার প্ল্যান মত কাজ করেছে তো? ঐ গূঢ় অর্থব্যঞ্জক কথার তাৎপর্য কৌশিকবাবু উপলব্ধি করতে পারেন। দীর্ঘকাল তিনি পার্টিতে আছেন এবং এই জাতীয় বহু ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি। সুতরাং কমরেড আহমদ ও বিভাসের চিন্তাধারা কোন্ দিকে কাজ করছে, তা অনুমান করে নিতে তাঁর বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। কিন্তু উপায় কি, কি ভাবে এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? ঘরের একটি মাত্র দরজায় তো বাইরে থেকে শিকল বন্ধ। তা হলে বাইরে বেরোবার উপায় কি? আর বেশী দেরি করলে তাঁর প্রচেষ্টার কোন মূল্য থাকবে না। কারণ পার্টির কোন কমরেড তাঁদের কাজ বাকী ফেলে রাখেন না।

কৌশিকবাবু যেন অকস্মাৎ উন্মত্ত হয়ে পড়লেন। বন্দীদশা ঘোচাবার উপায় খুঁজে না পেয়ে তাঁর পায়ের বেগ দ্বিগুণিত হয়ে গেল। মনের অধীর উত্তেজনা চলার মাধ্যমে প্রকাশ পেল। দুম্ দুম্ করে তিনি উন্মত্তের মত পা ফেলে চলতে লাগলেন। আর মনের ভিতরকার প্রচণ্ড আলোড়ন তাঁর সমগ্র চিন্তা-ভাবনাকে তোলপাড় করতে লাগল। কি করে মুক্তি পাওয়া যায়? কেমন ভাবে তাঁর জীবনদাত্রী ঐ নিরপরাধ সরলা ভদ্রমহিলাকে আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া যায়। কি বিপুল নির্ভরতায় এলসি কাল রাত্রে নিজের অর্ধচেতন দেহবল্লরী তাঁর বক্ষে এলিয়ে দিয়েছিল! ঐ কমনীয় দেহের কোমল স্পর্শের ভিতরও কী খর উত্তেজনা! তার পর—তার পর ইন্দুবাবুদের বাড়ি যাবার মোড়ের মাথায় এসে বিদায় নেবার সময় কী আন্তরিকতা মণ্ডিত মধুনিষ্যন্দ স্বরে বলা, আজ আপনার জন্যই প্রাণ ফিরে পেয়েছি। কানের ভিতর জলতরঙ্গের সুমিষ্ট ধ্বনির মত এখনও যেন এলসির কণ্ঠস্বর বাজছে। সরলতার প্রতিমূর্তি এক মুঠো রজনীগন্ধার মত স্নিগ্ধ সুরভিমাখা ঐ মহিলাকে রক্ষা করার কোন উপায়ই কি নেই?

পাশের ঘরে ওরা কি ষড়যন্ত্র করছে কে জানে? মাঝে মাঝে মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া গেলেও কথাবার্তা অনুধাবন করার উপায় নেই। কৌশিকবাবু রুদ্ধনিশ্বাসে দরজার উপর কান পেতে রইলেন। মচ্ মচ্ মচ্, মচ্ মচ্ মচ্—কয়েক জনের পদশব্দ এগিয়ে আসছে। এই—এই বুঝি দরজার সামনে থেমে শিকল খুলবে। এক দুই তিন—না। খুলল না তো! পদশব্দে কোন রকম ছেদ পড়ল না। মানুষগুলি এই বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে গেল। বাইরে মোটরের গর্জন শ্রুতিগোচর হল। কিন্তু তাঁকে একা এখানে বন্দী করে রেখে আর সকলে চলে গেল নাকি? না, পাশের ঘর থেকে কথাবার্তা বলার মৃদু গুঞ্জন এখনও ভেসে আসছে। সবাই যায় নি তা হলে।

এলসিকে বাঁচাতে হবে, এলসিকে সতর্ক করে দিতে হবে—এবং অতীব সত্বর। কিন্তু কি ভাবে? কৌশিকবাবু ভেবে কোন কূলকিনারা পান না। অবরুদ্ধ উত্তেজনায় অধীর হয়ে আবার তিনি পায়চারি শুরু করেন। তবে কি কোন উপায় নেই? তাঁর নিজের জীবন না হয় গেলই। কিন্তু ফুলের মত নির্দোষ নিরীহ এক মহিলাকে অন্যায় ষড়যন্ত্রের কবল থেকে তিনি কি রক্ষা করতে পারবেন না? বিশেষ যাঁর দয়ায় তিনি পুনর্জন্ম লাভ করেছেন? ঘরের ঐ বন্ধ দরজার মত এখান থেকে কৌশিকবাবুর মুক্তি পাবার সকল পন্থাই কি রুদ্ধ? হতাশ হয়ে কৌশিকবাবু দুই হাতে জানালার দুটি গরাদ ধরে তার উপর নিজের অবশ মাথা চেপে ধরেন। তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়ে আতঙ্কের এক হিমানী স্রোত বয়ে যায়।

হঠাৎ খুট্ করে একটু চাপা শব্দ হতেই কৌশিকবাবু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরে তাকান। তবে কি তাঁর মৃত্যুপরোয়ানা এসে গেল? এত তাড়াতাড়ি সব শেষ?

কৌশিকবাবুর উদ্দাম হৃৎপিণ্ড তাঁর বক্ষপঞ্জরে যেন মাথা কুটছে। ধূমায়িত লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোক সত্ত্বেও দরজার গোড়ায় দণ্ডায়মান মনুষ্য মূর্তিটিকে চিনতে পেরে বিস্ময়ে তাঁর মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসে।

দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মীনাক্ষী কৌশিকবাবুর কাছে এগিয়ে এসে তাঁর মুখের উপর নিজের তর্জনী চেপে ধরে। কৌশিকবাবু এ ইঙ্গিতের অর্থ জানেন। তাই কোন কথা বলেন না। নীরবেই মীনাক্ষী কৌশিকবাবুর হাত ধরে এগিয়ে চলে। কৌশিকবাবু সম্মোহিতের মত সেই রহস্যময়ীর অনুবর্তী হন।

মুক্ত—মুক্ত—এবার কৌশিকবাবু সম্পূর্ণ মুক্ত। মাথার উপর প্রবল বর্ষণ আর বিশ্বপ্রকৃতি তোলপাড় করা ঝোড়ো হাওয়া সত্ত্বেও কৌশিকবাবু মুক্তির উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

মীনাক্ষী উত্তেজিত কণ্ঠে বলছিল, "কাল গাড়ি ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে বিভাসদাকে আপনার কামরার একটু দূরে আর একটি কামরায় উঠতে দেখেই চমকে উঠেছিলাম। তাঁর তো রাখামাইন্‌সে আসার কোন কারণই থাকতে পারে না। কিন্তু আপনাকে সাবধান করে দেবার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিল। কাল সারা-দিন-রাত ধরে মনের সঙ্গে লড়াই করার পর আজ শেষ কালে ভোলানাথদাকে সব খুলে বললাম—মানে পার্টির কথাও। বলে আপনাকে সাবধান করার জন্য এখানে আসার প্রস্তাব করলাম। উনিও সমর্থন করলেন। সন্ধ্যার সময় এখানে পৌঁছে আপনার হোস্টেল হয়ে বিভাসদার বাড়িতে পৌঁছেই শুনি আপনার বিচার-সভা চলছে। তার পর থেকে লুকিয়ে থেকে সুযোগ খুঁজছিলাম। এবার ওদের বেশীর ভাগ বেরিয়ে যেতেই সাহস করে ঢুকে পড়লাম। আর তার পর···"

"তার পর তো আমি জানিই।" সস্নেহে কথা কয়টি উচ্চারণ করতে করতে কৌশিকবাবু মীনাক্ষীকে কাছে টেনে নিলেন।

"কিন্তু আর দেরি করা চলবে না কৌশিকদা। ওরা মিস মূরকেও মারার ষড়যন্ত্র করেছে। মানুষের বিরুদ্ধে—ভগবানের বিরুদ্ধে ওদের এই ষড়যন্ত্রকে সফল হতে দেওয়া চলবে না।" মীনাক্ষী ব্যগ্র কণ্ঠে বলে।

কৌশিকবাবু ওর কথার প্রতিধ্বনি তোলেন, "না, কিছুতেই না।" প্রবল ঝড় জল মাথায় করে ঘন অন্ধকারের মধ্যেই তাঁরা মাঠের পথে মোহনপুরের অভিমুখে ছুটে চলেন। আর সেই মুহূর্তেই আবার গুড় গুড় করে মেঘ ডেকে উঠে ওদের যেন অভিনন্দিত করে।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

নীল শেডের বাতির নয়ন-স্নিগ্ধকর আলোক জলছে এলসির শয্যা-গৃহে। দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় রূপকথার রাজকন্যার মত মত বর-তনু এলিয়ে দিয়ে সুপ্তির ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করেছে সে। বাইরের রুদ্র প্রকৃতির ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে থেকে থেকে তার কুন্দশুভ্র নেটের মশারি হিল্লোলিত হচ্ছে। ও যেন কন্যার চতুর্দিকস্থ ক্ষীরসায়রের তরঙ্গলহরী।

এলসি স্বপ্ন দেখছে। কোথায় কোন্ সুদূর প্রান্তের এক নির্জন বনানীর মাঝখানে তার গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। আর মাথার উপরের বৃক্ষশাখা থেকে এক বিশালকায় অজগর লাফিয়ে পড়ে তার দীর্ঘ সর্পিল দেহের পাকে পাকে এলসিকে জড়িয়ে ধরে পিষ্ট করে ফেলার উপক্রম করেছে। কী দুঃসহ শ্বাসরোধকর পরিস্থিতি আর অসহ্য বেদনা মণ্ডিত মৃত্যু-যন্ত্রণা। দেখতে দেখতে ঐ কুৎসিত জীবটি ওর সমগ্র চেতনাকে অভিভূত করে দিয়ে তার করাল বদন ব্যাদান করে এলসির মুখের দিকে এগিয়ে এল। কী ভীষণ কুটিল দৃষ্টি ঐ ক্ষুদ্রাকৃতি চোখ দুটিতে। বিশ্বের সমস্ত আক্রোশ আর লোভের সমাবেশ হয়েছে ঐ পল্লববিহীন অপলক অক্ষি-গোলক দুটিতে। লক্ লক্ করে চেরা জিভটি লালসা মাখা মুখ-বিবর থেকে বেরোচ্ছে আর ঢুকছে। ওর মুখের ভিতর দুই পাটিতে যে দুই সারি তির্যক দশনপংক্তি রয়েছে, তার সূচীতীক্ষ্ণ অগ্রভাগগুলি বহুদিনলালিত কামনা পরিপূর্তির সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হওয়ায় যেন ক্রুর উল্লাস্যে অট্টহাস্য করছে। আর ঐ ভুজঙ্গরাজের নিশ্বাস? প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসে মেঘগর্জন করছে। সাক্ষাৎ কৃতান্ত যেন গুরুগম্ভীর গর্জনে চতুর্দিক মুখরিত করে সম্মোহিতা এলসির সম্মুখীন হয়েছে।

কিন্তু বাঁচার কি কোন উপায় নেই? এলসির সমগ্র সত্তা চীৎকার করে আর্তনাদ করতে চাইছে—বাঁচাও, বাঁচাও, কে কোথায় আছ বাঁচাও। কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে ভীতিমিশ্রিত একটা হিস্ হিস্ ধ্বনি ছাড়া আর কিছু বেরোচ্ছে না। কে বাঁচাবে? ঐ তো একটু দূরে অসহায়ের মত ডিউক দাঁড়িয়ে আছে। থেকে থেকে ঘেউ ঘেউ করে আর্ত রব বার করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছে না ওর অনুগত সারমেয়টি। ওর চোখে মুখে ভীতিমণ্ডিত কাতরতা। আর একটা মৃদু সুরেলা কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। কোন্ মহাসিন্ধুর পার থেকে ঘুমপাড়ানী গানের মৃদু গুন্‌গুনানির মত অমিতার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে—সুদূর কোন্ নদীর পারে, গহন কোন্ বনের ধারে, গভীর কোন্ অন্ধকারে হতেছ তুমি পার। কিন্তু ও তো কেবল দূরাগত কণ্ঠস্বর, দেহধারী এমন কেউ ধারে কাছে নেই যে এলসিকে রক্ষা করতে পারে।

মৃত্যুদূত অনিবার্য গতিতে হেলে দুলে এগিয়ে আসছে। এবার থেকে থেকে ওর চেরা জিভের হিম শীতল স্পর্শ অনুভব করছে এলসির ললাট নাসিকা ও গণ্ডদেশ। আর বুঝি উপায় নেই। কিন্তু ঐ—ঐ কার রুদ্র হুঙ্কার শোনা গেল। সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝা ঘুর্ণিবাত্যা উপেক্ষা করে দুর্মর দুর্বার বেগে

ও কোন্ ত্রাণকর্তা ছুটে আসছে? শত প্রাকৃতিক দুর্যোগেও ওর পদস্খলন হচ্ছে না, আকাশের সমস্ত বজ্র ও বিদ্যুৎ তাকে তার নিশ্চিত সঙ্কল্প থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে অক্ষম। দিগ্‌দিগন্ত মন্দ্রিতকারী অভয় বাণী উচ্চারণ করতে করতে ঝটিকার চেয়েও প্রবল বেগে, মেঘগর্জনের চেয়েও উচ্চতর স্তননবৎ সেই কম্বু কণ্ঠে মাভৈঃ মাভৈঃ রব ছাড়তে ছাড়তে ও তার কোন্ রক্ষাকর্তা ওর দিকে ধেয়ে আসছে? এত দূর থেকেও তাঁর অঙ্গের প্রতিটি রেখা স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছে এলসি। শালপ্রাংশু মহাভুজ বুঢ়োস্কন্ধ গৌরবর্ণ আদর্শ পুরুষ। ললাটে কয়েক সারি বলিরেখা এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশির মাঝে মাঝে শুভ্রতার প্রলেপ। দীর্ঘায়ত অক্ষি-পল্লবের নীচে টানা টানা স্বপ্নাঞ্জন-শোভিত চক্ষু, যার দৃষ্টি এই পৃথিবীতে থাকলেও বহু দূরের মহাকাশাগত নক্ষত্রের আলোকশিখার মত মনে হয়। পুরুষোচিত উন্নত নাসিকা এবং তার নীচে দৃঢ় সঙ্কল্পদ্যোতক চাপা অধর ও ওষ্ঠ। ও মূর্তি তো এলসির একান্ত পরিচিত। কত দিন কত রাত্রির নিভৃত মুহূর্তে মনের দেউলে ওর আরতি করেছে এলসি। ঐ—ঐ তো আসছে ওর পরিত্রাতা।

গুম্ গুম্ গুম্—ঐ বুঝি ওর মৃত্যুবর্ষী অগ্নিনালিকা অব্যর্থ লক্ষ-সন্ধানে এলসির শমনের ঔদ্ধত্যের সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়েছে। কুৎসিত জীবটির লোভাতুর দৃষ্টির কামনাবহ্নি নিমেষে নিভে গেল, সমস্ত শরীর থেকেই বুঝি ঐ মৃত্যুশীতল পিচ্ছিল আলিঙ্গনপাশ শিথিল হয়ে আসছে।

গুম্ গুম্ গুম্। আবার গুম্ গুম্ গুম্। এ কী, এখনও ওর নায়ক গুলি চালাচ্ছে নাকি? আর তো প্রয়োজন নেই এর। কিন্তু তথাপি চতুর্দিক মুখরিত করে থেকে থেকে গর্জন উঠছে—গুম্ গুম্ গুম্। আবার—আবার গুম্ গুম্ গুম্।

এলসির ঘুম ভেঙ্গে গেল। ওঃ কী ভীষণ দুঃস্বপ্ন! এখনও বুকের ভিতরটা ভয়ে আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু একি, আবার গুম্ গুম্ গুম্, গুম্ গুম্ গুম্! এ তো স্বপ্ন নয়। উত্তেজনায় ঠোঁট কামড়ে এলসি বিছানার উপর উঠে বসল। ঐ—ঐ—ঐ তো কে বদ্ধ ঘরের দরজায় উন্মত্তের মত আঘাত করছে—গুম্ গুম্ গুম্, গুম্ গুম্ গুম্। এই তো এলসি জেগে রয়েছে, আর বাইরে ঝড় বৃষ্টি ও মেঘের গুরু গুরু গর্জন ভেদ করে স্পষ্ট ওর কানে দরজায় প্রচণ্ড শক্তিতে ধাক্কা দেবার শব্দ ভেসে আসছে। আর দেরি করা চলে না।

দরজা খুলে দিতেই একরাশ জলসিক্ত দমকা হাওয়া শিস্ দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। মুহূর্তেই ঘরের সব কিছু ওলট পালট হয়ে গেল যেন। নীল শেডের বাতিটি দপ্ দপ্ করতে করতে কোন মতে সামলে নিল। আগন্তুক ততক্ষণে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

"শিগ্‌গির, শিগ্‌গির করুন মিস মূর। আর দেরি করবেন না। আপনাদের চতুর্দিকে ভীষণ বিপদ।" জল ও কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে কৌশিকবাবুর সর্বাঙ্গ। কপালের একটা কোণ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। পরিধেয় থেকে বড় বড় বিন্দুতে জল চুঁয়ে পড়ছে। এ কী বিচিত্র বেশভূষায় এমন অসময়ে এক অসম্ভব স্থানে ওঁর উপস্থিতি!

তাড়াতাড়িতে শোবার পোশাকেই এলসি উঠে এসেছিল। দুঃস্বপ্নের ঘোর তখনও ওর দেহে মনে রয়েছে। তার উপর এই অভাবনীয় পরিস্থিতি—উত্তেজনার উপর উত্তেজনা। অবরুদ্ধ স্বরে সে কেবল বলল, "এ কি, এমন সময় আপনি এখানে?"

"আর সময় নেই মিস মূর। চিন্তা ভাবনার অনেক সুযোগ পাবেন পরে। এখন প্রাণ বাঁচান আগে। আপনাদের চতুর্দিকে প্রচণ্ড বিপদ।"

এ কি বলছেন কৌশিকবাবু! এত রাত্রে এই দুর্যোগের মধ্যে এই অবস্থায় ওর শয়নকক্ষে উপস্থিত হয়ে ভদ্রলোক এসব কি বলে চলেছেন? বিপদ—কিসের বিপদ, কার জন্য বিপদ?

অন্তরের উদ্বেগ কোন মতে চেপে রেখে এলসি প্রশ্ন করল, "আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কৌশিকবাবু।"

ব্যগ্র ভাবে কৌশিকবাবু বললেন, "আমাদের পার্টি আপনাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, প্রচণ্ড ষড়যন্ত্র—মারাত্মক ষড়যন্ত্র। ওঃ, এখনও বুঝতে পারছেন না? আপনাদের খাদানের ধর্মঘট আমাদের পার্টির নির্দেশে আমিই শুরু করেছিলাম। কিন্তু এখন ধর্মঘট ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হওয়ায় পার্টি চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চলেছে।"

এলসির বুদ্ধিশুদ্ধি সবই বুঝি লোপ পেয়ে গেছে। নিজের চোখ-কানকেও আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। এ কি শুনছে সে, এ কি দেখছে? এ সব কি সত্য? গুড় গুড় গুড় গুড় করে বাইরে গম্ভীর স্বরে মেঘ গর্জন করে উঠল। বিদ্যুতের আলোকোজ্জ্বল লেখা সমস্ত গগন আলোকিত করে ক্ষণকালের জন্য জ্বলে উঠল। তারই তীব্র চোখ-ধাঁধান আলোতে এলসি দেখল তার সামনে স্বপ্ন কল্পনা কিছুই নয়, রয়েছেন কৌশিকবাবু তাঁর রক্ত

মাংসের শরীর নিয়ে। জলে ভিজে কাদায় মাখামাখি হয়ে এই দুর্যোগের অন্ধকারে এতটা পথ অতিক্রম করার উত্তেজনার ছাপ তাঁর দেহে থাকলেও এলসির সম্মুখে বিস্রস্ত বেশবাসে দণ্ডায়মান অপ্রত্যাশিত আগন্তুক কৌশিকবাবু ছাড়া আর কেউ নন। চকিতে এলসির ওর বাবার দুপুর বেলার সেই কথাটা মনে পড়ে গেল—আমাকে হুডউইংক করবে কি না একটা স্কুল-টীচার!

"কিন্তু কেন, নিজেকে এমনি করে বিপন্ন করে আপনি আমাকে বাঁচাবার জন্য ছুটে এলেন?" বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে এলসি বলল।

কেন, কেন? এ তো বড় কঠিন প্রশ্ন। চড় চড় চড়াৎ—আবার সৌদামিনীর ঝলক। কৌশিকবাবুর সম্মুখে এলসি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর নীল অক্ষিতারকা দুটিতে কী গভীর দৃষ্টি—ঢল ঢল রমণীয় মুখের ঐ কমনীয় দৃষ্টিতে কত অব্যক্ত ভাবাবেগ ক্রিয়া করছে। টিকালো নাকের নাসারন্ধ্র দুটি উত্তেজনা-প্রসূত দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসের ফলে ঈষৎ বিস্ফারিত; গোলাপ দলের মত ঠোঁট দুটি থেকে থেকে ঈষৎ কাঁপছে—বুঝি কি বলতে গিয়েও বলতে পারছে না ওরা। কৌশিকবাবুর সম্মুখে দণ্ডায়মানা অভাবনীয়ের আঘাতে পর্যদস্ত নায়িকা টেনে টেনে গভীর শ্বাস গ্রহণ করছে আর স্বল্পবাসের অন্তরালে তার উচ্ছ্রিত বক্ষ তালে তালে ওঠানামা করছে। কৌশিকবাবু মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির দৃষ্টিতে তাঁর নায়িকার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

দেখতে দেখতে সেই নীলোৎপল অক্ষি যুগলের কোণে দুই বিন্দু মৌক্তিক জমে উঠল। ঘরের ঈষৎ নীলাভ আলোকে সেই শুভ্র বিন্দু দুটি চক্ চক্ করতে লাগল আর তার পর এক সময় গলিত ধারায় এলসির রক্তিম গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

কান্না—কেন এই কান্না, কিসের এই অশ্রুজল?

সহানুভূতিতে কৌশিকবাবুর হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠল। আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি দুই পা এগিয়ে গিয়ে সেই মূর্তিমতী বিষাদপ্রতিমার মৃণাল-বৃন্তবৎ যুগল বাহু স্পর্শ করে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, "একি তুমি কাঁদছ কেন, কি হয়েছে তোমার?"

থর থর কম্পিত তনুলতা কৌশিকবাবুর সুপ্রশস্ত বক্ষপটে এলিয়ে দিয়ে ব্যথাকুল বিকৃত কণ্ঠে এলসি কেবল উচ্চারণ করল, "কেন নিজেকে এমনি ভাবে বিপন্ন করে ছুটে এলে তুমি?" তার পর আত্মবিস্মৃতের মত তাঁর কাঁধে মাথা রেখে আবার ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল এলসি।

আবার সেই প্রশ্ন—কেন, কেন এভাবে ছুটে এসেছেন কৌশিকবাবু?

মুহূর্তে কৌশিকবাবুর ভিতর আকাশের সমস্ত বজ্র গর্জন করে উঠল, সমস্ত বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। প্রলয়ঙ্কর সপ্ত সমুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য শুরু হল তাঁর মস্তিষ্কের কোষে কোষে আর প্রতিটি স্নায়ু কেন্দ্রে। উন্মত্ত আবেগে এলসির সুকুমার দেহবল্লরীকে অধীর দুই বাহুর আলিঙ্গনে বন্দী করে নিজের বক্ষে নিষ্পেষিত করতে করতে তিনি তার অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল চুম্বনে চুম্বনে প্লাবিত করে দিলেন।

গুম্ গুম্ গুম্, গুড়ুম গুম্-ম্-ম্। এলসির দেহ কৌশিকবাবুর বক্ষের ভিতরই প্রবল ভাবে শিহরিত হয়ে উঠল। সে আর্তনাদ করে উঠল, "ও কি? খাদানের দিকে ও কিসের শব্দ হচ্ছে?"

কৌশিকবাবু কিছুক্ষণের জন্য বুঝি বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। অকস্মাৎ তাঁর দেহে মত্ত মাতঙ্গের বল সঞ্চারিত হল। এলসিকে দুই হাতে করে বুকের উপর তুলে নিয়ে তিনি চক্ষের নিমেষে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পর মুহূর্তেই মূর সাহেবের বাংলোর উঁচু বারান্দা থেকে নীচের লনে লাফিয়ে পড়লেন তিনি।

"ড্যাড— ড্যাড রয়ে গেল যে কৌশিক।" এলসি আর্তনাদ করে উঠল।

এলসিকে লনে নামিয়ে রেখে একলম্ফে কৌশিকবাবু আবার বাংলোর মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম— বজ্র নির্ঘোষে দিগ্বিদিক প্রকম্পিত করে সেই মুহূর্তে বিকট শব্দে পর পর তিনটি বিস্ফোরণ ঘটে গেল। আর তার প্রকোপে মোহনপুরের টিলার উপরিস্থিত মূর সাহেবের বাংলোর ইঁট কাঠ লোহা আর মাটি আর্তনাদরতা এলসির চোখের সামনে নিমেষের মধ্যে কোটি কোটি খণ্ডে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ঊর্ধ্বাভিমুখে উৎক্ষিপ্ত হল। পলকের প্রলয়ের অবসানে ওখানে এক ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই রইল না।

* * *

টিলার নীচে স্বাহা তখনও উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। কমরেড আহমদের কাছে তখন এর জন্য প্রস্তাব করা আর এখন এর বাস্তব রূপায়নের মধ্যে কী অকল্পনীয় ব্যবধান! কিন্তু— কিন্তু এ ছাড়া তো কৌশিককে ফেরাবার আর কোন উপায় ছিল না। এখন যদিও সেই কর্ণপটাহ-বিদারক বিস্ফোরণের আওয়াজ নেই, কিন্তু কানের ভিতর থেকে থেকে তারই প্রতিধ্বনি উঠছে— গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্, গুড়ুম্ গুম্-ম্-ম্। আর নীড়ভ্রষ্ট বায়সকুল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পাখা ঝাপটিয়ে কা কা রবে কাতর আর্তনাদ করছে।

জিপটা এসে টিলার গোড়াতেই দাঁড়াল। কয়েক জন অনুচর পরিবৃত কমরেড আহমদ বর্ষাতিতে সমস্ত অঙ্গ ঢেকে দীর্ঘ পদক্ষেপে স্বাহার কাছে এসে ওর পিঠ চাপড়ে বললেন, "ওয়েল ডান কমরেড। আপনার প্রচণ্ড মানসিক বল ও এই অসমসাহসিকতার কথা পার্টির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। কমরেড বিভাসও ভাল কাজ করেছে। মাসখানেকের আগে আর খাদান কাজের উপযোগী হবে না। মুর সাহেবের বারুদখানার চাবিটা ওঁদের জমাদার মারফত বিভাসই বুদ্ধি করে হাতিয়েছিল। সে কথা এখন থাক। চলুন এবার, আর দেরি করা উচিত নয়।"

কথা বলতে বলতে ওঁরা জিপের জলন্ত চক্ষু দুটির সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। রক্তবর্ণ চক্ষুর ঘোলাটে দৃষ্টি তুলে জড়িত স্বরে স্বাহা প্রশ্ন করল, "ও কই— কৌশিক ?" বৃষ্টিতে ভিজে স্বাহার শাড়ি ব্লাউজ দেহের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। ভিজে চোখ মুখের উপর জলসিক্ত চুল কোথাও কোথাও গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে চেপে বসেছে। সব মিলিয়ে যেন ভূতাবিষ্টের মত আকৃতি।

"কৌশিকবাবু— উনি তো কমরেড বিভাসের ঘর থেকে পালিয়েছেন। আমরা এখানে আসার সময় কমরেড আহমদের নির্দেশ পালন করার জন্য দরজা খুলে দেখি উনি নেই।" গাড়ির ভিতর থেকে কে যেন জবাব দিল।

"নেই, কোথায় গেল তবে ?" স্বাহার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ যেন হাহাকার করে ওঠে।

"ঐ ওখানে, মুর সাহেবের বাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে।" জমাট অন্ধকারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে নিরাসক্ত ভঙ্গীতে বিভাস কথাগুলি উচ্চারণ করে।

"কি— কি বললে ?" আকাশ বাতাস মুখরিত করে স্বাহার বুক-ফাটা কান্না বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

এক ঝটকায় কমরেড আহমদ স্বাহাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ড্রাইভারের পাশের আসন দখল করলেন। তার পর কঠিন কণ্ঠে হুকুম করলেন, "এ সব সেন্টিমেণ্টের প্রশ্রয় দিলে পার্টির কাজ চলে না। চালাও সন্তোষ সিং। এবার সিংভূমের দক্ষিণ কোণে গুয়ার লোহা পাথরের পাহাড়ে আবার নূতন করে যবনিকা উঠবে।"

ক্লাচ, গিয়ার। যন্ত্রের কর্কশ ক্রুদ্ধ গর্জনে এক মানবীর করুণ কান্না চাপা পড়ে গেল।